সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক

গোলাম মুরশিদ

সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক

১৮৫৪-১৮৭৬

Kolloi Book Center

সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক
১৮৫৪-১৮৭৬

গোলাম মুরশিদ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

কল্লোল বুক সেন্টার
Kollol Book Center

প্রথম সংস্করণ:
ফাল্গুন ১৩৯০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

বা.এ. ১৪০৫
মুদ্রণ সংখ্যা: ২২৫০ কপি

পাণ্ডুলিপি: সমাজবিজ্ঞান, কলা, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশনায়
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে: ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ: ওবায়দুল ইসলাম

মূল্য: [redacted] (৫ মার্কিন ডলার)

SAMAJ-SANSKAR ANDOLON O BANGLA NATAK, 1854-1876 (Social Reform Movement and Bengali Dramatic Writings), by Ghulam Murshid, Published by Bangla Academy, Dhaka-2, Bangladesh. February, 1984
Price: Tk. [redacted] (5 U.S. Dollar)

উৎসর্গ

আমার মা

বেগম তমিজন নেছা (১৯১৮—৬. ৪. ১৯৪৪)

তুমি আজও বেঁচে আছো

আমার শোণিতে

মুখবন্ধ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত (১৯৭৭) আমার পি-এইচ.ডি. থিসিস 'ঊনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজ-সংস্কার সচেতনতার ইতিহাস ও বাংলা নাট্যরচনায় তার প্রতিফলন, ১৮৫৪-১৮৭৬'-এর ওপর ভিত্তি করে বর্তমান গ্রন্থ রচিত। গত শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রতি দেশের শিক্ষিত তথা হিন্দু সমাজের মনোভাব কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং তার ফলস্বরূপ নতুন মূল্যবোধের জন্ম হয়-এটাই এ গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এই আন্দোলনের ফলে বাংলা সাহিত্য, বিশেষত নাট্যসাহিত্য কিভাবে প্রভাবিত হয় এবং নাট্যসাহিত্য আবার কিভাবে এ আন্দোলনকে প্রভাবিত করে, তার আলোচনাও করা হয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ওপর সংস্কার আন্দোলনের এবং সংস্কার আন্দোলনের ওপর রঙ্গমঞ্চের পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপ ও পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টাও করা হয়েছে।

এই নিবন্ধ রচনাকালে আমি আমার গবেষণা-নির্দেশক প্রফেসর David Kopf-এর কাছ থেকে নিরন্তর উৎসাহ এবং সব রকমের উপদেশ লাভ করেছি। তিনি আমার বহু অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছ হতে সাহায্য করেন। তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। আমার খসড়া পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রফেসর সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আহমদ শরীফ, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শ্রীসনৎকুমার সাহা, জনাব আলী আনোয়ার ও জনাব হাসান আজিজুল হক বহু উপদেশ দান করেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, লণ্ডনের ব্রিটিশ মুাজিঅম লাইব্রেরি, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এবং স্কুল অব অরিএন্টাল অ্যাণ্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজ-এর লাইব্রেরি আমাকে কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের জেরক্স্‌ ও মাইক্রোফিল্ম সরবরাহ করেন। ডক্টর আলী আসগর খান দুটি গ্রন্থ হাতে লিখে কপি করে পাঠান লণ্ডন থেকে। এঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রধানত ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থ সহায়তায়ই এসব উপকরণ সংগ্রহ সম্ভব হয়—এজন্যে এ প্রতিষ্ঠানের কাছেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

উপকরণ সংগ্রহে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মুাজিঅমের কাছ থেকে। এর পরিচালক প্রফেসর মুখলেসুর রহমান যে অকৃপণ সহায়তা করেন তার জন্যে তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরি, দিনাজপুর নাজিমউদ্দীন হল, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকেও বহুমূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির 'পুঠিয়া সংগ্রহ' থেকেও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ পেয়েছি। এ সব লাইব্রেরির কর্মচারীদের কাছে সকৃতজ্ঞচিত্তে আমার ঋণ স্বীকার করি।

ইন্‌স্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সংঙ্গে যুক্ত থেকে একাজ করার সুযোগ দান করার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এবং ইন্‌স্টিটিউটের তৎকালীন পরিচালক ডক্টর সৈয়দ আবদুল কাদিরের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

কিছু উপাদান সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেন জনাব সারওয়ার জাহান এবং জে.পি. এমার্ট। তাঁদের কাছে আমি ঋণী।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ইত্যাদিতে বিশেষ সাহায্য করেন জনাব নাজিম মাহমুদ, ইয়াসমীন আনোয়ারী এবং আমার স্ত্রী এলিজা মুরশিদ। পাণ্ডুলিপি টাইপ করেন জনাব বাহার উদ্দীন ও জনাব নবী। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ।

সবশেষে এ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এ গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশের জন্যে আমি নিজেই বেশি দায়ী।

পাদটীকা সম্পর্কে একটি কৈফিয়ৎ

বাংলা পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে বর্ষ ও সংখ্যার পরিবর্তে কেবল সময়ের (বছর ও মাস) উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে বাংলা পত্রপত্রিকায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হয়নি। 'কল্প,' 'বর্ষ,' 'সংখ্যা,' 'খণ্ড,' 'ভাগ' ইত্যাদি এড়ানোর জন্যেই কেবল সময়ের উল্লেখ করা হলো। নাটকের ক্ষেত্রে কেবল অঙ্ক ও দৃশ্যের উল্লেখ করাই প্রামাণ্য রীতি। কিন্তু বাংলা নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি পালিত হয়নি। কেউ কেউ অঙ্ক ও দৃশ্যের বদলে 'রঙ্গভূমি,' 'সংযোগস্থল,' 'সন্ধিস্থল' ইত্যাদি নামে তাঁদের নাটককে বিভক্ত করেন। এ কারণে নাটকের বেলাতে কেবল পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ করা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৫ বৈশাখ, ১৩৮৮

গোলাম মুরশিদ

সূচীপত্র

সংকেত (এগার)

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

১. পুনর্বিবাহ : বালবিধবাদের দুর্দশা মোচনের আন্দোলন ১২

২. বাংলা নাট্যরচনায় বিধবাবিবাহ সচেতনতা ৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন ৮৯

২. বাংলা নাট্যরচনায় কৌলিন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ক সচেতনতার প্রতিফলন ১১৮

তৃতীয় অধ্যায়

১. কৌলীন্য ও তার অনিবার্য কুফলসমূহ : কন্যাবিক্রয় প্রথা ১৪৭

২. কৌলীন্য ও তার অনিবার্য কুফলসমূহ : আদ্যরস ১৭৪

৩. কৌলীন্য ও তার অনিবার্য কুফলসমূহ : সাপত্ন্য ১৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

১. ইহলৌকিকতার আলোকে বিবাহবিষয়ক সংস্কার ১৯৯

২. বাংলা নাট্যরচনায় বিবাহসংস্কার বিষয়ক সচেতনতা ২৩১

পঞ্চম অধ্যায়

নারীমুক্তি : স্ত্রীশিক্ষা ২৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীমুক্তি : পণরোধ ও বন্দীত্বমোচন এবং সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন ৩০৬

সপ্তম অধ্যায়

স্থিতিশীল ও শোভন সমাজের জন্যে আন্দোলন : পানাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৩৩৮

অষ্টম অধ্যায়

স্থিতিশীল ও শোভন সমাজের জন্যে আন্দোলন : মাদকতা।
ও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৩৮৫

উপসংহার ৪০৮

পরিশিষ্ট ক-ঝ ৪১৯-৪৪৬

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ৪৪৭

দুষ্প্রাপ্য নাটকের আলোকচিত্র ৪৮১

নির্ঘণ্ট ৫০১

সংকেত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	তত্ত্বপ
বামাবোধিনী পত্রিকা	বামাপ
সংবাদপত্রে সেকালের কথা	সসেক
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র	সাবাস
বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ২ খণ্ড	বিধবাবিবাহ
Widow Remarriage Papers	WRP

ভূমিকা

ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন এবং তার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বঙ্গদেশে, বিশেষত রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসে। এর এক পক্ষে ছিলেন শাসক ইংরেজরা, অন্য পক্ষে শাসিত বাঙালিরা। ঔপনিবেশিক পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই শাসিত বাঙালিরা শাসক ইংরেজদের সংস্কৃতির দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হন।[১] উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে এই প্রভাবের মিথস্ক্রিয়ায় নাগরিক বাঙালি সংস্কৃতি এবং মনোভাবে রূপান্তর সূচিত হয়। ঐতিহ্যিক সমাজে এভাবেই প্রথম পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। কলকাতা-কেন্দ্রিক ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক যোগাযোগজাত সমাজ-সচলতাও প্রথাবদ্ধ মূল্যবোধে ফাটল ধরায়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতি যখন এরূপ একটি যুগান্তরের সম্ভাবনায় প্রায় দ্রবীভূত, সে সময়ে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মোহনায় প্রথমে ব্যাপটিস্ট এবং পরে অন্যান্য মতাবলম্বী খৃস্টান মিশনারিগণ এদেশে আগমন করেন। ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মান্তর করাতে না-পারলেও, হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কার এবং অনিষ্টকারী দেশাচার তাঁরা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই আক্রমণের মুখে এদেশবাসীর নিকট দুটি মাত্র পথ উন্মুক্ত ছিলো,—হয় এগুলো পুরোপুরি পরিত্যাগ করা, নয়তো প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধানের আলোকে সংস্কারের মাধ্যমে এগুলোকে রক্ষা করা।

মিশনারিদের সমকালে উইলিআম জোন্‌স্‌, হেনরি কোলব্রুক প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ প্রাচীন ভারতকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে রামমোহন রায় প্রমুখ দেশীয় ব্যক্তিও 'গৌরবোজ্জ্বল' প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে, বিশেষত প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে, মুখ ফেরান। এই শাস্ত্রের আলোকে তাঁরা স্বকালের ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রত্যক্ষ করেন বহু অসঙ্গতি ও অমানবিক আচার। এইভাবেই বঙ্গদেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সূচিত হয়। রামমোহন রায়কেই (১৭৭২-১৮৩৩) সাধারণত এই আন্দোলনের জনক বলা হয়। যেহেতু তিনি

1. J.N.Gray, 'Bengal and Britain ; Culture Contact and the Reinterpretation of Hinduism in the Nineteenth Century, in **Aspects of Bengali History and Society**, ed by R.V.M. Baumer (Hawaii, 1974), pp. 99-101.

১৮১৪ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন, সে কারণে অনেকেই ১৮১৪ সালকে এ আন্দোলনের প্রারম্ভ-কাল বলে চিহ্নিত করেন।[২]

রামমোহনের অনেক আগেই উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মারাঠা, শিখ ও মুসলমানদের মধ্যেও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বঙ্গদেশের আন্দোলনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এই যে, রামমোহনও দেশাচারের কবল থেকে ধর্মকে মুক্ত করার জন্যে প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দেন। বৈসাদৃশ্য এই যে, রামমোহন উজান ঠেলে প্রাচীন কালে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেননি, বরং প্রাচীন শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচন করে সযত্ন সম্পাদনার ও আধুনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন যুগের উপযোগী বক্তব্য পরিবেশন করেন। বেদ, উপনিষদ, বাইবেল প্রভৃতি তিনি ব্যবহার করেন আপন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে।[৩] তবে যুক্তিবাদ ও উদার নৈতিকতার আদর্শ তিনি অনেকাংশই লাভ করেছিলেন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে। সমাজ ও দেশের শোচনীয়তা দূর করার জন্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান যে আবশ্যিক ছিলো, তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।[৪] বস্তুত, বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন উন্মুক্ত ছিলো সকল ধরনের পাশ্চাত্য প্রভাবের সম্মুখে। অপর পক্ষে, অতীতমুখী মারাঠা, শিখ কিংবা ওয়াহাবি আন্দোলন পাশ্চাত্য প্রভাবের মুখে প্রতিক্রিয়াশীলতার একটি নির্মোকে নিজেদের ক্রমশ সংকুচিত করে।

কিন্তু, ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হলেও, পাশ্চাত্যের উনিশ শতকীয় সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের তুলনায় বঙ্গদেশের আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্যের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো দরিদ্র শ্রেণীর, বিশেষত কলকারখানার শ্রমজীবী মানুষের, দুরবস্থা মোচন করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীমুক্তি। বঙ্গদেশে সেকালে কোনো শিল্পবিপ্লব হয়নি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনীয় শ্রমজীবী বা

২. সরকারী উদ্যোগে শিশুহত্যা ও গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন বন্ধ হয় ১৮০২ সালে। সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কেও সরকারী মহলে সচেতনতা দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। প্রকৃত পক্ষে ১৮১৪ সালের আগেই সংস্কারকর্ম শুরু হয়।

৩. S. N. Hay, 'Western and Indigenous Elements in Modern Indian Thought : The Case of Rammohun Roy, in **Changing Japanese Attitudes Toward Modernization**, ed. by M. B. Jansen (Princeton, 1967), pp. 326-27.

৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর ১১ ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখের এবং অজ্ঞাতনামা অপর ব্যক্তিকে লেখা তাঁর ১৮ জানুআরি ১৮২৮ তারিখের পত্রদ্বয়। **The English Works of Raja Rammohun Roy**, pt. IV (Calcutta, 1947), pp. 95-96, 105-08.

প্রোলেটারিয়েট এদেশে তখনো সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এদেশের সমাজ-সংস্কারকগণের লক্ষ্য তাই সম্ভবত নারীমুক্তি। কারণ, সেকালে এদেশের নারীদের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। কেবল যে তাঁদের সামাজিক স্ট্যাটাসই ছিলো অতীব নিম্নমানের তাই নয়; নানা ধর্মীয় আচারের নামে তাঁদের ওপর চলতো অমানুষিক অত্যাচার।

বঙ্গীয় সংস্কারকগণ প্রথমেই দাবি জানান, সতীদাহ নিবারণের। কারণ, এর মতো বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তাঁদের বিবেচনায় আর ছিলো না। সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার পর, এঁরা চেষ্টা করেন বিধবাদের, বিশেষত বালবিধবাদের, ব্রহ্মচর্যের নিষ্করুণ অত্যাচার থেকে বাঁচাতে। কুলীনকন্যাদের দুর্গতি মোচনের জন্য তাঁরা বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিবাহিত জীবনে নারীদের চরম দুরবস্থা দৃষ্টে তাঁরা বাল্যবিবাহ, অসমবয়স্ক বিবাহ, পাত্রপাত্রীর মতামত ব্যতীত বিবাহ, স্বামীর অন্যায় শাসন ইত্যাদি নিবারণেও সচেষ্ট হন। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, অবরোধমোচন, স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের ভদ্র পোশাকের প্রচলন ইত্যাদির মাধ্যমেও নারীদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়াস চলে।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কিংবা সহজিয়াদের মতো জাতিভেদ প্রথা লোপের আন্দোলন না-হলেও, ভদ্র-সমাজে পারস্পরিক মেলামেশায় যেসব জাতিভেদগত দেশাচার বাধা দিতো—সেসব উৎখাত করতেও অনেকে সচেষ্ট হন। পারিপার্শ্বিক সমাজরীতিকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের গোমাংস, মুসলমানের তৈরি পাঁউরুটি, বিস্কিট ভক্ষণের ঘটনা সুবিদিত। এমন কি, দেশাচার অগ্রাহ্য করে কালাপানি পার হওয়া অর্থাৎ সমুদ্রপথে বিদেশ গমন করার এবং পংক্তি ভোজনের বহু দৃষ্টান্তও আলোচ্য-কালে স্থাপিত হয়। এ ছাড়া, বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি জনপ্রিয় দেশাচার ও ধর্মীয় রীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। সমাজ তারও কতকটা সহ্য করে, বোধ হয় স্বীকারও করে নেয়। শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধনী বাবু ও ভদ্রলোকদের পানাসক্তি এবং লাম্পট্যকে সমাজ যে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দান করে,[৫] তা বোধহয় এই মনোভাবেরই

৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ কলকাতার বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের জনৈক কালীপ্রসাদের উল্লেখ করা যায়। কালীপ্রসাদ একটি মুসলমান উপপত্নীর গৃহে কিছুকাল বাস করলে সমাজে হৈচৈ পড়ে যায়। কিন্তু দত্তদের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাবের সামনে সকল আন্দোলন প্রশমিত হয়। কালীপ্রসাদের সমর্থক সেকালের কলকাতার ধনকুবের রামদুলাল দে এ উপলক্ষে, বলেন, জাত তাঁর বাকসের ভিতর। অর্থাৎ অর্থ দিয়ে তিনি অনায়াসে জাত রক্ষা করতে পারবেন। রাজনারায়ণ বসু, **সেকাল আর এ কাল** (কলিকাতা, ১৮৭৪), পৃঃ ২৮-২৯।

রামনাথ বাচস্পতিও জনৈক হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমান পত্নী গ্রহণের কথা বলেছেন। সমাজ এই বিবাহজাত সন্তানদের স্বীকার করে নিয়েছিলো।—A. F. S. Ahmed, **Social Ideas and Social Change in Bengal** (Leiden, 1965) p. 15. কৃষ্ণমোহন

পরিচায়ক। মোট কথা, খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ-হেতু, খানিকটা পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুকরণবশত, খানিকটা নগরায়ণজাত সচলতার ফলে নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কার অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। তবে এর মধ্যে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, পানাসক্তি, লাম্পট্য, জাতিভেদ, প্রভৃতি প্রশ্নে যে সচেতনতা ও আন্দোলনের জন্ম হয় তার তীব্রতা অসাধারণ, ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

এক নতুন ভাবনা ও উদ্দীপনা এই সংস্কার আন্দোলনের সমকালে বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-অঙ্গনকে প্লাবিত করে এবং তার ফলে আধুনিক বঙ্গের উন্মেষ। এই নতুন জাগরণকে বঙ্গদেশের রেনেসান্স বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অনেকেই এই সংস্কার আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৬] এই আন্দোলনের লক্ষ্য, সময়-সীমা, এতে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের ভূমিকা, এই উপলক্ষে আইন প্রণয়নের প্রয়াস, আন্দোলনের ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে এসব রচনায় কমবেশি আলোচনা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে হয়, এইসব আলোচনায় আন্দোলনের প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয় গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করা হয়নি।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বন্ধুরা যে যথেষ্ট মাত্রায় সমাজকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁরা সমাজের প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য ছিলেন।

৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ, **বাংলার নবজাগৃতি** (কলিকাতা, ১৯৪৮); এবং **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** (প্রথম ওরিয়েণ্ট লংম্যান সং; কলিকাতা, ১৯৭৩); যোগেশচন্দ্র বাগল, **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা** (কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৪১-৪২); সুনীলকুমার গুপ্ত, **উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ** (কলিকাতা, ১৯৫৯); শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ** (কলিকাতা, ১৯০৪); N. S. Bose, **Indian Awakening and Bengal** (Calcutta, 1960) ; K. Datta, **Renaissance Nationalism and Social Change in Modern India** (Calcutta, 1965) ; A. Ghosh, **Renaissance in India** (2nd. ed.; Calcutta, 1946) ; A. Gupta (ed.), **Studies in the Bengal Renaissance** (Jadavpur, 1958) ; C. H. Heimsath, **Indian Nationalism and Hindu Social Reform** (Princeton, 1964) ; K. P. Karunakaran, **Religious and Political Awakening in India** (2nd ed. ; Meerat, 1969) ; D. Kopf, **op. cit.** ; B. T. McCully, **English Education and Origins of Indian Nationalism** (New York, 1940) ; A. Mukherjee, **Reform and Regeneration in Bengal** (Calcutta, 1968) ; S. Natarajan, **A Century of Social Reform in India** (Bombay, 1959) ; A. Sen (S. K. Sarkar), **Bengal Renaissance and Other Essays** (New Delhi, 1970).

এই আন্দোলনের সঠিক সময়সীমা কী, এর প্রতি সমকালীন ব্যক্তি ও পত্রিকাসমূহের প্রতিক্রিয়া কী ধরনের, এ আন্দোলনের যথার্থ সাফল্য কতোটুকু, এ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কী ইত্যাদি বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এসব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বিশেষত সংস্কার আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষদের সচেতনতা কী প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়—এসব কৌতূহল পূর্বোক্ত গ্রন্থাদি থেকে চরিতার্থ হয় না। যে বিধবা, কুলীনকন্যা, অশিক্ষিত ও অবরুদ্ধ নারীদের এবং কুলীন ব্রাহ্মণ, মাতাল, লম্পট ইত্যাদির সমস্যা নিয়ে এ আন্দোলন দানা বাঁধে, তাঁরা এ আন্দোলনের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সে মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেছিলো কিনা—এ প্রশ্নের জবাব না-পেলে সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মননের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়। বর্তমান নিবন্ধ সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিনীত প্রয়াস মাত্র। বিশেষত এই আন্দোলনের প্রতি সমাজমানসের সচেতনতার বিবর্তন এবং মনোভাবের স্বরূপ এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই আন্দোলনের সূচনাকাল ১৮১৫ খৃস্টাব্দ, আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করার দিন থেকেই সমাজ সংস্কার সম্পর্কে জনচিত্তে সচেতনতার জোয়ার বইতে শুরু করেনি। বরং হিন্দু কলেজের ছাত্ররা, বিশেষত কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর শিষ্যরা, ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে এ বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা প্রদর্শন করেন।[৭] তাঁরা পিতা-পিতামহদের ধর্ম ও দেশাচার সম্পর্কে ঔদাসীন্য, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অনাস্থা প্রদর্শন করেন। বস্তুত পাশ্চাত্য মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করায় তাঁরা জাতিভেদ প্রথা লোপ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। তবে এটা ছিলো সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবে ব্যতিক্রমধর্মী মনোভাব।

১৮৫০-র দশকে এই সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দশকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃত-শিক্ষিত, রক্ষণশীল কুলীন পরিবারের সন্তান পাঁউরুটি-বিস্কিট খেয়ে জাতিভেদ অস্বীকার (১৮৫১) না করলেও, সংস্কৃত কলেজের দ্বার অবারিত করেন অব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্যে।

৭. Anisuzzaman, 'Young Bengal', **Journal of the Asiatic Society of Pakistan,** Vol. XXII, No. 3 (December, 1967,) p. 371.

ব্রাহ্মণ সন্তান রামতনু লাহিড়ী এ সময়ে উপবীত ত্যাগ করে জাতিভেদ অস্বীকার করেন। প্রায় একই সময়ে হিন্দু কলেজও উন্মুক্ত হয় সকল ধর্মাবলম্বীর জন্যে (১৮৫৩-৫৪)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মধর্মের নামে ঐতিহ্যিক হিন্দু-মূল্যবোধে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন। রংপুরের একজন গ্রাম্য জমিদার আলোচ্য কালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কৌলীন্যবিরোধী নাটক রচনার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন (১৮৫৩)। কলকাতার একজন ধনী শূদ্র এ সময়ে আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাও সংগ্রহ করেন (১৮৫৩)। মোট কথা, ১৮৫৫ সাল থেকে সমাজ-সংস্কারের যে প্রবল বাত্যা নাগরিক হিন্দু সমাজকে দারুণ আলোড়িত করতে থাকে, ১৮৫০-এর দশকের শুরুতেই তার পটভূমিরূপে জনচিত্তে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা জাগ্রত হয়।

১৮৫৪ সালে সচেতনতার নির্ভুল প্রকাশ লক্ষ্য করি কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে। এই বছর কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে কলকাতার 'সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' স্থাপিত হয়। কেবল সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতি গঠনের ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম। এ সভা প্রথম অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সরকারের নিকট বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন প্রণয়নের নিমিত্তে আবেদন করা হোক।

১৮৫৪ সালেই বাংলা ভাষায় প্রথম সমাজ সংস্কার-বিষয়ক নাটক—রামনারায়ণ তর্করত্নরচিত *কুলীনকুলসর্বস্ব* প্রকাশিত হয়। এবং এর পরে রামনারায়ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে বহু নাট্যকার এগিয়ে আসেন। এভাবেই সংস্কারক ও নাট্যকারগণের মিলিত আন্দোলন এ বছর থেকে শুরু হয়।

বিবিধার্থ সংগ্রহের মতো দায়িত্বশীল পত্রিকাও এই বছরই একটি রচনা প্রকাশের মাধ্যমে বিধবাদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য ও তার কঠোরতা বিষয়ে সমালোচনা করে এবং তাঁদের বিবাহের ঔচিত্য স্বীকার করে। নারীজাতি ও পারিবারিক কল্যাণের আদর্শ সামনে রেখে এ বছর প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার *মাসিক পত্রিকা* নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন।

এই পটভূমিতে পরের বছর (১৮৫৫) জানুআরি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অক্টোবর মাসে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, এই মাসে দেশের প্রায় এক সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তি সরকারের নিকট একটি আবেদন প্রেরণ করে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যে দাবি জানান। পরবর্তী

দু দশকে একে একে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পানাসক্তি ইত্যাদি নিবারণের এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্তনের জন্যে উপর্যুপরি আন্দোলনের বহু অভিঘাত সমাজকে বিচলিত করতে থাকে। সমগ্র সমাজে আন্দোলনের ধুয়ো অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ফ্যাশনে পরিণত হয়।

কিন্তু ১৮৫০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকেই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের স্রোতে উল্টার টান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৬০-এর দশক থেকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রকাশ যতো প্রবল হতে থাকে সমাজ সংস্কারের উৎসাহ বিষমানুপাতিকভাবে ততোই হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক স্থাপিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' তেমন সফল না হলেও, ১৮৬৭ সালে স্থাপিত নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' জাতীয়তাবাদের প্রকাশকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। হিন্দু মেলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা সূচিত হয় 'জাতীয় সভা'র মাধ্যমে।

National Paper (১৮৬৫), অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮), মধ্যস্থ (১৮৭২) পত্রিকা ইত্যাদি এ সময়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চর্চাও শুরু করে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে নাটকগুলি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে সেগুলিও ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক অথবা ইংরেজ- এবং যবন- (অর্থাৎ মুসলমান) বিরোধী।

সংক্ষেপে বলা যায়, আলোচ্যকালে একটি রাজনৈতিক সচেতনতা নির্ভুলভাবে প্রকাশ পায়। পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করার জন্যে অতঃপর প্রয়োজন ছিলো একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিএশন' স্থাপন করে এই অভাবও দূর করেন। অতঃপর আত্মসমালোচনামূলক সংস্কার আন্দোলনের পরিবর্তে আত্মগর্বমূলক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৌতূহল এবং মনোযোগ সঞ্চারিত হয়।

১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সমাজ-সংস্কারমূলক, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা কমবেশি এক রকমের ছিলো। বরং সংস্কারমূলক নাটকই বেশি লিখিত হয়। কিন্তু ১৮৭৫ সালের পর সমাজ সংস্কারে নাট্যকারগণ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের ফলে ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনাও নিরুৎসাহিত হয়। ব্যাপক সংখ্যায় রচিত হতে থাকে পৌরাণিক নাটক। তা ছাড়া, এ সময়ে প্রাচীন ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি জনচিত্তে অন্ধভক্তির উদ্রেক হয়। ভক্তিবাদের বন্যাও সংস্কার আন্দোলনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই জন্যেই ১৮৭৬ সালকে আলোচনার শেষ সীমা ধরা হয়েছে।

এই সংস্কার আন্দোলনের, বিশেষত এ আন্দোলনবিষয়ক সচেতনতার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ দু ধরনের অসুবিধের সম্মুখীন হন বলে মনে হয়। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এ ইতিহাসের উপকরণ হিশেবে প্রধানত ইংরেজি রচনার উপর নির্ভর করেন।[৮] কিন্তু সংস্কারমূলক ও সংস্কারসংক্রান্ত রচনা বাংলার তুলনায় ইংরেজিতে সামান্যই প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং ইংরেজি ভাষায় লিখিত উপকরণভিত্তিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস খণ্ডিত ও অগভীর হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহাসিকদের একটা সুবিধে ছিলো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের (পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশ) গ্রন্থাগারগুলিতে দুর্লভ। গ্রন্থাদি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদির সবচেয়ে ভালো সংগ্রহ আছে বৃটিশ ম্যুজিঅম লাইব্রেরি এবং ইণ্ডিয়া অফিস (কমনওয়েলথ রিলেশনস অফিস) লাইব্রেরিতে। এ কারণে দেশীয় ঐতিহাসিকদের নাগালের প্রায় বাইরে। এ অবস্থায় ভাষাজ্ঞান ও সহজে দেশীয় সমাজমানস বোঝার সুযোগ থাকলেও, দেশীয় ঐতিহাসিকগণ সংস্কার আন্দোলনের যেসব ইতিহাস রচনা করেন—উপকরণের অপ্রতুলতা হেতু সেগুলি পূর্ণাঙ্গ কিংবা গভীর হতে পারেনি।[৯]

বর্তমান নিবন্ধ রচনার জন্যে আমি ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংস্কারমূলক ষাট খানি প্রবন্ধ পুস্তক, দেড় শতাধিক প্রবন্ধ, প্রায় অর্ধশত সংস্কারমূলক গদ্যপদ্য অন্যান্য রচনা, পঁচিশ খানি পত্র-পত্রিকা এবং অর্ধশত সংস্কারমূলক নাটক ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। এ সমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলি কোনো ঐতিহাসিক ইতিপূর্বে ব্যবহার করেননি। এমনকি কয়েকটি রচনার অস্তিত্ব সম্পর্কেও গ্রন্থতালিকা-প্রস্তুতকারীগণ সচেতন ছিলেন না। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করেছি, তারও অনেকগুলি দুর্লভ। **অবোধ বন্ধু, তমোলুক পত্রিকা, বসন্তক, বঙ্গমহিলা, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভারতসুহৃদ, মধ্যস্থ, সমদর্শী** এবং **হিতসাধক** অনেক ঐতিহাসিকই ব্যবহার করার সুযোগ পাননি।

বাংলা নাটকের প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। বঙ্গদেশীয় গ্রন্থাগারগুলিতে দুর্লভ অথবা আদৌ নেই এমন পঁচিশ খানা নাটক আমি ব্যবহার করেছি।[১০] (মোট

৮. যেমন C. H. Heimsath রচিত **Indian Nationalism and Hindu Social Reform**। এ গ্রন্থে বাংলা ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থের উল্লেখ নেই।

৯. যেমন নীলিমা ইব্রাহিম রচিত **উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক** (ঢাকা, ১৯৬৪)। এই বই-এর গ্রন্থপঞ্জীতে মাত্র ৫৪ খানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার উল্লেখ আছে।

১০. অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, **অসত্যাস্বীকার প্রকরণ** (কলিকাতা, ১৮৬১) ; উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, **বিধবোদ্বাহ নাটক** (কলিকাতা ১৮৫৬) ; কস্মিন হিন্দু মহীলা, **বরাঙ্গী খ্যাত নাটক**

ব্যবহৃত নাটক সংখ্যা পঞ্চাশ) এ নাটকগুলি ইতিপূর্বে কোনো সমালোচক কিংবা ঐতিহাসিক ব্যবহার করেননি। এর মধ্যে দুখানা নাটক গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।[১১] অপর পাঁচখানি নাটকের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউই অবহিত ছিলেন না।[১২] বৃটিশ মুাজিঅম লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ইম্পেরিআল লাইব্রেরি ক্যাটালগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরি ক্যাটালগ এবং কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে এ গ্রন্থগুলির উল্লেখ নেই।

এসব নাটক ব্যবহারের ফলে বাংলা নাটকে অঙ্কিত সমাজচিত্রের বৈচিত্র্য হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কার আন্দোলনসম্পর্কিত মনোভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করাও সম্ভবত সহজ হয়েছে। কেননা সমাজ সংস্কারবিষয়ক সচেতনতা ও মনোভাব সেকালের সাহিত্যের সকল বিভাগেই কমবেশি ছড়িয়ে থাকলেও, নাটকেই বোধ হয় সবচেয়ে ব্যাপক এবং সরাসরিভাবে ব্যক্ত হয়। এ নাটকগুলো রচিত হয়েছিলো সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এসব রচনায় সংস্কারের পক্ষে এবং বিপক্ষে

(কলিকাতা, ১৮৬৭); কালাচাঁদ উকীল ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় **একেই কি বলে বাবুগিরি ?** (কলিকাতা, ১৮৬৩); কেদারনাথ দত্ত, **ইন্দুমতী নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬১); গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, **বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়** (কলিকাতা ১২৬৮); নফরচন্দ্র পাল, **কন্যাবিক্রয় নাটক** (কলিকাতা ১৮৬৪); **নবীনবিরহিণী নাটক** (কলিকাতা, ১৭৮৬ শতাব্দ); পার্বতীচরণ সিংহ, **তরঙ্গমোহিনী নাটক** (কলিকাতা, ১২৭২); **বিধবা বিষম বিপদ** (কলিকাতা, ১৮৫৬); **বিধবা সুখের দশা** (তৃতীয় সং ; কলিকাতা, ১৭৮৪ শকাব্দ); মনোমোহন বসু, 'নাগাশ্রমের অভিনয়', **মধ্যস্থ** ১৭৭৪ ; মহেশচন্দ্র দাস দে, **নেশাখুরি কি ঝকমারি নাটক** (কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ); রাধামাধব মিত্র, **বিধবা মনোরঞ্জন নাটক** (কলিকাতা, ১৮৫৬), শ্রীমতী নিতম্বিনী, **অনূঢ়া যুবতী** (ঢাকা, ১৮৭২); **সুধাকর বিষময়** (কলিকাতা, ১৮৬৭); **মীমিত্র** (কলিকাতা, ১৮৬০); হরিশচন্দ্র মিত্র, 'কন্যাপণ কি ভয়ানক', **মিত্র প্রকাশ**, ১২৭৭ ; এবং **ম্যাও ধরবে কে ?** (ঢাকা, ১৮৬২); হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, **দলভঞ্জন নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬২); অম্বিকাচরণ বসু, **কুলীন কায়স্থ নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬১); বটুবিহারী চক্রবর্তী, **কলির কুলটা বা অদ্ভুত কাণ্ড** (কলিকাতা, ১২৮৩); জীবনকৃষ্ণ সেন, **ফালতো ঝকড়া** (কলিকাতা, ১৮৭০); শ্যামলাল চক্রবর্তি, **কি মজার কর্তা** (আজিমগঞ্জ, ১৮৭৫); এবং অজ্ঞাত, **বাহবা চৌদ্দআইন** (কলিকাতা, ১২৭৬)।

১১. মনোমোহন বসুর 'নাগাশ্রমের অভিনয়' এবং হরিশচন্দ্র মিত্রের 'কন্যাপণ কি ভয়ানক'। নাগাশ্রমের অভিনয় পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো।

১২. অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ**, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়, বিধবা সুখের দশা, সুধাকর বিষময়,** এবং হরিশচন্দ্র মিত্র রচিত **'কন্যাপণ কি ভয়ানক'**।

সেকালের জনসাধারণের মোটামুটি বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। নাট্যকারগণ কাহিনী পরিকল্পনা, চরিত্রনির্মাণ এবং পরিণতি অঙ্কনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কারের সপক্ষে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাঁরা কল্পিত প্রতিপক্ষকে চিত্রিত করে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। বরং এরূপ বক্তব্য প্রকাশ করে তারপর তাকে খণ্ডন করেন। সুতরাং বলা যায়, সংস্কার আন্দোলনবিষয়ক যে সচেতনতা এবং অনুকূল প্রতিকূল যে মনোভাব এসব নাটকে প্রকাশিত হয়, তা সমকালীন সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিলো। এই সচেতনতা এবং অনুকূল-প্রতিকূল উভয় শ্রেণীর মনোভাব আমার আলোচনায় বিবেচনা করেছি।

সরকারী দলিল ও প্রতিবেদন, সামাজিক সংগঠনসমূহের প্রতিবেদন, হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেও সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি।

মনোভাবের (attitude) ইতিহাস রচনা করার প্রতি ঐতিহাসিকদের যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে, তা সাম্প্রতিক। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মনোভাব নিয়ে এ জন্যেই বেশি কাজ এ পর্যন্ত হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা--- নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাঙালী জীবনে রমণী (তৃতীয় সং ; কলিকাতা, ১৯৭১। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮) এবং তপন রায় চৌধুরীর 'Norms of Family Life and Personal Morality among the Bengali Hindu Elite, 1500-1850' (in *Aspects of Bengali History and Society* ed. by R.V.M. Baumer,Hawaii. 1974)। নীরদচন্দ্র চৌধুরী সৃজনশীল সাহিত্য, বিশেষত কথাসাহিত্য, বিশ্লেষণ করে বাঙালী সমাজে প্রেমসম্পর্কিত ধারণার বিবর্তনের পরিচয় দিয়েছেন। সৃজনশীল সাহিত্যের বাইরে অন্যান্য উপকরণও তিনি ব্যবহার করেছেন। তপন রায় চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ রচনার জন্যে নির্ভর করেছেন প্রধানত আত্মজীবনীমূলক রচনার উপর। তবে কবিতা, উপন্যাস এবং অন্যান্য উপকরণও প্রয়োজনবোধে তিনি ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় এই যে, এঁরা কেউই নাটক ব্যবহার করেননি। এ জন্যেই, প্রধানত নাট্যরচনা অবলম্বন করে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি সচেতনতা এবং মনোভাবের ইতিহাস রচনাকালে অনুকরণযোগ্য কোনো আদর্শ বা মডেল আমি পাইনি। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক গ্রন্থে নীলিমা ইব্রাহিম এবং সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন গ্রন্থে জয়ন্ত গোস্বামী[১৩] নাটকে অঙ্কিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের চিত্র পুনর্গঠনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা

১৩. জয়ন্ত গোস্বামী, **সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন** (কলিকাতা, ১৯৭৪)।

সচস্থানে একমাত্রিক। তা ছাড়া, সংস্কার আন্দোলন বিশেষত এ-সম্পর্কিত সচেতনতা ও মনোভাব তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।[১৪]

আন্দোলনের প্রত্যেকটি ধারা আলোচনা করার জন্যে আমি সমস্যার পরিচয়, প্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তার বিস্তৃতি, তার বিবিধ অনিষ্টকারিতা, সমাজে সে সম্পর্কে সচেতনতার উদ্রেক এবং আন্দোলনের সূচনা বিকাশ ও পরিণতি, সফলতা-ব্যর্থতা, আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। অতঃপর বাংলা নাট্যরচনা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগ দেখাতে চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া, নাট্যরচনাসমূহের প্রকাশ, জনপ্রিয়তা ও অভিনয় এ আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করে, তারও মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছি। নাটকে চিত্রিত চরিত্রসমূহ, কাহিনী এবং ব্যবহৃত সংলাপে এই আন্দোলনের এবং আন্দোলনের প্রতি নরনারীর যে মনোভাব বিধৃত আছে, তার বিশ্লেষণ আমার একটি প্রধান লক্ষ্য ছিলো।

১৪. বর্তমান সন্দর্ভ রচিত ও ডিগ্রির জন্যে গৃহীত হওয়ার পর সম্প্রতি (১৯৮১) প্রদ্যোত সেনগুপ্ত রচিত **বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য** (কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭৬) গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের আলোচনা অথবা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

পুনর্বিবাহ : বালবিধবাদের দুর্দশা মোচনের আন্দোলন

স্বেচ্ছায় হোক অথবা জোরপূর্বক হোক, সতীদাহ অবশ্যই অমানবিক একটি রীতি বলে গণ্য হতে পারে। সে জন্যেই, বুঝতে অসুবিধে হয় না, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষিত এলিটবৃন্দ কেন সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের পাঠকদের পক্ষে, বিশেষত পাশ্চাত্যের পাঠকদের পক্ষে, এটা বোঝা শক্ত বিধবাদের বিবাহ নিয়ে বঙ্গসমাজে গত শতাব্দীতে কেন অত হৈ চৈ হয়। বিধবা বিবাহ এখনো হিন্দু সমাজে প্রায় নিষিদ্ধ, অথচ এখন আর বিধবাবিবাহ আন্দোলন হয় না—এটা বর্তমান পাঠকদের অধিকতর বিভ্রান্ত করতে পারে।

বস্তুত, গত দেড় শ বছরের মধ্যে বঙ্গসমাজে 'বিধবা' কথাটির অনুষঙ্গগত অর্থের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন বিধবা বললে সাধারণত একজন প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধাকে বোঝা যায়। কিন্তু গত শতাব্দীতে বালিকা অথবা শিশুও বিধবা হতে পারতো। বাল্যবিবাহ তখন খুব জনপ্রিয় ছিলো,[১] তা ছাড়া জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ইত্যাদির অভাবে শিশু-মৃত্যু-হার ছিলো খুব চড়া।[২] তিন চার বছর বয়সেও অনেক

১. বাল্যবিবাহ সেকালে যে কতো ব্যাপক প্রচলিত ছিলো, সে বিষয়ে গত শতাব্দীতে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**, আষাঢ় ১৭৬৮ শকাব্দ (জুন-জুলাই, ১৮৪৬), পৃ. ২৯৮; **ধর্মনীতি** (কলকাতা : বাল্মিকী যন্ত্র, ১৮৫৬), পৃ. ৬৯; (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর), 'বিবাহ বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা', **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, কার্তিক ১৭৭৬ (১৮৫৪), পৃ. ১৮৩; 'এতদ্দেশীয় বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', **অবোধবন্ধু**, ভাদ্র ১২৭৬ (১৮৬৯), পৃ. ৯৯; 'স্ত্রী স্বাধীনতা', **বঙ্গ-মহিলা**, মাঘ ১২৮৩ (১৮৭৭) পৃ. ২৩৩।

তদুপরি দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাল্যবিবাহের দোষ', **সর্বশুভকরী পত্রিকা**, অগস্ট ১৮৫০, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত **সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র**, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : বাক্ষণ, ১৯৬৪), গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৪০।

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র অতঃপর খণ্ড সংখ্যাসহ **সাবাস** নামে উল্লিখিত।

বালিকা বিধবা হতো।[৩] বৈধব্য দূরে থাক, এসব বালিকা বিয়ের অর্থই বুঝতো না। অথচ, আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয় এদেরও বৈধব্যের আচারসমূহ পালন করে চলতে হতো। এসব আচারের মধ্যে ছিলো একাদশীর দিনে নির্জলা উপবাস, নিরামিষ এবং একবার মাত্র আহার, মেঝেতে শয়ন, মোটা ও নিরলঙ্কার বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি।[৪] প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার জন্যেও এসব আচার পালন করা সহজ ছিলো না। এসব আচার এবং তদুপরি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন কম বয়সী বিধবাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতো। অনেক সময়ে, এ কারণেই কোনো কোনো বিধবা আজীবন এসব কৃচ্ছ্রসাধন করার পরিবর্তে সহমরণকে স্বাগত জানাতেন।[৫]

শিক্ষিত এবং উদার পরিবারেও বিধবাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হতো, তা যে কোনো মানদণ্ডে রূঢ়, এমন কি, নির্দয় বলে বিবেচিত হতে পারে।[৬] সুন্দরী যুবতী যে স্ত্রীকে একদিন বাড়ির সৌভাগ্য এবং দেবী হিশেবে গণ্য করা হতো, বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাগ্যে জুটতো চরম অবহেলা এবং নিষ্ঠুর আচরণ।[৭] সমাজ বৈধব্যের জন্যে বিধবাকেই দায়ী করতো। মনে করা হতো যে, পূর্বজন্মে স্বামীকে প্রতারণা অথবা হত্যা করার জন্যেই এ জীবনে

৩. বাল্যবিবাহ জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করার পরেও, ১৮৮১ সালে ১০ বছরের কম বয়স এমন বালিকাদের মধ্যে ১৩·৬% বিবাহিত এবং ৬% বিধবা ছিলো। দ্রষ্টব্য : **Report on the Census of Bengal, 1901**, Vol. VI, pt. 2 (Calcutta ; Bengal Secretariat Press, 1902), p. 266.

১৮৬৬ সালে, তিনটি বিধবার পুনর্বিবাহ হয়। এদের একজন ৩ বছর বয়সে এবং একজন ৪ বছর বয়সে বিধবা হয়।—দ্রষ্টব্য : 'নূতন সংবাদ', **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ফাল্গুন ১২৭২ (১৮৬৬), পৃ. ২১৭। **বামাবোধিনী পত্রিকা** অতঃপর বামাপ বলে উল্লিখিত।

৪. বিধবাদের জন্যে অবশ্যপালনীয় আচারসমূহের বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, তিথিতত্ত্বম্** (কলিকাতা, ১৯০৬), পৃ. ৫৫-৭৩।

৫. Max Muller, quoted in M. F. Billington, **Women in India** (Reprint : New Delhi, 1973 : first published in the 1890's), p. 113.

৬. L. Scrafton, **A History of Bengal Before and After Plassey** (Reprint ; Calcutta, 1975), p. 9 ; M. F. Billington, p. 121.

৭. R. Roy, **Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females According to the Hindu Law of Inheritance** (1822), quoted in S. D. Collet, **The Life and Teachings of Raja Rammohun Roy** (3rd ed. : Calcutta, 1962), p. 195 ; P. C. Mitter, 'Marriage of Hindu Widows', **Calcutta Review**, Vol. XXV, No. 2 (Dec., 1855), p. 353.

বৈধব্য ঘটেছে। সুতরাং কঠোর আচার পালনের মাধ্যমে বিধবার প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। বিধবার কোনো সন্তান না থাকলে অথবা অবিবাহিতা কন্যা থাকলে, সে বিধবাকে আরো বেশি পাপী বলে ধারণা করা হতো।[৮] বস্তুত, বিধবাকে পাপ ও অমঙ্গলের প্রতীক বলে মনে করা হতো। এবং সে কারণে, বিবাহ ইত্যাদি শুভানুষ্ঠানে বিধবার উপস্থিতি কেউ কামনা করতো না।

সোমপ্রকাশ পত্রিকার মতে, পরিবারের মধ্যে বিধবার কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। সমাজও তার প্রতি ছিলো খড়্গহস্ত। সংক্ষেপে, বিধবা এবং ক্রীতদাসীর মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিলো।[৯] নিজের পরিবারের মধ্যেও বিধবা কার্যত দাসীর মতোই বাস করতো,—এমন কথা অক্ষয়কুমার দত্তও বলেন।[১০] বিধবার প্রতি শিক্ষিত পরিবারেও কী ধরনের আচরণ করা হতো, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে সমকালীন একজন মহিলা লেখেন যে, যুবতী বিধবা একটু ভালো শাড়ি পরলে, বিছানায় শয়ন করলে, উত্তম দ্রব্য আহার করলে, আসনে উপবেশন করলে, এবং সমবয়স্ক রমণীদের সঙ্গে হাস্য করলে গৃহিণীরা অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। 'শুনিয়াছি—অমুক তাহার বিধবা ভগিনীর নাসিকা কর্তন করিতে গিয়াছেন, অমুক তাহার বিধবা কন্যাকে প্রত্যহ পাদুকা প্রহার করিতেছেন, অমুক তাহার বিধবা পুত্রবধূকে ধানেভাতে খাওয়াইতেছেন—।'[১১] অবশ্য বিধবাদের এই অমর্যাদা কেবল উনিশ শতাব্দীর কোনো ঘটনা নয়। মুসলিম আমলেও বিধবাদের অবস্থা কম-বেশি এমনই ছিলো।[১২]

৮. **Ibid.** ; P. Ramabai Saraswati, **The High Caste Hindu Woman** (2nd ed. ; Philadelphia, 1887), pp. 69-70.

৯. 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কিনা', **সোমপ্রকাশ**, ২ আষাঢ় ১২৯২ (১৮৮৫), **সাবাস** ৪ (কলকাতা, ১৯৬৬), পৃ. ৩৪০।

১০. 'বিধবাবিবাহ', **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**, চৈত্র ১৭৭৬ (১৮৫৫), পৃ. ১৫৪-৫৬।

১১. 'বামারচনা', **বামাপ**, চৈত্র ১২৭৭ (১৮৭১), পৃ. ৩৬৬-৬৭।

১২. T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir** (Calcutta, 1953), pp. 187-88.

রামমোহন রায় তাঁর **Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females** রচনায় যা বলেন, তা থেকে মনে হয়, প্রাচীনকালে হিন্দুবিধবাদের অবস্থা উনিশ শতকের মতো মন্দ ছিলো না। অথর্ব বেদের সময়ে বিধবাদের জন্যে চারটি পথ খোলা ছিলো। কেউ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান ধারণ করে সংসার ধর্ম পালন করতেন। কেউ সরাসরি পুনর্বিবাহ করতেন। কেউ বা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। কেউ কেউ সহমরণও বরণ করতেন। নিয়োগের মাধ্যমে সন্তান গ্রহণের রীতি শাস্ত্রানুমোদিত এবং জনপ্রিয় ছিলো। (দ্রষ্টব্য : **মনুসংহিতা**, ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত ও অনূদিত [কলিকাতা, ১৮৬৬], ৯ অধ্যায়,

সমাজের অত্যাচার সহ্য করা এবং কঠোর আচারাদি পালন করা ছাড়াও, ব্রহ্মচর্যও কম শক্ত ছিলো না। বালবিধবা যখন ধীরে ধীরে যৌবন লাভ করতো, তখন অন্যান্য সকল মানব-মানবীর মতোই তার মধ্যেও যৌন কামনা জেগে উঠতো। নিজেদের সংযত করতে সমর্থ না-হওয়ায়, উনিশ শতকে বহু বিধবাই ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সতীত্ব বিসর্জন দেয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের ভালো ব্যবস্থা না-থাকায়, এর ফলে এই অসতী বিধবাদের হয় গর্ভপাত করাতে অথবা আত্মহত্যা করতে হয়।[১৩] ১৮৫৫ সালে কলকাতায় রাস্তায় একটি সদ্যজাত পরিত্যক্ত সন্তান পাওয়া যায়। এই সন্তানটি যে কোনো বিধবার গর্ভজাত এমন কোনো প্রমাণ ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জনপ্রিয় মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়ে, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, সন্তানটি নিশ্চয়ই বিধবার গর্ভজাত। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে কলকাতায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিলো। ঈশ্বরগুপ্তও এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি তাই মন্তব্য করেন : 'বিধবাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে এরূপ ঘটনা কদাচ হইতে পারে না। ...এ বঙ্গদেশের ব্যভিচারিণীদিগের দ্বারা এইরূপ কত শত ঘটনা হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না, ইহাতেও হিন্দুমণ্ডলী বিধবাবিবাহে সম্মত হয়েন না, কি চমৎকার!'[১৪]

এরূপ অনুমান ছাড়াও বিধবাদের ব্যভিচার এবং ভ্রূণ হত্যার সংবাদ সেকালের পত্রিকায় প্রায়শ প্রকাশিত হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাড়িয়াপাড়ার এক বিধবা অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়। গর্ভপাত করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়।[১৫] খাঁটুরায় আর একজন বিধবা ভ্রূণ হত্যা করতে না পারায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

শ্লোক সংখ্যা ৬০, ৬১ ও ৭০, পৃ. ৪৩৫, ৪৩৭।) নিয়োগের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : B. Bandyopadhaya, **Foreign Accounts of Marriage in Ancient India** (Calcutta, 1973), pp. 8-19; A. S. Altekar, **The Position of Women in Hindu Civilization** (3rd ed.; Delhi, 1962), p. 151. কিন্তু নিয়োগ ও পুনর্বিবাহের রীতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে এবং মধ্যযুগে পুরোপুরি লুপ্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী দয়ানন্দ এই রীতি পুনঃপ্রবর্তন করার চেষ্টা করলে, মূল্যবোধের পরিবর্তন হেতু, তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিধবাদের জন্যে সহমরণ এবং ব্রহ্মচর্যের পথই খোলা থাকে।

১৩. বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন করার জন্যে যে আবেদনপত্রগুলি সরকারের নিকট প্রেরিত হয়, তার প্রায় সবটাতেই এই যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। পরে দ্রষ্টব্য।

১৪. 'বিধবাবিবাহ', **সংবাদ প্রভাকর**, ১০ মে ১৮৫৫, সাবাস ৪, পৃ. ৭৬১-৬২।

১৫. **সামাপ**, শ্রাবণ ১২৭২ (১৮৬৫), পৃ. ৭৮।

করে।[১৬] বিধবার গর্ভবতী হওয়া এবং ভ্রূণ হত্যা করার বিষয়টি সেকালের সমাজে এমন বহুল প্রচলিত ও সর্বজনস্বীকৃত ছিলো যে, শিক্ষিত, সদ্‌বিবেচক ও ভদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাও আপনাদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে পরিবারস্থ কুপথ-গামিনী বিধবা রমণীকে ভ্রূণ হত্যা করতে উৎসাহ দেওয়া অন্যায় কার্য বলে মনে করতেন না।[১৭]

গর্ভবতী যে বিধবা গর্ভপাত করাতে অথবা আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হতো, তার একটিমাত্র পথ খোলা থাকতো। পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত এই বিধবাকে তখন পালিয়ে গিয়ে সরাসরি বেশ্যা হতে হতো। সেকালে বেশ্যাবৃত্তি বিধবাদের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গিয়েছিলো যে, একই বাংলা শব্দ 'রাঁড়' বললে বিধবা ও বেশ্যা উভয়কেই বোঝাতো।[১৮] সেকালে কলকাতা শহরের অধিকাংশ বেশ্যাই যে হিন্দু বিধবা ছিলো, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৮৫৩ সালে কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট এক প্রতিবেদনে জানান যে, তখন কলকাতায় ১২,৪১৯ জন বেশ্যা ছিলো। এদের ১০,০০০-এরও বেশি ছিলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী।[১৯] ১৮৬৭ সালে কলকাতার হেলথ অফিসার অন্য এক প্রতিবেদনে জানান যে, তখন কলকাতার বেশ্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে

১৬. **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭৭ (১৮৭০), পৃ. ৮২।

১৭. প্যারীচরণ সরকার, 'দৃষ্টান্তের ফল', **হিতসাধক**, আষাঢ় ১২৭৫ (১৮৬৮), পৃ. ১২৭।

১৮. সেকালের বেশির ভাগ বেশ্যাই যে বিধবা ছিলো সমকালীন নাটকে তার অনেক প্রমাণ আছে। একটি নাটকে এক বেশ্যা তার পৃষ্ঠপোষকের উপর বিরক্ত হয়ে বলে, সে বেশ্যার কাছে না এসে 'ভদ্র রাঁড়ের' কাছে গেলেই পারে। বেশ্যা ও ভদ্র রাঁড় কথা দুটির তুলনা তাৎপর্যপূর্ণ।—গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, **বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়** (কলিকাতা ১২৬৮, ১৮৬১-৬২), পৃ. ৪১।

প্যারীমোহন সেনের **রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলকাতা** (কলিকাতা, ১৮৬২-৬৪) গ্রন্থের নামকরণ থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র বেশ্যা এবং রাঁড় একই অর্থজ্ঞাপক।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই অর্থে রাঁড় শব্দটি ব্যবহার করেন।—"তাহাদিগের (যবন বেশ্যাদের) সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।"—ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, **নববাবু বিলাস**, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা ১৯৩৭-৩৮), পৃ: ২৩।

ঘর থাকতে বাবুই ভেজে নাটকে স্বামীর রক্ষিতা রাখার প্রসঙ্গে প্রবীণা মন্তব্য করে—'রাঁড় রেখেছে।'—হরিশচন্দ্র মিত্র, **ঘর থাকতে বাবুই ভেজে** (ঢাকা, ১৮৬৩), পৃ. ৯।

১৯. Quoted in K. M. Banerji, 'Kulin Polygamy', **Calcutta Review**, Vol. XLVII, No. 93 (1868), p. 142.

যায়। এদেরও 'great majority' ছিলো হিন্দু।[২০] এই প্রচুরসংখ্যক হিন্দু বেশ্যাদের শতকরা নব্বই ভাগই বিধবা বলে অমৃত বাজার পত্রিকায় দাবি করা হয়।[২১] বেশ্যাদের প্রধান অংশই হিন্দু বিধবা হওয়ার কারণ বোধহয় এই যে, যৌবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত তাদের অনেকেরই পদস্খলন হয়। তারপর সমাজে ফিরে যাওয়ার উপায় না-থাকায় তারা ১৮৬৮ সালের 'চৌদ্দ আইনানুসারে' রীতিমতো বেশ্যা হিশেবে নিবন্ধীকৃত হয়। কোনো কোনো বিধবা আর্থিক অনটন এবং অভিভাবকের অভাবেও হয়তো ভ্রষ্ট হতো। ১৮৮৮ সালে একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে সাহিত্যিক-মুন্সেফ চণ্ডীচরণ সেন বলেন, হিন্দু বিধবাদের শতকরা নিরানব্বই জনই অসতী।[২২] এই উক্তি অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। কিন্তু এ থেকে বিধবাদের ব্যাপক ব্যভিচারের আভাস পাওয়া যায়।

বিধবাদের জীবনের ব্যর্থতা, শোচনীয়তা এবং ব্যভিচার ছাড়াও বৈধব্যহেতু আরো একটি সমস্যা হিন্দু সমাজে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিলো। বৈধব্যের দারুণ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কোনো কোনো বিধবা হিন্দু ধর্মত্যাগ করে ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন। এ রকমের একটি ধর্মান্তরের কথা প্রথম উল্লিখিত হয় ১৮৬১ সালে অগত্যা স্বীকার প্রকরণ নাটকে।[২৩] এ নাটকের নায়ক মন্মথ বিধবা যুবতী বাসবিহারিণীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তর গ্রহণ করার জন্যে এক খৃস্টান ধর্মযাজকের সঙ্গে যোগাযোগ করে।[২৪] বাস্তবে এরূপ একটি সাড়া জাগানো ধর্মান্তর ঘটে ১৮৭০ সালে। গণেশসুন্দরী নামক একটি যুবতী বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার আশায় মার্থা নামক এক দেশীয় খৃস্টান মহিলার প্ররোচনায় খৃস্টান হন।[২৫] শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রচেষ্টায় গণেশসুন্দরী খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন।[২৬] বিধবাদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মান্তরের ঘটনা যে ধীরে ধীরে

২০. Ibid.

২১. শিশিরকুমার ঘোষ, 'বিধবাবিবাহ', অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ মার্চ ১৮৬৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ (দ্বিতীয় সং ; কলিকাতা, ১৯৬১) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৮৯।

২২. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, পৃ. ৮৯।

২৩. অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অগত্যাস্বীকার প্রকরণ (কলিকাতা, ১৮৬১), পৃ. ৩৪-৩৫।

২৪. ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫।

২৫. বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ (১৮৮১), পৃ. ৫৩-৫৪।

২৬. মধ্যস্থ, ৩০ আষাঢ় ১২৭৯ (১৮৭২), পৃ ২২২।
গণেশসুন্দরী অতঃপর ব্রাহ্ম হন এবং তাঁর নতুন নাম হয় মনোমোহিনী। ১৮৭২ সালে এক ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দ্রষ্টব্য : শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৯৯-১০২, ১২৩।

বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, তার সমসাময়িক প্রমাণ আছে। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় বলা হয়। ক্রমশ অধিক সংখ্যক হিন্দু বিধবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করছে।[২৭] আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করবো, ব্রাহ্ম সমাজে 'আশ্রয় গ্রহণ' করার অন্যতম কারণ ছিলো ১৮৭২ সালের সিবিল বিবাহ আইন। ব্রাহ্ম হলে এই আইনের আওতায় বিয়ে করার সুযোগ মিলতো।

সমস্যার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতার বিকাশ

বিধবাদের সুকঠোর ব্রহ্মচর্য, হতাশা, ব্যাপক ব্যভিচার, ধর্মান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজ উদাসীন ও সহানুভূতিহীন হলেও, বালবিধবাদের কৃচ্ছ্রসাধনা ও দুর্দশা কোনো কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই ব্যথিত ও সহমর্মী করে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঢাকার বড়ো জমিদার রাজা রাজবল্লভের নাম করা যেতে পারে। তিনি তাঁর আট বছরের বিধবা কন্যা অভয়া দেবীর বৈধব্য দেখে এতো বিচলিত হন যে, ১৭৫৬ সালে পণ্ডিতগণের মতামত সংগ্রহ করে পুনর্বার বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন।[২৮] এই উপলক্ষে তিনি দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ করেন।[২৯] কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের প্রতিকূলতায় তিনি কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে ব্যর্থ হন। এ রকমের আর একটি দৃষ্টান্ত রাণী ভবানীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তিনিও তাঁর বালিকা কন্যার দুর্দশা দেখে বিচলিত হন। রাণী ভবানী নিজেই বিধবা ছিলেন। তিনি কন্যাকে একাদশী উপবাসসহ অন্যান্য কঠোর আচারের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতায় কন্যাকে পুনর্বিবাহ দেওয়া দূরে থাক, উপবাস থেকেও বাঁচাতে পারেননি।[৩০]

২৭. **বামাপ**, বৈশাখ ১২৮৯ (১৮৮২), পৃ. ৮। পরবর্তী বছরের বৈশাখ সংখ্যা **বামাবোধিনীতেও** অনুরূপ দাবি করা হয়। পৃ. ৭।

২৮. P. C. Mitter, p. 358; 'বিধবার পুনর্বিবাহ', **বেঙ্গল স্পেক্টেটর**, জুলাই ১৮৪২, **সাবাস ৩**, পৃ. ৯১; কৈলাশচন্দ্র সিংহ, 'রাজা রাজবল্লভ সেন', **বান্ধব**, সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (১২৮৯), পৃ. ৮০-৮১; রসিকলাল গুপ্ত, **মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্তী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ** (দ্বিতীয় সং.; কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৯২-৯৩।

২৯. K. Datta, **Survey of India's Social Life etc.** (Calcutta, 1961), p. 36; কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, **ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত** (কলিকাতা, ১৯৩২ সংবৎ, ১৮৭৫-৭৬), পৃ. ১৫৪-৫৬। কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

৩০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'রাণী ভবানী', **সাহিত্য**, ফাল্গুন ১৩০৪ (১৮৯৮), পৃ. ৬৬৮।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ নাগাদ ইংরেজি শিক্ষা এবং তার ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য মূল্যবোধ সামান্য পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ায়, কলকাতার শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে বিধবাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সমস্যার ব্যাপ্তি সম্পর্কেও সচেতনতার বিকাশ ঘটে। অতঃপর বিধবা মুক্তির প্রয়াস চলে প্রথম সতীদাহ নিবারণ এবং পরে পুনর্বিবাহ আন্দোলনের মাধ্যমে।

রামমোহন এবং তাঁর লিবার্যাল বন্ধুদের মধ্যে বিধবাদের বিষয়ে সহানুভূতি ও সচেতনতার উদ্রেক হয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগে। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে আত্মীয় সভার এক অধিবেশনে এঁরা বালবিধবাদের উপর আরোপিত ব্রহ্মচর্যের অনাবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন বলে জানা যায়।[৩১]

১৮৩০ সালে রামমোহন ইংলণ্ডে গেলে অনেকেই মনে করেছিলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যেই ইংলণ্ড যাত্রা করেন।[৩২] এ থেকে মনে হয়, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে কিছু না-লিখলেও রামমোহন বিধবাবিবাহের ঔচিত্য বিষয়ে প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা করতেন। যে সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো সেখানে বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনা অবশ্য নিতান্ত অকালীয় ব্যাপার।

তবে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে অনুসিদ্ধান্তের মতোই বিধবাদের অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধনা সমাজকর্মীদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। বিধবাদের—বিশেষত বালবিধবাদের দুঃখ মোচনের সহজতম পন্থা হিশেবেই এ সময়ে বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা ইয়ংবেঙ্গলসহ স্বল্প কয়েকজন সমাজকর্মীর স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৩৩-৩৪ সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল-পরিচালিত জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম লেখা হয়। এঁরা বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্যে এ সময়ে কলকাতায় একটি সভাও স্থাপন করেন বলে জানা যায়।[৩৩] এ ছাড়া ১৮৩৭ সালে সমাচার দর্পণে শান্তিপুরের এক বিধবাও সরকারের কাছে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের দাবি জানান।[৩৪]

৩১. সংবাদটি প্রকাশিত হয় **ইণ্ডিয়া গেজেট** পত্রিকায়। পরে এটি ১৮ মে ১৮১৯ তারিখের **ক্যালকাটা জার্নালে** পুনর্মুদ্রিত হয়।

Soo **Selections from the Indian Journals**, Vol. I, ed. by S. Das (Calcutta, 1963), p. 159.

৩২. P.C.Mitter, p.359.

৩৩. **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৫০), পৃ. ২৬৩-৬৪। অতঃপর **সসেক** ২ বলে উল্লিখিত।

৩৪. রামদুলাল বসু, **বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ** (কলিকাতা, ১৯৭৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৷৷/. পাটী।

এ চিঠিটি আদৌ কোনো মহিলার রচনা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন একটি চিঠি সেকালে বহুল প্রচলিত একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে, এ বছরই, এ জাতীয় আরো একটি চিঠি এ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।[৩৫]

সমগ্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির আন্দোলন বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর এ সময় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলেই মনে হয়। তবে আন্দোলনকারীরা সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই দেখতে পাই, সরকার এ সময়ে (জুন, ১৮৩৭) বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের, ঔচিত্য সম্পর্কে কলকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি সদর আদালতে বিচারকদের মতামত জানতে চান।[৩৬] এই বিচারকগণ জানান যে, মানবিক দিক দিয়ে বিধবার বিবাহ যুক্তিসঙ্গত হলেও প্রস্তাবিত বিধি হিন্দু মনোভাবকে রূঢ়ভাবে আঘাত করবে এবং উত্তরাধিকার আইনও বিচলিত হবে। এর মধ্যে কলকাতা সদর কোর্টের রেজিষ্ট্রার ম্যাকান জানান যে, বিধবার পুনর্বিবাহকে হিন্দু সমাজ 'disgrace' এবং 'guilt'-এর ব্যাপার বলে বিবেচনা করে। কোর্ট অবশ্য স্বীকার করেন যে, পুনর্বিবাহ প্রথা চালু না-থাকায়, সমাজে বহু অনাচার হচ্ছে।[৩৭] এলাহাবাদ সদর কোর্ট জানান যে, পুনর্বিবাহ প্রথা দারুণভাবে হিন্দুদের আঘাত করবে এবং আইন প্রণীত হলেও, তা কেউ মানবে না।[৩৮] মাদ্রাজ থেকে জানানো হয় যে, পুনর্বিবাহ প্রথা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং এমন কোনো আইন গৃহীত হলে, উচ্চবর্ণের লোকেরা তাকে তাঁদের জাত মারার ষড়যন্ত্র বলে বিবেচনা করবেন।[৩৯]

সেকালের দু-একটি পত্র-পত্রিকা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন জানালেও,[৪০] জনমত ছিলো প্রবলভাবে বিরোধী। খৃস্টান মিশনারিদের পত্র-পত্রিকাও এ আইনের বিরোধিতা করে। প্রসঙ্গত *Friend of India* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারকে নিরুৎসাহিত করে এতে বলা হয়, সরকারের এমন আইন প্রণয়নের চেষ্টা

৩৫. ঐ।

৩৬. From J. P. gnrant, Offg. Secretary, Indian Law Commissioners, to the Registrars of all Sudder Courts of Calcutta, Allahabad, Bombay and Madras, 30 June 1837; Widw Remarriage Papers, mentioned hereinafter as **WRP.**

৩৭. From R. Macan to J. P. Grant, 24 July 1837; **WRP.**

৩৮. From A. B. Harrington to J. P. Grant, 11 August 37; **ibid.**

৩৯. From W. Douglas to J. P. Grant, 31 July 1837; **ibid.**

৪০. সাসেক ২, পৃ. ২৬৪।

বলা উচিত নয়, যা পালন করতে জনগণকে বাধ্য করানো যাবে না। এতে আরো বলা হয়, বিধবাবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী একেবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং এই শাস্ত্রবিরোধী আইন প্রণয়ন করা অবাঞ্ছনীয় বলে মন্তব্য করা হয়।[৪১] আদালত এবং সংবাদপত্রের এই বিরোধিতার মুখে ল কমিশনের প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

সরকারী বিধি প্রণীত হলো না বটে, কিন্তু ১৮৩৭ সালে আইন প্রণয়নের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে পত্রপত্রিকায় বিধবাবিবাহ সমস্যা প্রথম বারের মতো বহুল ভাবে আলোচিত হয়। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না সে প্রশ্ন অবশ্য আলোচ্য কালে বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। বরং বালবিধবাদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য পালনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিকতা ও যুক্তির সূত্র ধরে বলা হয়েছে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে যদি পুরুষ পুনরায় বিবাহ করতে পারে, তবে একই রক্তমাংসের তৈরি নারীদের পক্ষে পুনর্বিবাহ অন্যায় বা অধর্ম হবে কেন?[৪২]

পরের বছর ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে Society for the Acqusiition of General Knowledge স্থাপিত হওয়ায় বিধবাবিবাহ প্রশ্নটি আলোচনা করার একটি অনুকূল প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেলো। প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত[৪৩] এই সোসাইটিতে সমকালীন সমাজের নানা সমস্যারই পর্যালোচনা করা হয়। বঙ্গদেশের নারীদের অশিক্ষা, অবরোধ, প্রাত্যহিক জীবনের দুর্গতি, বিধবাদের দুর্দশা ইত্যাদি

৪১. **Friend of India,** 7 December 1837, quoted in E. D. Potts, **British Baptist Missionaries in India** (Cambridge, 1967), p. 157.

৪২. **জ্ঞানান্বেষণ, সংসক ২,** পৃ. ২৬৪।

৪৩. এই সমিতি স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে ২০ ফেব্রুআরি ১৮৩৮ তারিখে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ দে একটি সভা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করেন। সভাটি সংস্কৃত কলেজে ১২ মার্চ সন্ধ্যে সাতটায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় তিনশত ভদ্রলোক উপস্থিত হন এবং এই সমিতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমিতির কাজ শুরু হয় ১৬ মে ১৮৩৮ তারিখে।

এই সভায় যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র দেব, গৌরমোহন দাস, রাজনারায়ণ দত্ত প্রমুখ—তাঁদের নাম থেকেই বোঝা যায়, সভাটি প্রধানত হিন্দু কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ছিলো।

হিন্দু কলেজের সঙ্গে আদৌ যুক্ত নন অথবা নামে মাত্র যুক্ত ব্যক্তিরাও এই সমিতির সদস্য ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামোল্লেখ করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অল্প দিনই হিন্দু কলেজে গমন করেছিলেন।

See G. Chattosadhyay (ed.), **Awakening in Bengal** (Calcutta, 1965) List of Members, pp. LXI-LXVII.

বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। মহেশচন্দ্র দেব গঠিত 'A Sketch of the Condition of the Hindoo Women' প্রবন্ধে বিধবাদের দুরবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, ব্রহ্মচর্য নিতান্তই তাঁদের উপর আরোপিত। অতি শৈশবে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁদের যে বিয়ে হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তারপর তাঁদের যে বৈধব্য ঘটে—তার কোনোটির জন্যেই তাঁরা দায়ী নয়। এ প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের শ্রেয়তাও স্বীকৃত হয়।[৪৪] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-পঠিত 'Reform, Civil and Social' এবং প্যারীচাঁদ মিত্র পঠিত 'On Native Education' ইত্যাদি প্রবন্ধেও হিন্দু মহিলাদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়।[৪৫] বস্তুত ১৮৪২-৪৩ সাল নাগাদ 'চক্রবর্তী-ফ্যাকশনের'[৪৬] সদস্য বলে পরিচিত ইয়ং বেঙ্গলগণ বিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হন এবং দশজন একত্রিত হলেই তাঁদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হতো।[৪৭]

১৮৪২ সালে তারাপদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত বেঙ্গল স্পেকটেটর পূর্ববর্তী দশকের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার মতোই বিধবাবিবাহকে সমর্থন জানায়। জ্ঞানান্বেষণে কেবল মানবিকতা ও যুক্তির আলোকে বিধবাবিবাহের শ্রেয়তা স্বীকৃত হয়েছিলো। কিন্তু বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায়ই একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি একটি পত্রে নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য,

G· Chattopadhyay's **Awakening in Bengal** is an anthology of the papers read at the Society for the Acquisition of General Knowledge quring the years 1838-1841· These were originally published under the title **Discourses Delivered at the Meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge,** 3 Vols· (Calcutta, 1840-1843),

৪৪. **Awakening in Bengal,** pp· 103-04·

৪৫. **Ibid.,** pp· 182-97, 237-97·

৪৬. ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি রামমোহনের সময়কার ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে তিনি কার্যত ইয়ং বেঙ্গলদের প্রশ্নাতীত নেতা হন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), দেশ হিতৈষিণী সভা (১৮৪১) এবং বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩) স্থাপনে তাঁর ভূমিকা ছিলো অগ্রণীর। তাঁর সমর্থক প্রগতিশীল সদস্যদের চক্রবর্তী ফ্যাকশন বলে আখ্যায়িত করা হতো। See B. B. Majumdar, **History of Political Thought from Rammohun to Dayanand**, Vol· 1 (Calcutta, 1934), pp· 78, 87–88, 105–08, 172·

৪৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ** (কলিকাতা, ১৯০৪), পৃ. ১৯০।

হারীত প্রভৃতি স্মৃতিকারের রচনা বিচার করে লেখেন যে, বিধবাবিবাহ রীতিমতো শাস্ত্রসম্মত। এ চিঠিতে বলা হয়, পূর্ববর্তী কয়েক বছর ধরে বিধবাবিবাহ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু হিন্দু সমাজ এর প্রতি খুব প্রবল বিরোধিতা দেখায়নি। পত্রে লেখক আশা করেন, বিদ্যার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্কে 'দ্বেষের ক্রমশ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে।' এবং 'কুনিয়ম শোধনে উপস্থিত দ্বেষ চিরস্থায়ী হইতে পারিবেক না'।[৪৮]

এই পত্র বিধবাবিবাহ সম্পর্কে নতুন একটি বাদপ্রতিবাদের জন্ম দেয়। এর আগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা নব্যসংস্কারকগণ সে প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। সবার ধারণা ছিলো, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী। কিন্তু পূর্বোক্ত পত্রটি শাস্ত্রীয় এবং যুক্তির দিক দিয়ে এমন জোরালো ছিলো যে, রক্ষণশীল সমাজ এতে উচচকিত হয়। কদিনের মধ্যে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এর একটি প্রতিবাদ মুদ্রিত হয়। এতে শাস্ত্রবিচার করে বলা হয়, দ্বিতীয় বার বিবাহের সময় কন্যাকে সম্প্রদান করা শাস্ত্রমতে শক্ত ব্যাপার হবে। কারণ একবার সম্প্রদানের পরে কন্যাকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করা সম্ভব নয়।[৪৯] বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকা এর উত্তরে যথাযোগ্য শাস্ত্রীয় মীমাংসা দান করে। স্পেকটেটরের এই রচনায় পরাশরের বিখ্যাত শ্লোক 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে'—ইত্যাদির বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা ছিলো।[৫০] ১৮৪৩ সালে স্পেকটেটর পত্রিকা লুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এতে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত আরো একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের তৎকালীন দুটি প্রধান ধর্মীয় সমিতি--ধর্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার নিকট জানতে চায়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা। তত্ত্ববোধিনী সভা এ বিষয়ে নীরবতা পালন করে; কিন্তু ধর্মসভার সঙ্গে বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যপারে আরো কিছু কাল যোগাযোগ রক্ষা করে।[৫২] সম্ভবত এরই ফলে বিধবা বিবাহ যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এই মত প্রচার করে ধর্মসভা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।[৫৩]

৪৮. 'বিধবার পুনর্বিবাহ', বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সাবাস ৩, পৃ. ৭৭-৮০। পত্রটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা বলে মনে করি। দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট 'ক'।

৪৯. 'বিধবার পুনর্বিবাহ', বেঙ্গল স্পেক্টেটর, জুলাই ১৮৪২, সাবাস ৩, পৃ. ৯০।

৫০. ঐ, পৃ. ৯০-৯২।

৫১. ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্যোগে সমিতিটি স্থাপিত হয় ১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাসে।

৫২. P. C. Mitter, p. 359.

৫৩. কলিকাতা ধর্মসভা বিধবাবিবাহ নিষেধবিষয়ক ব্যবস্থা (কলিকাতা, ১৮৪৫)।

বিধবাবিবাহ নিয়ে আর কোন তোড়জোর ১৮৪৬ থেকে ১৮৫০-৫১ সালের মধ্যে হয়নি। কেবল জানা যায় যে, এ সময়ে নব্যশিক্ষিত যুবকগণ ক্রিয়াকর্মে না হোক অন্তত তাঁদের ভাবলোকে আন্দোলনটি জিইয়ে রেখেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সমকালে নব্যশিক্ষিত যুবকদের এই নিষ্ক্রিয় ভাবসর্বস্বতার নিন্দা করেন।[৫৪] অপরপক্ষে, ১৮৪৭ সালে দুর্জন দমন মহানবমী নামক মাসিক পত্রিকায় যেভাবে 'কেহ বা বিধবার বিবাহতেই ব্যতিব্যস্ত' বলে তরুণদের নিন্দা করা হয়,[৫৫] তা থেকে মনে হয় তরুণরা বিধবাবিবাহ প্রশ্নটি কেবল ভাবলোকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি,—কর্মে না হোক, অন্তত কথায়, তাঁরা সমাজকে আন্দোলিত করছিলেন।

প্রবীণদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য[৫৬] ১৮৪৯ সালে লেখেন যে রাম-মোহনের সময়ে তিনি কলকাতা নগরীতে আগমন করেন এবং তখন থেকেই সতীদাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করার ব্যাপারে প্রাণপণে চেষ্টিত আছেন।[৫৭] একজন প্রবীণের উচ্চারিত এ উক্তি থেকেও সেকালের বিধবাবিবাহসংক্রান্ত সচেতনার আভাস পাওয়া যায়।

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিধবাবিবাহ সচেতনতা ইয়ংবেঙ্গলদের বহির্ভূত শিক্ষিত পরিমণ্ডলে সর্ব প্রথম লক্ষযোগ্যভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই বছরের গোড়ার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন বিদ্যালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বুদ্ধিজীবী একত্রিত হয়ে কলকাতায় 'সর্বশুভকরী সভা' স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কারই ছিলো এই সভার উদ্দেশ্য। আর যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সদস্যগণ বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, বিধবাবিবাহ ছিলো সেগুলির অন্যতম।

এই সভার মুখপত্র সর্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়, তার সর্বত্রই এ দেশের নারীদের হীনাবস্থা সম্পর্কে

৫৪. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'কলিকাতা বর্তমান দুরবস্থা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শকাব্দ (জুলাই, ১৮৪৬), পৃ. ৩১২।

৫৫. দুর্জনদমন মহানবমী ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), বাংলা সাময়িকপত্র, প্রথম খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৭২) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৯১।

৫৬. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (?—১৮৫৯) সম্বাদ ভাস্কর ও রসরাজ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। এ ছাড়া তিরিশ দশকে তিনিই ইয়ং বেঙ্গলদের পক্ষে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার প্রকৃত লেখক ছিলেন। সতীদাহ নিবারণে তিনি রামমোহন রায়কে, স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেন। অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী এই সাংবাদিক সত্যের ও ন্যায়ের পথে লিখতে গিয়ে আদালতে দণ্ডিতও হন। দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরশঙ্কর তর্কবাগীশ (কলিকাতা, ১৯৪১)।

৫৭. সম্বাদ ভাস্কর, ২৬ মে ১৮৪৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬২।

সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক একটি রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক অপর একটিনিবন্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিধবাদের দুর্দশার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা উভয়েই বিধবাদের পুনর্বিবাহের ঔচিত্য সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন।[৫৮]

১৮৫১-৫২ সালে বিধবাবিবাহ দেওয়ার জন্যে রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের রাজার সহায়তায় সে অঞ্চলে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তবে শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন সফল হয়নি।[৫৯] এবং সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিণতিকে অস্বাভাবিক বলেও মনে হয় না। কিন্তু এ আন্দোলন বিধবাবিবাহের প্রতি সমাজ-মানসকে আংশিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে—একথা সম্ভবত স্বীকার করতে হয়। তা ছাড়া আলোচ্য কালে কলকাতায় যে দু-তিনটি চাঞ্চল্যকর বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতার শ্যামাচরণ দাস যেভাবে পণ্ডিতদের ব্যবস্থা নিয়ে নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন,[৬০] তা-ও সমাজ-মানসকে বাস্তব ঘটনা হিশেবে বিধবা-বিবাহের প্রতি সহনশীল করে তোলে এবং হয়তো কারো কারো মধ্যে সমর্থনও সহানুভূতিরও উদ্রেক করে।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে ইয়ংবেঙ্গল-দের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। ১৮৫১-৫২ সালের দিকে তিনি বর্ধমানরাজের অন্যতমা বিধবা স্ত্রী বসন্তকুমারীকে বিয়ে করেন। এ বিয়ে ছিলো একই সঙ্গে অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহ।[৬১] জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা ১৮৩০-এর দশকে বিধবাবিবাহকে যেভাবে সমর্থন জানিয়েছে, তাতে দক্ষিণারঞ্জনের পক্ষে এ বিবাহ সঙ্গতিপূর্ণই মনে হয়। কিন্তু এ বিবাহের ফলে প্রাচীন সমাজ তো বটেই, এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ ইয়ংবেঙ্গল বন্ধুরাও তাঁকে ত্যাগ করেন।[৬২] শেষ পর্যন্ত অযোধ্যায় গিয়ে বসবাস

৫৮. 'বাল্যবিবাহের দোষ', সাবাস ৩, পৃ. ৫৪০-৪১; 'স্ত্রীশিক্ষা', সাবাস ৩, পৃ. ১৭০।

৫৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১৭০।

৬০. পরে, পৃ. ২৬।

৬১. মন্মথনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ১৯১৭-১৯১৮), পৃ. ৯২।

রাজনারায়ণ বসু, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (কলিকাতা, ১৯০৯), পৃ. ১১৯।

দক্ষিণারঞ্জন বিয়ে করেন কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বার্চের সমক্ষে। বিয়ের সাক্ষী ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

৬২. রসিককৃষ্ণ মল্লিক দক্ষিণারঞ্জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও নীতির দিক দিয়ে প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি অতঃপর আর কোনোদিন দক্ষিণারঞ্জনের মুখ দর্শন করেননি।

করে তিনি সামাজিক অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করেন। এ থেকে বিধবাবিবাহের প্রতি তৎকালীন সমাজের মনোভাব বোঝা যায়। ১৮৫২ সালে অনুষ্ঠিত অন্য একটি বিধবাবিবাহের সংবাদ পরিবেশন উপলক্ষে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় যে মন্তব্য করা হয়, তাও এই মনোভাবকে প্রকাশ করে। এই বিবাহ গান্ধর্ব কি অন্য কোন মতে অনুষ্ঠিত হয়, এবং এর ফলে 'বিধবার খানি রুম হইল ফিলাপ', এখন 'হুম কোরে, উম পেয়ে, ঘুম হবে ভাল' প্রভৃতি তির্যক মন্তব্যের মাধ্যমে বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে।[৬৩] তবে জনগণের মনোভাব যেমনই হোক না কেন এ দুটি বিধবাবিবাহের সংবাদ সমাজকে হয়তো এ ধরনের আরো সংবাদের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলো।

শ্যামাচরণ দাস তাঁর বিধবাকন্যার বিবাহ দিতে চান, কিন্তু তিনি নিজে প্রাচীনপন্থী বলে দক্ষিণারঞ্জন থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। আদালতে বিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, তিনি চান কলকাতার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় মীমাংসা। এই পণ্ডিতগণ শাস্ত্র বিচার করে মত দেন যে, অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।[৬৪] এই ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার সময়ে পণ্ডিতগণ কতোটা অর্থলোভে বিচলিত হয়েছেন, কতোটা নিরাসক্ত থেকেছেন শাস্ত্রবিচারে,[৬৫] সে প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর, কিন্তু এর ফলস্বরূপ সমাজে একটা হৈচৈ পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে পণ্ডিতদের একটি বিতর্কসভা বসে। তুমুল বিতর্কের পর এখানে প্রমাণিত হয় যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।[৬৬] এ প্রমাণ অবশ্য সমাজ প্রসন্ন মনে মেনে নেয়নি। এমন কি শ্যামাচরণ দাসও বিধবাকন্যার বিবাহ দিতে পারেননি। বিধবাবিবাহ একেবারে হিন্দু ধর্ম বিধ্বংসী একটি ষড়যন্ত্র—অন্তত এই ধারণা এর ফলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে বিধবাবিবাহবিরোধী নিদারুণ বিদ্বেষ এবং আতঙ্কের ভাবও হয়তো খানিকটা লঘু হয়।

এই পরিবেশে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে কোনো কোনো মহলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সহানুভূতি জেগে ওঠে। ১৮৫২ সালে বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা বিধবাদের সম্পর্কে কেবল এরূপ মন্তব্য করেছিলো যে, অন্য দেশের বিধবারা বিয়ে করতে পারে এবং সচরাচর তাই করে, অথচ ভারতীয় বিধবারা বিয়ে না করে

৬৩. 'হিন্দু বিধবার বিবাহ', **সংবাদ প্রভাকর**, ১০ চৈত্র ১২৫৮(১৮৫২), **সাবাস ১**, পৃ. ১৮৪।

৬৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব** (তৃতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৮৬২), পৃ. ৩-৫।

৬৫. ঐ, পৃ. ৫।

৬৬. **সংবাদ প্রভাকর**, ১৮, আশ্বিন ১২৬৪ (অকটোবর ১৮৫৩), **সাবাস ১**, পৃ. ৯৭।

আত্মত্যাগ ও সতীত্বের শ্রদ্ধেয় দৃষ্টান্ত রাখে।[৬৭] এ মন্তব্যে বিধবাদের বিয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায়নি, বরং বিধবাদের ব্রহ্মচর্যকেই আদর্শায়িত করা হয়েছে। কিন্তু ১৮৫৪ সালে সেই বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায়ই একটি প্রস্তাবে বলে, 'মনুষ্য নিতান্ত নির্দয়—নিতান্ত নিষ্ঠুর না হইলে, এককালে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠোর না করিলে—এবং বৃক্ষপর্বতাদির ন্যায় অচেতন না হইলে' বিধববাবিবাহের বিরুদ্ধবাদী হতে পারে না।[৬৮] বিধবাবিবাহের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে এতে বলা হয়যে, যৌবনে বিপত্নীক হলে যেমন শারীরিক নিয়ম রক্ষার জন্যে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হয়, বাল্যকালে বিধবা হলে তেমনি দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।[৬৯]

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মনোভাবেও এই পার্থক্য লক্ষণীয়। ১৮৫২ সালে বিধবাবিবাহের সংবাদ পরিবেশন কালে এ পত্রিকা বিধবাবিবাহেয় নিন্দা করেছিলো। কিন্তু ১৮৫৫ সালের প্রারম্ভ থেকেই সংবাদ প্রভাকরে বিধবাদের বিবাহসংক্রান্ত প্রশ্নটি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে শুরু করে। এ সময়ে বিধবাবিবাহবিষয়ক বহু রচনা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।[৭০] প্রকৃত পক্ষে এককালের তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৫ সালেই বিধবাবিবাহ বিষয়ে সবচেয়ে প্রগতিশীলতার পরিচয় দান করেন।[৭১]

পরিবর্তনের এই অনুকূল পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে কলকাতার শিক্ষিত ধনীদের এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় যা পূর্বে দেখা যায়নি। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে স্থাপিত 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী বন্ধুবর্গ সমিতি' ইয়ং বেঙ্গল ও এই ধনীদের সহযোগিতার ফল। এই সমিতিতে একদিকে কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরিশচন্দ্র মুখোপধ্যায় প্রমুখ, অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল

৬৭. 'সতীত্ব', বিবিধার্থ সংগ্রহ, কার্তিক ১৭৭৪ (১৮৫২), পৃ. ১৭৪-৭৬।

৬৮. 'বিবাহবিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা', বিবিধার্থ সংগ্রহ, কার্তিক ১৭৭৬ (১৮৫৪), পৃ. ১৮৪। রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বলে মনে করি। দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট 'ক'।

৬৯. ঐ, পৃ. ১৮৫।

৭০. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : সাবাস ১, পৃ. ২১৬-২০।

৭১. বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যে বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাতে স্বাক্ষর দান করেন। এ সময়ে প্রভাকরে যে রচনাসমূহ প্রকাশিত হয় তাতেও বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁর সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৮৫৫ সালের শুরুতে তিনি রাধাকান্ত দেব প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন করেন। পত্রিকা পরিচালনার জন্যে তাঁকে অনেকাংশে এঁদের উপর নির্ভর করতে হতো। সম্ভবত এর জন্যেই তিনি নীতির ব্যাপারে আপোশ করতে বাধ্য হন।

মিত্র, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি যোগদান করেন।[১২] এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন যে, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হোক বিধবা বিবাহের প্রচলন। দেবেন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।[১৩] অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রস্তাব করেন যে, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইনসম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করার জন্যে ব্যবস্থাপক সভার কাছে আবেদন করা হোক। সভায় এ প্রস্তাবও সমর্থিত হয়।[১৪]

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদারের সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায়ও বিধবাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।[১৫] পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে বিখ্যাত কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকও প্রকাশিত হয় এ বছর। কৌলীন সমস্যাই এ নাটকের মূল উপজীব্য; কিন্তু প্রসঙ্গত বিধবা-বিবাহ সমস্যাও এতে আলোচিত হয়।

সব মিলে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দ শেষ হওয়ার আগেই বিধবাবিবাহ নিয়ে পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর পরিধিতে একটা সচেতনতার বিকাশ ঘটে এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়। হিন্দু ধর্মের তথা ঐতিহ্যের রক্ষক বলে যাঁরা নিজেদের চিহ্নিত করতেন, সেই প্রাচীনপন্থীদের সমিতি—ধর্মসভা—বিকাশোন্মুখ এই ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ১৮৫৪ সালেই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে সামাজিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।[১৬] বলা বাহুল্য বিধবাবিবাহের প্রতি ধর্মসভার মনোভাব ছিলো প্রতিকূল।[১৭]

পূর্বোক্ত পটভূমিকায় ১৮৫৫ সালের জানুআরি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত কি না এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১৮]

১২. মন্মথনাথ ঘোষ, **কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র**, (কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৯২৬-২৭), পৃ. ১০৫।

১৩. ঐ, পৃ. ১০৫।

১৪. ঐ, পৃ. ১০৫-০৬।

১৫. P. C. Mitter, p. 351.

১৬. কলিকাতা ধর্মসভা, **বিধবাবিবাহ বাদ** (শ্রীরামপুর, ১৮৫৪)।

১৭. N. Mukherjee, **A Bengal Zamindar: Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times** (Calcutta, 1975), p. 141.

১৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব**, প্রথম পুস্তিকা (কলিকাতা, ১৮৫৫)। অতঃপর বিধবাবিবাহ বলে উল্লেখিত। পুস্তিকাটি পরের মাসে (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শকাব্দ) **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়** পুনর্মুদ্রিত হয়। অনেকেরই ভুলবশত এমন ধারণা যে, পুস্তিকাটি প্রথমে **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়** প্রকাশিত হয়।

মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত, পরাশর প্রভৃতি শাস্ত্রকারের যুক্তি জ্যামিতির মতো একটির পর একটি সাজিয়ে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন যে, বিধবা বিবাহ কলিযুগে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত, এবং নিন্দনীয় দেশাচারকে অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রমতে বিবাহ দিয়ে বিধবাদের দুঃখের অবসান ঘটানো উচিত।[৭৯]

এই পুস্তিকায় উপস্থাপিত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ এবং সেগুলির ব্যাখ্যা এমন আকাট্য ছিলো যে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে, বিধবাবিবাহের সমর্থকগণ এই পুস্তিকায় খুঁজে পান তাঁদের বহুকাঙ্ক্ষিত অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ। এ পুস্তক পাঠে রক্ষণশীল সমাজ যেমন উত্তেজিত, নব্যসমাজ তেমনি উল্লসিত হন। রাজনারায়ণ বসু সমাজের এই সর্বব্যাপী উত্তেজনা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এই চটী (পূর্বোক্ত পুস্তিকা) বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গসকল উঠাইতে থাকে।'[৮০]

এই পুস্তিকা যথার্থই সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো, তার সমসাময়িক অনেক প্রমাণ আছে। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, তাঁর আশঙ্কা ছিলো যে, বিধবা-বিবাহের নাম শুনে অবজ্ঞা ভরে কেউ হয়তো এ পুস্তক আদৌ পাঠ করবেন না। কিন্তু তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে মুদ্রিত দু হাজার পুস্তকই নিঃশেষিত হয়। এমন কি তারপরে মুদিত তিন হাজার কপিও অল্প দিনের মধ্যে বিক্রীত হয়।[৮১]

শুধু তাই নয়, বহু খ্যাত এবং অখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার প্রতিবাদে অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন।'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর ২৯ জন পণ্ডিত-রচিত এরূপ ২১ খানা গ্রন্থের উল্লেখ করেন।[৮২] এ ছাড়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৫ সালের শেষ দিকে এরূপ প্রতিবাদী পুস্তিকার সংখ্যা কমপক্ষে ৩০ বলে উল্লেখ করেন।[৮৩]

৭৯. ঐ (তৃতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৮৬২), পৃ. ১১-১৯।

৮০. P. C. Mitter, p. 359; **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ৯৮। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়** বলা হয়, এ পুস্তিকা প্রকাশের সময় থেকে হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে।—**ভত্ত্ব**, অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৫), পৃ. ১০৪।

৮১. **বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক**, পৃ. ২০।

৮২. ঐ, পাদটীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৮৩. P. C. Mitter, p. 360.

পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তেমন দিতে পারেননি। বরং বড়ো করে তুলেছেন তাঁদের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যাকে। তাঁদের 'বিচার প্রণালী দোষাবহ' এবং তাঁদের আপত্তি 'অমূলক'।[৮৪] বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত পরাশরের বিখ্যাত শ্লোক আদৌ পরাশরের নয়, অথবা পরাশর কেবল তা উল্লেখ করেছেন, অথবা এ বিবাহ কলিযুগের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, অথবা এ বিবাহ কেবল বাগ্‌দত্তা কন্যার বেলায়ই প্রযোজ্য—এরূপ নানা ব্যাখ্যা দেন আলোচ্য পণ্ডিতগণ।[৮৫] বিদ্যাসাগর প্রতিবাদী গ্রন্থগুলির মধ্যে পদ্মলোচন ন্যায়রত্নের বিধবাবিবাহ শীর্ষক পুস্তিকার প্রশংসা করেন।[৮৬]

পদ্মলোচনের গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করে বলা হয় যে, তিনি সংস্কৃত শ্লোকসমূহের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অযথার্থ এবং অভিনব। তাঁর মতে, সংস্কৃত শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ করলে অনর্থ হতে পারে।[৮৭] কেননা 'বহুদিন মৃত পুরুষের মনের ভাব লিখিত শব্দ দ্বারা নিশ্চয় করা অল্প পরিশ্রমের কর্ম নয়...।[৮৮] কতগুলো শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে পূর্বোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মলোচন বলেন, বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত।[৮৯] সর্বোপরি, বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ[৯০] এবং মনুর বিধান এবং পরাশরের সম্পূর্ণ বিরোধী।[৯১] সম্প্রদান করা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়া অনুচিত[৯২] এবং বিধবার গর্ভজাত পুত্র ঔরসপুত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না।[৯৩] বিদ্যাসাগর যুক্তি, মানবিকতার প্রশ্ন তুলে বিধবাবিবাহ সমুচিত বলে দাবি করেছিলেন। এ সম্পর্কে পদ্মলোচনের বক্তব্য : 'লৌকিক ভয়ে কে কবে ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে'?[৯৪]

এসব পণ্ডিতের মত খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রকাশ করেন ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। এর ফলে, রাজনারায়ণ বসুর মতে, সামাজিক

৮৪. তত্ত্ব, অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৫), পৃ. ১০৪।
৮৫. পণ্ডিতগণের এইসব ব্যাখ্যা বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত গ্রন্থেই লভ্য।
৮৬. ঐ, পাদটীকা, পৃ. ২১৪।
৮৭. পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন, বিধবাবিবাহ (১৮৫৫, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই পুস্তকের যে কপি আছে, তার নামপত্র ছিন্ন।), পৃ. ১-৫।
৮৮. ঐ, পৃ. ২৮।
৮৯. ঐ, পৃ. ৫-১৭।
৯০. ঐ, পৃ. ২৬-২৮।
৯১. ঐ, পৃ. ৩৭-৪৩।
৯২. ঐ, পৃ. ৫৩-৫৪।
৯৩. ঐ, পৃ. ৮০-৮২।
৯৪. ঐ, পৃ. ১০০।

আন্দোলন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।[১৫] কিন্তু বিদ্যাসাগরের যুক্তি এবং তথ্য দৃষ্টে পণ্ডিতগণ প্রায় নীরব হয়ে যান। দীর্ঘকাল পরেও বিধবাবিবাহ বিরোধী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বটে,[১৬] কিন্তু বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে কেউ দিতে পারেন নি।[১৭] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, এ নীরবতা সম্মতিসূচক কি না?[১৮]

সম্মতি যে নয়, আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ। আসলে, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় বিচারে হার মানলেন, কিন্তু সমাজ বিধবাবিবাহের উচিত্য স্বীকার করলো না।

আইন প্রণয়নের জন্যে লড়াই

শাস্ত্রীয় আলোচনা করে সামাজিক রীতি সংশোধন করার প্রেরণা বা ধারণা বিদ্যাসাগর কোথায় পেলেন, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়, সম্ভবত রামমোহনই তাঁর আদর্শ ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিশ্চয় এ-ও লক্ষ্য করে থাকবেন যে, রামমোহন সতীদাহ সম্পর্কে কেবল শাস্ত্রালোচনা করেই সুফল পাননি বা ক্ষান্ত থাকেননি। সেই সঙ্গে তিনি রাজনিয়ম প্রণয়নের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই আইনের বলেই সার্থকভাবে সতীদাহ নিবারিত হয়েছিলো। বিদ্যাসাগরও মনে করলেন যে, আইন প্রণীত হলে বিধবার বিবাহ রীতি সমাজে হয়তো বহুলভাবে প্রচলন লাভ হবে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক দোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সরকারী আইন যে যথেষ্ট কার্যকরী হয়, বিদ্যাসাগরের এ বিশ্বাস বোধহয় অনেক দিনের। ১৮৪২ সালে বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত যে পত্রটি প্রকাশিত হয় এবং যে পত্রটি বিদ্যাসাগরের রচনা বলেই আমি মনে করি, তাতেই বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সরকারী আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে ওকালতি করা হয়েছে।[১৯]

১৫. **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত,** পৃ. ৯৮।

১৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য-রচিত **বিধবাবিবাহ নিষেধক পুস্তক** (বোয়ালিয়া, ১৮৬৮)। এ পুস্তকেও বলা হয়, বিদ্যাসাগর কতগুলি বচনের অযথার্থ অর্থ করে সত্যগোপন্যাস করেছেন।—ঐ, পৃ. ২।

অনুরূপ আরো দুখানা গ্রন্থ : সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, **সমাজ সংস্কার** (ঢাকা, ১৩৩২) এবং বৈদ্যনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য, **উত্থানের পথ : বিধবাবিবাহাদির মিমাংসা** (কলিকাতা, তারিখ নেই, ১৯২০ এর দশক)। শেষোক্ত গ্রন্থের পৃ. ২৫-৭৮ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

১৭. **সম্বাদ ভাস্কর,** ১৭ জানুআরি ১৮৫৬, সাবাস ৩, পৃ. ২৯১।

১৮. ঐ।

১৯. 'হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ', সাবাস ৩, পৃ. ৮০।

১২৫৮ বঙ্গাব্দের ২৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখের **সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়**-এ প্রকাশিত এক পত্রে আইন প্রণয়ন করে বিধবাবিবাহ জনপ্রিয় করে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। রামদুলাল বসু, পৃ. ॥/.।

আমরা লক্ষ্য করেছি, কিশোরীচাঁদ মিত্রের নেতৃত্বে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী বন্ধু-বর্গ সমিতি' ১৮৫৪ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছে একটি আবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সময় অনুকূল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এ আবেদন সরকারের নিকট প্রেরিত হয়নি। কিন্তু বিধবাবিবাহ-বিষয়ক বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা দুটি প্রকাশিত হওয়ার পরে সমাজে এমন একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, বিদ্যাসাগর এরূপ একটি আবেদনপত্র সরকারের নিকট পাঠা-নোর উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন। বস্তুত, তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ৯৮৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে সরকারের কাছে পাঠান।[১০০] এই আবেদনপত্রে বলা হয় যে, বিধবাবিবাহ পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত। কেবল দীর্ঘকালের দেশাচারই একে হিন্দুসমাজের নিকট অগ্রহণীয় করে তুলেছে। কম্পানির আদালত-সমূহও বিধবাবিবাহের অধিকার স্বীকার করে না। অথচ বাল্যবিবাহের জনপ্রিয়তা-বশত অনেকেই কথা বলতে বা হাঁটতে শেখার আগেই বিধবা হয়। বাধ্যতামূলক ব্রহ্ম-চর্য সমাজে বহু অনাচারের জন্ম দেয়—তা-ও এতে বলা হয়। উপসংহারে বিধবা বিবাহকে আইনসঙ্গত করার জন্যে এবং সেই মোতাবেক হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করার আবেদন জানানো হয়।[১০১] এই আবেদনপত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একটি খসড়া আইনও প্রেরণ করেন। এই খসড়ায় স্পষ্টত বলা হয় যে, পুনর্বিবাহিত বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার হারাবে।[১০২]

বিদ্যাসাগর যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে, পুনর্বিবাহিত বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার না হারালে, সমাজ বিধবাবিবাহের প্রতি অধিকতর বিরোধিতা করবে। অপর পক্ষে, পুনর্বিবাহিত বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তি হারাবে,—এমন আইন প্রণীত হলে, বিধবার আত্মীয়রা বরং উৎসাহের সঙ্গে তার পুনর্বিবাহের আয়োজন করবে, বিদ্যাসাগর সম্ভবত এমন আশাও পোষণ করেছিলেন। পরে অবশ্য দেখা যায় যে, সম্পত্তিতে অধিকার থাক বা নাই থাক, বিধবার পুনর্বিবাহ রক্ষণশীল সমাজ আদৌ অনুমোদন করেনি।

১০০. Document no. 1, **WRP.**
মূল দরখাস্তের কপির জন্যে দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট 'খ'।
মূল আবেদনপত্রে কোনো তারিখ ছিলো না; সঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখিত পত্রের তারিখ ৪ অক্টোবর ১৮৫৫।

১০১. **Ibid.**

১০২. Document no. 2, **WRP.**

বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর যে-যুক্তি দেখান এবং তিনি যে-খসড়া বিল পেশ করেন— উভয়ই খুব সুচিন্তিত বলে মনে হয়! অসম্ভব নয় যে, আবেদনপত্র পেশের আগে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জে. পি. গ্র্যান্টের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। বিধবাবিবাহের প্রতি গ্র্যান্টের মনোভাব ছিলো খুব অনুকূল। ১৮৩৭ সালে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন। তবে সময় প্রতিকূল থাকায় তাঁর সে প্রয়াস তখন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮৫৫ সালে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছিলো। তাই বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্র পাওয়ার পরেই, তিনি বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় একটি খসড়া বিল পেশ করেন।[১০৩] এই বিলের ভাষা এবং যুক্তি বিদ্যাসাগরের প্রেরিত আবেদনপত্র ও খসড়া আইনের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১০৪] বিলটি প্রথম বার পঠিত হয় ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে।

এরূপ একটি খসড়া বিল পঠিত হয়েছে,—এমন সংবাদে বঙ্গদেশের এবং বঙ্গদেশের বাইরের শিক্ষিত ও উদার ব্যক্তিরা বিশেষ উৎসাহিত হন। তাঁরা অতঃপর বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র পাঠাতে আরম্ভ করেন। এসব আবেদনপত্রে বিধবাবিবাহকে এবং বিধবাবিবাহজাত সন্তানদের আইনসঙ্গত করার আবেদন জানানো হয়। বিধবাবিবাদের পক্ষে দ্বিতীয় আবেদনপত্র আসে পুনার শিক্ষিত এলিটদের পক্ষ থেকে। যাঁরা এ আবেদনপত্র প্রেরণে নেতৃত্বদান করেন, গোপাল দেশমুখ তাঁদের অন্যতম। এঁরা বিদ্যাসাগর প্রেরিত আবেদনপত্রের কথা উল্লেখ করেন।[১০৫] এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, বিদ্যাসাগর নিজেই হয়তো এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বিধবাবিবাহের সপক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ আবেদনপত্রের তারিখ যথাক্রমে ১ ও ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫। এ দুটি পাঠান কৃষ্ণনগর ও বারাসাতের অধিবাসীরা।[১০৬] মোটামুটি একই সময়ে একটি তারিখ বিহীন আবেদনপত্র পাঠান কলকাতার ৬৮৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তি।[১০৭] এই তিনটি আবেদনপত্রে সেকালের অনেক বড়ো ও ছোটো জমিদার স্বাক্ষরদান করেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, বর্ধমানের রাজা, রাজকৃষ্ণ মুখার্জী, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ ছিলেন। তা ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জয়কৃষ্ণ মুখার্জী ইতিপূর্বে

১০৩. Documents 3–8, **WRP.**
১০৪. দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট 'গ'।
১০৫. Document 9, **WRP.**
১০৬. Documents 10 and 12, **WRP.**
১০৭. Document 13, **WRP.**

বিদ্যাসাগর প্রেরিত আবেদনপত্রেই স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। জমিদার ব্যতীত সেকালের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ, চিকিৎসকগণ, উকিলগণ, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেকেই স্বাক্ষর দান করেছিলেন। স্বাক্ষরগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিধবাবিবাহের পক্ষে যাঁরা স্বাক্ষর দেন তাঁদের প্রধান ভাগই ইংরেজিতে স্বাক্ষর দেন।[১০৮] এ থেকে এমন মনে করা স্বাভাবিক যে, প্রধানত ইংরেজি-শিক্ষিত এলিটগণই বিধবাবিবাহের পক্ষে আবেদন করেন। এঁরা সেকালের সমাজে সুপরিচিত ও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। এমন কি, সরকারের ওপরও এঁদের কম প্রভাব ছিলো না। সম্ভবত এ জন্যেই এঁদের আবেদন সরকার খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন।

পরবর্তী পাঁচ মাসে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের সপক্ষে আরো অনেকগুলো আবেদনপত্র সরকারের নিকট পোঁছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আসে বঙ্গদেশের বাইরে থেকে। এর মধ্যে ছিলো ধুলিয়া, আহমেদনগর, সাঁতারা, রত্নগিরি এবং সেকেন্দ্রাবাদের অধিবাসীদের আবেদনপত্র।[১০৯] এই আবেদনপত্রগুলিতে যাঁরা স্বাক্ষর দান করেন তাঁদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিলো না, বিশেষ করে বিধবা-বিবাহ আইনের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা যখন বিবেচনা করি তখন এ সংখ্যাকে মোটেই বড়ো বলা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষিত এলিটগণ এবং জমিদারগণ সরকারকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করতে সমর্থ হন।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যা বেশি ছিলো, আগেই তা বলা হয়েছে। তাঁদের প্রভাবও কম ছিলো না। প্রথম বার বিল পঠিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করেন। কলকাতায় রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট জনসভা

১০৮. স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, হরচন্দ্র ঘোষ, কার্তিকচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিবচন্দ্র দেব, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, দ্বারকানাথ মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (প্রথম বিধবাবিবাহকারী), কামাখ্যানাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বসু, অভয়চরণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র মিত্র (সম্ভবত **বিধবাবিবাহ নাটকের** লেখক), রামতনু লাহিড়ী এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

এই স্বাক্ষরকারীদের অনেকেই একাধিক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দান করেছিলেন। যেমন, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্রের প্রথম স্বাক্ষরকারী, আবার রসিককৃষ্ণ মল্লিকদের আবেদনপত্রেও তিনি শরিক হন। অনুরূপভাবে প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ অনেকের নামই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

১০৯. Documents 14, 19, 23, 57, 58 and 62, **WRP**.

অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে দাবি করা হয় যে, সরকার যেন এমন ঐতিহ্যবিরোধী আইন প্রণয়ন না করেন।[১১০]

এই আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রথম আবেদন পাঠান নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, কোটালিপাড়া, বাকলা প্রভৃতি সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র থেকে একশ জন বিখ্যাত পণ্ডিত। এঁরা যুক্তি দিয়ে বলেন যে, হিন্দুদের সব শাস্ত্রমতেই বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিধবাবিবাহজাত সন্তানরা অবৈধ। এই অবৈধ সন্তানদের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। অতএব, তাঁরা দাবি করেন, এই সন্তানদের আইনত বৈধ ঘোষণা করলে, বৈধ উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করা হবে।[১১১]

তখনকার বঙ্গদেশের ঐতিহ্যিক হিন্দুদের মুকুটবিহীন রাজা ছিলেন রাধাকান্ত দেব। ধর্মসভার সভাপতি হিশেবে তিনি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিধবাবিবাহ-বিরোধী একটি আন্দোলনের আয়োজন করতে সমর্থ হন। এমন একটি আইন প্রণীত হতে পারে এ আশঙ্কায় ঐতিহ্যিক হিন্দুরা রীতিমতো ভীত হন। তাঁরা তাঁদের আবেদনে বলেন যে, এমন আইন হিন্দুধর্মের পবিত্রতা বিনষ্ট করবে। হাজার হাজার হিন্দু এজন্যে স্বেচ্ছায় এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দান করেন। কোনো কোনো গ্রাম্য জমিদার তাঁদের প্রজাদের স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন বলেও শোনা যায়।[১১২] রাধাকান্ত দেব ও ধর্মসভার বিশিষ্ট সদস্যগণ যে-আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দেন তাতে মোট স্বাক্ষরের সংখ্যা ছিলো একশতের কম।[১১৩] কিন্তু বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩৫ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি এই আবেদনপত্রের সমর্থনে অনেকগুলি আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করেন।[১১৪] এঁরা কম-বেশি পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের অনুরূপ যুক্তি দান করেন। এঁরা তদুপরি বলেন যে, এই আইন প্রণীত হলে তার অর্থ হবে সরকার দেশীয়দের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন। তা ছাড়া, এর ফলে ১৮৫০ সালের Lox Loci আইনের সাহায্য নিতে চান, এমন ব্যক্তিদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।[১১৫]

১১০. P.C. Mitter, P. 366.

১১১. Document 22, **WRP.**

সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেন, এসব পণ্ডিতগণের বেশির ভাগই আসলে মূর্খ। দ্রষ্টব্য: **সম্বাদ ভাস্কর**, ২৩.২.১৮৫৬, **সাবাস** ৩, পৃঃ. ৩০৩-৩৫।

১১২. ফরিদপুরের রামরত্ন রায় এমন একজন জমিদার—**সম্বাদ ভাস্কর** এমন সংবাদ প্রকাশ করে।—**সম্বাদ ভাস্কর**, ১১ মার্চ ১৮৫৬, **সাবাস ৩**, পৃ. ৪৫৯।

১১৩. Document 26, **WRP.**

১১৪. Documents 27, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 53, এবং ৫৫, **WRP.**

১১৫. Document 26, **WRP.**

বঙ্গদেশের বাইরে থেকেও পুনা, রত্নগিরি, আগ্রা, সাতারা, আহমেদনগর, কশবা, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও প্রায় ২০ হাজার ব্যক্তি প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন জানান।[১১৬] এটি লক্ষণীয় বিষয় যে, যে-সব জায়গা থেকে আইনের পক্ষে আবেদন পাঠানো হয়, সে সব জায়গা থেকেই আইনের বিরুদ্ধেও আবেদনপত্র আসে।

বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পক্ষে ৫,১৯১ জনের স্বাক্ষরসংবলিত মোট ২৩ খানা আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। অপর পক্ষে, বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে ২৮ খানা আবেদনপত্র এবং এতে ৫৫,৭৪৬ জনের স্বাক্ষর ছিলো।[১১৭] মোট আবেদনকারীদের শতকরা মাত্র ৮·৫ জন আইন প্রণয়নের পক্ষে ছিলেন। তা ছাড়া, বিধবাবিবাহের বিপক্ষ দল আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে যে-যুক্তি দান করেন, তা-ও ছিলো যথেষ্ট প্রবল। দেশীয় ধর্ম ও রীতিনীতি সম্পর্কে কম্পানির মনোভাবও ছিলো অত্যন্ত সতর্ক ও নিরপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ আইন প্রণীত হয়। এর কারণ বোধহয় এই যে, বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন করার পক্ষে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। এদের প্রতি কিছু আনুকূল্য করা সরকারের নীতি ছিলো। প্রসঙ্গত একথা মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত এবং জমিদার শ্রেণীর এই ব্যক্তিরাই ছিলেন বিদেশী শাসক ও দেশীয়দের যোগসূত্রস্বরূপ।

মফস্বল থেকেও যাঁরা বিধবাবিবাহের পক্ষে আইন প্রণয়নের জন্যে আবেদন করেন, তাঁরা ছিলেন স্থানীয় জমিদার শ্রেণী ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদের প্রতিনিধির মতো। চট্টগ্রাম থেকে প্রেরিত আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীদের সামাজিক স্ট্যাটাস বিশ্লেষণ করলে এই সত্য ধরা পড়ে। ৫৬ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১২ জন ছিলেন জমিদার, ৮ জন ছিলেন শিক্ষক, ১০ জন সরকারী কর্মচারী এবং ১৭ জন উকিল-মোক্তার প্রভৃতি আদালতে কর্মরত ব্যক্তি।[১১৮] অন্যান্য স্থান থেকে প্রেরিত আবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলেও হয়তো কম-বেশি একই ধরনের চিত্র ধরা পড়তো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসব আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীদের সামাজিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়নি। এই জমিদার, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক এবং উকিল-মোক্তারগণই মোটামুটিভাবে ঔপনিবেশিক সরকারের দালাল হিশেবে কাজ করতেন। অতএব তাঁদের দাবির প্রতি কিঞ্চিৎ মর্যাদা দেখানো সরকারের প্রায়

১১৬. Documents 37, 42, 48, 51, 52, 65, 66 and 67, **WRP.**

১১৭. **Reprot of the Select Committee,** Document 63, **WRP.**

১১৮. Document 21, **WRP.**

দায়িত্ব ছিলো। এখানে প্রসঙ্গত একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিধবাবিবাহের পক্ষে বঙ্গদেশ থেকে যাঁরা আবেদন করেন, তেমন ৪,৫৪১ জনের মধ্যে ২,৪৯৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগই ইংরেজিতে স্বাক্ষর দেন।[১১৯] অপর পক্ষে, বিধবাবিবাহের বিপক্ষ যে ৫৫ হাজার ব্যক্তি আবেদন করেন, তাঁদের মধ্যে ৫০০ জনেরও কম ইংরেজিতে স্বাক্ষর দেন। কমপক্ষে ছটি আবেদনপত্রে আদৌ কোনো ইংরেজি স্বাক্ষর ছিলো না। এ থেকে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র বিধবাবিবাহের সমর্থন না করলেও, যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁরা প্রধানত ইংরেজি-শিক্ষিত ছিলেন। আর যাঁরা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি থাকলেও, তাঁরা প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষিত ছিলেন না।

ব্যবস্থাপক সভা তথা সরকার হয়তো মনে করেছিলেন যে, তাঁরা আইনের বিরোধী ব্যক্তিদের হৈচৈ উপেক্ষা করতে পারেন। আইন প্রণয়নের উদ্যোগ সফল হওয়ার প্রধান কারণ অবশ্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের, বিশেষ করে জে. পি. গ্র্যান্টের অনুকূল মনোভাব। সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদন থেকে এই মনোভাবের প্রমাণ মেলে। গ্র্যান্টসহ তিন সদস্যবিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটি দীর্ঘ ৩০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধবাবিবাহের বিপক্ষ দলের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করেন।[১২০] তা ছাড়া, স্যার রবার্ট হ্যামিলটন, মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কমিশনারগণের আপত্তিও তাঁরা খণ্ডন করেন। পরিশেষে কলকাতার ইয়ংবেঙ্গলগণ বিধবাবিবাহের পরিবর্তে যে সাধারণ সিবিল বিবাহের আইন প্রণয়নের দাবি করেন,[১২১] তাঁরা তার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁরা আইন প্রণয়নের পক্ষে জোর সুপারিশ করেন।[১২২]

৩১ মে ১৮৫৬ তারিখে বিধবাবিবাহ বিল তৃতীয় বার পঠিত হওয়ার পরেও, রাধাকান্ত দেবের অনুসারীবৃন্দের কাছ থেকে সরকার কয়েকখানি আবেদনপত্র পান।[১২৩]

১১৯. আমি মাত্র একজনের স্বাক্ষর দেখেছি, যিনি ইংরেজি জানা সত্ত্বেও, বাংলায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ইনি দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। হতে পারে তাঁর মনিব কৃষ্ণনগরের মহারাজা বাংলায় স্বাক্ষর দেওয়ায়, তারপরেই দেওয়ান ইংরেজিতে স্বাক্ষর দিতে সংকোচ বোধ করেন। দ্রষ্টব্য : Document, **WRP.**

১২০. Document 63, **WRP,** pp. 1447-77.

১২১. Document 16, dated 13 January 1856, **WRP.**

১২২. Document 63, **WRP.**

১২৩. এর মধ্যে কয়েকটি আবেদনপত্র ছিলো বঙ্গদেশের বাইরের। দ্রষ্টব্য : Documents 65, 66, 67, 68, 69, 76 and 75, **WRP.**

ব্যবস্থাপক সভা শেষ পর্যন্ত ১৯ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন করেন এবং গবর্ণর জেনারেল ২৫ জুলাই তারিখে এটি অনুমোদন করেন।[১২৪] এই আইন অতঃপর ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন নামে পরিচিত হয়।

আইনের পক্ষে যাঁরা প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন করেছিলেন, আইন প্রণীত হলে তাঁরা স্বভাবতই খুব উল্লসিত হন। সম্বাদ ভাস্করে লেখা হয় যে, বিশেষ আনুকূল্য করার জন্যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জে. পি. গ্র্যান্টকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।[১২৫] এবং সত্যি সত্যি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বন্ধুগণ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্র্যান্টকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১২৬]

আইনের সীমিত সাফল্য

বিধবাবিবাহের সমর্থকগণ সাফল্যের এই উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে বোধ হয় আশা করেছিলেন যে, আইন প্রণীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক বিধবাবিবাহ করবে এবং বিধবারাও নিজেদের বিবাহের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, সম্ভ্রান্ত কোনো হিন্দু বিধবা বিবাহবিষয়ে কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।[১২৭] কেবল কয়েকটি ব্যতিক্রমই লক্ষ্য করা যায়। এক বিধবা--বিদ্যা দেবী-বিধবাবিবাহ আইনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর আর বিবাহের শখ নেই, কিন্তু শত শত বিধবার দুঃখ এর ফলে দূরীভূত হবে, অতঃপর এই আনন্দ ও সান্ত্বনা নিয়ে তিনি মরতে পারবেন।[১২৮] বিদ্যা দেবীর মতো কিছুসংখ্যক বিধবার এইরূপ ব্যতিক্রমধর্মী মনোভাবের পরিচয় আমরা বাংলা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখতে পাবো।[১২৯] কিন্তু এসত্ত্বেও স্বীকার না করে পারা যায় না যে, বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত সচেতনতার পরিধি তখনো অত্যন্ত সীমিত ছিলো এবং তত্তুত

১২৪. Documents 72 and 73, **WRP.**

১২৫. **সম্বাদ ভাস্কর,** ১৯ অগস্ট ১৮৫৬, **সাবাস ৩,** পৃ. ৩২৮।

১২৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৬২। এঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই কৃতজ্ঞতা জানান ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখে।— N. Mukherjee, p. 141.

১২৭. বিবাহ আইন 'প্রকাশিত হইলে পর ঘর ঘর অনুসন্ধান করিয়াছি কোন বাড়ীর কোন বিধবা কোন প্রকারে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না, কোন অবলা কৌতুকচ্ছলেও বলেন নাই বিবাহ করিবেন'—**সম্বাদ ভাস্কর,** ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬, **সাবাস ৩,** পৃ. ৩৪৬-৪৭।

১২৮. বিদ্যা দেবীর পত্র **সম্বাদ ভাস্কর,** ২১ অগস্ট ১৮৫৬, **সাবাস ৩,** পৃ. ৪৮৩-৮৪। এ পত্র আদৌ কোনো মহিলার কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে।

১২৯. পরে।

বিধবার পুনর্বিবাহের ঔচিত্য স্বীকার করলেও বাস্তবে বিধবাবিবাহ করা অথবা বিধবার বিবাহ দেওয়া—উভয়ই একান্ত অবাস্তব ও অনুচিত কর্ম বলে বিবেচিত হয়।[১৩০]

বস্তুত পক্ষে, বহু শতাব্দী ধরে বিধবাবিবাহের অনৌচিত্য সম্পর্কে সমাজে যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিলো সরকারী উদ্‌যোগে আইন প্রণয়নের মতো তাকে বিচলিত করা অত সহজ ব্যাপার ছিলো না। সে জন্যেই দেখতে পাই, আইন ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিধবাবিবাহ হয়নি। প্রকৃত পক্ষে, প্রায় সাড়ে চার মাস পরে বিধবাবিবাহ সমর্থকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই বিবাহ কর্মটিও খুব স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়নি। এ বিয়ের বর সংস্কৃত কলেজের এক সময়কার কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিয়ে করার কথা বলে শান্তিপুরের সৎকুলজাতা একটি বিধবাকে কলকাতায় আনেন কিন্তু শেষে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন।[১৩১] কন্যাপক্ষ এতে হাইকোর্টে মামলা রুজু করার হুমকি দেন।[১৩২] এদিকে শ্রীশচন্দ্রের মাতা দু-দুবার ছুরি নিয়ে বসে থাকেন এবং ভয় দেখান যে, শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ করলে তিনি আত্মঘাতী হবেন।[১৩৩] দু-দুবার তারিখ পাল্টানোর পরে শেষ পর্যন্ত ২৩ অগ্রহায়ণ (৭ ডিসেম্বর) এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৪]

এ বিয়ের পেছনে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় বলা হয়, বিধবা কন্যার জননী 'চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ' হওয়ায় এবং পাত্র শ্রীশচন্দ্র 'রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশা' করায় এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৫] শ্রীশচন্দ্র ডেপুটি কালেক্টরের চাকুরি পান আলোচ্য বিবাহের এক বছর আগে।[১৩৬] বিয়ের পর চাকুরি ক্ষেত্রে তাঁর দ্রুত উন্নতি হয়েছিলো, এমন কথাও জানা যায় না। সুতরাং এ অভিযোগের অর্ধেক ভিত্তিহীন।

১৩০. সমকালীন একটি বাংলা নাটকের একটি সংলাপ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : 'ওমা আমি কোথা যাব। অবাক কল্লি মা। বিধবার বের বিধেন হয়েছে, বলে কি সত্যি সত্যি বে হলো।' উমেশচন্দ্র মিত্র, **বিধবাবিবাহ নাটক** (দ্বিতীয় সংস্করণ; ভবানীপুর, ১৮৫৭) পৃ. ৪৮। সে সময়কার সমাজমানস এরূপ ছিলো বলে মনে করা সঙ্গত।

১৩১. **Hindu Patriot,** 4 December 1856, ইন্দ্রমিত্র, **করুণাসাগর বিদ্যাসাগর** (দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৭১), পৃ. ৩০৭।

১৩২. **সম্বাদ ভাস্কর,** ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬, সাবাস ৩, পৃ. ৪৩-৪৪।

১৩৩. **সম্বাদ ভাস্কর,** ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬, সাবাস ৩, পৃ. ৩৪৪-৪৫।

১৩৪. ঐ।

১৩৫. **সম্বাদ প্রভাকর, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৬।

১৩৬. A Guha (ed.) **Unpublished Letters of Vidyasagar** (Calcutta, 1971), letter no. 188 (7 Dec. 1855), p. 83.

বাকি অর্ধেক সত্য হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বিধবা-বিবাহের পক্ষে এতো সব গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও, দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ বিধবার বিয়ে দিতে অথবা বিধবাকে বিবাহ করতে রাজি ছিলেন না অথবা আদৌ রাজি থাকলেও হয়তো সাহস করেননি। অথচ প্রলোভনও কম ছিলো না। দেশব্যাপী রাতারাতি খ্যাতি লাভ করা ছাড়াও, কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘোষণা করে-ছিলেন, ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৫৭) মাস পর্যন্ত যাঁরা বিধবাবিবাহ করবেন, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি এক হাজার টাকা করে পুরস্কার দেবেন।[১৩৭] বর্ধমানের রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রথম বিধবাবিবাহকারীকে তিনি একটি রৌপ্য পাত্র প্রদান করবেন।[১৩৮]

বিধবাবিবাহের সমর্থকগণ শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বলা বাহুল্য আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত হন। বিবাহ উপলক্ষে যে জাঁকজমক হয়েছিলো, তা এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের প্রমাণ দেয়।[১৩৯] এই আনন্দ ও উল্লাসের কারণ এ নয় যে, এই বিবাহের ফলে তাবৎ বিধবার দুঃখদুর্দশার অবসান হলো বলে এঁরা মনে করেন। বরং তাঁরা উচ্ছ্বসিত হন এ জন্যে যে, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এ দেশের একটি অতি সুকঠোর আচারে তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে আঘাত করতে সমর্থ হলেন। তাঁরা সম্ভবত এমন আশাও করেছিলেন যে, এ রকমের আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তাঁরা দেশাচারের নিষ্ঠুর শাসন থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে পারবেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র বোধ হয় এই উচ্ছ্বাসবশতই সেদিন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'অদ্যকার দিন আমার দেশের ইতিহাসে নবযুগের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য হইবে।'[১৪০]

১৩৭. **সম্বাদ ভাস্কর**, ২২ নভেম্বর ১৮৫৬, সাবাস ৩, পৃ. ৩৩৫-৩৬।

১৩৮. **সম্বাদ ভাস্কর**, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৫৬, ঐ, পৃ. ৩৫৬।

১৩৯. বিবাহ সভায় কলকাতার প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এঁদের শকটে বিবাহবাড়ির নিকটস্থ রাজপথ সকল পূর্ণ হয়ে যায়। **তত্ত্ব**, পৌষ ১৭৭৮, পৃ. ১২৯-৩০। বিবাহ সভায় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ মিলে অন্তত দু হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া সামাজিক সমর্থন জানাতে লালবনাত পরা শতাধিক ধর্মব্যবসায়ী পণ্ডিত এবং কয়েকজন বিখ্যাত ঘটকও অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন। রঙ্গপ্রদর্শনার্থীদের এতো ভিড় হয়েছিলো যে, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পুলিশ ডাকতে হয়েছিলো।--সংবাদ প্রভাকর, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৬।

১৪০. মন্মথনাথ ঘোষ, **কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র**, পৃ. ১০৮।

রাজনারায়ণ বসু এ দিনের স্মৃতিচারণ করে লেখেন, 'সেদিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে, যুগ উল্টানোর ন্যায় একটি কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে।'[১৪১]

তত্ত্ববোধিনী কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর প্রাণহীন আচার থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ পত্রিকায় লেখা হয় যে, বিধবাবিবাহের ফলে—

> কোন কোন ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেছেন,—কেহবা এই ঘটনাকে স্বদেশের চিরকল্যাণের কারণ জানিয়া ইহার প্রযোজক ও প্রবর্তকদিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন---। এই চিরবাঞ্ছিত ও দূরলক্ষিত সুখময় শুভদিন উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারাই আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছেন এবং এই কল্যাণকর পুণ্যতর যত্নে সফল হওয়াতে তাহারাই আপনাদিগের সকল শ্রম ও সকল যত্নকে সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দ স্রোতে প্লাবিত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে জগদীশ্বরের অসদৃশ করুণাপ্রসাদে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে জ্ঞানসূর্যের উদয় হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে, জ্ঞানজ্যোতি: প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক সন্তান জননী জন্মভূমিকে নানা প্রকার অধর্মকণ্টকে বিদ্ধ দেখিয়া তাহা উত্তোলন করিবার জন্য ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়াছে এবং তাহাকে পুণ্যকর্মরূপ পরম শোভনীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতেছেন, যে পাপভার প্রপীড়িত ভারতভূমি অনেক সাধু ব্যক্তির যত্নহেতু এতদিনে এই সকল পাপের ভার হইতে পুনর্বার মুক্ত হইতেছে, ভুবন বিখ্যাত হিন্দুজাতির বহুকালের গাঢ় কলঙ্ক ক্রমে অপনীত হইবার উপায় হইয়াছে এবং অবনত-মস্তক হিন্দুস্থান পুনর্বার উন্নতগ্রীব হইয়া আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারা এই সমস্ত শুভ চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া হিন্দুস্থানের শ্রীবৃদ্ধির ও হিন্দুজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য আশালতাকে নিয়ত বলবতী করিতেছেন।---বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে যে ভারতবর্ষের কি পর্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষবাসি হিন্দুজাতির কতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইবার পথ হইয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপে ক্রমে যদি ভারতবর্ষের সকল কুপ্রথা নিরাকৃত হয় এবং এখানে সুপদ্ধতিসকল প্রচলিত হইয়া উঠে তাহা হইলে, ভারতভূমি পৃথিবীর মধ্যে পুনর্বার সর্বাগ্রগণ্য ধর্মক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হিন্দুজাতি

১৪১. রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃ. ৯৯-১০০।

সম্যকরূপে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া উঠে।[১৪২]

অপর পক্ষে, সমাজের রক্ষণশীল অংশ বিধবাবিবাহকে গণ্য করেন, তাঁদের জাত মারার ষড়যন্ত্র হিশেবে।[১৪৩] এজন্যে এ ঘটনাদৃষ্টে তাঁরা স্বভাবতই শোকাভিভূত ও ক্রোধান্বিত হন।[১৪৪] আইন প্রণয়ন ও বিবাহানুষ্ঠানের ব্যাপারে বাহ্যত তাঁদের পরাজয় হয়। এ কারণে তাঁরা সমাজের অভ্যন্তরে আপনাদের যথাসাধ্য প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পান। যাতে কেউ বিধবার বিবাহ দিতে অথবা বিধবাকে বিবাহ করতে উদ্যত না হয়, অথবা দিলে কিংবা করলে যথোচিত সামাজিক দণ্ড লাভ করে, রক্ষণশীল সমাজ সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। যে পুরোহিতগণ বিধবা বিবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাঁরা যাতে একঘরে হন—সে ব্যবস্থাও গৃহীত হয়! এর ফলস্বরূপ দেখতে পাই, কলকাতার বুদ্ধিজীবী ও 'বাবু'দের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, প্রথম বিধবাবিবাহকারী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কিংবা দ্বিতীয় বিধবাবিবাহকারী মধুসূদন ঘোষ সামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাননি।[১৪৫] 'জ্ঞাতি কুটুম্বাদি সকলে তাঁহারদিগকে গ্রহণ করেন নাই, কতক এদিগে কতক ওদিগে এরূপ দলাদলি ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।'[১৪৬] কেবল তাই নয়, শ্রীশচন্দ্র ও মধুসূদনের বিবাহ সভায় যে-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগদান করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই নিমন্ত্রণ বন্ধ হয় এবং সমাজের বিরোধিতায় অনেকের টোল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিধবাবিবাহের সপক্ষদল অপেক্ষা বিপক্ষ দলের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃহত্তম সমাজে অনেক বেশি প্রবল ছিলো। তাই বিপক্ষদল বিধবাবিবাহের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার না করায়, সামাজিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এর ফলে বিধবাবিবাহ আদৌ স্ফূর্তিলাভ করতে পারেনি। শ্রীশচন্দ্র ও মধুসূদনের বিয়ের সাত সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যাসাগর আরো পাঁচ ছটি বিধবাবিবাহের আয়োজন করেন, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায়, বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুদের অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রভাব ইত্যাদি সত্ত্বেও এসমস্ত বিবাহ শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।[১৪৭]

বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক হলাহল ওঠে, তা দীর্ঘকালের জন্যে

১৪২. 'বিধবাবিবাহ', **তত্ত্বপ**, পৌষ ১৭৭৮ (ডিসেম্বর ১৮৫৬—জানুআরি ১৮৫৭), পৃ. ১৩০-৩১।

১৪৩. পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজ-চিন্তা অথবা ইয়োরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজ-বিষয়ক প্রস্তাব** (কলিকাতা, ১৮৮২), পৃ. ৮১। অতঃপর সমাজচিন্তা বলে উল্লিখিত।

১৪৪. 'বিধবাবিবাহ', **তত্ত্বপ**, পৌষ ১৭৭৮, পৃ. ১৩০।

১৪৫. 'বিধবাবিবাহ', **সম্বাদ ভাস্কর**, ৩১ জানুআরি ১৮৫৭, সাবাস ৩, পৃ. ৩৭৪-৭৬।

১৪৬. ঐ, পৃ. ৩৭৫।

১৪৭. ঐ।

পরিবারের সঙ্গে পরিবারের, এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিনষ্ট ও ব্যাহত করে। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে রাজনারায়ণ বসুর দুই জ্যেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ ও মদনমোহন বসু তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহের পাত্র হন।[১৪৮] বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই রাজনারায়ণ ব্যাপারটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানিয়ে তাঁর মতামত শুনতে চান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এর ফলে 'যে বিষ উঠিবেক তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে।' এই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করে লেখেন, 'কিন্তু "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা করিবেন'।[১৪৯] পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও রাজনারায়ণ উদ্যোগী হয়ে এই বিবাহ সম্পাদন করেন। বিয়ের সংবাদে রাজনারায়ণের মা 'ক্ষিপ্ত প্রায়' হয়েছিলেন। বিয়ের সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। বাড়িতে থাকলে, রাজনারায়ণ যথার্থই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, এ বিয়ে দুটি অনুষ্ঠিত হতো না। পরে এ ব্যাপারে মা তাঁর কাছে আক্ষেপ প্রকাশ করে ছিলেন।[১৫০] কেবল তাই নয়, তাঁর খুল্লতাতের ভাষায়—এ বিয়ের পরে তাঁরা কায়স্থকুল থেকে বহিষ্কৃত হন। গ্রামের লোকের ভয়ে রাজনারায়ণ অতঃপর দীর্ঘকাল দিনের বেলায় বাড়িতে যেতে পারেননি।[১৫১] দশ বছর পরে ১৮৬৭ সালে তিনি যখন গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ছ মাস বাস করেন, তখনো খুড়া মহাশয়ের আদেশে তাঁকে বাড়ির সংলগ্ন স্থানে একটি আলাদা গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে হয়। খুড়া মহাশয়ের আশঙ্কা ছিলো, রাজনারায়ণ মূল বাড়িতে থাকলে তাঁরা সকলেই জাতিচ্যুত হতে পারেন।[১৫২]

বস্তুত বিধবাবিবাহ প্রাচীন ও নবীন, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের ব্যবধান তীক্ষ্ণ, অনেক ক্ষেত্রে দুস্তর করে দেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, তাঁর পিতামহ যেমন বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাঁর পিতা তেমনি এর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।[১৫৩] পিতার সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পর্ক ১৮৬৮ সালের আগেই আলগা হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে

১৪৮. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৬ ; **রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত**, পৃ. ১০০।

১৪৯. দেবেন্দ্রনাথের চিঠি, অমৃতসর থেকে ২৪ ফাল্গুন ১৭৭৮ শকাব্দ (মার্চ ১৮৫৭) তারিখে লেখা, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক), **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী** (কলিকাতা, ১৯০৯), পৃ. ৬১-৬২। অতঃপর **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী** বলে উল্লিখিত।

১৫০. **রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত**, পৃ. ১০১।

১৫১. **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ. ৬৩; **রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত**, পৃ. ১০০-০১।

১৫২. **রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত**, পৃ. ১১১।

১৫৩. S.N. Banerjea, **A Nation in Making** (Reprint; Calcutta, 1963), P. II.

বিধবাবিবাহ করতে সহায়তা করায়, পিতার সঙ্গে শিবনাথের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়।[১৫৪] সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (১৮৭৫) নাটকের রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ দাসও শিবনাথের সহায়তায় ১৮৬৯ সালে বিধবাবিবাহ করেন।[১৫৫] তাঁর পিতা শ্রীনাথ দাস হাইকোর্টের উকিল এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এ বিবাহে তিনি এতোই রুষ্ট হন যে, পিতাপুত্রের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের জন্যে ছিন্ন হয়।[১৫৬]

বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে বিধবাবিবাহ আন্দোলন এক সূত্রে গাঁথা, বিধবা-বিবাহকে তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম কার্য বলে মনে করেন।[১৫৭] কিন্তু তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিধবাবিবাহ করেন,[১৫৮] তখনো তাঁর রক্ষণশীল আত্মীয়স্বজন বিদ্যাসাগরকে ত্যাগ করার হুমকি দেন।[১৫৯] এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর মনোমালিন্য ঘটে।[১৬০] অন্যেরা এ বিয়েকে ব্যঙ্গ করে পুস্তক প্রকাশ করেন।[১৬১]

১৮৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দুর্গামোহন দাস বিধবা বিমাতার[১৬২] বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন। এ নিয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীমোহনের সঙ্গে তাঁর দারুণ মতান্তর ঘটে। কালীমোহন বিমাতাকে কাশী পাঠিয়ে সেখানে গোপন করে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্গামোহনের যে-ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে এই মহিলার প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো, তাঁর সঙ্গে দুর্গামোহনের চেষ্টায় এর বিয়ে হয়।[১৬৩]

১৫৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্ম-চরিত** (কলিকাতা, ১৯৫২-এর সিগনেট সং.), পৃ. ৭৬-৭৭।

১৫৫. বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় ১২৭৬ সালের শ্রাবণ মাসে। **বামাপ**, আশ্বিন ১২৭৬, পৃ. ১১৭, শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৮১-৮৪।

১৫৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৫৭. তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি, ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এ উদ্ধৃত, পৃ. ২৯৭।

১৫৮. বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় ২৭ শ্রাবণ ১২৭৭ তারিখে।— **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৭ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৭০), পৃ. ১৪৬।

১৫৯. আত্মীয়দের হয়তো ধারণা ছিলো অন্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলেও, নিজের ছেলেকে তিনি নিশ্চয় কুমারী বিবাহ দেবেন।— চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৬।

১৬০. A. Tripathi, **Vidyasgar : The Traditional Moderniser** (Calcutta, 1974) P. 64.

১৬১. অজ্ঞাতনামা-রচিত, **উৎকৃষ্টকাব্য** (কলিকাতা, ১৮৭০)। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার একটি কপি আছে।

১৬২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, এই মহিলা বালিকা ছিলেন।— পৃ. ২৭৭। কিন্তু তাঁর বিয়েটি প্রণয়ঘটিত, সে থেকে মনে হয়, বয়স কম হলেও তিনি বালিকা ছিলেন না।

১৬৩. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'অসাধারণ দুর্গামোহন দাস,' **দীপ্তি** (কলিকাতা, ১৯০২), S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, p. 424.

এবিয়ের ফলে বরিশালের সমগ্র হিন্দু সমাজের সঙ্গে দুর্গামোহনের সম্পর্ক এক প্রকার ছিন্ন হয়।[১৬৪] যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবাবিবাহ করায় শিবনাথের পিতাই শিবনাথের উপর রুষ্ট হননি, যোগেন্দ্রনাথের আত্মীয়গণও যোগেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন। এক সময়ে আত্মীয়রা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করে অন্য একটি কুমারীকে বিয়ে করার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। অপর পক্ষে, তাঁর শাশুড়ী বিধবাকন্যার পুনর্বিবাহ হওয়ার সংবাদ শুনেই বাড়ী ত্যাগ করে কাশী চলে যান।[১৬৫]

সমাজের এর চেয়েও প্রতিকূলতা লক্ষ্য করি আর একটি দৃষ্টান্তে। এডুকেশন গেজেট পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিমাইচরণ সিংহ বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের কথায় একটি বিধবাকে বিবাহ করেন। সংবাদ শুনে তাঁর মা তাঁকে গ্রামের বাড়িতে ডেকে পাঠান এবং পুনরায় একটি কুমারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। পরে এডুকেশন গেজেটের স্বত্ব প্যারীচরণ সরকারের হাত থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে গেলে, নিমাইচরণ তাঁর চাকুরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। কিন্তু ভূদেব তাঁকে চাকুরিতে রাখেন। নিমাইচরণ একদিন ভূদেবের বাড়িতে সস্ত্রীক বেড়াতে গেলে বাহ্যত তাঁদের যত্ন করা হয়। কিন্তু তাঁরা চলে যাওয়ার পরে তাঁরা যে মাদুরে বসেছিলেন সেটি ধুয়ে ফেলা হয়। ভূদেবের স্ত্রী মন্তব্য করেন যে, ভাগ্যিস অল্পের জন্যে তাঁরা বিছানাপত্র ছুঁয়ে সেগুলি নষ্ট করেননি। তার চেয়েও বড়ো কথা একটি বিবাহিত বিধবাকে হিন্দুর বাড়িতে বেড়াতে আসতে দেখে তিনি বিস্মিত হন। কয়েক বছর পরে নিমাইচরণ ও তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দুটিকে প্রতিপালনের জন্যে ভূদেব নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে ভৃত্যরা বলে যে, তারা ব্রাহ্মণ বাড়িতে কাজ করতে এসেছে, এ জাতীয় বিয়ের ফলে জাত সন্তানদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করতে আসেনি।[১৬৬]

এর থেকেও মন্দ আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক নিকট আত্মীয়া বিধবার বিবাহ দেন। বিবাহ হয় এই বিধবার পছন্দ-করা এক পাত্রের সঙ্গে।[১৬৭] কিন্তু এই বছরই, এই হতভাগিনী

১৬৪. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, **জীবনালেখ্য** (দ্বিতীয় সং., কলিকাতা, ১৮৭৯), পৃ. ৭১-২২, S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, pp. 424-25.

১৬৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৭৬-৭৮।

১৬৬. কুমারদেব মুখোপাধ্যায় ভূদেবচরিত, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, তারিখ নেই) পৃ. ২৭৩-৭৫।

১৬৭. D. Chakrabarty, **Sasipada Banerjee: A Study in the Nature of First Contact of the Bengali Bhadralok with the Working Classes of Bengal** (Calcutta, 1974), p. 8 ; D. Kopf, 'The Making of Modern India : History of Brahmo Samaj (Forthcoming book), Ch. XVII.

বিধবাকে রীতিমতো শারীরিক নির্যাতন এবং মর্মান্তিক অপমানের মুখে স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়।[১৬৮] এ থেকেই বিধবাবিবাহের প্রতি বৃহত্তর সমাজের মনোভাব কি রকমের ছিলো, তা অনুমান করা যায়।

আসলে সমগ্র জনসাধারণের এক শতাংশও নয়—এমন কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া, আপামর জনগণ যে-বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখতো, তা জনপ্রিয় হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই বিপুল আয়োজন এবং ব্যাপক অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ সাধারণ্যে প্রচলিত হতে পারেনি। ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৬০টি বিধবাবিবাহের জন্যে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সঙ্গীদের সংগৃহীত বিধবাবিবাহ তহবিল থেকে ৮৭,০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। এই টাকা দিয়ে দরাজ হাতে ঘটক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দক্ষিণা দিতে হতো। পাত্রীকে দিতে হতো অলঙ্কার। এসব বিয়ের ব্যয় বহন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন বলে জানা যায়। এ সময়ে তাঁকে বছরে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা করে সুদ দিতে হতো।[১৬৯] কিন্তু বিদ্যাসাগরের এসব প্রয়াস সত্ত্বেও কলকাতা নগরীতে বিধবাবিবাহ বিষয়ে ভাটা লক্ষ্য করা যায়, ষাট দশকের শুরু থেকেই।

মফস্বলেও বিধবাবিবাহের কথায় কোথাও কোথাও উৎসাহ জেগেছিলো। নোয়াখালির মেয়ে মহলে বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, প্রভাকরে তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো।[১৭০] মেদিনীপুরের বিধবারাও নতুন আশার আলো দৃষ্টে উচ্ছ্বসিত পত্র লিখেছেন প্রভাকরে।[১৭১] শান্তিপুরের তাঁতিরা এ সময়ে বিদ্যা-সাগর পেড়ে শাড়ি তৈরি করেন।[১৭২] গ্রামের পথে গরুর গাড়িতে যাবার সময়ে পথিক, বাঁক কাঁধে যেতে যেতে শ্রমিক, এমন কি টলমল পদে ঘরে ফেরার সময়ে মাতাল 'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর' গান করছে[১৭৩]—ইত্যাদি টুকরো দৃশ্য এ আন্দোলনের ব্যাপ্তিই প্রকাশ করে। কিন্তু যে সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো খুব সীমিত এবং শিক্ষার হার অতি নগণ্য, সেখানে এ আন্দোলন

১৬৮. Sir A.R. Banerji, **An Indian Pathfinder: Memoirs of Sasipada Banerji** (Reprint; Calcutta, 1971. First published in the 1920's), pp. 60–61, 82–83.

১৬৯. **সোমপ্রকাশ**, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ (মে ১৮৬৭); **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, পৃ. ২৭৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৮৫।

১৭০. **সংবাদ প্রভাকর**, ১২ জুন ১৮৫৫, **সাবাস** ৪, পৃ. ৭৭৬-৭৭।

১৭১. ঐ, ২৪ মে ১৮৫৫, **সাবাস** ৪, পৃ. ৭৬৯-৭০। এই পত্র সত্যি সত্যি বিধবাদের রচনা কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৭২. ইন্দ্র মিত্র, **করুণাসাগর বিদ্যাসাগর**, পৃ. ২৮৫।

১৭৩. **সম্বাদ ভাস্কর**, ১২ অগষ্ট ১৮৫৬, **সাবাস** ৩, পৃ. ৪৮১-৮৩।

মফস্বলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া অথবা আন্দোলনের পক্ষে সাফল্য অর্জন সহজ ছিলো না। ঢাকার মতো একটি প্রধান শহরে এ আন্দোলনের ঢেউ লাগে ১৮৬১ সালে, যখন খোদ কলকাতায় এ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছে।

ঢাকা অঞ্চলের এই আন্দোলন নতুন করে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ধারায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত করেন।[১৭৪] এ আন্দোলন উপলক্ষে হরিশচন্দ্র মিত্র এই আন্দোলনকারীদের উৎসাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে একটি নাটিকা প্রকাশ করেন।[১৭৫] এই নাটিকায় বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের প্রয়াস ছিলো। রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে একটি নাটিকা রচনা করে এর জবাব দেওয়া হয়।[১৭৬] অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষিত যুবকগণ এই নাটিকার পাল্টা উত্তর দেন অশুভ পরিহারক নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এ সময়কার ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় বহু ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রকাশ করে বিধবাবিবাহের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে বিধবাবিবাহ দিতে প্রায় কেউই অগ্রসর হয়নি। হরিশচন্দ্র এই অবস্থা দৃষ্টে লেখেন—

> ভরসা করিয়াছিলাম স্বাক্ষরকারীগণ অনতি বিলম্বে আপনাদিগের স্থির প্রতিজ্ঞা প্রদর্শাইয়া এ প্রদেশে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তিত করিয়া তুলিবেন। এক্ষণে সে আশা অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ যেরূপ দীর্ঘ সূত্রিতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, তাঁহারা কৃতকার্যতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে না।[১৭৭]

হরিশচন্দ্রের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। সত্যি সত্যি ঢাকা অঞ্চলে বিধবাবিবাহ একটি অতিশয় ব্যতিক্রম হিশেবেই বিবেচিত হতে থাকে।[১৭৮] কিন্তু সংখ্যার বিচারে এ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হোক অথবা না-ই হোক, ষাট-দশকের গোড়ার দিকে কয়েক বছর ঢাকা অঞ্চলে বিধবাদের দুর্দশা সম্পর্কে জনচিত্তে একটি সচেতনতার উন্মেষ ঘটেছিলো—এটা অস্বীকার করা যায় না।

১৭৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বিধবাবিবাহ**, বিজ্ঞাপন, পৃ. ১।

১৭৫. হরিশচন্দ্র মিত্র, **শুভস্য শীঘ্রং** (ঢাকা, ১৮৬১)।

১৭৬. গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, **অশুভস্য কালহরণং** (ঢাকা, ১৮৬২)।

১৭৭. হরিশচন্দ্র মিত্র, **ম্যাও ধরবে কে?** (ঢাকা, ১৮৬২), বিজ্ঞাপন, পৃ. /.।

১৭৮. ১৮৬৪ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে **বামাবোধিনী** পত্রিকায় যে পঞ্চাশটি বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, তার মাত্র তিনটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য।

এরূপ সচেতনাতর স্বাক্ষর মফস্বলের অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়। বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি নিয়েই ১৮৬৪ সালে হাওড়ার 'বিধবা-বিবাহোৎসাহিনী সভা,[১৭৯] ১৮৭১ সালে মোগল সরাই-এর 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'[১৮০] প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহ জনপ্রিয় না হয়ে ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। ষাট দশকের শেষভাগে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সমাজমানসের পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সত্তর দশকের গোড়া থেকেই এ আন্দোলনের ধারা প্রায় শুকিয়ে যায়।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তকে ঈশানচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন যে, বিধবাবিবাহের মতো অনুচিত ঝড় থেমে গেছে এবং সমাজের স্রোত স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত হচ্ছে।[১৮১] আর্যদর্শন পত্রিকায় এ মন্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলা হয়, তা থেকেও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ভাটার কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্যদর্শনে বলা হয়, 'আমরা গ্রন্থকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই স্রোত প্রকৃতির নিয়মানুসারে আবার বিপরীত দিকে যাইবে, কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে না।'[১৮২] বামাবোধিনী পত্রিকায় বিধবাবিবাহের সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই পত্রিকায় বিধবাবিবাহের একটি সংবাদও লক্ষ্য করা যায় না।[১৮৩] ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ব্রাহ্মদের মধ্যেও ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ সালের ভেতর মাত্র ৮টি বিধবাবিবাহ হয়।[১৮৪] বিধবাবিবাহ আন্দোলনের এই পরিণতি দৃষ্টে ১৮৮২ সালে পূর্ণচন্দ্র বসু বলেন, 'আর বিধবার বিবাহের শব্দ বৎসরেও একবার শুনা যায় না।[১৮৫] এই কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন পরের বছর বামাবোধিনী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, বিধবাবিবাহের কথা অনেক দিন হিন্দুসমাজে আর শোনা যায়নি।[১৮৬]

১৭৯. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, কার্তিক ১২৭১, পৃ. ২১২।

১৮০. **সোমপ্রকাশ**, ৩০ ফাল্গুন ১২৭৭, সাবাস ৪, পৃ. ২২৭।

১৮১. ঈশানচন্দ্র বসু **বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত** (কলিকাতা, ১৮৭৪), **আর্যদর্শন**, মাঘ ১২৮১ (জানুআরি-ফেব্রুআরি, ১৮৭৫)-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৫৪১।

১৮২. 'বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত', **আর্যদর্শন**, পৃ. ৫৪১-৪২।

১৮৩. দ্রষ্টব্য : **বামাপ**, ১২৪ সংখ্যা থেকে ১৭৯ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৮০ থেকে অগ্রহায়ণ ১২৮৬ উপরন্তু দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট 'ঘ'।

১৮৪. **Report on the Administration of Bengal, 1882-83** (Calcutta, 1883), p. 497.

১৮৫. পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজ-চিন্তা**, পৃ. ৮৪।

১৮৬. **বামাপ**, চৈত্র ১২৮৯, পৃ. ৩৫৪।

আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে এবং আইনের সমর্থন আদায় করেও লোকাচারবিরোধী বিধবাবিবাহকে হিন্দুসমাজে প্রচলিত করা গেলো না। ১৮৫০-এর দশকের শেষার্ধে সমগ্র বঙ্গসমাজ এই আন্দোলনে অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু বিশ বছরেরও কম সময়ের ভিতর আন্দোলনের পরিণতি যে হতাশাব্যঞ্জক সে সম্পর্কে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা মন্তব্য করে। সেই সঙ্গে এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করে এতে বলা হয়, দেশের প্রায় তাবৎ শিক্ষিত লোকই বিধবাবিবাহ প্রচলনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝে থাকেন কিন্তু সমাজবন্ধন ত্যাগ করতে পারেন না; এ জন্যেই বিধবাবিবাহের প্রচলন সম্ভব হলো না।[১৮৭]

আসলে বিধবাদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা দেখে বিচলিতচিত্ত সমাজকর্মীগণ ১৮৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এ কথাটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি যে, ক্ষেত্র যথার্থভাবে প্রস্তুত না হলে, সংস্কারের বীজ যতোই রোপিত হোক, ফসল আশানুরূপ হয় না। প্রাচীন শাস্ত্র উদ্ধার করে, যুক্তি দিয়ে ঐতিহ্যিক সমাজে বড়ো কোনো পরিবর্তন আনা যায় না। যে সমাজে পুরুষদের শিক্ষাই আংশিকভাবে প্রচলিত ছিলো এবং স্ত্রীশিক্ষা কার্যত অপ্রচলিত ছিলো, সে সমাজের মনোভাবে পরিবর্তন আনয়ন করা সহজে সম্ভব হয় না। প্যারীচাঁদ মিত্র যথার্থই এ আন্দোলনের সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন,

> We entertain serious doubts, as to whether any great social reform can be immediately effected. It is possible that the force of the present agitation, or the pressure of influence, may bring about one or two marriages of widows, but when there is no good male education, . . . when the females are so far behind, when the duty of raising them is not practically appreciated, where are the elements of sustained and continuous action ?[১৮৮]

বাস্তবে দেখতে পাই, ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০টি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হলেও বিধবাবিবাহ রীতিমতো প্রচলিত বা জনপ্রিয় হয়নি। বরং এ সময়ের মধ্যেই বিধবাবিবাহ সম্পর্কে অত্যুৎসাহী সমাজকর্মীগণও তাঁদের মনোবল এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ১৮৬৭ সালে *Hindu Patriot* পত্রিকায় প্রদত্ত

১৮৭. 'উদাসীনা', জ্ঞানাঙ্কুর, ফাল্গুন ১২৮০ (ফেব্রুআরি-মার্চ ১৮৭৪), পৃ. ১৮৭।
১৮৮. P.C. Mitter, p. 365.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিবৃতিতে বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁর আর উৎসাহ নেই এমন কথা সরাসরি না থাকলেও, তাঁর তিক্ততা এবং জনগণের সহানুভূতি সম্পর্কে তাঁর হতাশা আদ্যন্ত সমস্তটা বিবৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[১৮৯] সমগ্র সমাজের বিরোধিতার মুখে বিদ্যাসাগরের একার প্রয়াস যে অর্থহীন তা অনুধাবন করে প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে লেখেন, বিদ্যাসাগর বনিয়াদি ঘরওয়ানা নন, কারো উপর তাঁর প্রভুত্ব নেই, তাঁর যথেষ্ট ধনও নেই, তিনি একা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করবেন কী করে। হতাশ প্যারীচরণ মন্তব্য করেছেন, 'সত্যের সর্বত্র জয়' যে প্রবাদ আছে, সে কাজের কথা নয়, তা কেবল অবাস্তব।[১৯০]

একদিন যাঁরা বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং তহবিলে চাঁদা দিতে স্বীকার করেন, এই হতাশা হেতু তাঁরা অনেকেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে আরম্ভ করেন। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র এই অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রমাণ দেয়।[১৯১] কালীপ্রসন্ন সিংহ কিংবা কৃষ্ণনগরের মহারাজাও দুর্গা-চরণে মতোই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। বিধবাবিবাহকারীদের পুরস্কার দেবেন বলে কালীপ্রসন্ন শেষ পর্যন্ত পুরস্কার দেননি[১৯২] এবং কৃষ্ণনগররাজ চাঁদা দিয়ে ফেরত নেন।[১৯৩]

কেউ কেউ বলেন, আইনের ত্রুটির জন্যেই (পুনর্বিবাহ করলে প্রথম স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন) বিধবাবিবাহ জনপ্রিয় হতে পারেনি।[১৯৪] কিন্তু এ কথা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ সেকালে অনেক বিধবা নিশ্চয়

১৮৯. **Hindu patriot,** 1 July 1867, ইন্দ্র মিত্র, **করুণাসাগর বিদ্যাসাগর**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩১-৩২।

প্রসঙ্গক্রমে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্রখানিও দ্রষ্টব্য।-- চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এ উদ্ধৃত, পৃ. ২৮৭-৮৮। এই বিবৃতি ও পত্রের প্রতিলিপির জন্যে দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ৬।

১৯০. প্যারীচরণ সরকার, 'বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা,' **হিতসাধক,** শ্রাবণ ১২৭৫, পৃ. ১৫২-৫৩।

১৯১. বিদ্যাসাগর এ পত্রে লেখন যে, একদিন যাঁরা বিধবাবিবাহ তহবিলে চাঁদা দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন, তাঁরা অনেকে আদৌ চাঁদা দেননি, অনেকে কেবল আংশিক দেন। দুর্গা-চরণও তার এককালীন চাঁদার অর্ধেক মাত্র দেন এবং শেষে মাসিক চাঁদা দেওয়াও বন্ধ করেন। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ৬।

১৯২. ভদ্রবংশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পত্র, **সম্বাদ ভাস্কর,** ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, **সাবাস** ৩, পৃ. ৩৭৭।

১৯৩. **কৃষ্ণনগররাজের পত্র, চণ্ডীচরণে উদ্ধৃত,** পৃ. ২৮৯।

১৯৪. **সোমপ্রকাশ,** ৪ ভাদ্র ১২৯১ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৪), **সাবাস** ৪, পৃ. ৩২২-২৩।

ছিলেন, যাঁদের প্রথম স্বামীর সম্পত্তি তেমন বেশি ছিলো না। আসলে আইন করে সতীদাহের মতো একটি রীতিকে নিষিদ্ধ করা যায়, কিন্তু একটি ঐচ্ছিক রীতিকে প্রচলিত করা যায় না।

শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করেও এরূপ ঐচ্ছিক রীতিকে প্রচার করা যায় না। তাই দেখতে পাই, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেও, বিদ্যাসাগর দেশাচার-বিরোধী বিধবাবিবাহ প্রথাকে জনপ্রিয় করতে পারেননি।[১৯৫] বিদ্যাসাগর নিজেও দেশাচারের প্রবল ও সর্বব্যাপী প্রভাবের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এ জন্যে তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে অযৌক্তিক ও অর্থহীন দেশাচারের বন্ধন ত্যাগ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান।[১৯৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশাচারের কাছেই বিধবাবিবাহ আন্দোলন পরাস্ত হয়। সাধারণ মানুষ একে নিম্নবর্ণোচিত বলে চিহ্নিত করে।[১৯৭] অন্ধ সমাজ এ জন্যে বিধবাবিবাহের ঔচিত্য অনুধাবন করলেও সাহসের অভাবে নতুন প্রথাকে বরণ করতে অসমর্থ হয়। বিচারের সময় যতোই শাস্ত্রের দোহাই দিক না কেন 'কার্যকালে লোকাচারের' অন্ধ পথই অনুসরণ করে।[১৯৮] প্রকৃত পক্ষে, এই লোকাচারের মুখেই উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, উদারতা ও মানবিকতার মূল্যবোধসমূহ স্ফূর্তি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। তা ছাড়া শতাব্দীর শেষ পাদে ভিক্টোরিয় বঙ্গদেশ আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের যে আপোশ করে[১৯৯] এবং এর ফলে তার যেসব মূল্য দিতে হয়, বিধবাবিবাহের প্রত্যাখ্যান সেগুলির অন্যতম।

দেশাচারের অন্ধ অচলায়তন ছিন্ন করা হয়তো সম্ভব হতো, তার সঙ্গে কোনো একটা ধর্মীয় আন্দোলনের যোগাযোগ ঘটিয়ে। ১৮৬১ সাল থেকে কেশবচন্দ্র সেনের পোষকতায় তাঁর অনুসারীগণ প্রায় ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে বিধবাবিবাহের সমর্থন করেন। এর ফল হয় দ্বিবিধ। একদিকে এর ফলে নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক বিধবারবিবাহ হয়।[২০০] অন্যদিকে ব্রাহ্মগণ বিধবাবিবাহের

১৯৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম', **নব্যভারত**, ভাদ্র ১২৯১ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৪), পৃ. ২২৮-২৯।

১৯৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বিধবাবিবাহ**, পৃ. ২১৫-২২।

১৯৭. 'হিন্দু বিধবা', **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই-অগস্ট ১৮৭০), পৃ. ১০৩।

১৯৮. শিবনাথ শাস্ত্র, 'শাস্ত্রী, দেশাচার ও ধর্ম', **নব্যভারত**, ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ২২৮-২৯।

১৯৯. P. Sinha, **Nineteenth Century Bengal: Aspects of Social History** (Calcutta, 1965), pp. 136-39.

২০০. ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত এ রকমের বিবাহ সংখ্যা কমপক্ষে ১৫। দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ঘ।

পোষকতা করায় ঐতিহ্যবাদী হিন্দু সমাজের মনোভাব বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আরো প্রতিকূল হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মদের বিচ্ছিন্নতাবাদ বিধবাবিবাহকেও মূল সমাজের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

দেশাচারকে জয় করার আর একটি পথ ছিলো,—শিক্ষা তথা নতুন মূল্যবোধের বিকাশ। কিন্তু শিক্ষা তখন পর্যন্ত সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। বিশেষত শিক্ষার সঙ্গে মহিলাদের যোগাযোগ তখনো প্রায় হয়নি বললেই চলে। মেয়েদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কর্ম করার কিংবা চিন্তা করার অধিকার ছিলো আরো সংকীর্ণ। যে বিধবাদের বিবাহের প্রশ্নে সমাজে এতো বড়ো ঢেউ ওঠে, তাঁদের মধ্যেও এ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব দারুণ প্রকটভাবে লক্ষণীয়। আগেই দেখেছি, বিধবাবিবাহ আইন গৃহীত হওয়ার কালে বিধবারা তাঁদের বিয়ের বিষয়ে সামান্যই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সচেতনতা সামান্য বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু ততোদিনে পুরুষ সমাজের মনোভাব আবার রীতিমতো প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এ জন্যেই বিধবাদের কোনো প্রভাব এ আন্দোলনের তেমন কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি।

বিধবাবিবাহ আইন ঘোষিত হওয়ার দশ বছর পরে মোজাফফরপুরের সারদা দেবী স্পষ্টভাবে বলেন,

> যখন পুরুষেরা এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের পাপগ্রস্ত হইতে হয় না, তখন পতিহীনা অবলা কামিনীরা পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহারা তাহাতে কেন দূষিত হয়েন? অতএব বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার নিবারণ করা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কখনই হইতে পারে না।[২০১]

কিন্তু এ কণ্ঠস্বর সে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে। তবে ধীরে ধীরে একটি সচেতনতার উন্মেষ যে ঘটেছিলো মেয়েদের

১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে মোট ৩৬টি বিধবার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।—**Report on the Administration of Bengal 1882-1883** (Calcutta, 1883), p. 497.

১৮৮৩ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে পূর্বোক্ত আইনানুসারে আরো ৩৬টি বিধবার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।—**Report on the Administration of Bengal 1892-93** (Calcutta, 1893), p. 582.

২০১. শ্রীমতী---,'বঙ্গদেশের লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে,' বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৪০২।

মধ্যে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত ও জনপ্রিয় না হওয়ায় আরো দশ বছরের মধ্যে এক বিধবা রমণী বঙ্গদেশের সমকালীন তাবৎ বুদ্ধিজীবী নেতাকে দায়ী এবং হিন্দুজাতি ও দেশাচারের নিন্দা করেন। ব্রজবালা দেবী তাঁর 'আমি কি উন্মাদিনী' কবিতায় বলেন,

বলিব সঘনে নাচিয়া নাচিয়া/"ওরে দেশাচার যা তুই পুড়িয়া,"...
"ওই যে কাতরা মলিন-বয়ান/কাঁদিছে বিধবা দেখ না হায়।"---
"তেজস্বী পুরুষ নাহি কি ধরায়/তাই বুঝি ওরা এসব সয়।"
"ওরে হিন্দুজাতি পশুর অধম!/এই কি তোদের ধরম করম,
নাহি কিরে জ্ঞান একটু সরম,/কিসে যবনকে কসাই বল?
বল না বঙ্কিম, হে বিদ্যাসাগর,/বল না অক্ষয়—গুণেরি আকর,
বল না কেশব—দয়াল-অন্তর,/বল না ভূদেব—ওজোবুদ্ধিধর,
বল না রাজেন্দ্র—বাঙালী-গৌরব,/বল না প্রসন্ন—প্রসন্ন-বদন,
বল না গোস্বামী---সাহিত্য-প্রসূন,/দগ্ধ কি না বঙ্গবিধবাদল?" ---[২০২]

ব্রজবালা দেবীর এ কবিতার প্রতিবাদ পরের মাসের বঙ্গমহিলা পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিলো,[২০৩] এবং সেটা আদৌ অসাধারণ নয়। কিন্তু ব্রজবালা দেবী একটি সনাতন সমাজে চিরকালের বিশ্বাস ও মনোভাবের বিরোধী কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন, এটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ এবং সমাজমানসের আংশিক পরিবর্তন সমসাময়িক নারীদের উপর সীমিত মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সে কারণে, অবলা ও অসহায় নারী সমাজ পুরুষ সমাজের কাছে নিজেদের অধিকারকে বড়ো করে তুলে ধরতে সমর্থ হয়নি।

২০২. ব্রজবালা দেবী, 'আমি কি উন্মাদিনী' (কবিতা), **বঙ্গমহিলা**, কার্তিক ১২৮৩, পৃ. ১৬৬-৬৭।

২০৩. কামনা দেবী, 'আমি তো বিধবা' (কবিতা), **বঙ্গমহিলা**, অগ্রহায়ণ ১২৮৩, পৃ. ১৮৬-৮৯।

এ কবিতায় বিধবাদের সতীত্বের প্রশংসা করে বলা হয়, তাঁরাই ভারতের গৌরব। বিধবা-বিবাহকে কামনা দেবী 'গণিকার বিলাস' বলে অভিহিত করেন। ব্রজবালা দেবীর প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন,

বল না ঈশ্বর দয়ার সাগর/তুমিই কেশব গুণেরি আকর,/কে সবে বল না হেন কুলাচার?/ বিধবাবিবাহ কর না প্রচার,/তুমিই ভূদেব ভারতের দেব,/অজ্ঞান বালায় করো গো ক্ষমা।'—পৃ. ১৮৯।

শ্রীমতী কুসুমকামিনীও একটি কবিতায় ব্রজবালা দেবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন।—'কে লিখিল (কবিতা)', **বঙ্গমহিলা**, মাঘ ১২৮৩, পৃ. ২৩৫-৩৮।

আসলে সে সমাজে বিধবার প্রভাব কার্যত ছিলো না বললেই চলে। তা ছাড়া নিজেদের মনোভাবও তাঁরা অপ্রকাশিত রাখতেন[১০৪] এবং পুনর্বিবাহের ইচ্ছে থাকলেও তাকে বাস্তবায়িত করার শক্তি তাঁদের ছিলো না। এঁদের বিয়ে দেওয়ার তাগিদ এ জন্যেই পুরুষ সমাজ প্রায় মোটেই অনুভব করেনি। সর্বোপরি, যে সমাজে কেবল মেয়েদেরই নয়, পুরুষদেরও বিয়ে হতো নিতান্ত বাল্যকালে এবং ষোলোআনা অভিভাবকের ইচ্ছেয়, এবং যেখানে বিয়ের জন্যে বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের প্রতিবেশীদের একমত হতো হতো—সেখানে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নতুন মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ নব্য সমাজ বিশেষত যুবক ব্রাহ্মগণ, বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ এঁদের মধ্যে কেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো না, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এবং এ কথাও বলা যায়, নব্য সমাজ মৌখিক সমর্থনের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে বিধবাদের বিবাহ করলে নিশ্চয় বিধবাবিবাহের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তাঁদের সমর্থন কেবল মৌখিক কেন?

উত্তরে বলতে হয়, গত শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের পরিবারগুলি ছিলো একান্তভাবে একান্নবর্তী। পুরুষের যখন বিয়ে হতো তখনো তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে নির্ভরশীল থাকতেন পরিবারের উপরে। সুতরাং পরিবারের মতের বিরুদ্ধে সাধারণ যুবকদের পক্ষে বিধবাকে বিবাহ করা সম্ভব ছিলো না। করলে পূর্বোক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির মতোই পরিবারের দ্বারা পরিত্যক্ত হতেন। বিপিনচন্দ্র পাল বিধবাবিবাহ করেছিলেন, কারণ তাঁর কোনো পারিবারিক পেছুটান ছিলো না। তাঁর মা মারা যাওয়ার পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁর পিতা তাঁকে কার্যত ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।[১০৫] আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়েই তিনি বিধবাবিবাহ করতে পেরেছিলেন।

বিধবাদের পক্ষে এই অর্থনৈতিক অধীনতা ও পারিবারিক শাসন ছিলো আরো কঠোর। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও বিধবারা এবং সমর্থন থাকলেও নব্যশিক্ষিত

১০৪. 'হিন্দু বিধবা', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭৭, পৃ. ১০৪।

আসল মনোভাব অব্যক্ত রাখার কারণ বিশ্লেষণ করে এ প্রবন্ধে বলা হয়: ১. বিধবাগণ বিবাহকে মহাপাপ বলে মনে করেন, ২. বিয়ে করতে চাইলে সমাজ নিন্দা করে, ৩. নববৈধব্যে ভাবী কৃচ্ছ্রসাধনা অনুমান করতে পারে না, ৪. বৈধব্যের প্রারম্ভে কিছুকাল আত্মীয়দের কাছ থেকে আদর ও সান্ত্বনা লাভ, ৫. আশা করা বৃথা জেনে নৈরাশ্যপোষণ, ৬. অন্য বিধবাদের দৃষ্টান্তে ধৈর্য অবলম্বন।

১০৫. B. C. Pal **Memories of My Life and Times, I, 324-31.**

যুবকগণ—কেউই বিধবাবিবাহ প্রচলনে বাস্তব সহায়তা করতে পারেননি।

তবে সমাজের একাংশ বিধবাদের বিশেষ দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলো বলেই ১৮৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এতো বড়ো একটা আন্দোলন সমগ্র দেশকে দীর্ঘদিন উত্তেজিত করেছিলো। সেইসঙ্গে মোজাফফরপুরের সারদা দেবী কিংবা ব্রজবালা দেবীর মতো স্বল্পসংখ্যক বিদুষী মহিলার মনেও নতুন এক সচেতনতার উদ্রেক হচ্ছিলো। এই সচেতনতা সমাজের মনোভাবে কোনোই পরিবর্তন আনেনি—এ কথা সম্ভবত বলা যায় না। হয়তো এই সচেতনতার মুখেই বিবাহ না দিক, সমাজ অন্তত বিধবাদের দুর্গতি এবং দুর্দশার প্রতি আগের তুলনায় বেশি সজাগ ও সতর্ক হয়েছিলো। অনেকেই অনুভব করেছিলেন, বিধবাদের বিয়ে দিতে না পারলেও, তাঁদের দুঃখ মোচন করা অবশ্যকর্তব্য। সুদূর য়োরোপ থেকে Max Muller এ জন্যেই ভারতবাসীদের বিভিন্ন স্থানে বিধবাশ্রম স্থাপন করে তাঁদের দুঃখ লাঘব করার উপদেশ দান করেন।[২০৬] পণ্ডিতা রমাবাই বিধবাশ্রম স্থাপনের জন্যে আমেরিকাসহ বিভিন্ন স্থানে চাঁদা সংগ্রহ করেন।[২০৭] শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বরাহনগরে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করেন।[২০৮] আগেই দেখেছি, তিনি ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে তাঁর এক সম্পর্কীয়া বিধবা ভাগ্নীর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে দিয়েও এই ভাগ্নীর দুঃখ মোচন করতে পারেননি।[২০৯] এ জন্যেই তিনি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিধবাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে এই বিধবাশ্রম স্থাপন করেন।

বিধবাশ্রম স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তিত মনোভাবই প্রকাশ পায়। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিবাহ নয়,—বিধবার দুঃখ মোচন—বিশেষত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের মাধ্যমে—সমাজকর্মীদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য একথাও স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, রাজবল্লভ, রামমোহন রায় অথবা বিদ্যাসাগরও বিধবাদের যৌনক্ষুধার কথা চিন্তা করেই তাঁদের বিবাহ দিতে

২০৬. **বামাপ,** আশ্বিন ১২৯৪, পৃ. ২৬১।

২০৭. ঐ, মাঘ ১২৯৪, পৃ. ৩১৮।

২০৮. 'মহিলাশ্রম', **বামাপ,** চৈত্র ১২৯৪, (মার্চ-এপ্রিল ১৮৮৮), পৃ. ৩৭১-৭৪।

২০৯. পূর্বে, পৃ.

এই আশ্রমে যাঁরা আসতেন, ধরে নেওয়া হতো তাঁরা বিয়ে করবেন না। এখানে বিধবাদের শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায়, স্বাবলম্বন লাভ করে এই বিধবাদের কমপক্ষে ৩৫ জন পুনরায় বিবাহ করেন। তবে এ বিবাহ হতো অনেকটা বাই-প্রোডাক্টের মতো। See L. S. S. O Mally, **Modern India and the West** (Reprint; London, 1968), P. 466.

চাননি। বরং বিবাহকে তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন বিধবাদের মুক্তির পথ বলে। কিন্তু ১৮৭০-এর দশক থেকেই বিবাহকে আর মুক্তির পথ বলে গণ্য করা হয়নি অথবা সমাজকর্মীগণ বুঝে নিয়েছিলেন যে, সুকঠোর দেশাচারের মুখে বিধবাদের বিবাহ দেওয়া প্রায় অসম্ভব, সুতরাং মুক্তির অন্য পথ সন্ধান করা আবশ্যক। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমাজকর্মী মনে করেছিলেন, যথার্থ মুক্তি আসতে পারে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের পথে। এবং তিনি শিক্ষকতাকেই বিধবাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ ও সম্মানজনক কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন। অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের কথা আদৌ চিন্তা করেননি। শিক্ষকতাও তাঁর বিবেচনায় বিধবাদের পক্ষে অনুপযোগী। কেবল বিধবা কেন, তাঁর মনে হয়েছে, সম্ভ্রান্ত কোনো মহিলার পক্ষে অন্তঃপুরের বাইরে কোনো কাজ সম্মানজনক বলে বিবেচিত হতে পারে না।[২১০] আসলে বিধবাদের উপযোগী শ্রেষ্ঠতম পথ কোনটি তা সেকালে নির্ধারিত হয়নি এবং বিধবাদের যথার্থ মুক্তিও আসেনি।

তবে বিধবাদের অবস্থার সামান্য মুক্তি হয়তো হয়েছিলো। শতাব্দীর শেষভাগে সামগ্রিকভাবে দেশে বিবাহের বয়স পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছিলো।[২১১] ফলে বালবিধবাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়।[২১২] কুলীনদের বহুবিবাহ আগের চেয়ে কমে যাওয়ায়, কুলীনদের মধ্যে বৈধব্য কিছু কমে যায় এমন অনুমান সঙ্গত। তারচেয়েও বড়ো কথা সংসারে বিধবাদের অস্তিত্ব আগের চেয়ে সম্ভবত অধিক গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা সংসারে তাঁদের যথোপযুক্ত স্থান লাভ করেন- এমনও অনুমান করা যায়।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দে 'বিধবাবিবাহ উচিত কি না'— এ বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বক্তৃতা করতে গিয়ে সংসার ও সমাজে বিধবাদের বিশিষ্ট ভূমিকার আদর্শায়িত একটি চিত্র রচনা করে বলেন,

> হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে, নহিলে এতদিনে, আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া যাইত, ঠাকুরঘরে drawing room হইত, তুলসীমঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রাম বিলিয়ার্ড হইত, গৃহে

২১০. সিসিল বীডনকে লেখা বিদ্যাসাগরের ১. ১০. ১৮৬৭ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য, ইন্দ্র মিত্রে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৮৪-৮৪।

২১১. পরে, পৃ.

২১২. ১০ থেকে ১৫ বছর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ঐ বয়সের মেয়েদের মধ্যে ১৮৮১ সালে শতকরা ৩.৪, ১৮৯১ সালে ২.৯।—**Report on the Census of India,** Vol. VI, Pt. I, p. 266.

> ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্তে ক্লাবে ডিনার দিতাম। প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, poor fund-এ subscribe করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম... হিন্দুসমাজের সহিত হিন্দু বিধবারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে, দুঃখে শিরায় শিরায় জাড়িত।[২১৩]

সমাজের বিধবার স্থান যে উচ্চে, এর আগে, অন্তত শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত, আমরা দেখিনি। এ থেকে মনে হয়, বিয়ের অধিকার স্বীকৃত না হলেও তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের মানবিক অধিকার সম্ভবত এ সময়ে খানিকটা স্বীকৃত হয়েছিলো। অক্ষয়চন্দ্র বিধবাবিবাহের ঔচিত্য স্বীকার না করায়, **নব্যভারত, সঞ্জীবনী, সোমপ্রকাশ** প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর তীব্র সমালোচনা করা হয়। তা থেকে মনে হয়, বাস্তবে বিবাহ না দিলেও অন্তত তত্ত্বত ও নৈতিকভাবে বিধবাবিবাহের ঔচিত্য তখনো সমাজ স্বীকার করতো। তা ছাড়া এ সব সমালোচনা এবং অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতার মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ আছে--সে বিধবার বর্ধিত মানবাধিকারের স্বীকৃতি। বিধবাবিবাহের আন্দোলনের ফলে অন্তত দৃষ্টি ও মনোভাবের এটুকু পরিবর্তন হয়েছিলো। বিধবাবিবাহের নামে একদিন সমগ্র হিন্দুসমাজের ভিত্তিভূমি যদি নাড়া দিলেও এবং রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে একদিন গুণ্ডা লাগিয়ে মারতে উদ্যত হলেও,[২১৪] শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর যে অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির মূর্তি রচনা করেন আপামর জনসাধারণের মানসলোকে, সে-ও প্রমাণ করে বিধবাদের প্রতি সমাজের সহানুভূতি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

২১৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা', **সাবিত্রী**, (কলিকাতা, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৭৮-৭৯।

২১৪. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৫।

বাংলা নাট্যরচনায় বিধবাবিবাহ-সচেতনতা

সমাজে বিধবাদের স্থান, বৈধব্যের কঠোরতা, বিধবাদের ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা এবং নিহত ও সুপ্ত বাসনাকামনা, বিধবাবিবাহের ঔচিত্য-অনৌচিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সমকালীন বাংলা নাট্যরচনায় চমৎকারভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের তেমন বিকাশ হয়নি, কবিতায়-ও এ প্রসঙ্গ স্ফূর্তি লাভ করেনি, কিন্তু নাটক প্রহসনে বিধবাবিবাহ খুব গুরুত্ব লাভ করেছে। কেবলমাত্র বিধবাবিবাহবিষয়ক যে নাটক-প্রহসনগুলি রচিত হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও সমসাময়িক অনেকগুলি সামাজিক নাট্যরচনায় বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি বারংবার উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, এ বিষয়টি সেই সমাজ ও সময়কে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো।

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, ১৮৫৪ সাল নাগাদ বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত সচেতনতা সমাজের একটি অংশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই বছরই প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক **কুলীনকুলসর্বস্ব** প্রকাশিত হয়।[১] এই নাটকের মূল লক্ষ্য ছিলো কৌলীন্য ও বহুবিবাহ রীতির সমালোচনা করা। নাটকের নামকরণেও সে লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার কৌলীন্য ও বহু-বিবাহকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে--সে সময় কার একটি বড়ো সামাজিক প্রশ্ন--- বিধবাবিবাহের কথা বিস্মৃত হতে পারেননি। এ জন্যেই এ নাটকে প্রাসঙ্গিকভাবে বিধবাবিবাহের কথা আলোচিত হয়েছে। তবে নাট্যকারগণ কেবলমাত্র বিধবা-বিবাহবিষয়ক নাটক লেখার প্রেরণা ও সাহস পান বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পরে। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে আইন ঘোষিত হওয়ার পর পর এ বছরের মধ্যে উমাচরণ

১. রামনারায়ণ তর্করত্ন, **কুলীনকুলসর্বস্ব** (তৃতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৯১৭, ১৮৬০-৬১)।

রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। **কুলীনকুলসর্বস্ব** নাটক প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের প্রেস থেকে। রামনারায়ণ ১৮৬৬ সালে বিধবাবিবাহের সপক্ষে আইন প্রণয়নের জন্যে প্রেরিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দান করেন। ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত বিধবা-বিবাহের প্রতি তাঁর ধারণা যে অপরিবর্তিত ছিলো---ঐ বছর প্রকাশিত **নবনাটক** থেকে তা বোঝা যায়।

চট্টোপাধ্যায়ের **বিধবোদ্বাহ**,[২] **উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ**, **রাধামাধব মিত্রের বিধবামনোরঞ্জন**[৩] এবং অজ্ঞাতনামার **বিধবা বিষম বিপদ**[৪] অন্তত এই চারটি নাটক প্রকাশিত হয়। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, তিনিও প্রথম বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগেই তাঁর নাটকটি রচনা করেন।[৫] বিধবাবিবাহবিষয়ক নাটক রচনার উৎসাহ ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মোটামুটি বজায় থাকে, তারপর ধীরে ধীরে আন্দোলনের মতোই নাটকের ধারাও শুকিয়ে আসে। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ কম-বেশি আলোচিত হয়েছে এমন ২১ খানা নাটকের[৬] প্রকাশের সময় ও সংখ্যাভিত্তিক একটি রেখাচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো। এ থেকেও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জোয়ার-ভাটার একটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

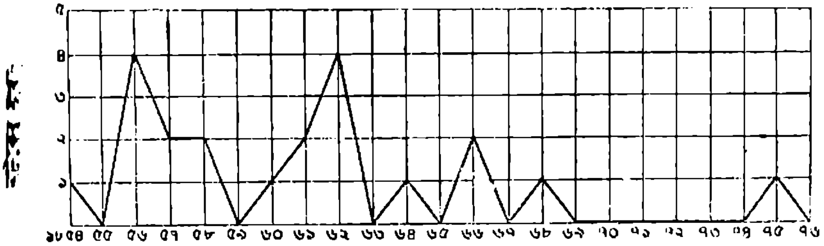

বিধবাবিবাহবিষয়ক নাটকের প্রকাশকাল ও সংখ্যা

একটি সামাজিক প্রশ্নকে ঘিরে বিশেষত এমন একটি বিতর্কিত বিষয়ে এতোগুলি নাটক প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা থেকেই সেই আন্দোলনের প্রবণতা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে এই নাটকগুলি সম্পর্কে পাঠকসমাজের প্রতিক্রিয়া থেকেও আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি খানিকটা নির্দেশ সম্ভব।

২. উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, **বিধবোদ্বাহ নাটক** (কলিকাতা, ১৭৭৮ শকাব্দ, ১৮৫৬)।
এ গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখের **সম্বাদ ভাস্কর** পত্রিকায়।—**সাবাস** ৩, পৃ ৩২৯-৩০।

৩. রাধামাধব মিত্র, **বিধবামনোরঞ্জন নাটক** (কলিকাতা, ৮ পৌষ ১২৬৩, ডিসেম্বর ১৮৫৬)। পরে নাটকটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।
এ নাটকটি ছাড়াও রাধামাধব **কবিতাবলী** (দুই খণ্ড) এবং **বণিতা মরণ খেদের কারণ** নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। রাধামাধব ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন।

৪. **বিধবা বিষম বিপদ** (কলিকাতা, ১৮৫৬, ২০ অগস্ট)। এই নাটকের প্রকাশের সংবাদ প্রকাশিত হয় **সম্বাদ ভাস্করের** পাতায়।—১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, **সাবাস** ৩, পৃ. ৩৩০।

৫. যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক** (কলিকাতা, ১৮৫৭), বিজ্ঞাপন।

৬. এই নাটক-প্রহসনগুলি হলো :

উমেশচন্দ্র মিত্রের[৭] **বিধবাবিবাহ নাটক** প্রথমবার প্রকাশিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২৫ ভাদ্র তারিখে লেখা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকার বলেন,

> বিধবাবিবাহ নাটক যখন প্রথম প্রকাশ হয় তখন আমার এমত প্রত্যাশা ছিলো না যে উহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইবেক কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইবা মাত্রেই সকলে এমত যত্নপূর্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন যে অতি শীঘ্রই পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইল। বিধবাবিবাহের কর্তব্যাকর্তব্যতা যত প্রমাণ হউক বা না হউক সকলে যে এই পুস্তক যত্নপূর্বক পাঠ করিয়াছেন ইহাতেই আমাকে সাধারণ সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবেক।[৮]

রামনারায়ণ তর্করত্নের **কুলীনকুলসর্বস্ব** এবং **নবনাটক**, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের **বিধবোদ্বাহ নাটক**; উমেশচন্দ্র মিত্রের **বিধবাবিবাহ নাটক**; রাধামাধব মিত্রের **বিধবামনোরঞ্জন নাটক**; **বিধবা বিষম বিপদ**; যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**; বিহারীলাল নন্দীর **বিধবা পরিণয়োৎসব**; তারকচন্দ্র চূড়ামণির **সপত্নী নাটক**; **বিধবা সুখের দশা**, শিমুয়েল পিরবক্সের **বিধবাবিরহ নাটক**; হরিশচন্দ্র মিত্রের **শুভস্য শীঘ্রং** এবং **ম্যাও ধরবে কে**; গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **পুনর্বিবাহ নাটক**; অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ**, গোবিন্দ চক্রবর্তীর **অশুভস্য কাল হরণং**, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় **দমভঞ্জন নাটক**, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের **বিধবাবিলাস**; দীনবন্ধু মিত্রের **বিয়ে পাগলা বুড়ো**; বিপিনমোহন সেনগুপ্তের **হিন্দু মহিলা নাটক**; এবং বিরাজমোহন চৌধুরীর **বঙ্গবিধবা**।

এ নাটকগুলির মধ্যে কেবল **অশুভস্য কাল হরণং** বিধবাবিবাহবিরোধী। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের **বিধবার দাঁতে মিশি** (কলিকাতা, ১৮৭৪) এবং বিহারীলাল মিত্রের **বিধবা-বঙ্গবালা** (কলিকাতা, ১৮৭৫) নাটকদ্বয়ের সঙ্গে 'বিধবা' কথার যোগ থাকলেও বিধবাবিবাহ সমস্যার কোনো যোগ নেই।

৭. উমেশচন্দ্র মিত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে তিনি ব্রাহ্মদের তৎকালীন সংস্কার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

৮. উমেশচন্দ্র মিত্র, **বিধবাবিবাহ নাটক**, বিজ্ঞাপন, পৃ. ৩/.।

বিদ্যাসাগরও **বিধবাবিবাহ** পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অনুরূপ উক্তি করেছেন। উমেশচন্দ্রের ভূমিকার ভাষা যথেষ্ট বিদ্যাসাগরীয় বলে মনে হয়। অসম্ভব নয় যে, এ নাটক রচনায় পেছনে বিদ্যাসাগরের হাত ছিলো। পরবর্তীকালে উমেশচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত **সীতার বনবাস** অবলম্বনে একটি নাটক রচনা করেছিলেন এবং নাটকটি বিদ্যাসাগরকেই উৎসর্গ করেছিলেন; এ থেকেও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়।

এই সংস্করণে উমেশচন্দ্র শেষ দৃশ্যের বেশ খানিকটা বর্জন করেন। ফলে নাটকীয়তা বৃদ্ধি পায়।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে এ নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯] চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে। যেকালে শিক্ষার বিকাশ সামান্যই ঘটেছিলো, সেইকালে একটি নাটকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাকে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হয় এবং বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পাঠকসমাজের সচেতনতাও এ থেকে প্রমাণিত হয়।

অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির **বিধবা সুখের দশা**[১০] নামক একটি অতি ক্ষুদ্র নাট্য রচনা প্রকাশিত হয় সংবৎ ১৯১৪ সালে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ করে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে কোনো এক সময়ে। এই নাট্যরচনা নাটক হিসেবে অতি দুর্বল। এতে অঙ্ক বা দৃশ্যের কোনো উল্লেখ নেই, প্লট বা চরিত্রও একেবারে বৈশিষ্ট্যবর্জিত। চারটি বিধবাকন্যার সংলাপ পিতা তার শ্বশুর কাছে সাজিয়ে প্রকাশ করছে—নাটকের প্রথমাংশে আমরা চরিত্রগুলিকে এরূপ পরোক্ষে দেখতে পাই। পরে অবশ্য চরিত্র এবং প্লট ব্যয়বীয়তা ত্যাগ করে কিছুটা শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। তবু এ নাটকটি আদৌ পুনর্মুদ্রিত হওয়ার কথা নয়। তথাপি দেখতে পাই ১৮৭৪ শকাব্দে (১৮৬২-৬৩ খৃস্টাব্দে) এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ কী?

বিধবাবিবাহবিষয়ক অন্যান্য নাটকের সঙ্গে বর্তমান রচনাটির পার্থক্য এই যে, এতে চারটি বিধবাকন্যার বিবাহ ও সন্তান হওয়ার কথা আছে।[১১] কাহিনীর এই মিলনান্তক পরিণতিই হয়তো বর্তমান নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ। এ অনুমান যথার্থ হলে বলতে হবে সমকালীন পাঠকদের অনেকেই বিধবাবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কারণ যা-ই হোক না কেন, এ রকমের অকিঞ্চিৎকর নাটকের তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশের ঘটনা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

রাধামাধব মিত্রের **বিধবামনোরঞ্জন নাটকে**রও একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত

৯. এই সংস্করণে উমেশচন্দ্র ভাষার খানিকটা পরিমার্জন করেন। আগের সংস্করণ পর্যন্ত ভদ্রলোকগণের ভাষায় ক্রিয়াপদে 'করিতেছেন' 'বলিতেছেন' ইত্যাদি রূপ বজায় ছিলো। কিন্তু এ সংস্করণে তার পরিবর্তে 'বলতেছেন' 'করতেছেন' প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

১০. **বিধবা সুখের দশা** (তৃতীয় মুদ্রণ; মিরজাপুর, কলিকাতা, ১৮৭৪ শকাব্দ, ১৮৬২-৬৩)। প্রথম সংস্করণ বৃটিশ মুজিয়ম লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। কিন্তু Catalogue-এ এর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে—'A tale'. এ জন্যেই এ নাটিকাটি সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

১১. **চপলাচিত্তচাপল্যের** পরিণতিও মিলনান্তক। এ প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্য আমরা পরেই লক্ষ্য করবো। তিনি এ নাটকটিকে বিদ্রূপ করলেও ১৮৫৩-এর দশকেই আরো একাধিক নাট্যকার মিলনান্তক পরিণতি নির্দেশ করেছেন।

হয়। এ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। অথচ এ নাটকের কাহিনী অতি তুচ্ছ। চরিত্রও অস্পষ্ট। কেবল এর পরিণতিই মনোরঞ্জক। হয়তো এই পরিণতিই এ নাটকের একাধিক সংস্করণের কারণ।

বিধবাবিবাহসম্পর্কিত নাটকের অভিনয় প্রয়াসও আন্দোলনের প্রতি সমাজের একাংশের সমর্থন প্রমাণ করে।[১২] বিনিময়ে এ সমস্ত নাটকের প্রচার ও নাট্যাভিনয়ের প্রয়াস বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রভাবিত এবং প্রসারিত করেছিলো—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

প্রকৃত পক্ষে বিধবাবিবাহসম্পর্কিত সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বাইরের দিকের স্বাক্ষর মেলে পণ্ডিতগণের শাস্ত্রবিচারে, পত্রপত্রিকা ও লেখকদের মানবিক আবেদনে, আইন প্রণয়ন এবং বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগে। অন্যদিকে, এ আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাবের পরিচয় মেলে আলোচ্য নাটকগুলিতে। পণ্ডিত, লেখক ও সাংবাদিকগণ বিধবাদের দুর্দশা, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনা, এমন কি ভ্রূণহত্যা এবং আত্মহত্যার যে বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দিতে পারেননি, নাট্যকারগণ তাকেই কেবল বিস্তারিতভাবে নয়, বিচিত্র, বর্ণাঢ্য এবং অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ করেন। কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে নাট্যকারগণ আসলে সে সময়ের সমাজমানসটিকেই তুলে ধরেছেন।

বিধবাবিবাহ কেন প্রচলিত হওয়া উচিত এর কারণ নির্দেশ করে সমাজসংস্কারকগণ বার বার বৈধব্যের যন্ত্রণা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিধবাদের ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। বিধবাবিবাহসম্পর্কিত নাটকগুলির —বিশেষত প্রথম দিকের নাটকগুলির—মূল বক্তব্যও মোটামুটি এই। কেবল এক-একটি স্বতন্ত্র প্লট ও কতগুলি চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে সমস্যাটিকে জীবন্ত করে তুলে ধরা হয়েছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকে আন্দোলনের প্রতি সমাজের অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় ধরনের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। কীর্তিরাম ঘোষ তিনটি বিধবা যুবতীকন্যার পিতা ও একটি বিধবা পুত্রবধূর শ্বশুর। সে নিজে একে-একে ছটি বিয়ে করে এবং বর্তমান স্ত্রী মারা গেলে সম্ভবত পুনরায় বিয়ে করবে।[১৩] কিন্তু বিধবা কন্যাদের বা পুত্রবধূর দুর্গতি সম্পর্কে সে মোটেই সচেতন নয়। সে এবং তার

১২. প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার ছ মাসের মধ্যে সংবাদপত্রে এ রকমের খবর প্রকাশিত হয় যে, শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক অভিনীত হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ নাটকটি আর অভিনীত হয়নি। তবে তিন বছরের মধ্যে অভিনীত হয়েছিলো উমেশচন্দ্র মিত্রের **বিধবাবিবাহ নাটক**।

১৩. সুলোচনার উক্তি, **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ৫

না—কেউই বিধবাদের বিয়ে শ্রেয় বলে মনে করে না। বরং মনে করে, ব্যভিচার বিয়ের চেয়ে শ্রেয়তর।[১৪] কিন্তু বিধবারা সুখদুঃখসম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষ,[১৫] সুতরাং তার বালবিধবা কন্যারা এবং পুত্রবধূ বিধবা বিয়ের কথায় ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে।[১৬] সমাজের প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে আর সবাই আত্মসংযম করে; কিন্তু ছোটোমেয়ে সুলোচনা আত্মহারা হয়। পাশের বাড়ির সুদর্শন যুবক মন্মথকে দেখে সে প্রেম নিবেদন করে। পাড়ায় অনুষ্ঠিত একটি বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত এই প্রেমকে আরো এগিয়ে দেয়। নাপিতানী রসবতীর মধ্যস্থতায় সুলোচনা এবং মন্মথের মিলন হয় এবং যথাসময়ে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফলে আত্মহত্যা করে সুলোচনা নিজের পরিবারকে কলঙ্ক থেকে রক্ষা করে, নিজেও মরে গিয়ে জীবন্মৃত অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। এই আত্মহত্যা কীর্তিরামের মতো রক্ষণশীল ব্যক্তির চৈতন্যোদয়ের কারণ হয়।

বিধবাদিগের বিবাহ হইলে তাহারাও এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহাদিগের মাতাপিতা আত্মীয়স্বজনেরও তাহাদিগের জন্য বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না।[১৭]

—কীর্তিরামের এই স্বগতোক্তি আসলে ঘটনাক্রমে কেবল তারই উপলব্ধি নয়, নাট্যকার এই উক্তি দিয়ে সমাজকেই উপদেশ দিয়েছেন।

সুলোচনার মৃত্যুর দৃশ্য দিয়ে উমেশচন্দ্র পাঠক ও দর্শকদের মনে বিধবাদের সম্পর্কে করুণার উদ্রেক করতে চান এবং সম্ভবত সাফল্যের সঙ্গেই তা করতে পেরেছেন। 'হা! যদি আমি পতি আশ্রয় পাইতাম তবে কি আমার অদৃষ্টে এ দুর্দশা ঘটিত? সংসাররূপ বৃক্ষে নব মুকুরিত শাখাস্বরূপ হইতাম, শুষ্ক পল্লবের ন্যায় এতদ্রূপ পতিত হইতাম না, প্রিয়তমা ভার্যার ন্যায় পতিসেবা করিতাম, সন্তানসন্ততি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতাম।'[১৮] সুলোচনার এই উক্তি প্রায় বক্তৃতার মতো শোনালেও, নাটকের মূল দৃশ্যে বেশ খাপ খেয়ে যায়। তার এই বিলাপ-পরিতাপ, একাদশীর জন্যে শেষ মুহূর্তে তার হাত থেকে জলপাত্র সরিয়ে নেওয়া, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূ, এমন কি কীর্তিরামের শোক পাঠকদের

১৪. কীর্তিরামের উক্তি, ঐ, পৃ. ৯।

১৫. 'না আমরা মানুষ নই, যেদিন বিধবা হয়েছি সেই দিন মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাট্টে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয়? একেবারে স্পন্দরহিত হয়েছি।'—সুখময়ীর উক্তি। ঐ, পৃ. ৩।

১৬. ঐ, পৃ. ৪-৫।

১৭. ঐ পৃ. ১১৭-১৮।

১৮. ঐ, পৃ. ১২২।

হৃদয়কে স্পর্শ না-করে পারে না। তার পিতাও আর স্বগতোক্তি নয়, প্রকাশ্যে বলে ফেলে,

> এমন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিধবাবিবাহের কর্তব্য প্রমাণ হইল। হা! সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে এ বিপদ কদাচ ঘটিত না, আমি বিধবাবিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমাকে স্ত্রীহত্যা পাতকের অংশী হইতে হইল।[১৯]

—এই উক্তি এবং সুলোচনাকে উদ্দেশ্য করে তার উক্তি—

> তোকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, আমি তোর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। হা! আমি যদি ভ্রমান্ধ না হইয়া তোর বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে তোর এরূপ মৃত্যু কদাচ হইত না। হা! তোর মত কত দুর্ভাগা রমণী এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। হা! স্বামী আশ্রয় পাইলে তোর মত কত অভাগিনী এইরূপে বিপদে পতিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত।[২০]

—উদ্দেশ্যমূলকতো বটেই এবং শুনতেও বক্তৃতার মতো। কিন্তু ঘটনার পরিণতির সঙ্গে এ উক্তিদ্বয় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুলোচনার মর্মান্তিক পরিণতি অঙ্কনে উমেশচন্দ্র যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা বোধ হয় কাঙ্ক্ষিত ফললাভে সমর্থ হয়েছিলো। ১৮৫৩ সালের ২৩ এপ্রিল ও ৭ মে তারিখে কলকাতায় সিঁদুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে কেশবচন্দ্র সেন ও মুরলীধর সেনের অধ্যক্ষতায় এ নাটকের যে অভিনয় হয়,[২১] দর্শকগণ তা দৃষ্টে ব্যথিত ও বিচলিত হন।[২২] পনেরো বছর পরে বিধবাবিবাহের আন্দোলনের স্রোত যখন কার্যত একেবারে অবরুদ্ধ, তখনো এই নাটকের অভিনয় সামাজিকগণের হৃদয়কে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছিলো। এই অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় লেখা হয়, এর অভিনয় দেখে অন্তত একবার বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হতে ইচ্ছে হয়।[২৩]

১৯. ঐ, প. ১২৯।

২০. ঐ, পৃ. ১৩০।

২১. See P.C. Mazoomdar, **The Life and Teachings of Keshub Chunber Sen** (Calcutta, 1887), pp. 114–16, **The Bengal Hurkura**, 27 April 1859, quoted in ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** (চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬১), পৃ. ৪২; **সংবাদ প্রভাকর**, ১৪ মে ১৮৫৯, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৪২-৪৩।

২২. বিদ্যাসাগর অভিনয় দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। ইন্দ্র মিত্র, পৃ. ৪২৫।

২৩. **বঙ্গীয় নাট্যকার ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত, পৃ ১৪৭।

'কামিনীগণের শৈশবাবস্থায়, বিবাহ হওয়ায়, বিদ্যাশিক্ষায় পরাঙ্মুখ হওয়ায়, অন্তঃপুরে যাবজ্জীবন আবদ্ধ থাকায় এবং বিধবা হলে পুনর্বার বিবাহ না হওয়ায় অনেক 'মহানিষ্ট ঘটিয়াছে।' কিন্তু 'পরমেশ্বরের অনুকম্পায় বিদ্যাশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবার এক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রত্যাশা হইয়াছে।'—এই অনুকূল পরিবেশে অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ** নাটক প্রকাশ করেন।[২৪] এই নাটকের প্লট বা চরিত্র সৃষ্টিতে কোন মৌলিকত্ব নেই, কিন্তু এতে উমেশচন্দ্র মিত্রের **বিধবাবিবাহ নাটকের** অভিনয়ের কথা উল্লেখ আছে এবং এ নাটকে উমেশ-চন্দ্রের প্রভাব প্রায় সর্বত্র লক্ষণীয়।—এজন্যেই **বিধবাবিবাহ নাটকের** আলোচনা প্রসঙ্গে **অগত্যাস্বীকার প্রকরণের** আলোচনা সঙ্গত বলে মনে হয়।

নাটকের প্রারম্ভে কৃষ্ণদাসকে ভোররাতে বাইরে থেকে ফিরে আসতে দেখি। তার কথা থেকে জানা যায় যে, সে উমেশচন্দ্র মিত্রের **বিধবাবিবাহ নাটকের** অভিনয় দেখে ফিরেছে। বাড়িতে ঢুকেই সে তার পিতা বৈষ্ণবদাস ও পাশের বাড়ির সম্পর্কীয় পিতৃব্য সাধুচরণের সামনে পড়ে। তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণদাস সংক্ষেপে **বিধবাবিবাহ নাটকের** মূল কাহিনী বিবৃত করে। সে নিজে বিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত।[২৫] কিন্তু তার পিতা বৈষ্ণবচরণ এ নাটকের কথা শুনে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয় এবং এর অভিনয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করাকে নিতান্ত অপচয় বলে গণ্য করে। তার মনে হয়, এ বিষয়টি এতোই গর্হিত যে এর 'আলোচনা করাই ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।'[২৬] সাধুচরণ নাটক হিশেবে বিধবাবিবাহের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করলে, বিরক্ত বৈষ্ণবচরণ বলে 'বার বার এই ঘৃণিত বিষয়ের আলোচনায় কি প্রয়োজন?'[২৭]

বৈষ্ণবচরণের যুবতী বিধবা কন্যা রাসবিহারিণী কলেজের ছাত্র মন্মথকে[২৮] ভালোবাসে। উমেশচন্দ্রের নাটকের মতোই দৈবজ্ঞ এসে রাসবিহারিণীর দুই বিয়ের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে। মন্মথ গত্যন্তর না দেখে খ্রীস্টান হয়ে রাসবিহা-রিণীকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করে এবং সেদিন রাতে উমেশ মিত্রের নায়ক মন্মথের মতোই গোপনে রাসবিহারিণীর গৃহে তার সঙ্গে মিলিত হয়। সেই অবস্থায় তারা উভয়ে কৃষ্ণদাসের হাতে ধরা পড়ে। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণদাসের সঙ্গে

২৪. অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ** (কলিকাতা ১৮৬১)
২৫. ঐ, পৃ. ৫, ৫৭।
২৬. ঐ, পৃ. ৫।
২৭. ঐ, পৃ. ৫-৬।
২৮. **বিধবাবিবাহ নাটকের** নায়কের নামও মন্মথ।

মন্মথের তর্ক শুরু হয় এবং মারামারির উপক্রম হয়। কিন্তু মন্মথ রাসবিহারিণীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত জেনে কৃষ্ণদাস আশ্বস্ত হয়। বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় দেখে সে আগে থেকেই বিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্পর্কে দ্বিধাহীন হয়েছিলো। সুতরাং মন্মথের সঙ্গে রাসবিহারিণীর বিয়ে দেবার জন্যে সে পিতা বৈষ্ণবচরণের কাছে আবেদন করে। বৈষ্ণবচরণ প্রথমে অসম্মত হয়, পরে পুত্রের অনুনয়-বিনয় এবং সংসার ত্যাগ করার হুমকিতে অগত্যা বিয়ে দিতে রাজি হয়।

চপলাচিত্তচাপল্য নাটকের নায়িকা বিধবা তরুণী চপলার পিতা বাসব কীর্তিরাম বা বৈষ্ণবচরণের মতো রক্ষণশীল নয় অথবা কন্যার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। তার অতি আদরের একমাত্র কন্যা চপলা বিধবা হলে সে স্বভাবতই মর্মাহত হয়। আজীবন চপলাকে বৈধব্যব্রত পালন করতে হবে এই দুর্ভাবনায় সে কাতর হয়ে পড়ে। চপলার মা পার্বতী বাসবের চিন্তাকেই যেন ভাষা দিয়ে বলে,

> কদিন এইটা মনে হচেচ যে চপলা একাদশী কর্বে, এক সন্ধ্যা আলোচাল খাবে, আর আমি কেমন কোরে সব খাবো দাবো। বোন চপলা আমার জন্যো অবধি ক্লেশ সইতে পারে না, আর আমিও ওকে কখন কোন রকমে ক্লেশ দিইনি; ও একাদশীর দিন কিছু খাবে না, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে এক বিন্দু জল পাবে না, আমিত মা হয়ে তা দেখবো !!![২৯]

শোক এবং বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনা ছাড়াও, বাসব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে, আত্মীয়স্বজনসহ সংসারের সকলে বিধবাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। এক গোমস্তা মারা গেলে তার বিধবা এসে বাসবের কাছে অভিযোগ করে,

> এমন কিছুই নাই, শুদু বসদবাড়ি, আর একখানি বাগান, তা আমার মাস্তুত দেওররা সে সব দখল করেচে, আমায় বলে যে ওসব তাদের লিখে পড়ে দে, তাদের বাড়িতে গে থাক্তে, তা আমার একটি দু বছরের ছেলে আছে, তা আমি কেমন করে দিই—[৩০]

প্রবঞ্চনার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে বাসব ঘাবড়ে যায়। তদুপরি ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার আর-একটি দৃষ্টান্ত তাকে আরো বিচলিত করে। তারই জমিদারির মধ্যে তিলক বিশ্বাসের একটি বিধবা কন্যা গর্ভপাত করতে গিয়ে বিপদে পড়ে। এরপরে বাসবের দ্বিধা কেটে যায় এবং মেয়ের বিয়ের জন্যে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। অন্যদিকে চপলা একটি শিক্ষিত সুদর্শন যুবককে দেখে

২৯. চপলাচিত্তচাপল্য, পৃ. ১২।
৩০. ঐ, পৃ. ৩০।

চঞ্চল ও মুগ্ধ হয়। কিন্তু বাসব কন্যার প্রণয়ের সংবাদ না জেনেও চপলার সৌভাগ্যক্রমে তারই পছন্দ-করা যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করে। যথা-সময়ে সাড়ম্বরে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। যদুগোপাল বিধবাবিবাহ সমস্যার সমাধান দেখান এরূপ মিলনান্তক পরিণতির মাধ্যমে।[৩১]

শিমুয়েল পিরবকস তাঁর **বিধবাবিরহ** নাটকে সমস্যা ও সমাধানের চিত্রটি অঙ্কন করেন কিঞ্চিৎ ভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে। কিন্তু মূল প্রেরণা তাঁর একই। তাঁর নাটকের নায়িকা মনোমোহিনী বিধবা যুবতী। স্বাভাবিক মানসিক ও দৈহিক ক্ষুধাবশত একদিন সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটি নীচকুলোদ্ভব যুবককে সে ভালোবেসে ফেলে। এক সময়ে সে গর্ভবতী হয় এবং প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। সমস্যার এরূপ সহজ সমাধান দেখিয়ে, মনোমোহিনীর পিতার মাধ্যমে নাট্যকার সমগ্র হিন্দু সমাজকে উপদেশ দিয়েছেন—

> হে দেববংশীয় হিন্দুলোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক এ জন্য তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই যদি এই কুলশীল জাতি মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।[৩২]

অজ্ঞাতনামার **বিধবা বিষম বিপদ** নাটকেও পিরবকসের কৌশল অবলম্বিত হয়েছে।[৩৩] এ নাটকে মুখোপাধ্যায়ের বিধবাকন্যা প্রসন্ন পাড়ার চৌকিদার বকসের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তার পিতা-মাতা একটি স্ত্রীলোকের সহায়তায় তার গর্ভপাত করায়। ঘটনাটি জমাদারের কাছে প্রকাশ পায় এবং পাড়ার পাঁচজনও জানতে পারে। সে জমাদারকে ষাট টাকা ঘুষ দিয়ে খুশি করতে এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঙুলি, ঘোষাল সমাজের

৩১. রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাটকের এই পরিণতি দৃষ্টে সন্তুষ্ট হতে পারেননি; তাই প্রায় ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'এ ব্যাপারে অত্যাশ্চর্যই হইয়াছে, যেহেতু চপলার যে প্রকার চিত্তের চাপল্য জন্মিয়াছিল তাহাতে ঘটনার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে অনিষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা হইয়াছিল।'— 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা,' **বিবিধার্থ সংগ্রহ,** অগ্রহায়ণ ১৭৭৯ শকাব্দ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৭), পৃ. ১৯২।

৩২. শিমুয়েল পিরবক্স, **বিধবাবিরহ নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬০), পৃ. ৬০।
আমি নিজে এ নাটকটি দেখার সুযোগ পাইনি। এ নাটকের বিস্তারিত নোট পেয়েছি প্রফেসর আনিসুজ্জামানের কাছে।

এ নাটক সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'দুটি পুরোনো বাংলা নাটক,' **বাংলা একাডেমী পত্রিকা,** বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬।

৩৩. প্রকাশকালের দিক দিয়ে **বিধবা বিষম বিপদ** পূর্ববর্তী, সুতরাং বলা ভালো পিরবক্স **বিধবা বিষম বিপদের** কৌশল অবলম্বন করেন।

এ সব নেতার কাছে বহু বিনয় প্রকাশ করে মুখোপাধ্যায় পরিত্রাণ পায়। কিন্তু জমাদারের ঘুষ ও হরর পারিশ্রমিক বাবদ সত্তর টাকা এবং একটি ভোজের আয়োজন করতে গিয়ে মুখোপাধ্যায়ের ভদ্রাসনটুকু দলপতির নিকট বন্ধক রাখতে হয়। নাট্যকার দেখিয়েছেন ঘরে যুবতী বিধবা থাকলে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা ঘটতে পারে এমন কি সে গর্ভ যবনের সংশ্রবেও হতে পারে। মুখোপাধ্যায়ের চরম লাঞ্ছনা এবং যবনান্ত হওয়ার মাধ্যমে নাট্যকার বিধবাবিবাহের ঔচিত্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। পরিণতি দৃষ্টে মুখোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রীও উভয়ই স্বীকার করে বিধবার বিবাহ দেওয়া ভালো :

> মুখো : চাড়ুয্যে বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে বল্লে। এ অপেক্ষা সে সৎকর্ম, তার আর সন্দেহ নাই। বামন পণ্ডিত বেটারা যে মরতেছে। বোটারা কি টের পায় না, না আপনাদের ঘরেই দেখতে পায় না, বিধবা কন্যার জন্যে যবনান্ত পর্যন্ত হতে হচ্ছে। এর চেয়ে কি বিয়ে দেওয়া ভাল নয়।[৩৪]

গর্ভপাত করানোর পরে গৃহিণী মন্তব্য করে :

> পোড়ালোকের ভয়ে জাতির ভয়ে কি দুষ্কর্মই না করতে হলো। হায় হায়! শুনেছি শাস্ত্রে বলে বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হতে পারে, পোড়াদেশের লোকে যদি শাস্ত্রের মতে চলে, তা হলে আর এ নিষ্ঠুর কর্ম, এ পাপ কর্ম করতে হয় না। কি করবো, লোক লজ্জায়, জেতের ভয়ে, এমন কর্মও করতে হলো।[৩৫]

বিধবা কন্যা নীচ জাতির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনায় পতিত হতে হয়—এই পরিণতি বিধবা **বিষম বিপদ** এবং **বিধবাবিরহ** উভয় নাটকেই দেখানো হয়েছে। অসম্ভব নয় যে, পিরবকস **বিধবা বিষম বিপদ** নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিধবাদের ব্যভিচার এবং ভ্রূণহত্যা যে সেকালের সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত রীতি ছিলো, আমরা পূর্বেই তা লক্ষ্য করেছি। আলোচ্য নাটকসমূহে এই সমস্যা সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং এ ব্যাপারে সামাজিকগণের মনোভাবও অত্যাশ্চর্য-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। **বিধবাবিবাহ** নাটকে সুলোচনার গর্ভ লক্ষণ আবিষ্কৃত হলে তার পিতামাতা এবং ভ্রাতৃবধূ সকলেই তার ভ্রূণহত্যার জন্যে উদ্যত হয়। এ প্রসঙ্গে কীর্তিরাম ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করে,

৩৪. **বিধবা বিষম বিপদ**, পৃ. ৯।

৩৫. ঐ, পৃ. ১৭।

ভ্রূণহত্যা! যাহা শ্রবণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যাহা যেখানে ঘটে সে স্থান পর্যন্ত পতিত হয়, সে সংসারে ঘটে সে সংসারে ভাবতেই নরকগামী হয়, আমাকে জ্ঞান-কৃত সেই উৎকট পাপের সাহায্য করতে হলো?[৩৬]

ভ্রূণহত্যার অমানবিক নিষ্ঠুরতা নয়, এ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিধানের কথাই কীর্তিরামকে উত্তেজিত করে। এবং পাপ যতোই গুরুতর হোক না কেন কন্যার গর্ভপাত যে করাতেই হবে এ বিষয়ে সে দ্বিধামুক্ত। তাই স্ত্রীকে আদেশ দিয়ে বলে 'এখন তুমি এ কর্মের উপযুক্ত কর্মী অনুসন্ধান কর, বিলম্বের অনেক দোষ।'[৩৭]

বিয়ে পাগলা বুড়োতে রাজীব মুখুজ্জেও মনে করে বিধবারা বরং উপপতি করতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে পারে না।[৩৮]

বিধবা বিষম বিপদ নাটকেও যত দিন গর্ভ হয়নি, মুখোপাধ্যায় এবং গৃহিণী বকসের সঙ্গে মেলামেশায় প্রসন্নকে প্রচ্ছন্নভাবে অনুমোদনই করেছে।[৩৯]

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিধবোদ্বাহ নাটকেও বিধবাদের ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত আছে। এ নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র শিক্ষিত যুবক ধীমানের মতে অল্প বয়সে যারা বিধবা হয় তাদের প্রায় সকলেই অসতী।[৪০] তাদের গ্রামের বিধবাদের ব্যভিচার সম্পর্কে সে যে পরিসংখ্যান দেয় তা কৌতুককর এবং তার উৎস অজ্ঞাত; কিন্তু তার দ্বারা বিধবাদের ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব খানিকটা অনুমান করা যায়। ধীমানের হিশেব অনুসারে তাদের গ্রামের ৬৪ ঘর ভদ্রব্রাহ্মণ পরিবারের মোট ৯৬ জন সধবার মধ্যে মাত্র ৯ জন অসতী। অপর পক্ষে মোট ৮৪ জন বিধবার মধ্যে ২৬ জন অর্থাৎ শতকরা ৩৫ জন অসতী।[৪১]

এই ব্যাপক ব্যভিচারের ফলে প্রায়ই মেছুনীর ডাক পড়ে গর্ভপাত করানোর জন্যে। মেছুনী তার জীবনে মোট কতো গর্ভপাত করেছে—সে প্রশ্নের উত্তরে বলে,

তার বৌঠাউরুন তা কি মোর মনে আছে। আমি যে কত দিচি তার ঠিকেনা

৩৬. **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ১১৭।

৩৭. ঐ, পৃ. ১১৮।

৩৮. দীনবন্ধু মিত্র, **বিয়ে পাগলা বুড়ো**, **The Collected Works of Rai Dinabandhu Mitra Bahadur** (Calcutta, 1877)—গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ২৪৭। অতঃপর এই সংকলনটি **দীনবন্ধু রচনা সংকলন** নামে উল্লিখিত।

৩৯. **বিধবা বিষম বিপদ**, পৃ. ৭-৮ (গৃহিণীর উক্তি), ৮-৯ (মুখোপাধ্যায়ের উক্তি)।

৪০. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৪৩।

৪১. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪।

কেমন করে বলবো, মোর মনে কেবল এই আচে যে মোর যখন কুড়ি বচ্ছর বয়েস তেকোন থেকে একোন নিয়ে ফি মাসে দুটো চাট্টে—

করে 'কেস' তার হাতে এসেছে। নিজের বয়স সম্পর্কে বলেছে, 'বোদ করি চোদ্দ গোণ্ডা বচ্ছর হবে।'[৪২]

বিধবাবিবাহ নাটকের নাপিতানী রসবতী এবং চপলাচিত্তচাপল্য নাটকের মালিনীরও মেছেনীর মতোই জীবিকা নির্বাহের দ্বিতীয় পথ ভদ্রলোকের ঘরের বিধবাদের গর্ভপাত ঘটানো।[৪৩] বিধবার বিয়ে হবে এ সংবাদ তাই মালিনীকে চিন্তিত করে— 'আমি থাকতে যেন না হয় তা হলে আমার লোকসান হবে।' পরে আবার ব্যাখ্যা করে বলেছে,

> ভাই এখন যাহোক অল্প বইসি বিধবা ছুঁড়িগুলোর মন যুগিয়ে চলতে পাল্লে যখন যা ধরি তা তারা দেয় থোয়, আর বেঁধে গেলে কেউ পাঁচ সিকে ছাড়ায় না, তা এমন ত মাসের মধ্যে হচ্ছেই। তা যদি বিধবার বে চলিত হয় তবে লুকিয়ে আর এ কম্ম কর্বে কেন, পেট বাঁধলে ওষুধ খাবেই বা কেন। তা যদ্দিন না হয় আমার পক্ষেই ভাল।[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে বিধবাদের ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা এতো স্বাভাবিক ছিলো যে একে জীবনের অনিবার্য ও সংশোধনাতীত কুরীতি বলেই সমাজ গণ্য করতো। চপলার পিতা বাসব যখন এই ব্যভিচার ও কলঙ্কের সম্ভাবনার কথা বলে আপনার আশঙ্ক প্রকাশ করে সুদেব তখন যে-সান্ত্বনা দেয় তা থেকেও ভ্রূণহত্যার প্রতি সমাজের অনুক্ত অনুমোদন প্রকাশ পায়।—'কেন এমন ত বিধবাদের মাজে মাজে শুনা যায়, সে চিন্তা কোন কাযের নয়, তারত এক সদুপায় আছে…।'[৪৫]

কিন্তু ভ্রূণহত্যার সমাজের অনুমোদন থাকলেও বিধবার গর্ভসঞ্চার সব সময়ে সামাজিক কলঙ্কের সৃষ্টি করতো। তাছাড়া ভ্রূণহত্যা কোনো স্থায়ী কিংবা সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলেও স্বীকৃত হতে পারে না। এজন্যেই নাট্যকারগণ বিধবাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন বিবাহের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় চপলাচিত্তচাপল্য নাটকে, অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অগত্যা-স্বীকার প্রকরণে এবং অজ্ঞাতনামা নাট্যকার বিধবা সুখের দশায় রীতিমতো বিবাহ

৪২. ঐ, পৃ. ১৬৭। মাসে দুটি করে হলে ৮৬৪টি, চারটি করে হলে ১৭২৮।

৪৩. মেছনীর উক্তি : 'ছোটনোকে তো কখনো ওকম্ম করে না, একে দেয়। বৌঠারুণ ; যত কাণ্ড তোমাদের ভদ্দর নোকের ঘরে।' ঐ, পৃ. ১৬৭।

৪৪. চপলাচিত্তচাপল্য, পৃ. ৩৬-৩৭।

৪৫. ঐ, পৃ. ১০।

ঘটিয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছেন। তিনটি নাটকেরই কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এই যে বিবাহের পূর্বে নায়িকারা কেউ অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়নি এবং তাদের অভিবাবকগণই তাদের বিবাহ দিয়েছে।

বিধবামনোরঞ্জন নাটকে রাধামাধব মিত্রও বিবাহ দিয়ে সমস্যার সমাধান করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর নাটকে চারটি বিধবা যুবতী—কুমুদিনী, বিনোদিনী, পদ্মমুখী এবং নবৌ সকলেই যৌবনের জ্বালাকে অসহ্য বোধ করে। বিধবাবিবাহের আইন প্রণীত হয়েছে শোনা অবধি তারা সকলেই বিয়ের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে কুমুদিনীর পিতা ন্যায়রত্ন, বিনোদিনীর ভাই দুঃখহর এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ বিধবাবিবাহের সমর্থক। তারা কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবাবিবাহের সভায় (শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের) যোগ দান করে কুমুদিনী ও বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়ার সংকল্প নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বিপত্নীক দুঃখহর বিধবা ভ্রাতৃবধূ নবৌকে বিয়ে করার কথাও চিন্তা করে। নবৌই এ প্রস্তাব জানায়। কুমুদিনী, বিনোদিনী, নবৌ সকলেই ভাবী বিবাহের আশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।[৪৬] বিধবাবিবাহ নাটকে উমেশচন্দ্র মিত্র সম্ভাব্য অন্য একটি পরিণতি—নায়িকার গর্ভসঞ্চার ও আত্মহত্যা—দেখিয়ে বিধবার বিবাহ না দেওয়ার কুফলের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। শিমুয়েল পিরবকস বিধবাবিবাহ নাটকে অন্যতর আর-একটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তার নায়িকা, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, গর্ভবতী হয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু বেশির ভাগ নাট্যকার সমস্যাটি কেবল তুলে ধরেছেন, কোনো সমাধান স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেননি। উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবোদ্বাহ নাটক, হরিশচন্দ্র মিত্রের ম্যাও ধরবে কে, দীনবন্ধু মিত্রের বিয়ের পাগলা বুড়ো ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

নাটকের পরিণতি অথবা নাট্যকারদের সমর্থন যেমনই হোক, একটা জায়গায় প্রথম দিকের সবগুলি নাটকের মধ্যে মিল দেখতে পাই—সকলেই বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত বলে বক্তব্য পেশ করেছেন। এ সমস্ত নাটকে বৈধব্যের করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক চিত্রও একটি সামান্য লক্ষণ। তবে মজার ব্যাপার এই যে, নায়িকারা কেউ বৈধব্যের নিদারুণ কঠোরতায় বিশীর্ণ এবং পিষ্ট তা মনে হয়

৪৬. নাটকটি রচিত হয় শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে এবং ঐ মাসেই প্রকাশিত হয়। এ নাটকে এমন আশা পোষণ করা হয়েছে যে, একটি বিবাহ যখন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখন সকল বিধবা যুবতীরই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। বিনোদিনীর মা বা চূড়ামণি বিরোধিতা বা নিন্দা করলেও এ নাটকে বিধবাবিবাহ দলের জয়জয়াকার প্রদর্শন করা হয়েছে। আসলে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ যে আশাবাদের জন্ম দিয়েছিলো, বর্তমান নাটকে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করি।

না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেরই কয়েকটি বিধবা পার্শ্বচরিত্রে বৈধব্যের অর্থহীনতা ও কৃচ্ছ্রসাধনা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। এ সকল চিত্র সহৃদয় হৃদয়কে স্বভাবতই ব্যথিত ও অভিভূত করে।

একাদশীর সময়ে বিধবারা নির্জলা উপোস করে থাকে এবং পিতামাতার বুক ফেটে গেলেও তৃষ্ণাকাতর কন্যাকে এমন কি শিশু কন্যাকে এক ফোঁটা পানীয় দিতে পারে না--এ কথা বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে অনেকেই বলেছেন। নাটকে এই চিত্র আরো জীবন্তভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বিধবাবিবাহ নাটকে সুলোচনা বিষ খেয়ে মুমূর্ষু হয়। পিপাসায় সে ছটফট করতে করতে মায়ের কাছে জল খেতে চায়। তার হাতে এনে জলপাত্র দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ ভ্রাতৃবধূ সুখময়ীর মনে পড়ে 'আজ যে একাদশী ওকে কেমন করে জল দেবে। অভাগিনীর ইহকালটা গেছে আবার পরকালটাও যাবে। ওতো মরবেই আর ওকে জল দিলে কি হবে।'[৪৭] এর পরই মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর সুলোচনার হাত থেকে জলপাত্রটি কেড়ে নেওয়া হয়। প্রতিবেদন হিশেবে যেমনই হোক নাটকের দৃশ্যে এ ঘটনাটি যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা দর্শক ও পাঠকের মর্মস্পর্শ না করে পারে না। এই ঘটনা থেকেই একাদশীর উপবাস যে কী কঠোরভাবে পালিত হতো তা বোঝা যায়। সেইসঙ্গে সুখময়ীর উক্তি থেকে একাদশী সম্পর্কে বিধবাদের গভীর বিশ্বাস এবং বিধানের প্রতি তাদের অগাধ ভক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বিয়ে পাগলা বুড়োতে গৌরমণি একাদশীর বর্ণনা দিয়ে বলে,

> একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জলে যায়। পেটের ভিতরে পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। একখান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়। দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই, তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়।[৪৮]

চপলাচিত্তচাপল্য নাটকে বিনোদা বালবিধবার একাদশীর যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে তা-ও কিছু কম সহানুভূতির উদ্রেক করে না।

> আমি যখন ন বছরের তখন পর্যন্ত ত একাদশীতে দীক্ষে, তা বোন প্রথম একাদশীর দিনে, ভুলেই হোক, কি ধর্ম জানেন, জেনেই হোক, মা ভাত খেতে দিচলেন। তা বোন তার পরের দিনে, পাড়ার লোক বাবাকে একঘরে কর্তে চেয়েছিল। তার পরের বার একাদশী এলে কেউত কিছু খেতে দিলে না,

৪৭. **বিধবাবিবাহ নাটক, পৃ. ১২৬।**

৪৮. **বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাসংকলন, পৃ. ২৪৬।**

> একে আষাড়ান্ত বেলা, তাতে ন বছর বয়েস, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো, শেষে বেলান্তে কেমন হয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেম। তখন মা করেন কি গঙ্গাজল মুখে এনে দেন, তবে রক্ষা পাই।[৪৯]

কেবল এ রকমের শারীরিক যন্ত্রণাই নয়, বিধবাদের যে মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হতো, তা-ও তাদের কম ক্লিষ্ট করতো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিধবারা এই নির্যাতনকে বিনা প্রতিবাদে সহিষ্ণু জন্তুর মতো মেনে নিতো। কিন্তু বিধবা-বিবাহের আন্দোলন তাদের মনে এক অভূতপূর্ব সচেতনতা এনে দেয়, সে জন্যেই একদিন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে সমাজকেই যেন প্রশ্ন করে তারা কি মানুষ নয়?[৫০] সত্যিকারভাবে তারা আর পাঁচজন রক্তমাংসের মানুষের মতোই স্পর্শকাতর, দুঃখে বিচলিত এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়।

বিধবোদ্বাহ নাটকের মনোরমা এমনি একটি মানবিক অধিকারসচেতন বিধবা চরিত্র। মনোরমার মা মারা গেলে তার বাবা রাতের বেলায় একদণ্ডও বাড়িতে থাকতো না। পড়শিদের উপদেশে শেষে সে মনোরমাকে পরিবর্ত করে মনো-রমার বয়সী অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে।[৫১] অচিরেই বৃদ্ধ স্বামী মারা যাওয়ায় মনোরমা বিধবা বেশে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। যথাসময়ে মনোরমা প্রস্ফুটিত কুসুমের মতো যুবতী হয়ে ওঠে। সেইকালে যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে তার পিতাকে ঢলাঢলি করতে দেখে মনোমরা যে মন্তব্য করে তা শুনে তাকে মুখরা, এমন কি নির্লজ্জ, মনে হতে পারে; কিন্তু সে মনোভাব যে যুবতী বিধবাদের মধ্যে খুব অসাধারণ ছিলো না, তা বোঝা যায়।

> মনোরমা।...বাবা যে তাঁর এই বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে আমার বইসি মাগ নিয়ে কত নেকরা ভেকরা করেন, আমি কি তা কিছু জানতে পারিনে, না বুঝতে পারিনে। একাদশীর দিন আমি যে পিপাসায় ছটফট করে মরি, তাতে তিনি কি একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, হাঁগা মা তুমি কেমন আছ? সমস্ত রাত্রি শয্যাকণ্টকির ন্যায় এপাশ ওপাশ করে আমি এ ঘরে সারা হই, তিনি সেই সময় ওঘরে ভুড়ুর ভুড়ুর তামাক খান আর মার সঙ্গে সারা রাত্তির কথাবাত্রা কৈতে থাকেন, তা দেখে শুনে কার বল দেখি তপজপে মন যায়?[৫২]

৪৯. **চপলাচিত্তচাপল্য**, পৃ. ২৫।
৫০. **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ৩। সুখময়ীর উক্তি।
৫১. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৫২. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৮৭-৮৮।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এরূপ অবিবেচক পিতা সে সমাজে অল্প ছিলেন না। বিধবা সুখের দশায় সখীও এমন একটি পিতার বর্ণনা দেয়,

> আপনি তো বুড়ো বল্লিই হয় কিন্তু এখনো ঘরকন্নার কর্ম সেরে গায়ের শুতে যেতে একটু দেরি হলেই সে রাগই কত। এদিকে মেয়েগুলোর যে চকের জল রাত্তির দিন পড়চে তা দেখেও দ্যাকেন না।[৫৩]

এ নাটকের মোহিনী এবং রাইকিশোরীও পিতার অবিবেচনায় সমান অসন্তুষ্ট। আর চন্দ্রমণি কেবল অসন্তুষ্ট নয় পিতামাতাকে মুখ ফুটে বিদ্যাসাগরের মতানুসারে বিয়েও দিতে বলেছিলো, কিন্তু বিয়ে না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত নবীন নামক একটি যুবকের সঙ্গে ঢলাচলি আরম্ভ করে।[৫৪]

অভিভাবকের প্রতি বিধবাদের অসন্তোষ আসলে মোটেই অকারণ নয়। একাদশীর উপোস, সারা বছর এক বেলা আলোচাল খেয়ে থাকা, বসন, শয্যা ও দেহের যত্ন প্রত্যেকটি ব্যাপারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হাসিমুখে তাকে মেনে নিতে পারা রীতিমতো অতিমানবিক ব্যাপার। যতোদিন সতীদাহ প্রচলিত ছিলো ততোদিন এই কৃচ্ছ্রসাধনাকে অঙ্গীকার করতে সমর্থ হলেও সতীদাহ নিবারিত হওয়ার পরে নিশ্চয় ধীরে ধীরে এটাই বিধবাদের কাছে দুঃসহ বলে মনে হয়েছে। তা ছাড়া বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাদের সুপ্ত এবং অবদমিত বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, এমন মনে করাও অযৌক্তিক নয়। অন্তত বিধবাবিবাহ আন্দোলন যে মেয়েদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছিলো সমকালীন বহু নাটকেই তার স্বাক্ষর আছে। বিধবাবিবাহ নিয়ে দেশে হৈচৈ হচ্ছে—সুলোচনার মা এর উল্লেখ করায় তার বিধবা মেয়েদের যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

> রেবতী। কি বল্লি মা, রাঁড়ের বে হবে, কবে মা?
> রাইকিশোরী। কি বল্লি ২ মা রাঁড়ের বে, কার আগে হবে মা?
> সুলোচনা। ওমা! ওমা! কার সঙ্গে মা, কোথা থেকে, বাপের বাড়ী থেকে না শ্বশুর বাড়ী থেকে। বাবা কোন দলে মা?
>
> পদ্মাবতী। সেতো আর তোর মত ক্ষেপে উঠেনি, তা সে কোন দলে তুই জিজ্ঞাসা করতেছিস! ভাল মানুষের ঘরে কি কখন বিধবার বে হতে পারে, একথা বলতে লজ্জা করে, এ কি কখন হয়।

৫৩. **বিধবা সুখের দশা**, পৃ. ১৫।
৫৪. ঐ, পৃ. ১৫-১৬

স্থলোচনা। তা হবে কেন, আমরা ক্ষেপেছি বটে, বাবা যেমন পাঁচটার পরে তোকে বে করেছে আবার তুই যদি আজ মরিস তবে কাল অমনি আর একটি হবে। আমাদের বেলাই—

পদ্মাবতী। .... ভাল স্থলোচনা। যদি সত্তি ২ রাঁড়ের বে হয় তুই কি বে করতে পারবি ?

স্থলোচনা। বাবা কি এতে মত করবেন না, তোকে কি বলেছেন ? তার মতই মত।[৫৫]

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবোদ্বাহ নাটকের আগাগোড়াই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ রূপটি ফুটে উঠেছে। এ নাটকের তিনটি বিধবা—মনোরমা, মায়া এবং শ্রীমতী স্পষ্টতই এ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। মনোরমা ও মায়ার সংলাপ এবং শ্রীমতীর পত্রই তাদের সচেতনতার স্বাক্ষর।[৫৬] পুনর্বিবাহ নাটকের বিলাসবতীও এই আন্দোলনের সংবাদে উৎস্থক। 'ও বোন দেখিস, ও কালক্রমে চলে যাবে, তবে কি তা জানিস ও আমাদের অদৃষ্টে আর হলো না।'[৫৭] বিলাসবতীর এ উক্তিতে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তার উৎসাহ, অধৈর্য ও হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিধবা সুখের দশায় কুলীনকন্যা রাজকুমারীর মধ্যেও এই সচেতনা নির্ভুলভাবে লক্ষণীয়। বৈধব্যের সংবাদ শুনে যখন তার অন্য তিন ভগ্নী কাঁদতে আরম্ভ করে, তখন সে বলে 'আমরা ধবা কোনকালে তা আজ বিধবা হয়েচি বলে সার গেঁতে কান্তে বসেচিস না ?' তারপর পাড়ার দুটি বিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহের কথা শুনে বলেই ফেলে,

সত্তি দিদি, শুনে এলুম, চ আমরাও বাবাকে বলে তাই করি। আমি বসে সব কথা শুনে এইচি। তারা বল্যে কি কলিকাতায় না কি কে একজন বিধবার সখা বিদ্যাসাগর আছে তিনি না কি বিধবার বের পাঁজিপুতি করেচেন।[৫৮]

রাজকুমারী এবং তার তিন বিধবা ভগ্নী অবশেষে ঠিক করে ফেলে যে তাদের বাবা রাজি না হলে তারা নিজেরাই তাদের পথ দেখবে।[৫৯]

৫৫. বিধবাবিবাহ নাটক, পৃ. ৪-৫।
৫৬. বিধবোদ্বাহ নাটক, পৃ. ৮৭-৮৮, ১৫৪-৫৫, ২১২।
৫৭. গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্বিবাহ নাটক (কলিকাতা, ১৮৬২), পৃ. ৪২।
৫৮. বিধবা সুখের দশা, পৃ. ৫-৭।
৫৯. ঐ, পৃ. ৮।

আন্দোলনের সংবাদ গৌরমণির মনেরও ভাবান্তর ঘটায়। ভগ্নী রামমণি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে সে বিয়ে করবে কিনা, তখন সে তার যে জবাব দিয়েছে সেটা সকল রক্তমাংসের মানুষেরই কথা।

> আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্ছে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসনভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয় এক বয়সী প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুক-কথা বলতে বলতে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কাঁচ খোকা কোলে করে স্তন পান করাই; আর ছেলের মাতায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পালকিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথায় যাচেচা ?" আর পুত্র বলেন "আমি তোমার দাসী আনতে যাচিচ," কখন ইচ্ছা হয় মায়াময়ী মেয়ের সাধে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে কোমরে আঁচল জড়ায়ে পরমানন্দে পরমান্ন পরিবেশন করি। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসার ধর্ম কত্তে কার না সাধ যায়?[৬০]

গৌরমণির আরো দুটি উক্তি এই সচেতনতার পরিচয় দেয়।

১. আহা! দিদি, মা বাপ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝাতেন, তাহলে এতদিন বিধবা-বিয়ে চলতো।

২. দেখ দিদি এসব (বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যবস্থা) পরমেশ্বর করেননি, মানুষে করেছে, তিনি যদি কত্তেন, তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো।[৬১]

বিধবাদের বিয়ের প্রশ্নে একেবারে মৌল অধিকারের কথা তুলে বিধবোদ্বাহ নাটকের মায়া বলেছে যে, পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ যদি দূষণীয় না হয়, তবে মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহও দূষণীয় হতে পারে না।[৬২]

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার সংবাদ শুনে উচ্ছ্বসিত হওয়ার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই বিধবামনোরঞ্জন নাটকে। কলকাতা থেকে কুমুদিনীর পিতা ন্যায়রত্ন বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রসহ সংবাদ নিয়ে আসে যে প্রথম বিধবাবিবাহ

৬০. **বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাসংকলন,** পৃ. ২৪৫-৪৬।
৬১. ঐ, পৃ. ২৪৫, ২৪৬।
৬২. **বিধবোদ্বাহ নাটক,** পৃ. ১৫৬।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ন্যায়রত্ন এ-ও প্রকাশ্যে বলে যে, সে কুমুদিনীর বিয়ে দেবে। এ কথায় কুমুদিনী স্বাভাবতই দারুণ আনন্দিত হয়। সে ছুটে যায় তার সঙ্গী বিনোদিনীর বাড়ীতে এই আনন্দের সংবাদ পরিবেশন করতে।

কুমুদিনী। ওলো বিনোদিনি! ওগো পদ্মদিদি! বে—(আহ্লাদে আর কিছু বলিতে পারে না)

বিনোদিনী। কি? কি? বল না লো, আবার এক্ষুণি যে ফিরে এলি, তোর মা যে বড় আসতে দিলে।

পদ্মমুখী। কি বলতে এলি বল না।

কুমুদিনী। বে হো…(পুনর্বার অবাক, আর কিছু মুখে এলোনা)

বিনোদিনী। বে হো কি? বল না লো অমন কচ্চিস, কেন? কিসের আহ্লাদটা শুনি না কেন।

কুমুদিনী। বে হোয়ে গেছে বাবা কল্কেতা থেকে…।

পদ্মমুখী। ওলো বিনোদিনি। ওকি বললো? কি সুখের কতা লো।

কুমুদিনী। বে—(ক্ষণকাল পরে) বে হোয়ে গেচে, বাবা কল্কেতা থেকে এসে বল্লে লো, আমি সব শুনে এলেম, আহ্লাদের কথা মুখ থেকে বেরিয়ে ও বেরোয় না লো।

বিনোদিনী। কি বল্লি? কি বল্লি? ভাল করে বল ফিরে বল।[৬৩]

আলোচ্য নাটকসমূহে অবশ্য কেবল বিধবাবিবাহের সপক্ষীয় মনোভাবই কিছু সংবদ্ধ সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি; বিরোধী, কৌতুকজনক এবং ক্ষেত্রে-বিশেষে অদ্ভুত ও বিচিত্র মনোভাবও এসব নাটকের যত্রতত্র আমরা দেখতে পাই।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী, বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত এবং ফলত দেশাচারবিরোধী—এসব যুক্তি সমাজ প্রতিভূরা বারংবার উচ্চারণ করেন। কিন্তু পদ্মাবতী যখন বলে—

বল্লি কি রসবতি (নাসিকায় হস্ত প্রদান করিয়া) ওমা আমি কোথায় যাবো! ওমা আমি কোথায় যাব! অবাক কল্লি মা। বিধবার বের বিধান হয়েছে, বলে কি সত্তি সত্তি বে হলো। প্রসন্ন মা কেমন মেয়ে, কেমন করে বে করবে—কেমন করে সে ভাতারকে নিয়ে ঘরকন্না করবে? প্রসন্নের মাই বা কেমন? এ বের বর কে, তাকে কেমন করে জামাই বলবে? খান কতক বই পড়ে কি এতই বুঝেছে? ওমা, এ কি লজ্জার কথা। এর কত্তে প্রসন্নকে কেন মেচো বাজারে ঘর করে দিলে না, তাও যে ভাল ছিল।.... প্রসন্ন মা সেদিনকার মেয়ে, আমাদের বাড়ীতে খেলতে আসতো, খান দুই চার বই পড়ে সচ্ছন্দে রাঁড় মানুষ বে কত্তে চল্লো। এ বের

৬৩. বিধবামনোরঞ্জন, পৃ. ৩৭-৩৮।

ঘটকালি কোন পোড়ামুখো করেছে, তার কি দড়ি কলসী যোটে নাই—এ বের পুরত কোন হতভাগা তার কি আর যজমান যোটে নাই ?[৬৪]

তখন বোঝা যায়, যুগযুগান্তরের দৃঢ়মূল বিশ্বাস সমাজমানসকে কোন অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলো—যুক্তি দিয়ে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে, মানবিক আবেদন জানিয়ে, আইন প্রণয়ন করে এই বিশ্বাসের দেওয়ালে চির ধরানো সম্ভব নয়। পদ্মাবতীর এই উক্তি অথবা সত্যভামার মন্তব্য 'রাঁড়ের বের ব্যবস্থা বেরয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়।'[৬৫]—থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী পণ্ডিত-গণের বহুতর গ্রন্থ প্রকাশ এবং গোলযোগ সত্ত্বেও বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা অথবা সরকারী আইনের অমোঘতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু চিরকালীন বিশ্বাসের সঙ্গে আইন কি শাস্ত্রীয়তার আপোশ করতে পারছিলো না।

বিধবাবিবাহের বাধা কোথায় এ প্রশ্নের অন্যতম যে উত্তর কীর্তিরাম দিয়েছে, বর্ত-মানকালে তাকে হাস্যকর বলে মনে হলেও সে যুগে এটা বোধ হয় একটা বড়ো বাধাস্বরূপ ছিলো। প্রতিবেশী শ্যামাচরণের কাছে বিধবাবিবাহের অবৈধতা ব্যাখ্যা করে কীর্তিরাম বলে,

আপনি বিবেচনা করুন দেখি, বিধবাবিবাহের ন্যায় লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। কন্যা কিছু বড় হলে তাকে পাত্রস্থকরণকালীন সকলের সম্মুখে আনিতে কত ঘৃণা হয়। বয়স্থা বিধবার কি রূপে বিবাহ দিবে।[৬৬]

বাল্যবিবাহ সেকালে এমন সর্বজন প্রচলিত রীতি ছিলো যে কুলীনকন্যা ব্যতীত তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ের বিয়েও অতীব লজ্জার বিষয় বলে গণ্য হতো। কীর্তিরাম বয়স্থা বিবাহ কন্যাকে সর্বসমক্ষে এনে বিবাহ দেওয়ার চিন্তাতেই তাই সংকুচিত হয়। এই মনোভাব মেয়েদের ভিতরও সমানভাবে বর্তমান ছিলো। যুবতী বিধবা মনোরমার বিয়ে হলে লজ্জার মাথা খেয়ে সে কেমন করে স্বামীর সঙ্গে ঘর করবে—গুপ্তপ্রেমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, ধীরে ধীরে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হবে 'তাতে আবার একটা লজ্জাই বা কি ও ভাবনাই বা কি ?' তারপর গুপ্তপ্রেমাকে একটা পাল্টা প্রশ্ন করে আপন বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেয়,

ভাল তোরে আরো একটা জিজ্ঞাসা করি, পুরুষগুলোর মাগ মলে তারা এক রত্তী ছুঁড়ীগুলো নিয়ে শুতে, ও তাদের সঙ্গে কথাবাত্রা কইতে যদি লজ্জা না হয়, তবে আমাদের সমবইসি ভাতার হলে আবার লজ্জা কেন ?[৬৭]

৬৪. **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ৪৮।
৬৫. ঐ, পৃ. ৫৪।
৬৬. ঐ, পৃ. ৮।
৬৭. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৮৯-৯০।

এর উত্তর গুপ্তপ্রেমা দিতে পারেনি।

তরুণ এবং যুবতী বিবাহ কুলীনদের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে অপ্রচলিত ছিলো বলে, প্রাপ্তবয়স্কা বিধবার বিবাহের সম্ভাবনা সমাজমানসকে চঞ্চল করেছিলো। কীর্তিরামের ঘৃণা এবং গুপ্তপ্রেমার লজ্জাই নয়, সমাজের অন্য একটি মনোভাব স্বুবর্ণের অশ্লীল ইঙ্গিতপর্ণ মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তার মতে, 'এ বিবাহ কার অসাধ। এত সামান্য বিবাহ নয়, চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় নানা ব্যঞ্জন রসসংযুক্ত পক্ব অন্ন।'[৬৮] এ ইঙ্গিত বিনদা এবং মোক্ষদার আলাপেও স্পষ্ট।[৬৯]

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে, মনের মতো নয়—এমন স্বামীদের স্ত্রীরা মেরে ফেলবে; বিধবাবিবাহের বিরোধী দল এ যুক্তি বারংবার উত্থাপন করেছে।[৭০] **বিধবোদ্বাহ** নাটকে যূথিকা এবং মায়ার আলাপ থেকে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।—

যূথিকা। বুঝেচিলো, বুঝেচি। জেন্ত ভাতারটাকে তুই এখন মেরে ফেলে আবার-একটা বিয়ে করবি।

মায়া। সকলে ঐ কথা এখন কচেচ "যে রাঁড়ের বিয়ে চল্লে এই স্ত্রী মেয়ে যাদের ভাতার মনের মত হয়নি, তারা ভাতারকে মেরে ফেলে, বেশ? মনের মত বিয়ে করবে, যে মেরে ফেলতে না পারবে, সে নিদেনে কামনাও করবে।[৭১]

মায়া নিজে অবশ্য এ কথা স্বীকার করে না। তাই সে যুক্তি দিয়ে বলে, পুরুষেরা যদি স্ত্রী মনের মতো না হলে তাকে মেরে না ফেলে, তা হলে স্ত্রীরাই বা স্বামী পছন্দ না হলে তাকে মেরে ফেলবে কেন। যূথিকা উত্তরে যা বলে তা আপাতবিচারে অসঙ্গত নয়। তার মতে, পুরুষেরা এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে বলে, পছন্দ করে না এমন স্ত্রীকে মেরে ফেলে না।[৭২]

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি স্বামীর মনোভাবও উল্লেখযোগ্য। **চপলাচিত্তচাপল্য** নাটকের কামিনী খুব অল্প কথায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তার স্বামীর মনোভাব ফুটিয়ে তোলে,

বোন কথায় কথায় কাল তোমার কথা হোতে বল্লে কি, পোড়া কি এক সাগর, তার জ্বালায় আর মাগনে নিশ্চিন্তি হয়ে শোবার যো নাই। সে বিধবা বের বিধান

৬৮. **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**, পৃ. ৭-৮।

৬৯. ঐ, পৃ. ২৭-২৮।

৭০. দ্রষ্টব্য : অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বিধবাবিবাহ, তত্ত্বপ, চৈত্র ১৭৭৬ (মার্চ-এপ্রিল ১৮৫৫), **সাবাস** ২, পৃ. ১৬০-৬১।

৭১. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ১৫২-৫৪।

৭২. ঐ, পৃ. ১৫৪-৫৫

দিয়েছে। এখন আবার মেয়েগুলোর মন যুগিয়ে চলতে হবে, তা না কল্লে বিষ খাইয়ে, কি আর কোন রকমে মেরে ফেলে, আবার একটা বে কর্বে।[৭৩]

বিধবাবিবাহ সম্পর্কে এমনি অনেক, আজকের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হাস্যকর ও অসঙ্গত মনোভাব আলোচ্য নাটকসমূহের বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে। তবে প্রাচীনদের বিদ্বিষ্ট মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। অনেকেই এ ধরনের বিবাহকে মহাপাপের কাজ এবং এর সমর্থকদের ধর্মনাশী বলে জ্ঞান করতেন। রামমোহন রায় সম্পর্কে পদ্মাবতীর উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—'রামমোহন রায় নাকি বিধবার বে দেবার জন্যে বিলেত গিয়েছিলো, তা ধর্ম আছেন, সে কর্ম না হতে২ তাঁর সেখানেই মৃত্যু হলো, আর তাঁকে ফিরে আসতে হলো না।'[৭৪]

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় এবং তাঁর প্রবল প্রভাবের কালে রচিত এসব নাট্য-রচনাসমূহে তাঁর সম্পর্কেও এ রকমের প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। **বিধবোদ্বাহ নাটকে** রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ তাঁকে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যাদাতা বলে অভিহিত করেছে।[৭৫] গুপ্তপ্রেমা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'ও মিনষে কি ছাইভষ্ম লিখেছে।'[৭৬] কীর্তিরামের মতে বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎ কলি অবতার।[৭৭] কামিনীর স্বামী তাঁকে 'কি এক পোড়া সাগর' বলে আখ্যায়িত করে।[৭৮] রক্ষণশীল গণকঠাকুর বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখমাত্র ক্রোধান্ধ হয়—'ওটার আর নাম করিও না; শুনিলে রাগ জন্মে।' কারণ বিধবাবিবাহের কথা 'বেদে নেই, পুরাণে নেই, কোরাণেও' খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—বিদ্যাসাগর সেই বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।[৭৯]

বিদ্যাসাগর হিন্দুশাস্ত্রের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা হওয়ায় তিনি প্রাচীন সমাজের যথেষ্ট নিন্দা ও বিদ্বেষ অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অনুসারীদের সমাজ সংস্কার

৭৩. **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**, পৃ. ৫০।

৭৪. **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ৪-৫। **বিধবোদ্বাহ নাটকে** বিদ্যাশূন্যও রামমোহনকে দোষারোপ করে। পৃ. ২৪

৭৫. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৩-৫, ৪৭, ১৯৬।

৭৬. ঐ, পৃ. ৭৭। গুপ্তপ্রেমা নিজে ব্যভিচারিণী বিধবা, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তার ঘৃণার অন্ত নেই। তার আর একটি উক্তি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'যত ছোটলোকেরা এমন ধারা নিকেছে, তা নইলে কি ভদ্দোর লোকে এমন ধারা নিকতে পারে।'—পৃ. ৭৫।

৭৭. **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ১০।

৭৮. **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক** পৃ. ৫০।

৭৯. তারকচন্দ্র চূড়ামণি, **সপত্নী নাটক** (কলিকাতা, পৌষ ১২৬৪, ১৮৫৮), পৃ. ৪৫।

প্রয়াসকে রক্ষণশীল সমাজ রীতিমতো নাস্তিকের কর্ম বলে বিবেচনা করতেন। বিধবোদ্বাহ নাটকে সুশীল এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করে, সে যুগের পক্ষে তা অতি স্বাভাবিক। 'এক বিদ্যাসাগর, ও তাঁর পরিষদ কতকগুলি নাস্তিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারাই মত দিয়াছেন, এর আর আশ্চর্য কি ? "শঠেশাঠ্যং সমাচরেৎ।"[৮০] সূর্যকান্ত বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে মনে করে খ্রীস্টানি আচরণ বলে।[৮১]

বিধবা বিষম বিপদ নাটকে দলপতিও মনে করে বিধবাবিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব নিতান্তই খ্রীস্টানি কথা।—

> মেমজা! ও সব খ্রীস্টানিতন্ত্র, ভদ্র সমাজে ওসব কথা বলো না। আমাদিগকে কি এতই বেলীক পেয়েছ, যে সকলে পরামর্শ করে বিধবার বিয়ে দেবো। কি অধর্ম! তুমি লোকটা ছিলে ভাল, আজি কালি কতগুলো গো-খাদক খ্রীস্টানের পরামর্শ শুনতে আরম্ভ করেছ। তুমি অনায়াসেই দশজনের মধ্যে বসে এমন কথাটা বল্লে। বুড়ো হয়ে তোমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে।[৮২]

চপলার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে বিস্মিত তর্কালঙ্কার যে মন্তব্য করে, তা থেকে বোঝা যায়, বিধবাবিবাহকে আদৌ হিন্দু সমাজোচিত কর্ম বলে প্রাচীনগণ মনে করতে পারেননি।

> মজুমদার যথার্থ আমি বড় আশ্চর্য হয়েছি। হঁ্যা বুঝাতেন যে উভয় বৈবাহিকই নাস্তিকপক্ষ, হিঁদুত্ব কিছু মানেন না, তাহলে এ কর্মে তাদের কিছু দোষ দিতেম না। কিন্তু বাসব বাবুও নিতান্ত হিন্দু ধর্মাক্রান্ত, ভূদেবও অতি সুব্রাহ্মণ ..।[৮৩]

কেবল বৃদ্ধরাই নয়, প্রাচীনপন্থী যুবকরাও বিধবাবিবাহকে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে গণ্য করতো, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলভঞ্জন নাটকে[৮৪] তার প্রমাণ আছে। এ নাটকে দেখানো হয়েছে, কেমন করে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়। উত্তরপাড়ার লোকেরা বিধবাবিবাহের সমর্থক এবং তারাই যথার্থ শিক্ষিত ভদ্র এবং পরোপকারী। অপর পক্ষে, দক্ষিণ-পাড়ার নেতৃস্থানীয় যুবকরা নেশাখোর, লম্পট এবং ষড়যন্ত্রকারী। নেশা করার জন্যে তারা অন্ধ ভিখারির কাছ থেকেও পয়সা কেড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই দুর্জন যুবকরা রাখালের মায়ের শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে দলাদলি আরম্ভ করে।

৮০. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ১৯৬।

৮১. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৪৫-৪৭।

৮২. **বিধবা বিষম বিপদ**, পৃ. ৩২।

৮৩. **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**, পৃ. ৫৬-৫৭।

৮৪. হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, **দলভঞ্জন নাটক**, (কলিকাতা, ১ মাঘ ১২৬৮, জানুআরি ১৮৬২)।

রাখাল বিধবাবিবাহের সমর্থক বলে এরা তার জাত মারার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেকেই যোগদান করে এবং এদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। তদুপরি ছোকু মজুমদারের বাড়িতে চুরি করার দায়ে দারোগা এসে এদের গ্রেফতার করে চালান দেয়। তবে বিধবাবিবাহ দলের নেতা উত্তরপাড়ার ভগবান মাস্টারই তাদের ছাড়িয়ে আনে। নাট্যকার দেখিয়েছেন বিধবাবিবাহের সমর্থক-গণ আদর্শ চরিত্রবিশিষ্ট মানুষ আর বিপক্ষ দলের বৃদ্ধ এবং যুবকগণ বহু দোষের আকর—অমানুষ। বলা বাহুল্য, তাঁর সহানুভূতি বিধবাবিবাহের সমর্থকদের প্রতি।

বিধবাবিবাহের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের এ রকমের বিদ্বিষ্ট মনোভাব থাকলেও, নব্যসমাজ এবং বিধবাগণ আবার এ আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন নাটকে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক। কারণ এসব নাটকের রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহ আন্দোলন এবং বিদ্যাসাগরের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং কোনো-না-কোনো চরিত্রের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

বিধবা সুখের দশায় বিধবা কাদম্বিনী পক্ষী-রচিত গান—'বেঁচে থাকুক বিদ্যা-সাগর' ইত্যাদির প্রতিধ্বনি করে।[৮৫] সখী প্রার্থনা জানিয়ে বলে, 'হে পরমেশ্বর! তুমি বিদ্যাসাগরকে যেমন মতি দেচো বাবাকে সেই রকম মতি দ্যাও, আমরা আজন্ম আর যাতনা সইতে পারি না।'[৮৬] সখীর এ উক্তিতে বিদ্যাসাগরের প্রতি আন্তরিক সম্ভ্রম এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে।

বিধবাগণের এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পেছনে, বলা বাহুল্য, দুর্দশা থেকে মুক্তির এক উচ্চাশা তাদের অন্তরের অন্তস্তলে ক্রিয়াশীল ছিলো। এ মনোভাব মোহিনীর কথায় প্রকাশ পায়—

> (কিঞ্চিৎ চুপে চুপে) ওলো সখি। যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন আমাদেরও আজ না হয় কাল হবে। স্পষ্টই বলবো লো। ভয় কি আমরা তো চোর নই।[৮৭]

—এটা অর্ধ-গোপন উচ্চাশারই প্রকাশ। বিধবোদ্বাহ নাটকের মনোরমা, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, একটু বেশি স্পষ্টভাষী। সে কেবল আশাপোষণ করেই ক্ষান্ত নয়। রীতিমতো অধিকারের প্রশ্ন তোলে।

৮৫. বিধবা সুখের দশা, পৃ. ১৮। মোহিনীও বলে, 'বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকুক ভাই'। পৃ. ২০।

৮৬. ঐ, পৃ. ২১।

৮৭. ঐ, পৃ. ২০। মোহিনীর উক্তি।

পাছে তাঁর (বাবার) মুখ হেঁট হয়, এই জন্যেই তো কেবল চুপচাপ করে আছি, তবে যদি বিয়ের পদ্ধতি পড়ে গেল, তখন আর কে আমারে মানা করে রাখে, আমি অমন জ্ঞানের কথা সকলকে কহিতে পারি।[৮৮]

প্রকৃত পক্ষে, মনোরমা এবং মোহিনীর মতো অনেক বিধবাই সেকালে এ আন্দোলনের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন, কেবল রমণীর স্বাভাবিক লজ্জাবশত বিবাহের কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করেননি।[৮৯] বিধবাদের অভিভাবকগণও অনেকেই অংশত লজ্জায়, অংশত সমাজশাসনের ভয়ে বিধবাদের বিয়ে দিতে উদ্যোগী হননি। কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত এমন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উক্তি বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—'এ বিষয় এখন হওয়া বড় শক্ত, পাঁচছটা বিয়ে না হলে কেহ স্পষ্ট স্বীকার করিবে না।'[৯০] ম্যাও ধরবে কে নাটকে শশাঙ্ক একটি সুন্দরী বিদুষী বিধবা যুবতীকে বিয়ে করতে ষোলো আনা রাজি, কিন্তু তার কেবল একটি শর্ত আছে; প্রথমে অন্য কেউ বিধবাবিবাহ করলে তার পরের দিনই সে করবে, কিন্তু নিজে পথপ্রদর্শক হতে পারবে না।[৯১]

এরূপ সমাজমুখিতা এবং সংসাহসের অভাবহেতুই বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়নি, আমরা পূর্বের আলোচনায় তা লক্ষ্য করেছি। বিধবোদ্বাহ নাটকের অশিক্ষিতা বিধবা মায়ার কাছেও এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। —'আমার মনে নাগচে, বিয়ে হবে, তবে দেরিতে হবে, শীগগির ভদ্দোর নোকে লজ্জায় পড়ে দেবে না।'[৯২] মায়ার এ উক্তিতে সেকালের সমাজমানস উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত, কেবল এর মধ্যে যে আশাবাদটুকু আছে সেটাই পরবর্তীকালে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। মায়া যেমন মনে করেছিলো আসলে সাধারণ মানুষ তার চেয়েও সমাজের বেশি মুখাপেক্ষী ছিলো।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, প্রথম দিকে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সমাজকর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিলো তা ক্রমশ হ্রাস পায়। এর ফলে বিধবাদের পক্ষেও হতাশ হওয়া সম্ভব। অন্তত একটি নাটকে এই হতাশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

কমলিনী। ভাবনা কি ভাই কিছুদিন সবুর কর, "সবুরের গাছে মেওয়া ফলে"।
কামিনী। আর মেওয়া ফলে। কথায় বলে "থাক কুকুর তুই আমার আশে"

৮৮. বিধবোদ্বাহ নাটক, পৃ. ৮৮।

৮৯. বিধবোদ্বাহ নাটকে ধনহীন যথার্থই বলেছে, 'শুনিয়াছি অনেকের মত বিলক্ষণ আছে। কেবল লজ্জার খাতিরে প্রকাশ করে না।' পৃ. ১৯১-১৯২।

৯০. ঐ, পৃ. ১৯২।

৯১. ম্যাও ধরবে কে, পৃ. ৩৫-৩৬।

৯২. বিধবোদ্বাহ নাটক, পৃ. ১৬২।

ভাত দেব তোকে পোষ মাসে খাবি তুই গাসে গাসে” আমাদের তাই আর কি।

কম। কতজন বিধবাবিয়ের সাপক্ষে জুটেছে জানত ?

কামি। জানবো না কেন ? ঢাকা প্রকাশকে কদিন ত স্বাক্ষরে ২ ছেয়ে ফেলেচে। দেখ ভাই, কি আশ্চর্য যারা স্বাক্ষর করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁদের ঘরে কত বিধবা অবিরত চোক্ষের জলে ভেসে যাচেছ তবু তাদের বিয়ে দেবার নামটি নাই। তারাই আবার এ সভায় ও সভায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা কর্তব্য বলে গালবাদ্যি—মর কি বলে—বক্তৃতা করে ফেরেন। হায়! ধিক লজ্জাও পায় না।

সরলা। (স্বগত) কামিনী বেশ বলেছে।

কুমুদিনী। অনেকদিন হতে এদেশে বিধবাবিবাহের রীত উঠে গিয়েছে; পুনরায় সেই রীতি প্রচলিত করতে হলে অনেক যত্ন ও সময়ের আবশ্যক করে।

কামিনী। কত সময় চাই ? এক যুগ নাকি ?[৯৩]

বিধবাদের হতাশার কথাই নয়, বস্তুত সামগ্রিকভাবে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ওঠা-পড়া এবং এর প্রতি সমকালীন ভদ্রসমাজের মনোভাব বর্তমান নাট্যরচনা-সমূহে প্রত্যক্ষ করি।

আন্দোলনের প্রথম দিককার নাটকসমূহে (যেমন **বিধবাবিবাহ নাটক, বিধবোদ্বাহ নাটক, চপলাচিত্তচাপল্য নাটক, অগত্যাস্বীকার প্রকরণ, বিধবা সুখের দশা**) এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা যেমন লক্ষযোগ্য, তেমনি লক্ষযোগ্য নাট্যকারদের একটি প্রবণতা। তাঁরা সকলেই বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণে তৎপর। তাঁদের যুক্তি সর্বত্র এক রকমের নয়—কেউ বিধবাদের ব্যভিচার এবং ভ্রূণহত্যাকেই প্রাধান্য দেন, কেউ বিধবাদের দৈহিক ও মানসিক ক্লেশকে গুরুত্ব দান করেন, কেউ-বা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের প্রতিই সমধিক মনোযোগ দান করেন (যেমন **বিধবোদ্বাহ নাটক**), কিন্তু বিধবাবিবাহের শ্রেয়তা প্রমাণই তাঁদের লক্ষ্য ছিলো। সুলোচনার (**বিধবাবিবাহ নাটক**) আত্মহত্যা, চপলার চিত্তচাঞ্চল্য (**চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**), কামিনী (**হিন্দুমহিলা নাটক**) এবং মনোমোহিনীর পলায়ন (**বিধবাবিবাহ নাটক**), মনোরমার স্বেচ্ছাচারের হুমকি (**বিধবোদ্বাহ নাটক**), গুপ্তপ্রেমা, বন্ধুরা প্রমুখের ব্যভিচার (**বিধবোদ্বাহ নাটক**), প্রসন্ন (**বিধবাবিবাহ নাটক**), চপলা (**চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**), রাজকুমারী ও তার তিন বোনের (**বিধবা সুখের দশা**) এবং রাসবিহারিণীর (**অগত্যাস্বীকার প্রকরণ**) বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায় নাট্যকারগণ বেছে নেন— কিন্তু সকলেরই মূল বক্তব্য এক,—বিবাহের মাধ্যমেই বিধবাদের সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৯৩. **ম্যাও ধরবে কে**, পৃ. ৬-৭।

আন্দোলনের ফলে প্রাচীন ও নবীন সমাজের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, প্রথম দিককার নাটকে তারও পরিচয় আছে। কুবিক্রম বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী অথচ তার পুত্র ধীমান এর অত্যুৎসাহী সমর্থক (বিধবোদ্বাহ নাটক)—এরকমের পিতা-পুত্রের তথা দুই প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রায় সব নাটকেই লক্ষণীয়। বিধবাবিবাহ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে সব সময়ে বিতর্ক হতো, তারও প্রমাণ একাধিক নাটকে বর্তমান।[১৪] এমন কি সব বিতর্কের পরে কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটলে বিরোধী পণ্ডিতগণও মৌন থেকে অথবা তর্ক করে হেরে যাওয়ার অভিনয় করে বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থন জানাতেন, তারও নজির আছে।[১৫]

অপর পক্ষে, নব্যসম্প্রদায় কেবল মুখে বা স্বাক্ষর দান করেই বিধবাবিবাহের সমর্থন করতেন—এমন ঘটনার উল্লেখও আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে দেখতে পাই। এই সব যুবক নিজেরাও বিধবা বিয়ে করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সাহস পেতেন না। অথচ মৌখিক সমর্থন দিয়ে সমগ্র সমাজকে আন্দোলিত করতেন। এ জাতীয় নব্য-সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিস্তারিত পরিচয় মেলে বিধবোদ্বাহ নাটক এবং ম্যাও ধরবে কে প্রহসনে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের বাধা সম্পর্কে ম্যাও ধরবে কে প্রহসনে একটি সুন্দর ও বাস্তবোচিত চিত্র আছে। তাতে দেখা যায়, কুমুদিনী নামক একটি সুন্দরী ও বিদুষী বিধবার বিয়ের জন্যে তার ভগ্নীপতি প্রভাত খুব চেষ্টা করে। প্রভাতের এক বন্ধু শশাঙ্ক তাকে বিয়ে করতে রাজিও হয়। কিন্তু অভিভাবক ও আত্মীয়দের বিরোধিতায় সে সঙ্কুচিত হয়। তবে বিয়ে করতে না পারলেও শশাঙ্কের মতো যুবকগণ বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রগতি ও সভ্যতার নিদর্শন বলে গণ্য করতেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[১৬] আবার কেউ কেউ প্রগতিশীল ও সভ্য বলে পরিচয় জাহির করার জন্যেই বিধবাবিবাহকে মৌখিকভাবে সমর্থন করতেন,

১৪. যেমন **বিধবোদ্বাহ নাটক** (পৃ. ৩-১৩, ২৫-৬২, ১৭৮-৭৯, ২১৪-৪৩) এবং **বিধবাবিবাহ নাটক** (পৃ. ৫৭-৬৯)।

বিধবোদ্বাহ নাটককে অংশত একখানি প্রবন্ধ পুস্তকও বলা যায়। এই নাটকে বলতে গেলে কোনো প্লট নেই। একটি গ্রামের পণ্ডিতগণ বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় এবং নব্যশিক্ষিত যুবকগণ একে শাস্ত্রীয় বলে প্রমাণ করার জন্যে সচেষ্ট, সমগ্র নাটকের একটা বড়ো অংশ জুড়ে এই চিত্রটিই প্রকাশিত।

১৫. **চপলাচিত্তচাপল্য নাটক**, পৃ. ৩৮। **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ৫৭-৫৮, ৬০-৬৯।

১৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, **একেই কি বলে সভ্যতা** (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৮৬৩), পৃ. ২৪-২৫। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় নববাবু বক্তৃতায় প্রগতি ও সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ যে কটি বিষয়ের উল্লেখ করে বিধবাদের বিবাহ দেওয়া তাদের অন্যতম।

তারও উদাহরণ আছে।[৯৭] অনেকে কেবল বন্ধুদের অনুরোধেই স্বাক্ষর দান করে বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন, তা-ও জানা যায়।[৯৮]

যুবকদের এই অভিভাবক-নির্ভরতা এবং কারো কারো মুখসর্বস্বতা ও ভণ্ডামির জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই ঝিমিয়ে পড়ে। কবিকঙ্কণ এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছে,

> স্বাক্ষরকারীরা এখন বড় বিচিত্রভাব ধরেছেন। সকলেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা কর্তব্য বলে ফিরছেন, কিন্তু কেউ বিধবাবিবাহ করেছেন না, কেউ বিধবা ভগ্নী কন্যার বিবাহও দিতেছেন না। ইনি বলেন উনি আগে দেউন (উ) নি বলেন তিনি আগে দেউন। এই রকম সকলে সকলের অপেক্ষা করে ঠেলাঠেলি করছেন কেউ আর ম্যাও ধরতে সাহস করিতে পারছেন না।[৯৯]

যে সমাজের বেশির ভাগ লোক অন্ধ, গতানুগতিক এবং নিরাপদ পথে চলতে অভ্যস্ত, সে সমাজে এই ম্যাও ধরার সাহস না হওয়া বিচিত্র নয়, বরং এটাই প্রত্যাশিত।

এই অবস্থায়ই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে এবং ১৮৬০-এর দশকের শেষার্ধে এ আন্দোলন শুকিয়ে যেতে থাকে।[১০০] ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত নাটকেও আন্দোলনের প্রতি শিক্ষিত সমাজের পরিবর্তিত মনোভাব ও সচেতনতা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসনকে কেউ সম্ভবত বিধবাবিবাহবিষয়ক নাট্যরচনা বলে আখ্যায়িত করেন না। কিন্তু বিপত্নীক অতিবৃদ্ধ পিতার পুনর্বিবাহ করার জন্যে পাগলামির যে অতিরঞ্জিত চিত্র এ রচনায় অঙ্কিত তারই উল্টো পিঠে বিধবা যুবতী কন্যার করুণ ছবি অপরিসীম সহমর্মিতার সঙ্গে অঙ্কন করে নাট্যকার কি বিয়ে পাগলা এক বুড়োকে বিদ্রূপ করেছেন না যুবতী সন্তানহীন নিঃসম্বল বিধবার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

আসলে বিধবাবিবাহ সম্পর্কেই যেন চূড়ান্ত রায় দীনবন্ধু এই নাটকে প্রদান করেছেন। গৌরমণি ও রামমণির আলোচনা থেকে আমরা বিধবাদের কঠোর ক্লেশ, তিল তিল করে জীবন উৎসর্গকরণ, সীমাহীন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং নিরঙ্কুশ হতাশার কথা জানতে পারি। কিন্তু তাই বলে দীনবন্ধু বিধবাদের পক্ষে বিয়ে করাটা শ্রেয়তম কর্ম বলে গণ্য করেননি। গৌরমণি বলেছে,

৯৭. যেমন **বিধবোদ্বাহ নাটকের** সুশীল এবং **ম্যাও ধরবে কে**-র রসিক।
৯৮. দ্রষ্টব্য : **বিধবোদ্বাহ নাটক** ও **ম্যাও ধরবে কে**।
৯৯. **ম্যাও ধরবে কে**। পৃ. ৫৬
১০০. পূর্বে, পৃ. ৪৬-৪৮।

দিদি, আমার প্রাণপতি আমাকে অতিশয় ভালবাসতেন, আমিও তার মুখ একদণ্ড না দেখলে বাঁচতেন না, দিদি, বিধবা-বিয়ে চলিত হলেও আমি আর বুঝি বিয়ে কত্তে পারবো না।[১০১]

এর পর রামমণি ও গৌরমণিকে যে দুটি সংলাপ বলতে শুনি তা প্রকৃত পক্ষে ষাট দশকের শেষ দিকে বিধবাবিবাহসম্পর্কিত শিক্ষিতদের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

রাম। অনেক মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে[১০২] না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখেনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?

গৌর।- ছোট মেয়েটাই কি, আর বড় মেয়েটাই কি, বিধবাবিয়েতে দোষ নাই। বিধবা-বিয়ে চলে গেলে কেউ বিয়ে করবে, কেউ করবে না। এখন পুরুষদের মধ্যেও ত অমনি আছে, মাগ মলে কেউ বিয়ে করে কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলে ত এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা-বিয়ে রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সেকালে কত বিধবা-বিয়ে হয়েছে, রামায়ণে শোননি, বালী রাজা মলে তারার বিয়ে হয়েছিল, রাবণের রাণী মন্দোদরী বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল, সব লোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত।[১০৩]

এই সংলাপদ্বয়ে যা লক্ষণীয়, তা হলো দীনবন্ধু বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা, যৌক্তিকতা এবং ঔচিত্যস্বীকার করলেও গৌরমণির বিবাহের জন্যে ওকালতি করেননি। বরং গৌরমণি দীনবন্ধুর শ্রেয়তা বোধের পক্ষ থেকেই যেন বলেছে বিধবাবিবাহ চালু হলেও সে সম্ভবত বিয়ে করতে পারবে না। আসলে বিধবাদের বিবাহ করার অধিকার থাকা উচিত, তারা বিয়ে করুক আর না-ই করুক—ষাট দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই মানসিকতাই সমাজে ধীরে ধীরে প্রবলতা লাভ করে।

বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটক অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থাব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য ১৮৬৬ সালে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের একটি বিজ্ঞাপনের

১০১. বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাসংকলন, পৃ. ২৪৩-২৪৭।

১০২. পুনর্বিবাহ অর্থাৎ বালিকা স্ত্রীর প্রথম ঋতুমতী হওয়ার উৎসব। ঋতুমতী হওয়ার আগে স্বামী মারা গেলে সে কন্যা অক্ষতযোনি বলে বিবেচিত হতো।

১০৩. বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাসংকলন, পৃ. ২৪৭।

জবাবে রচিত হয়।[১০৪] এই নাটকের উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দু মহিলাদের দুর্দশার চিত্র সমাজের চোখের সামনে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা।[১০৫] এবং সত্যি সত্যি কৌলীন্য, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, বাল্যবিবাহ, অসমবয়স্ক বিবাহ, পুনর্বিবাহ উৎসব, স্ত্রীশিক্ষা, মেয়েদের কোন্দল, মেয়েদের পোশাক, মেয়েদের অশ্লীল গ্রন্থাদি পাঠ ইত্যাদি নানা সমস্যাই এই নাটকে প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু বিধবাবিবাহরূপ গুরুতর সমস্যাটি এ নাটকে প্রায় অনুপস্থিত। এ নাটকের এক স্থানে বলা হয়েছে, 'অবস্থানুসারে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত'।[১০৬] অন্যত্র এমনি আর-একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে, বিধবা কনিষ্ঠ ভগ্নীর বিবাহ দিলে সে গৃহত্যাগ করতো না।[১০৭] অথচ এ নাটকে বিধবা যুবতী গোলাপির গৃহত্যাগের ঘটনাটি পরবর্তী ঘটনাসমূহের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু বিধবাবিবাহ সমস্যাকে নাট্যকার আদৌ কোনো গুরুত্ব দেননি। আসলে ১৮৬০-এর দশকের মনোভাবের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত। সে জন্যেই এ সমস্যা তাকে তেমন ভাবিত করেনি। তাই তিনি কেবল শর্তসাপেক্ষ বলেছেন, 'অবস্থানুসারে' তাদের বিবাহ হওয়া উচিত।

১০৪. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা-ব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য** (কলিকাতা, ১৮৬৮). উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য। উৎসর্গপত্রের তারিখ ৩০ বৈশাখ ১২৭৩ (মে ১৮৬৬)।

১০৫. ঐ, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১০৬. ঐ, পৃ. ৫।

১০৭. ঐ, পৃ. ১১৩।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন

কৌলীন্যপ্রথা ও তার বিকার

ব্যুৎপত্তিগতভাবে সৎকুলে জাত ব্যক্তিকে কুলীন বলে। কিন্তু বাঙালী হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুলীন' বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে চিহ্নিত কয়েকটি বংশে জাত ব্যক্তিদেরই কুলীন বলে আখ্যায়িত করা হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই কুলীনগণ স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকার পেয়ে এসেছেন। তাঁদের বিবাহাদি রীতিনীতি নিয়ে যে ধর্মীয়-সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশন গড়ে উঠেছে তাকে কৌলীন্যপ্রথা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কুলীন বংশসমূহের বঙ্গদেশে আগমনের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস কুলজীশাস্ত্রে লিখিত হয়েছে।[১] এই সমস্ত কুলজীর বিবরণ সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী।[২] কিন্তু সকল কুলজী রচয়িতাই একমত যে, গৌড়ের রাজা আদিশূর একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে[৩] পৌরোহিত্য করার জন্যে বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কনৌজ থেকে নিমন্ত্রণ করে আনেন।[৪] বঙ্গদেশে আদৌ আদিশূর নামে কোনো

১. এসব কুলজীর মধ্যে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের **মহাবংশাবলী**, হরিহর মিশ্রের **কারিকা**, সর্বানন্দ মিশ্রের **কুলতত্ত্বার্ণব**, ধনঞ্জয়ের **কুলপ্রদীপ**, রামানন্দ শর্মার **কুলদীপিকা** ইত্যাদি প্রধান। এসব কুলজী মুসলিম-যুগে রচিত এবং বহু স্থানে প্রক্ষিপ্ত। **মহাবংশাবলীর** রচনাকাল ১৪৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দ।—M. R. Tarafdar, p.196 f.n.

২. কুলজীশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অনেকেই সঙ্গতভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। See R. C. Majumdar (ed.), **The History of Bengal, Vol. I** (Dacca, 1943), pp. 623-25, 630-31; M. R. Tarafdar, pp. 195-96.

৩. কি অনুষ্ঠান এ বিষয়ে ছয়টি মত প্রচলিত আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে পুত্রেষ্টি-যাগ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার**, **বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী**, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৮৯৫)-এ সংকলিত (প্রথম প্রকাশ ১৮৭১।) পৃ. ৩৬৩। অতঃপর **বহুবিবাহ** বলে উল্লিখিত।

লালমোহন বিদ্যানিধি, **সম্বন্ধনির্ণয়** (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৮৯৬) পৃ. ১৫-১৭।

৪. নগেন্দ্রনাথ বসু, **বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস**, প্রথম ভাগ, প্রথমাংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩১৮) পৃ. ৮৩।

রাজা ছিলেন কিনা ঐতিহাসিকগণ সে বিষয়ে নিশ্চিত নন।[৫] এবং আদিশূরের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ কেন, কুলজীকারগণও একমত নন।[৬] জনপ্রিয় মতে ৯৯৯ শকাব্দে আলোচ্য পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন।[৭] কালে-কালে একদিকে তাঁদের বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে এঁরা অনেকেই এঁদের পারিবারিক বিদ্যা ও আচারের ঐতিহ্য বিস্মৃত হন।[৮] সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন[৯] (রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৫৮-১১৯১) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গুণের তারতম্য অনুসারে এই ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরদের মধ্যে আটগাঁই-এর উনিশ ব্যক্তির ভিতর আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নটি গুণ লক্ষ্য করে তিনি তাঁদের কুলীন মর্যাদা দান করেন।[১০] চৌত্রিশ গাঁই-এর বংশধরগণ শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাভাজন হন।[১১] এবং বাকি চোদ্দ গাঁই-এর বংশধরগণ সদাচারভ্রষ্ট ছিলেন বলে গৌণ কুলীন বলে আখ্যায়িত হন।[১২]

নটি গুণের বিচারে কৌলীন্য নিরূপিত হয়...এ থেকে মনে হয় বল্লাল সেন সম্ভবত কৌলীন্যকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন।[১৩] নয়তো আট গাঁই-এর মাত্র উনিশজন সে মর্যাদা পেতেন না, সে-সব গাঁই-এর অন্যান্য সদস্যরাও সমান মর্যাদার অংশীদার হতেন। কিন্তু কালক্রমে কৌলীন্য ব্যক্তিগত গুণের স্বীকৃতি না হয়ে পারিবারিক মর্যাদায় পরিণত হয় এবং নয়টি গুণ নয়, একটি গুণই...'আবৃত্তি' অথবা সমান কিংবা উৎকৃষ্ট গৃহ থেকে কন্যা গ্রহণ বা এসব গৃহে কন্যাদান... কৌলীন্যের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।[১৪] স্থির হয় কুলীনেরা কেবল কুলীন পরিবারের সঙ্গেই বিবাহ বিষয়ে আদান-প্রদান করতে পারবেন। অবস্থাবিশেষে

৫. **History of Bengal**, I, 630.

৬. কুলজীতে প্রদত্ত সময় ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৬৪ ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শকাব্দ। লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ৩২৪-২৯; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১০২-০৫। **History of Bengal**, I, 626.

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৬৩।

৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৬৮; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৯. বল্লাল সেন আদিশূরের বংশধর বলে কথিত। লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ২৭১।

১০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৬৮; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৩৪-৩৫।

১১. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৭০।

১২. ঐ, পৃ. ৩৭১; নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৩৪-৩৬।

১৩. **History of Bengal**, I, 630; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৩৪-৩৫।

১৪. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৭১-৭২।

শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণ অনুমোদিত হয় কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান নিষিদ্ধ হয়। গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণ এবং গৌণকুলীনকে কন্যাদান উভয়ই কুলনাশক বলে বিবেচিত হয়। বিবাহের এই রীতিভঙ্গ করলে কৌলীন্য মর্যাদা হারিয়ে কুলীনগণ বংশজে পরিণত হন। ব্যবস্থামতে বংশজের কন্যা গ্রহণ করলেও, কুলীনগণ বংশজ বলে পরিগণিত হন।[১৫] এভাবে কুলীন শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিবারে বিবাহ করার ধারণা একীভূত হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিবাহ বিষয়ে একটি মাত্র শর্ত পালন করেই কুলীনগণ আপনাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারতেন।[১৬]

বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য মর্যাদা আরোপ করার কিছুকালের মধ্যেই কুলীন-দের প্রত্যাশিত নবগুণ ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এমন কি, বিবাহ-বিষয়ে তাঁদের যে বাধ্যবাধকতা ছিলো, তাও বহুস্থানে লঙ্ঘিত হতে থাকে।[১৭] ফলে কৌলীন্য প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে দশপুরুষের মধ্যে[১৮] ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে সেকালের বিখ্যাত ঘটক দেবীবর পুনরায় কৌলীন্যের সংস্কার করেন।[১৯] বল্লাল সেন গুণের বিচারে কৌলীন্য আরোপ করেছিলেন, দেবীবর দোষের তারতম্য অনু-সারে কুলীনদের মোট ৩৬টি মেলে বিভক্ত করেন। তিনি সেইসঙ্গে ব্যবস্থা দান করেন যে, নির্দিষ্ট মেলের মধ্যেই বিবাহসম্বন্ধ সীমিত থাকবে।[২০] এই সংস্কারের দ্বারা দেবীবর কুলীনদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন অধিকতর সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে।[২১]

দেবীবরের সংস্কারের ফলে কুলীনদের সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষা পেলেও ক্ষেত্র-বিশেষে তাঁদের পক্ষে বহুবিবাহ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমন অনেক সময়ে দেখা যেতো যে, নির্দিষ্ট পুরুষের (প্রজন্মের) বিশেষ গাঁই ও গোত্রের কয়েকটি কন্যার জন্যে বিধিমতো নির্দিষ্ট বর হয়তো কেবল একজনই আছেন।[২২] এমন অবস্থায়

১৫. ঐ, পৃ. ৩৭৩। বিবাহবিধি বিস্তারিতভাবে লক্ষণ সেনের আমলে প্রণীত হয়। See **History of Bengal**, I, 630.

১৬. নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ২১৩।

১৭. ঐ, পৃ. ১৮৩।

১৮. **বহুবিবাহ** পৃ. ৩৭৪।

১৯. M.R. Tarafdar, pp. 197-98 ; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৮৪-৮৭।

২০. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৭৪ ; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ: ২১৪-১৫ ; ২১৮-১৯।

২১. M.R. Tarafdar, pp. 197-98.

২২. **Report on the Census of India, 1901**, Vol. VI. Pt. I.p. 262. পাত্রীর অভাবে পুরুষের বিবাহ বন্ধ থাকতো না। কেননা, কুলীনপাত্র শ্রোত্রিয় পাত্রী গ্রহণ করতে পারতো।

কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার জন্যে বিশেষ পাত্রের একাধিক কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়তো। কৌলীন্যের সঙ্গে বহুবিবাহ অংশত এভাবেই যুক্ত হয়ে পড়ে।[২৩]

তবে ধর্মীয় কোনো বিধান কৌলীন্য মর্যাদা আরোপের ব্যাপারে কিংবা কুলীনদের বহুবিবাহ-বিষয়ে ছিলো না। বরং, ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদিত হলেও, হিন্দু শাস্ত্রে বহুবিবাহ একপ্রকার নিষিদ্ধই হয়েছে।[২৪] কিন্তু বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন ও শেষে দেবীবরের সংস্কারের ফলে বহুবিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুবিবাহের এই রীতি দুষ্টক্ষতের মতো ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর ফলে কেবল কুলীনগণই নয় সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষত স্ত্রীদের জীবনে এর ফলে অপরিসীম দুঃখদুর্দশার সূচনা হয়। এভাবে, প্রারম্ভে যে ধর্মীয়-সামাজিক প্রথা রচিত হয় গুণাবলীর তারতম্য অনুসারে, কালে-কালে তা-ই একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়।

কৌলীন্যপ্রথার এই বিকার ও কলুষায়ণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ১৯জন ব্যক্তি রাজপ্রদত্ত উচ্চ সম্মান লাভ করায়, তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এবং অকুলীন ব্রাহ্মণগণ এঁদের শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করেন। কিন্তু অকুলীনদের পক্ষে কৌলীন্য মর্যাদা লাভ করা সম্ভব ছিলো না। অথচ কুলীনদের সংস্পর্শে গিয়ে নিজেদের বংশ-মর্যাদা বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষা শ্রোত্রিয় এবং গৌণকুলীন সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক ছিলো। তাঁরা এজন্যে কুলীনদের কাছে নিজেদের কন্যা অথবা ভগ্নীর বিবাহ দিয়ে কিঞ্চিৎ কুলমর্যাদা লাভ করার প্রয়াস পান। কিন্তু, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, সমান বা উৎকৃষ্ট ঘরেই কুলীনদের বিয়ে করা প্রশস্ত বলে বিবেচিত হতো। এজন্যে অর্থ-প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং গৌণকুলীনগণ আপনাদের কন্যা কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করার প্রয়াস পান এবং এভাবে কুলমর্যাদা অর্জনের আশা পূরণ করতে উদ্যোগী হন।

অকুলীনদের জন্যে পরিবেশ আশ্চর্যজনকভাবে অনুকূল ছিলো। কুলীনরা বল্লাল-প্রদত্ত সম্মানের সুযোগ নিয়ে সামাজিক সুবিধাদি যথেষ্ট পরিমাণে আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলো, এমন অনুমান করা যায়। এই বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা তাঁদের অলস ও অকর্মণ্য করে তোলে। কালে-কালে তাঁরা বিদ্যাশূন্য হয়ে পড়েন এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন। জীবনযাত্রায় কৌলীন্যই

২৩. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৭৮; নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ২৩১-৩২।

২৪. **বহুবিবাহ**, প্রথম অধ্যায়, এবং **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার**, দ্বিতীয় পুস্তক (কলিকাতা, ১৮৭২-৭৩), যত্রতত্র।

অনেকের বেলায় একমাত্র মূলধন হয়ে দাঁড়ায়।[২৫] উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগরহিত কুলীনদের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত অবনত হয়। এবং এই অবস্থায়ই অকুলীনগণ হীনাবস্থায় পতিত কুলীনপাত্রদের মোটা অর্থ দিয়ে ব্যাপকভাবে কিনতে আরম্ভ করেন।[২৬] বিশেষ-বিশেষ কুলীনও আগতিক লাভের আশায় আপনাদের বংশমর্যাদা ত্যাগ করে অকুলীনকন্যা গ্রহণ করতে শুরু করেন।[২৭]

গোড়াতে নিয়ম ছিলো, শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করলে অথবা গৌণকুলীনের কিংবা বংশজের কন্যা গ্রহণ করলে কুলীন বংশজে পরিণত হবেন।[২৮] কিন্তু কালক্রমে সমাজ এ বিষয়ে আর একটু উদার ভাব ধারণ করে। কৌলীন্যের নিয়মভঙ্গকারী অতঃপর ভঙ্গকুলীন বলে গণ্য হন এবং তার পরের আরো চার পুরুষ পর্যন্ত কৌলীন্যের অধিকারী বলে বিবেচিত হন। বিশেষত প্রথম তিন পুরুষ পর্যন্ত এরকম ভঙ্গকুলীনের বিয়ের বাজারদর অত্যন্ত চড়া থাকতো।[২৯] শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং ভঙ্গকুলীনগণ ভঙ্গকুলীনের কাছে কন্যা দান করাকে অসাধারণ সম্মানের বিষয় বলে জ্ঞান করতেন এবং প্রাণপণ প্রযত্নে একটি ভঙ্গকুলীন পাত্র সংগ্রহ করতে চেষ্টা করতেন। ভঙ্গকুলীন পাত্রও কুল ভাঙার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এবং আপনাদের দারিদ্র্য মোচনের জন্যে যদ্দুর সম্ভব বেশি অর্থের বিনিময়ে যথাসাধ্য বেশিসংখ্যক বিয়ে করতেন। বিবাহ এভাবে কিছু কুলীনের জন্যে ব্যবসায়ে পরিণত হয়।[৩০] অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যবসায় প্রথম বারের মতো সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৩১]

উনবিংশ শতাব্দীতে কুলীন-বহুবিবাহের প্রসার

এ জাতীয় বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনরা বিয়ে করার সময়ে এককালীন পণ এবং পরবর্তী বিভিন্ন উপলক্ষে অর্থলাভের আশাতেই বিয়ে করতেন। নিজের

২৫. K.M. Banerji, 'Kulin Polygamy', **Calcutta Review,** p. 138.

২৬. K.M. Benerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal', **Calcutta Review,** Vol. II, No. 3 (1844), p. 14.

২৭. K. M. Benerji, 'Kulin Polygamy', p. 138.

২৮. বহুবিবাহ পৃ. ৩৭৩।

২৯. ঐ, পৃ. ৩৮৯ ; K. M. Banerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal', p. 14.

৩০. K. M. Banerji, 'Kulin Polygamy', p. 138 ; W. W. Hunter, **A Statistical Account of Bengal,** Vol. V (London, 1876), p. 55.

বিদ্যাসাগর একজন কুলীনের উল্লেখ করেন, যিনি দুর্ভিক্ষের পরে অন্যের কাছে এই বলে গর্ব করেন যে, বিয়ে করে তিনি স্বচ্ছন্দে সময় কাটিয়েছেন, দুর্ভিক্ষের কিছুমাত্র টের পাননি। **বহুবিবাহ** পৃ. ৩১৫।

৩১. T. Raychaudhuri, 'Norms of Family Life and Personal Morality Among the Bengali Hindu Elite, 1600-1850', p. 17.

ব্যয় নির্বাহের জন্যে এঁরা শ্বশুর বাড়ি গমন ও অবস্থান করতেন। 'কুল মর্যাদা' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণ না করে এঁরা শ্বশুরবাড়িতে উপবেশন, স্নান ও আহার কিছুই করতেন না। এমন কি, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপও করতেন না।[৩২] দীর্ঘদিন পরে কুলীন জামাতা বেড়াতে এলে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাই তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। প্রথমেই 'কুল-মর্যাদাস্বরূপ কিছু টাকা জামাতার হাতে তুলে দেওয়া হতো। অর্থের পরিমাণ দেখে জামাতা কখনো খুশি হতেন, কখনো হতেন না। রাতে শোবার আগে জামাতা স্ত্রীর কাছে অর্থ চাইতেন। সমকালীন একজন মহিলার রচনা থেকে জানা যায়, কুলীন স্ত্রীরা বছরের পর বছর চরকা-কাটা টাকা জমা করে রাখতেন স্বামীর মন পাওয়ার প্রত্যাশায়। কিন্তু তবু অর্থের পরিমাণ দৃষ্টে স্বামীরা সাধারণত খুশি হতে পারতেন না।[৩৩]

কুলীন স্বামী তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে কেবল যে ঘর করতেন না, তা নয়, তাঁদের কারো-কারো সঙ্গে বছরের পর বছর দেখা করতেন না।[৩৪] এবং স্ত্রীদের আদৌ মনুষ্য বা আত্মীয় বলে মনে করতেন না। এমনও নাকি দেখা গেছে যে, স্বামী কিছু অর্থলোভে তাঁর এক পক্ষের অকুলীন শ্যালকের কাছে অন্য এক স্থানের স্ত্রীকে জোর পূর্বক পুনর্বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৩৫] প্রকৃত পক্ষে, বিবাহ যখন জীবিকার উপায় বলে গণ্য হয়, তখন ব্যবসায়ীর মতো সকল বিবেক-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে কুলীন স্বামীর পক্ষে লাভের আশায় সকল রকমের অন্যায়ই করা সম্ভব। একটি বালক তার চেয়ে বয়সে বড়ো তিনটি সহোদরাকে,[৩৬] অন্য একটি বালক একই সঙ্গে তিনটি সহোদরা ও তাদের একটি পিসিকে[৩৭] অথবা

৩২. 'এতদ্দেশীয় বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', **অবোধ বন্ধু**, ভাদ্র ১২৭৬, পৃ. ৯৮।

৩৩. 'কুলীন বহুবিবাহ (কবিতা) : বামাগণের রচনা', **বামাপ**, পৌষ ১২৭৮, পৃ. ২৯০।

৩৪. **রামমোহন গ্রন্থাবলি**, পৃ. ২০৭।

৩৫. 'সংবাদ', **বামাপ**, মাঘ ১২৭৭, পৃ. ৩৩৩।

৩৬. **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৩, পৃ. ৯৯।

এই কন্যা তিনটির পিতার নাম ছিলো গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স তখন ২৮।

৩৭. ঘটনাটি ঘটে কুলিয়া বেলঘরিয়ায়। বালক বর এই বিয়ে চারটি করার জন্যে ৬০০ টাকা পণ গ্রহণ করেন।

বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮, পৃ. ৬০-৬১।

এক অতিবৃদ্ধ মৃত্যুর মাত্র ৭ দিন আগে[৩৮] একটি বিবাহ করে—এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত এ কারণেই পাওয়া যায়।

যে অর্থের বিনিময়ে ভঙ্গকুলীনরা বিয়ে করতেন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার পরিমাণ আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও যথেষ্ট বড়ো বলে মনে হয়। হান্টারের মতে ১৮৭০-এর দশকে একজন কুলীন তাঁর প্রথম বিয়ের জন্যে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে দুশো পাউণ্ড অর্থাৎ দুহাজার টাকা পর্যন্ত পেতেন। কিন্তু পণের পরিমাণ বিয়ের সংখ্যার সঙ্গে বিষমানুপাতিকভাবে কমে আসতো।[৩৯] শেষদিকে এই অর্থের পরিমাণ এতো হ্রাস পেতো যে, তা দিয়ে হয়তো কেবল একটি বারোয়ারি পুজোর চাঁদা দেওয়া যেতো।[৪০] হান্টার দু হাজার টাকার কথা লিখলেও, সাধারণ কুলীনরা পাঁচ-সাত-দশ টাকাতেই খুশি হতেন, এমন প্রমাণও সমসাময়িক রচনায় পাওয়া যায়।[৪১] আগেই বলা হয়েছে, বিয়ের বাজার দর ক-পুরুষে-ভঙ্গ-কুলীন তার উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিলো। ফলে দু-পুরুষে-ভঙ্গকুলীন একশটি বিয়ে করতে পারলে, তার পুত্র তিন-পুরুষে-ভঙ্গকুলীন হয়তো পঞ্চাশটি বিয়ে করতে পারতো। বিক্রমপুর অঞ্চলের এক কুলীনের কথা উল্লেখ করে হাণ্টার লিখেছেন, তিনি ১৮৭১ সালে জীবিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা তখন শতাধিক। অপর পক্ষে, তাঁর তিন পুত্র তখন পর্যন্ত যথাক্রমে মাত্র পঞ্চাশ, পঁয়ত্রিশ ও ত্রিশটি করে বিয়ে করতে পেরেছিলেন।[৪২]

পূর্বেই বলা হয়েছে, অর্থলোভে যে-কুলীন কুলক্ষয় করতেন, বেশি সংখ্যায় বিয়ে করে সে কৌলীন্যভঙ্গজনিত ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করতেন। অপর পক্ষে, অকুলীন এবং ভঙ্গকুলীন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরাও এঁদের সন্ধানে থাকতেন। ফলে বহুবিবাহের ব্যবসা খুবই স্ফূর্তি লাভ করেছিলো উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে।

৩৮. ১৮৬৫ সালে এমনি একটি ঘটনার কথা **বামাপ** থেকে জানা যায়। ঘটনাটি ঘটে বরাহনগরে।

বামাপ, কার্তিক ১২৭২, পৃ. ১৩৮।

৩৯. **A Statistical Account of Bengal**, V, 55.

৪০. এ রকমের একটি দৃষ্টান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য : **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৯৫।

৪১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৬।

উপরন্তু দ্রষ্টব্য : 'দুর্ভা গনী শ্যামা' (আংশিক প্রকাশিত উপন্যাস), **মিত্র প্রকাশ**, পৌষ ১২৭৭, পৃ. ২৯৩।

Also see **Report on the Census of India**, 1901, Vol. VI, Pt. 1, p. 252.

৪২ **A Statistical Account of Bengal**, V, 55.

ইয়ংবেঙ্গলদের পত্রিকা জ্ঞানান্বেষণে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন বহুবিবাহকারী কুলীনের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, ২৩টি গ্রামের ২৭জন কুলীন ৮টি থেকে ৬২টি পর্যন্ত বিয়ে করেছিলেন।[৪৩] ১৮৭১ সালে প্রকাশিত বহুবিবাহ গ্রন্থে বিদ্যাসাগরও এমনি দুটি তালিকা প্রকাশ করেন। এ তালিকায় নটি কুলীনের নাম দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা পঞ্চাশ থেকে বিরাশিটি পর্যন্ত বিয়ে করেছিলেন। পঁচিশ থেকে চুয়াল্লিশটি বিয়ে করেছিলেন এমন ১৪জন, এবং দশ থেকে তেইশটি বিয়ে করেছিলেন এমন ৬২জনের নামও এই তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪] এমনি আর একটি তালিকার কথা ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত অন্য একটি প্রবন্ধে থেকেও জানা যায়।[৪৫] ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার নিকটে বালিতে মারা যান, এমন একজন কুলীনের কথা শোনা যায়, যাঁর মৃত্যুতে একশ স্ত্রী বিধবা হন।[৪৬] সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বিয়ের উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শুনেছেন, এক ব্যক্তি ১৮০টি বিয়ে করেছিলেন।[৪৭] এ সমস্ত প্রমাণাদি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত এদেশে একশ্রেণীর কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ করার রেওয়াজ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।

বরের বাজারে ভঙ্গকুলীনদের এতো বেশি চাহিদা ছিলো যে, দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে এঁদের জামাতা হিশেবে লাভ করা দুঃসাধ্য ছিলো। এঁদের পক্ষে কুলীন জামাতা সংগ্রহ আবশ্যিক ছিলো না। কিন্তু দেশাচারের নিয়ম অনুসারে কুলীন ও ভঙ্গকুলীনদের কন্যা কুলীনদের কাছে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিলো অবশ্যপালনীয়। প্রতিযোগিতার বাজারে, সুতরাং, দরিদ্র কুলীনদের পক্ষে কন্যাকে চড়া পণের বিনিময়ে কুলীন পাত্রে অর্পণ করা শক্ত ছিলো। মেল-বন্ধনের রীতিকেও এঁরা অনেকেই ভালো বলে মনে করতেন না; কিন্তু দেশাচার কাটিয়ে ওঠার সাহস না থাকায়, এঁরা অনেকক্ষেত্রে কন্যাকে অপাত্রেই দান করতে বাধ্য হতেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ন বছর বয়সের আগেই কন্যার বিবাহ হলে অভিভাবকের অনেক পুণ্য হয়। অন্যদিকে বিয়ের আগে কন্যা ঋতুমতী হলে অভিভাবক ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী এবং নরকগামী হন।[৪৮] সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই

৪৩. **সমাচার দর্পণে** পুনর্মুদ্রিত, ২৩ এপ্রিল ১৮৩৬, **সংকলন** ২, পৃ. ২৫২-৫৩।
৪৪. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৪০৩-১৩।
৪৫. K.M. Banerji, 'Kulin Polygamy', p. 145.
৪৬. **সমাচার দর্পণ**, ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯, **সংকলন** ২, পৃ. ২৫৪।
৪৭. K.M. Banerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal', p. 22.
৪৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: তৃতীয় অধ্যায়।

কুলীন কন্যার একটু বয়স হলেই অভিভাবকগণ তাঁর বিয়ের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু দেশাচার অনুসারে তাঁকে অকুলীন পাত্রে দান করা যায় না। আবার সমকক্ষ কিংবা উচ্চতর বংশীয় কেউ চড়াপণ ব্যতীত বিয়েও করে না। কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত রাখাও গুরুতর পাপের কার্য। এমতাবস্থায় কন্যার অভিভাবকগণ রীতিমতো বিপদগ্রস্ত হতেন। এই সংকটে পড়ে তাঁরা বরং মনু-নারদ-পরাশর প্রমুখ শাস্ত্রকারের নিঃশব্দ শাসনকে সহ্য করতেন; কিন্তু প্রতিবেশীদের নিন্দা সহ্য করে কন্যাকে অকুলীন পাত্রে সম্প্রদান করার কথা চিন্তা করতেন না, বা সে সাহস তাঁদের হতো না। তাঁদের হাতে প্রকৃত পক্ষে, একটি মাত্র পন্থা অবশিষ্ট থাকতো,—পূর্বে অনেকগুলো বিয়ে করে যথেষ্ট অর্থ লাভ করেছেন এমন একজন বৃদ্ধ বা মধ্য বয়স্ক কুলীনকে তাঁদের কন্যা বা একসঙ্গে কয়েকটি কন্যাকে বিয়ে করে কুল-মান রক্ষা করার জন্যে অনুরোধ জানানো। কুলীন পিতা বা অভিভাবক এভাবে নিজেদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতেন, অন্য দিকে হয়তো মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনও কন্যার পাণিগ্রহণ করে জীবনের শেষ পূণ্যকর্ম পালন করতেন।[৪৯]

এ জাতীয় বিবাহ অনূঢ়ত্ব ঘোচানো ছাড়া কুলীন কুমারীদের জন্যে অন্য কোনো সান্ত্বনা নিয়ে আসতো না। এমন ঘটনা প্রায়ই শোনা যেতো যে, শুভ-দৃষ্টির পর স্বামীর সঙ্গে কুলীনস্ত্রীর আর কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি।[৫০] আবার সাক্ষাৎ হলেও যথেষ্ট অর্থ না পেলে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপও করতেন না। এ জন্যে কুলীনস্ত্রীরা স্বামী থাকা সত্ত্বেও সাধারণত বিধবার মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হতেন।[৫১] আবার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে না হওয়ায় কুলীন-কুমারী আত্মহত্যা করেছেন,[৫২] কিংবা অধিক বয়সী কুলীনকন্যার সঙ্গে বালকের বিবাহ হওয়ায় মনোদুঃখে কুলীনস্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন[৫৩] এমন ঘটনাও সে যুগে অসাধারণ ছিলো না।

বস্তুত, কুলীন স্ত্রীদের দারিদ্র্য এবং অনাদর মর্মান্তিক বিষয় বলে সেকালে গণ্য হতো। অনেক ক্ষেত্রেই কুলীনকন্যার জন্ম হতো মাতুলালয়ে, কারণ তাঁর বহুবিবাহকারী পিতা বিয়ে করে তাঁর মাতাকে শ্বশুর বাড়িতেই ফেলে রাখতেন।

৪৯. K.M. Banerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal', p. 16; তত্ত্ব, ১ ভাদ্র, ১৭৬৭ শকাব্দ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫।

৫০. 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', অবোধবন্ধু, ভাদ্র, ১২৭৬, পৃ. ৯৮।

৫১. 'দেশাচার: কৌলীন্য প্রথা', বামাপ, কার্তিক ১২৭২, পৃ. ১২৮।

৫২. 'সংবাদ', বামাপ, বৈশাখ ১২৭৪, পৃ. ৫০৫।

৫৩. 'সংবাদ', বামাপ, বৈশাখ ১২৯২, পৃ. ৩৪।

বয়স হওয়ার পরে এ কন্যার বিয়ে হলেও তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হতো না। তাঁকেও মাতুলালয়েই পড়ে থাকতে হতো। এমন কি, তাঁর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে-ও মাতা এবং মাতামহীর মতো সেই বাড়িতেই মানুষ হতো। পরের সংসারে এই কন্যাগণ সাধারণত অত্যন্ত অনাদরের মধ্যে জীবন কাটাতেন। সংসারের সকল কাজ তাঁদের করতে হতো দাসীর মতো। তার পরেও তাঁদের ভাগ্যে অবহেলা, ঘৃণা, তিরস্কার এমন কি শারীরিক নির্যাতন ও জুটতো।[৫৪] সত্যিকারভাবে দেখলে কুলীন-কন্যার পক্ষে বংশগত সম্মানই কঠোরতম দুর্ভাগ্যের কারণ হতো। এবং সেকালে কৌলীন্যই ছিলো 'cruel engine of female misery and degradation.'[৫৫]

কুলীনদের বহুবিবাহ কেবল কুলীনকন্যা অথবা তাঁদের অভিভাবকদের জন্যেই দুর্ভাগ্যের সূচনা করতো না, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে এই প্রথা আরো কতো-গুলো সামাজিক ব্যাধির জন্ম দিয়েছিলো। আমরা লক্ষ্য করেছি, কুলীনকন্যার অভিভাবক মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনকেও জামাতা হিসেবে বরণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না।[৫৬] এর ফলে এ রকম কুলীন কন্যারা অচিরেই বিধবা হতেন এবং বিনা দোষে বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হতেন। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে বিধবাদের সংখ্যা যে তুলনামূলকভাবে বেশি ছিলো তার অন্যতম কারণ কুলীনদের বহুবিবাহ আমরা প্রথম অধ্যায়েই এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

কুলীন স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারাজীবন স্ত্রীদের দেখা হতো না বলে সেকালের সমাজে ব্যভিচারের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।[৫৭] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন স্ত্রীদের ব্যভিচারের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> An uncultivated mind, destitute of restraints by which education balances the animal passions, and unprotected by a husband's tender care, must be subject to temptations of no ordinary power.[৫৮]

শিবনাথ শাস্ত্রী থাকমণি নামক একটি কুলীনস্ত্রীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, কালেভদ্রে তাঁর স্বামী তাঁর কাছে আসতো মাত্র। বয়স হওয়ার পরে পাড়ার একটি যুবক

৫৪. বহুবিবাহ, পৃ. ৩৯২-৯৩।

৫৫. K.M. Banerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal', p. 15.

৫৬. পুত্র পৌত্রাদি থাকা সত্ত্বেও সত্তর বছর বয়স্ক গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে করার আর একটি দৃষ্টান্ত জানা যায় বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে। দ্রষ্টব্য : বামাপ, ভাদ্র ১২৭৬, পৃ. ৯৯।

৫৭. দ্রষ্টব্য : নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি, কলিকুতূহল নামক গ্রন্থ (১৮৫২-৫৩। বরেন্দ্র রিসার্চ মুাজিয়ম লাইব্রেরিতে রক্ষিত এ গ্রন্থের কপিতে প্রকাশের স্থান উল্লিখিত নেই।), পৃ. ৩৮।

৫৮. K.M. Banerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal', P. 15.

খাকমণির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে ঘরের বাইরে আনে।[৫৯] ১৮৪২ সালে বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে এক কুলীনস্ত্রী জানান যে, তিন বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। ষোলো বছর বয়সের সময়ে একদিন হঠাৎ তাঁর স্বামী এসে উপস্থিত হন। স্বামীটি প্রায় বৃদ্ধ এবং তাঁর চেহারা কুৎসিত। রাত্রিবেলায় এই তরুণী স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে হয়। এরপর স্বামীর সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। যৌবনের স্বাদ পেয়ে তিনিও আর সৎ থাকতে পারেননি।[৬০]

এ রকমের ব্যভিচার সেকালের সমাজে বহুল প্রচলিত ছিলো বলে মনে হয় এবং এ জন্যেই সম্ভবত সমাজ এ জাতীয় ব্যভিচারকে কলঙ্কজনক মনে করলেও কঠোরভাবে শাসন করতো না। কুলীনগণ সমাজের চূড়ামণি এবং সে কারণে সমাজ শাসনের এক প্রকার বাইরে—এ-ও হয়তো সমাজের তথাকথিত ঔদার্যের কারণ। এ প্রসঙ্গে একজন সমকালীন লেখক মন্তব্য করেন,

> বিবাহ হইয়া অবধি স্বামীর সহিত হয়ত আদৌ দেখা সাক্ষৎ নাই, তথাপি কুলীন মহিলা সন্তান প্রসব করিতেছেন। কে তাহার দোষ ধরিবে? তিনি মনে করিলে এক মুহূর্তেই অনেকের জাতি নষ্ট করিতে পারেন, অনেককে সামান্য দোষে সমাজচ্যুত করিতে পারেন; কিন্তু তিনি কুলীন, সমাজের চূড়ামণি—তাঁহার দোষ কে ধরিবে?.... তবে কুলীনকন্যা বিধবা হইলে একটু ক্ষতি আছে—সমাজ তাহাকে আর সন্তান প্রসব করিতে দেয় না।[৬১]

অবৈধ গর্ভসঞ্চার হলে কুলীনদের মধ্যে সেটা কোনো বড়ো সমস্যা হয়েও দেখা দিতো না। বিধবাদের মতো গ্রামের এক শ্রেণীর মহিলাদের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে ভ্রূণহত্যা বা গর্ভপাত ঘটানোর ব্যবস্থা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলো। এর ফলে কখনো কখনো গর্ভবতীর মৃত্যুও হতো। এমন কি গর্ভবতীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও জানা যায়।[৬২] কিন্তু সবচেয়ে সহজ পথ ছিলো জামাতাকে নিমন্ত্রণ করে এর সমাধান করা। কিছু অর্থের বিনিময়ে জামাতা এসে অবৈধ গর্ভকে তার নিজের বলে স্বতঃই স্বীকার করেও নিতেন।[৬৩] জামাতা এসে অবৈধ গর্ভ তারই সম্ভূত বলে স্বীকার করে না নিলেও অনেক ক্ষেত্রে কুলীন পরিবার বিপদে পড়তো

৫৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৩৪-৩৬।

৬০. বিদ্যাদর্শন, কার্তিক ১৭৬৪, সংবাদ ৩, পৃ. ৫৭১-৭২। পত্রটি কোনো মহিলার লেখা কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

৬১. 'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ', ভারত সুহৃদ, আষাঢ় ১২৮৩ (জুন-জুলাই ১৮৭৬), পৃ. ৮৩।

৬২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৯৬২), পৃ. ৯।

৬৩. বহুবিবাহ, পৃ. ৩৯০।

না। এমতাবস্থায় কন্যার মা-ভগ্নী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ একদিন ঘোষণা করতেন যে, পূর্বরাত্রে আকস্মিকভাবে জামাতা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। খুব ব্যস্ত থাকায় প্রত্যুষেই চলে গেছেন।[৬৪] এভাবেই অবৈধগর্ভ সমাজের স্বীকৃতি লাভ করতো এর ফলে, বিয়ের পরে স্ত্রীর সঙ্গে একবারও মিলন না হওয়া সত্ত্বেও কুলীন পিতা একদিন হয়তো তাঁর পুত্রের সাক্ষাৎ পেতেন।[৬৫]

কোনো কোনো কুলীনস্ত্রীর পক্ষে মাত্রাধিক্য ব্যভিচারের ফলস্বরূপ অথবা প্রতিকূল পরিবেশের চাপে পড়ে বেশ্যা হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না। পূর্বোক্ত থাকমণি এবং বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় উল্লিখিত কুলীনস্ত্রী এমনি পতিতা। প্রকৃত পক্ষে, কলকাতার নিবন্ধীকৃত পতিতাদের মধ্যেও অনেক কুলীন স্ত্রী ছিলো। ১৮৫৩ সালে প্রদত্ত কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন এবং ১৮৬৭ সালে প্রদত্ত কলকাতার হেলথ অফিসারের প্রতিবেদন উভয় থেকেই দেখা যায় যে, কলকাতার তৎকালীন নিবন্ধীকৃত বেশ্যাদের মধ্যে বেশ কিছু ছিলো কুলীনস্ত্রী।[৬৬]

কুলীনবিবাহ পদ্ধতির আর-একটি কুফল অসমবয়স্ক বিবাহ। জামাতা সংগ্রহ করতে পারলে কুলীন অভিভাবক বৃদ্ধের সঙ্গেও শিশু অথবা বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ জন্যেই পঞ্চাশ বছর বয়স্ক চরিত্রহীন বৃদ্ধের সঙ্গে পাঁচ বছরের পরমা সুন্দরী ও সুশীলা কন্যার বিবাহের দৃষ্টান্ত সে সমাজে আদৌ অসাধারণ ছিলো না।[৬৭] আবার কুলীন জামাতা না পেলে কন্যাকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত অবিবাহিত রাখতেও অভিভাবক কুণ্ঠিত হতেন না।[৬৮] এর ফলে অনেক সময়ে ব্যভিচার ছাড়াও অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রশ্রয় পেতো। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের একটি সংবাদে জানা যায়, বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হওয়ায় বজ্রযোগিনী গ্রামের একটি কুলীন কুমারী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি শূদ্রকে বিয়ে করেন।[৬৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বরপণ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠে।[৭০] এ-ও কৌলীন্য প্রথার প্রভাব বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৮০-র দশকের গোড়ার

৬৪. ঐ, পৃ. ৩৯০-৯১।

৬৫. 'বহুবিবাহ', **বিদ্যাদর্শন**, ভাদ্র ১৭৬৪ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪২); **সাবাস** ৩, পৃ. ৫৬৭-৬৮।

৬৬. প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত, K.M. Banerji, 'Kulin Polygymy', p. 142.

৬৭. তত্ত্বপ, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫।

৬৮. ৪০ বছর বয়স্কা একটি 'কন্যার' বিবাহের সংবাদের জন্যে দ্রষ্টব্য : **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৬, পৃ. ৯৯।

৬৯. **বামাপ**, মাঘ ১২৭৭, পৃ. ৩৩৩।

৭০. দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়।

দিকেই অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন যে, পূর্বে পণ দিয়ে কেবল কুলীন জামাতাকে কিনতে হতো। কিন্তু পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র বিয়ের সময় কন্যাপক্ষের কাছে যথেচ্ছা অর্থের দাবি করতে শুরু করেন।[৭১] রূপচাঁদ পক্ষী এই প্রবণতাকে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যের সঙ্গে তুলনা করে একপেশে (অর্থাৎ এনট্রান্স উত্তীর্ণ), দুপেশে (অর্থাৎ এফ এ উত্তীর্ণ) এবং তিনপেশে (অর্থাৎ গ্রাজুএট) কৌলীন্য বলে অভিহিত করেন। যে সম্মান এককালে বংশানুক্রমিকভাবে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিলো, তা-ই নতুন পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে নতুন সামাজিক স্ট্যাটাসের প্রতীকস্বরূপ অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবে বরের নতুন মূল্য নির্ধারিত হয়।[৭২]

সর্বোপরি কৌলীন্য প্রথা আর-একটি সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। এ সমস্যাকে এক কথায় শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদের কন্যাসংকট বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ সমস্যা অত্যন্ত গুরুতরভাবে দেখা দেয়।[৭৩] গত শতাব্দীতে যাঁরা কৌলীন্য ও বিধবাবিবাহের অনিষ্টকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন পরিচালনা করেন, ভাবতে অবাক লাগে, তাঁরাও বহুবিবাহের সঙ্গে এ সমস্যার যোগাযোগ লক্ষ্য করতে অসমর্থ হন। কন্যাবিক্রয় নিয়ে যে স্বতন্ত্র আন্দোলন হয়, সে ক্ষেত্রেও কন্যার অভিভাবকদের প্রলোভনের কথা বারংবার ঘৃণার সঙ্গে বলা হয়, কিন্তু সমস্যার গোড়ার কথা--কুলীনদের বহুবিবাহ---আন্দোলনকারীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেনি। বস্তুত পক্ষে, কুলীনদের বহুবিবাহ দৃশ্য-অদৃশ্য বহু দোষের আকরস্বরূপ ছিলো।

কুলীন বহুবিবাহবিরোধী সচেতনতার বিকাশ

অন্যান্য অনেক সমস্যার মতো কুলীন বহুবিবাহের কুফলসমূহও শিক্ষা এবং আত্মসচেতনতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। বিধবাদের সহমরণ এবং বালবিধবাদের সারাজীবনের ব্রহ্মচর্য রামমোহন রায় ও তাঁর যে অনুসারী বন্ধুদের ভাবিত করছিলো, কুলীন বহুবিবাহের সমস্যাও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আত্মীয় সভায় ১৮১৯ সালের একটি বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিলো, এমন

৭১. 'নববর্ষ', বামাপ, বৈশাখ ১২৮৯ (এপ্রিল-মে ১৮৮২), পৃ. ৮।

৭২. 'বঙ্গদেশে পুত্রবিক্রয়', সোমপ্রকাশ, ১০ আষাঢ় ১২৯১ (জুন ১৮৮৪), সাবাস ৪, পৃ. ৩১২-১৩।

৭৩. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৪] একই বছরে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ গ্রন্থে রামমোহন এ সমস্যার উল্লেখ করে কুলীনস্ত্রীদের দুর্দশার প্রতি সামাজিকগণের সহানুভূতি উদ্রেক করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৭৫] কিন্তু সতীদাহ ও অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন নিয়ে রামমোহন এতো ব্যাপৃত ছিলেন যে, কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে তিনি অধিকতর মনোযোগ বা সময় দিতে পারেননি। কুলীনস্ত্রীদের অনাদর ও কৃচ্ছ্রসাধনার চেয়ে জোর করে একটি বিধবাকে পুড়িয়ে মারার সমস্যা স্বভাবতই তাঁর কাছে বেশি নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত বলে মনে হয়েছে। তাঁর বহুবিবাহ-বিরোধী মনোভাব মুষ্টিমেয় সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুকে সম্ভবত প্রভাবিত করেছিলো। আলোচ্য দশকেই কতিপয় হিন্দু মিলিতভাবে সরকারের কাছে একটি বহুবিবাহবিরোধী আবেদনপত্র প্রেরণের পরিকল্পনা করেন বলে জানা যায়।[৭৬]

কুলীনদের বহুবিবাহসংক্রান্ত সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় ১৮৩০-এর দশকে। খৃস্টান মিশনারিগণ এ সময়ে তাঁদের পত্রপত্রিকায় এ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার সমালোচনা আরম্ভ করেন।[৭৭] কিন্তু আসল আন্দোলন আরম্ভ হয় সমাজের ভেতর থেকে। যে ইয়ংবেঙ্গলগণ হিন্দুসমাজের প্রায় তাবৎ কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন, তাঁরাই তাঁদের পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে এই নিষ্ঠুর প্রথার প্রতি সমাজবিবেককে জাগ্রত করার প্রয়াস পান। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা জানায় যে, নব্যদের বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রতি প্রাচীনগণ অনুকূল সাড়া দেননি।[৭৮] বরং প্রাচীনগণ সমাচার চন্দ্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকার মাধ্যমে এই যুক্তিকেই বড়ো করে তুলে ধরতে চান যে, কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রাদুর্ভাব পূর্বে ছিলো, কিন্তু ১৮৩০-এর দশকে তা হ্রাস পেয়েছে। জ্ঞানান্বেষণ এর উত্তরে বহুবিবাহকারী কুলীনদের নাম-ঠিকানাসহ একটি তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় প্রত্যেক কুলীনের বিবাহ সংখ্যারও উল্লেখ করা হয়।[৭৯] ইয়ংবেঙ্গলদের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতিতেও (সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ) কুলীনদের বহুবিবাহ সম্পর্কে অনেকবার আলোচনা হয়।[৮০]

৭৪. সংবাদটি প্রথমে প্রকাশিত হয় **India Gazette** পত্রিকায়। পরে ১৯ মে ১৮১৯ তারিখের **Calcutta Journal** পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য: **Selections from Indian Journals**, p. 159.

৭৫. **রামমোহন গ্রন্থাবলি**, পৃ. ২০৬-০৭।

৭৬. A. Mukherjee, p. 340.

৭৭. E.D. Potts, p. 157.

৭৮. দ্রষ্টব্য: **সমাচার দর্পণ**, ২৩ এপ্রিল ১৮৩৬, **সসেক** ২, পৃ. ২৫২।

৭৯. ঐ, পৃ. ২৫২-৫৩।

৮০. See **Awakening in Bengal**. For example Mahesh Chandra Dev's paper—'A Sketch of the Condition of the Hindoo Women,' read at a meeting

বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গলদের এমন একটা দূরত্ব ছিলো যে, তাঁদের এই ১৮৩০-এর দশকের বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিকীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। বহুবিবাহকে অনিষ্টকর জ্ঞান করার জন্যে সমাজমানসের যে মনীষাগত পটভূমির (intellectual background) প্রয়োজন ছিলো, ইয়ংবেঙ্গলগণ সমাজকে তাও দিতে পারেননি।

১৮৪০-এর দশকে বরং বিদ্যাদর্শন, বেঙ্গল সেপক্টেটর, তত্ত্বোধিনী পত্রিকা, সম্বাদ ভাস্কর ও *Calcutta Review* এবং ১৮৫০-এর দশকে সর্বশুভকরী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িকীকে অবলম্বন করে অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী পূর্বোক্ত মনীষাগত ভিত্তিভূমি গড়ে তোলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্গদেশে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মনীষাগত ভিত্তিভূমি গড়ার অন্যতম পথিকৃৎ ও প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত বিদ্যাদর্শন পত্রিকার পাতায় অক্ষয়কুমার সর্বপ্রথম সমাজিক ব্যাধিবিশেষের প্রতি স্বদেশবাসীর সহমর্মিতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে এসব ব্যাধি থেকে সমাজকে বাঁচানোরার জন্যে তিনি পাঠকদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিতে থাকেন।[৮১]

১৮৪৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তত্ত্বোধিনী পত্রিকাকে অবলম্বন করেও অক্ষয়কুমার বছরের পর বছর সমাজ সংশোধনের জন্যে তাঁর প্রযত্ন অব্যাহত রাখেন। ১৮৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত তাঁর বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দুভাগ এবং ধর্মনীতি গ্রন্থে তিনি যুক্তি ও উপযোগিতার মাপে সমাজের রীতিনীতির বিচার-বিশ্লেষণ করেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাদি এবং এই গ্রন্থদ্বয় তৎকালীন সমাজকর্মীদের এক অতুলনীয় মনীষাগত সমর্থন দান করে। তাঁর লেখা পড়ে বহুজন সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনা পাঠ করে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন এবং মদ্যপান একেবারে বর্জন করেন। ব্যায়ামের প্রতি তাঁর আগ্রহও সৃষ্টি হয় অক্ষয়কুমারের প্রভাবে।[৮২]

of the Society for the Acquisition of General Knowledge, held in January 1839, pp. 89-105.

৮১. উদাহরণস্বরূপ বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' (শ্রাবণ ১৭৬৪ শকাব্দ), 'অধিবেদন' (ভাদ্র ১৭৬৪), 'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ' (কার্তিক ১৭৬৪) 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা' (আষাঢ় ১৭৬৪), 'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ' (আশ্বিন ১৭৬৪), 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস' (অগ্রহায়ণ ১৭৬৪) প্রভৃতি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

৮২. দ্রষ্টব্য : রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৩২ ও ৩৩, দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পৃ. ৪১-৪৩।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও তাঁর কয়েক বন্ধু বিদ্যালয়ে পাঠ করার সময় ধর্মনীতি পড়ে সংস্কারের প্রতি উৎসাহী হন।[৮৩] অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্বশুভকরী সভা, বন্ধুবর্গ সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে কেবল তাত্ত্বিকভাবেই নয়, বাস্তবেও এই আন্দোলনের পোষকতা করেন। ১৮৫০-এর দশকের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা করলে অক্ষয়কুমারকে তাত্ত্বিক ও বিদ্যাসাগরকে সংগঠক নেতা বলে অভিহিত করতে হয়। ১৮৪২ থেকে ১৮৫৬ সালে পর্যন্ত পনেরো বছরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর বিবিধ রচনা শিক্ষিতদের মনে বহুবিবাহবিরোধী একটা সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছিলো বললে অতিশয়োক্তি করা হবে না।

১৮৪৪ সালে *Calcutta Review* পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ 'The Kulin Brahmins of Bengal'-ও এ ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলো বলে মনে হয়।[৮৪]

১৮৫৩-৫৪ সালে নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি তাঁর কলিকুতূহল নামক গ্রন্থ প্রকাশ করে কৌলীন্যের বিভিন্ন অনিষ্টকারিতা বিষয়ে সমাজের সচেতনতা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৮৫]

কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা এবং আত্ম-সমীক্ষাই সমাজ-সংস্কারের, বিশেষত ভারতীয় সমাজের অচলায়তনকে নাড়া দেবার জন্যে যথেষ্ট নয়। একথা বিবেচনা করেই বহু-বিবাহ নিবারণের জন্যে একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং আইন প্রণয়নকে কেন্দ্র করে সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়ার আবশ্যকতা ১৮৫০-এর দশকের মাঝামাঝি অনেকেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ ও বিদ্যা-সাগরের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা, দিনাজপুর, নাটোর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণও এ আন্দো-লনের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

বহুবিবাহনিরোধক আইন প্রণয়নের প্রয়াস

বহুবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে প্রথম দাবি জানান অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে।

৮৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৭-৮।

৮৪. কুলীনদের বহুবিবাহের বিরোধিতা করে কৃষ্ণমোহন কমপক্ষে আরো একটি প্রবন্ধ *Calcutta Review* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে।

৮৫. নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি, কলিকুতূহল নামক গ্রন্থ, প. ৫০-৬০।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেন, সরকার যেমন সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের প্রথা নিষিদ্ধ করেছেন, আইনের সাহায্যে তেমনি বহুবিবাহরীতি নিবারণ করা উচিত। প্রসঙ্গত তিনি শাস্ত্রালোচনা করে প্রকৃত কুললক্ষণ এবং বহুবিবাহের অনৌচিত্য সম্পর্কে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।[৮৬]

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করার জন্যে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র স্থাপিত বন্ধুবর্গ সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভার সদস্যবৃন্দ।[৮৭] ১৮৫৫ সালের প্রথম ভাগে এই আবেদনপত্র প্রেরিত হয় বলে অনুমান করি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এ বছরই—২৭ ডিসেম্বর সরকারের কাছে অনুরূপ একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।[৮৮] এরপর ১৮৫৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৭টি আবেদনপত্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারের কাছে পাঠানো হয়।[৮৯] এ সমস্ত আবেদনপত্রে দশ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি স্বাক্ষর দান করেন।[৯০] ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত স্বাক্ষর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পঁচিশ হাজারে।[৯১]

রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন দৃষ্টে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন না। বহুবিবাদ শাস্ত্রসম্মত ব্যাপার এবং তা রহিত হলে কুলীনদের কৌলীন্য খর্ব হবে এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দু ধর্মীয় আচার পালনে বিঘ্নের সৃষ্টি হবে—সুতরাং এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়—এই যুক্তি প্রদর্শন করে রক্ষণশীল শ্রেণী ১৮৫৫ সালের শেষভাগেই সরকারের কাছে একটি পাল্টা আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।[৯২] ১৮৫৬ সালে এঁরা পুনরায় অনুরূপ আর-একটি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভার কাছে প্রেরণ করেন।[৯৩]

বহুবিবাহ নিবারণকারীগণ সরকারকে এই বলে আশ্বাস দেন যে আইন প্রণীত হলে সরকারের প্রতি দেশবাসীর আস্থা কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। অপর পক্ষে, আইনের দ্বারা অত্যন্ত সুচারুভাবে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব

৮৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'অবিবেদন', **বিদ্যাদর্শন**, ভাদ্র ১৭৬৪ শকাব্দ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪২), **সাবাস** ৩, পৃ. ৫৬৮-৭১।

৮৭. মন্মথনাথ ঘোষ, **কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র**, পৃ. ১০৭-০৮; **বহুবিবাহ** বিজ্ঞাপন।

৮৮. **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, পৃ. ২৮১।

৮৯. প্রধান প্রধান কয়েকটি আবেদনপত্রের পরিচয়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ঙ।

৯০. Anti-polygamy tracts, No. 1. (Calcutta, 1856), reprinted **Nineteenth Century Studies**, No. 10 (1975), p. 191.

৯১. 'বহুবিবাহ নিবারণ', **বামাপ**, বৈশাখ ১২৭৩, পৃ. ২৬২।

৯২. **বহুবিবাহ**, 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৩৪৩।

৯৩. 'বহুবিবাহ', **তত্ত্বপ**, ভাদ্র ১৭৭৮ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫৬), পৃ. ৬৬।

হবে। এর ফলে সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহও মোটেই বিচলিত হবে না।[১৪] সরকারও হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বিধবাবিবাহ আইন যুগান্তকারী ব্যাপার হলেও সমাজের সুবৃহৎ অংশই নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তা গ্রহণ করে। এজন্যেই ব্যবস্থাপক সভার কোনো কোনো সদস্য এই বলে আশ্বাস দেন যে, ১৮৫৭ সালের মে মাসের আগেই বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণীত হবে।[১৫] ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য জে.পি. গ্র্যান্ট আন্দোলনকারীদের জানান যে, শীঘ্রই একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করা হবে।[১৬] রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহযোগিতায় গ্র্যান্ট এ সময় একটি খসড়া বিল তৈরিও করেন, কিন্তু ১০ মে তারিখে সিপাহী বিপ্লব শুরু হওয়ায় আইন প্রণয়নের বিষয়টি তখনকার মতো স্থগিত থাকে।

১৮৬৩ খৃস্টাব্দে পুনরায় আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছে একটি আবেদন প্রেরিত হলেও, এবারে আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি। আন্দোলন জোরদার হয় ১৮৬৬ সালে। এ বছর পয়লা ফেব্রুআরি বর্ধমানের মহারাজা, কৃষ্ণনগরের রাজা, প্রধান প্রধান জমিদারগণ, বহু বুদ্ধিজীবী এবং বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মোট ২০,৮৪১জনের স্বাক্ষর সংবলিত একখানি আবেনপত্র বঙ্গদেশের গভর্নর সিসিল বীডনের কাছে প্রেরণ করা হয়। ১৯ মার্চ তারিখে সত্যশরণ ঘোষাল, প্যারীচরণ সরকার, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আবেদনপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে বীডনের নিকট অর্পণ করেন। বীডন বলেন, তিনি অতীতে দুবার বহুবিবাহ নিরোধক আইন রচনার ব্যাপারে উৎসাহ নিয়েছিলেন এবং এবারে যাতে অবশ্যই আইন প্রণীত হয় তার চেষ্টা করবেন।[১৭]

এবারের আবেদনপত্রের পেছনে বঙ্গদেশের প্রায় তাবৎ প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন থাকায় ভারত সরকার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং আইন প্রণয়ন করা যায় কি না সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার জন্যে বঙ্গদেশ সরকারকে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেন। বঙ্গদেশ সরকার সাতজন সদস্যবিশিষ্ট

১৪. **Anti-polygamy tracts, No. 1, Nineteenth Century Studies,** p. 187.

১৫. **সম্বাদ ভাস্কর,** ২৫ নভেম্বর ১৮৫৫, **সাবাস** ৩, পৃ. ৩৩৮-৩৯।

১৬. See **Legislative Deptt. Proceedings, No. 7** (1863) **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৮১।

১৭. 'বহুবিবাহ নিবারণ', **বামাপ,** বৈশাখ ১২৭৩ পৃ. ২৬১-৬২। Also see **Legislative Deptt. Proceedings No. 11** (1866), **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,** পৃ. ২৮৩।

যে কমিটি গঠন করেন,[৯৮] তাঁরা ১৮৬৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে বলেন, কুলীনদের বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। আইন প্রণয়নের প্রসঙ্গে এ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, গভর্নর জেনারেল শর্তসাপেক্ষ আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন তা দিয়ে কার্যকরভাবে বহুবিবাহ নিরোধ করা সম্ভব হবে না। রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করেন যে, বহুবিবাহের প্রকোপ কমে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন বাহুল্য। সত্যশরণ ঘোষাল ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভিন্নমত জ্ঞাপন করে বলেন যে, তখনো বহুবিবাহ ব্যাপকভাবেই সমাজে প্রচলিত ছিলো এবং আইনের সাহায্য ছাড়া তা কার্যকরভাবে নিবারণ করা সম্ভব নয়। বঙ্গদেশ সরকার সত্যশরণ ঘোষাল এবং বিদ্যাসাগরের মতের পোষকতা করেন।[৯৯] কিন্তু ভারত সরকারের উৎসাহের অভাববশত এ আইন প্রণীত হতে পারেনি। এর পরে বহুবিবাহ নিরোধক আইন রচনার জন্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস আর কেউ গ্রহণ করেননি।

আন্দোলনের প্রসার ও সাফল্য

সমস্যা হিসেবে বিধবাবিবাহের সঙ্গে বহুবিবাহের, বিশেষত কুলীনদের বহু-বিবাহের, তুলনা করলে দেখা যাবে, বিধবাবিবাহ ছিলো সমগ্র সমাজের সমস্যা। বহুবিবাহ, বিশেষত কুলীনদের বহুবিবাহ, সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশেরই সমস্যা ছিলো। তা ছাড়া ধারণা হিসেবে এবং শাস্ত্রীয় অনুমোদনের প্রশ্নে বিধবাবিবাহ যেমন আপামর হিন্দুদের চমকে দিতো, সর্বদ্বারী বিবাহ কিংবা একটি মাত্র বিয়ের কথা তেমন চমকে দিতো না। সুতরাং শিক্ষিত-অশিক্ষিত অব্রাহ্মণগণ এবং অকুলীন ব্রাহ্মণগণ কৌলীন্য লোপের কিংবা বহুবিবাহ নিবারণের প্রশ্নে শঙ্কিত হননি। বরং অকুলীন ব্রাহ্মণগণ কৌলীন্য লোপের সম্ভাবনা দৃষ্টে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, অতঃপর তাঁরাও কুলীনদের সমকক্ষ শুদ্ধমাত্র ব্রাহ্মণ বলেই গণ্য হবেন।[১০০]

৯৮. এই কমিটির সদস্য ছিলেন C.P. Hobhouse, H.T. Prinsep, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৯৯. See **Report of the Committee appointed by Govt. to consider the question of legislative interference for preventing the "excessive abuse" of Polygamy as practised by the Kulin Brahmans, dated 7th February, 1867** (Calcutta, 1867).

১০০. 'কস্যচিৎ সাধারণ হিতৈষিণঃ-এর পত্র, **সম্বাদ ভাস্কর**, ১৬ অগস্ট ১৮৫৬, **সাবাস** ৩, পৃ. ৩২১-২২।

তদুপরি নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবর্তিত মানসিকতার অধিকারী বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কিংবা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির মতো কুলীন ব্রাহ্মণগণ নিজেরাও বহুবিবাহ প্রথার অশেষ অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে, বহুবিবাহসংক্রান্ত আন্দোলন বিধবাবিবাহের মতো তীব্র বিরোধিতা এবং ব্যাপক দলাদলির সৃষ্টি করেনি। সম্ভবত সচেতন কুলীনমাত্রই এই প্রথার দোষাবলী সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। কিন্তু দেশাচারকে অমান্য করে তাঁরা অকুলীনের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ করতে সাহসী হতেন না। বাধ্য হয়ে দরিদ্র কুলীন তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতেন বৃদ্ধ কিংবা বহুবিবাহকারী কুলীন পাত্রে। কন্যার বৈধব্য বা বিবাহিত অবস্থাতেই বৈধব্যসদৃশ অবস্থা দেখে অচিরেই কুলীনকন্যার অভিভাবকগণ এ প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতেন, কিন্তু আচারকে অতিক্রম করার শক্তি তাঁদের ছিলো না। আলোচ্য আন্দোলন এই সচেতন কিন্তু দেশাচারের কাছে অবনত কুলীন অভিভাবকদের সম্ভবত সাহস জুগিয়েছিলো।

সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার মতো গোঁড়া হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও ১৮৭১ সালে কৌলীন্যবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করে।[১০১] ঢাকা অঞ্চলে এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাল্য ও কৈশোরে আটটি বিয়ে করেন অথবা অভিভাবকের কথায় করতে বাধ্য হন। অভিভাবক—তাঁর পিতৃব্য—তাঁর উপর বহু ঋণের বোঝা চাপিয়ে যখন তাঁকে একান্নবর্তী সংসার থেকে পৃথক করে দেন, রাসবিহারী তখন সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক। এই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে অতঃপর তিনি নিজেই আরো ছটি বিবাহ করেন।[১০২] কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি বহুবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে নিজের সর্বস্ব পণ করেন।[১০৩] ১৮৬৮ সালে তিনি কৌলীন্য প্রথার দোষ কীর্তন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১০৪]

১০১. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৩৪৫; **সোমপ্রকাশ**, ২০ আষাঢ় ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১), **সাবাস** ৪, পৃ. ২৩৭-৩৯।

১০২. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, **শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত**, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮১), পৃ. ৩। মৃত্যু ১৮৯৮।

১০৩. ঐ, পৃ. ৭। রাসবিহারী এক জমিদারের অধীনে চাকরি করতেন, আন্দোলন আরম্ভ করতে গিয়ে চাকরিটি তাকে ছেড়ে দিতে হয়। রাসবিহারী পুস্তিকা বিতরণ করে, গান রচনা করে এবং বক্তৃতা দিয়ে ঢাকা অঞ্চলে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১০৪. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, **বল্লালী সংশোধনী** (ঢাকা, ১৮৬৮)। মাত্র ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

এ বিষয়ে আরো দুটি পুস্তিকা তিনি রচনা করেন। একটি প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে,[১০৫] অন্যটি ১৮৭৪ সালে।[১০৬] অতি সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে। বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে তাঁর প্রেস থেকে পরিবর্ধিত আকারে এই রচনা দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃস্টাব্দে। তাঁর জীবনী সমাজ সংস্কারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে, এটা মনে করেই বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সহায়তা করেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, কেবল বিদ্যাসাগর নন, গোঁড়া হিন্দুগণও রাসবিহারীকে সমর্থন জানান। ঢাকার উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকাও রাসবিহারীর আন্দোলনের প্রতি যথাসম্ভব সহায়তা দান করে। রাসবিহারীর সংস্কার প্রয়াস এবং তাঁর আন্দোলনের প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের একাংশের সমর্থন—এ থেকেও বোঝা যায় বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রতি বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মনোভাব কেমন ছিল।

আলোচ্য সময়ে কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী অনেকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অজ্ঞাতনামার কুলকালিমা।[১০৭] কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্যপ্রথা সংশোধনী,[১০৮] ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখিনী কুলীন কামিনী[১০৯] শ্রীনাথ সিংহের কুলরহস্যকাব্য[১১০] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আমোদিনী[১১১] প্রভৃতি এগুলির মধ্যে প্রধান। এসমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ থেকে বোঝা যায়, সত্তর দশকে এ আন্দোলন যথেষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং এ আন্দোলন সূচিত হয় সমাজের ভিতর থেকেই। প্রাচীন সমাজের লোকেরা এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় প্রাচীন সমাজের উপর তার যে প্রভাব পড়ে, নব্যপন্থী যুবকদের আন্দোলন হয়তো সে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। বহুবিবাহ আন্দোলনে বহু প্রাচীন সমাজভুক্ত ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই, তবু এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই ছিলো কলকাতা কেন্দ্রিক এলিট শ্রেণীভুক্ত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ, নবীন ব্রহ্ম কিংবা সংস্কৃত কলেজের মতো কোনো প্রতিষ্ঠানের

১০৫. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, **কৌলীন্য সংশোধনী** (দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৮৭১)।

১০৬. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, **কুলীনকীর্তন** (ঢাকা, ১৮৭৪। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৭৭)।

১০৭. **কুলকালিমা** (কলিকাতা, ১৮৭৩), **বঙ্গদর্শন** ও **জ্ঞানাঙ্কুর** পত্রিকায় এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করা হয়।

১০৮. কালিদাস মুখোপাধ্যায়, **কৌলীন্য প্রথাসংশোধনী সভা** (কলিকাতা, ১৮৭১)।

১০৯. ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **দুঃখিনী কুলীন কামিনী** (কলিকাতা, ১৮৭২)।

১১০. শ্রীনাথ সিংহ, **কুলরহস্যকাব্য** (মুরশিদাবাদ, ১৮৭৭)।

১১১. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, **আমোদিনী** (কলিকাতা, ১৮৭৮)।

সঙ্গে যুক্ত। অপর পক্ষে, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো নেতার উদ্ভব হয়েছিলো একেবারে রক্ষণশীল, প্রায় শিক্ষাবর্জিত গ্রাম্যসমাজের অভ্যন্তর থেকে।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর আন্দোলনের আংশিক সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে তিনি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্দোলন করেননি, বরং তার সীমার মধ্যে অবস্থান করেই সমাজবিবেককে জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

> যৎকালে আমি সামাজিক প্রাচীন শ্রেণীস্থ লোকদিগের নিকট প্রথম উপস্থিত হইতাম, তৎকালে অনেকেই আমাকে নব্য সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করিতেন; কিন্তু আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং মনের ভাব জানিয়া ক্রমেই লোক সমাজ, আমার মতের অনুমোদন করিতে লাগিল।[১১২]

অমৃতবাজার পত্রিকা এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

> রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভঙ্গকুলীন এই আন্দোলনের নেতা।... তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক এবং ইংরেজী জানেন না। সুতরাং এই আন্দোলনটি কোন হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসী ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত তাহা আর হইবে না।[১১৩]

প্রকৃত পক্ষে, প্রাচীন সমাজের ভিতরে থেকে সে সমাজকে সংশোধন করার চেষ্টা করায় রাসবিহারীর আন্দোলন কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করে। তাঁর আন্দোলনের ফলে কৌলীন্যের একটি প্রধান আবাস বিক্রমপুরে বহুবিবাহবিরোধী এবং মেলবিরোধী একটি সচেতনতা ধীরে ধীরে দানা বাঁধে।[১১৪]

১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কুলীনদের বিবাহ সংস্কার করার চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টান্ত তাঁর কন্যার বিবাহ। তিনি কুলীনদের বিয়ের পর্যায়[১১৫] ভঙ্গ করে পাঁচ পুরুষে এক ভঙ্গকুলীনের পুত্রের কাছে নিজের কন্যার বিবাহ দেন। দুবছর পরে ১৮৭৫ সালের অগস্ট মাসে তিনি এর চেয়েও বলিষ্ঠ একটি কর্ম সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেন। এসময়ে তিনি তাঁর একটি কন্যা ও একটি পুত্রকে ভিন্ন মেলভুক্ত একটি পাত্র ও পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন।[১১৬] এইরূপ পালটা মেল বর্জন করে বিবাহসম্বন্ধ করা

১১২. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ১১।

১১৩. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২০ সংখ্যক, ১২৮৩ (১৮৭৬), পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.৯০।

১১৪. ঐ. যত্রতত্র, বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য পৃ. ৩২-৩৮, ৫৯-৬০, ১০৮-০৯।

১১৫. নিয়ম ছিলো কুলীনদের বিয়ে হবে পালটা মেলের একই প্রজন্মের (পঞ্চ ব্রাহ্মণ থেকে পুরুষ সংখ্যা) পাত্রপাত্রীর মধ্যে—বয়সটা সে ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিলো না। রাসবিহারী এই প্রজন্মের পর্যায় ভঙ্গ করেন।

১১৬. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ৩৮, ১১০।

সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে যে কী গুরুতররূপে দেশাচারবিরোধী কাজ ছিলো এবং মেলভঙ্গ করে রাসবিহারী যে কতো বড়ো সাহসের পরিচয় দান করেন ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২৪ সংখ্যক (১৮৭৭) ঢাকা প্রকাশ এবং *The East* III,1877 পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন থেকে তা বোঝা যায়।[১১৭] কিন্তু রাসবিহারীর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে অল্প দিনের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে এরূপ আরো অনেকগুলি সর্বদ্বারী বা আন্তঃমেল বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।[১১৮]

তবে এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, কুলীন বহুবিবাহের কোনো সমর্থক ছিলেন না। স্বয়ং বহুবিবাহকারী ভঙ্গকুলীন রাসবিহারী বলেছেন, কুলীনদের চোদ্দ আনা ভঙ্গকুলীন এবং বহুবিবাহই এঁদের ব্যবসা।[১১৯] আসলে অনেকগুলি বিয়ে করার অধিকার তাঁদের জন্মগত এবং জীবিকা উপার্জনের জন্যে তাঁদের অন্য কোনো প্রকার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই—কুলীনদের প্রধান ভাগই এরূপ মনে করতেন। সুতরাং তাঁদের নিশ্চিত উপার্জনের ক্ষেত্রে বাধা উপস্থিত হতে দেখে, কুলীনসমাজ তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করেন।[১২১] তারানাথ বাচস্পতি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বিধবাবিবাহের মতো প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় সমর্থন দান করেন এবং ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণীত হলে কুলীনদের বংশানুক্রমিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিদাদির অবসান ঘটবে, তখন আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা কুলীনদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে বাচস্পতি তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করেন।[১২২]

বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা উদাসীন বহু কুলীনের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মনোভাবের অনৈক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনোমোহন বসু[১২৩]

১১৭. ঐ, পৃ. ১১১-২১।

১১৮. ঐ, পৃ. ১৩০-১৩৪। এরূপ বিবাহের সংখ্যা, এক বছরের মধ্যে ৪২-এ পৌঁছে।

১১৯. 'প্রেরিত পত্র', **হিন্দুহিতৈষিণী** পত্রিকা. ৩৩ সংখ্যা ১২৮০ (১৮৭৩), পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩।

১২০. পত্র, **বিদ্যাদর্শন**, ভাদ্র ১৭৬৪ শকাব্দ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪২), **সাবাস ৩**, পৃ. ৫৬৭-৬৮। এ সম্পর্কে রাসবিহারীর অভিজ্ঞতার জন্যে দ্রষ্টব্য **জীবনবৃত্তান্ত**, পৃ. ২৪।

১২১. **রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত**, পৃ. ৮-২৬। রাসবিহারীকে সমাজচ্যুত করার, এমন কি হত্যা করার চেষ্টাও করা হয়। ঐ, পৃ. ৮-৯, ২৩।

১২২. **বহুবিবাহ**, দ্বিতীয় পুস্তক, (১৮৭৩), পৃ. ৫-৬।

১২৩. মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) প্রধান পরিচয় সাহিত্যিক-সাংবাদিক হিশেবে। তাঁর প্রকাশনাসমূহের মধ্যে **রামাভিষেক নাটক** (১৮৬৭), **প্রণয় পরীক্ষা নাটক** (১৮৬৯), **সতী**

জাতীয়তাবাদী হিন্দুসমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। ব্রাহ্মণদের সংস্কার প্রয়াস এবং সরকারের হস্তক্ষেপ উভয়ই তাঁর অননুমোদিত ছিলো। কিন্তু সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা এবং জাতীয় সভার[১২৪] সক্রিয় সদস্য হিশেবে তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রীতিমতো সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।[১২৫] জাতীয় সভায় বহুবিবাহ সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বহুবিবাহের 'অসীম দোষের কথা স্বার্থপরায়ণ অনকতক লোক ব্যতীত দেশের প্রায় আর-সকলেরই মনে বিশেষরূপে প্রতীত' হয়েছে।[১২৬]

প্রকৃত পক্ষে বহুবিবাহবিরোধী যে সচেতনতার উদ্রেক হয় তার ফলে সমাজ কেবল নব্য ও প্রাচীন এই দুভাগে বিভক্ত হয়নি, মাত্রা ভেদে প্রাচীন সমাজও ব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ, কুলীন ব্রাহ্মণ—অকুলীন ব্রাহ্মণ, নৈকষ্যকুলীন—ভঙ্গকুলীন ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়।

আলোচ্য প্রশ্নে পরিবারের মধ্যেও ফাটল দেখা দেয়। নতুন এক সচেতনতা এবং পরিবর্তিত মূল্যবোধ বৃদ্ধ এবং তরুণদের মধ্যে প্রজন্মগত ব্যবধানের সৃষ্টি করে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সব চেয়ে বড়ো শত্রুতে পরিণত হন তাঁরই বংশীয় আত্মীয়-বৃন্দ।[১২৭] দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির পরিবারের অনেক সদস্যই ছিলেন বহুবিবাহকারী কিন্তু দ্বারকানাথ এক স্ত্রী বর্তমান থাকা কালে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবেন না বলে

নাটক (১৮৭৩), হরিশচন্দ্র নাটক (১৮৭৫) নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫), পার্থ পরাজয় নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০), বক্তৃতামালা (১৮৭৩) এবং হিন্দু আচার ব্যবহার (১৮৭৩) প্রধান। ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মধ্যস্থ নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। এ পত্রিকাটি সেকালের তুলনায় যথেষ্ট আধুনিক ছিলো।

১২৪. ১৮৬৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে স্থাপিত হিন্দু মেলা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়েই মিলিত হয়ে জাতীয় ভাবধারার পোষকতা করার চেষ্টা করতো। এই প্রয়াসকে সারা বছরব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ১৮৬৯ সালে জাতীয় সভার জন্ম হয়। এই সভায় একদিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অন্যদিকে আদি ব্রাহ্ম সমাজ জাতীয়তার প্রশ্নে মিলিত হয় এবং সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ একদিকে, অন্যদিকে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দুনেতা জাতীয়তার নামে এই সভায় মিলিত হন।

১২৫. বক্তৃতাদি ছাড়াও তিনি বহুবিবাহের দোষ প্রকটিত করে একটি নাটক রচনা করেন।

১২৬. মনোমোহন বসু, হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথমভাগ (কলিকাতা, ১৮৭৩), পৃ. ৩৫। গ্রন্থটি রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রকে উৎসর্গীকৃত।

১২৭. রাজবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ১৭-২৫।

প্রতিজ্ঞা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন।[১২৮] শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারে যথার্থভাবে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিলো না, তবে অবস্থাভেদে দুটি বিয়ে করতে কেউ আপত্তি করেননি, কিন্তু নতুন কালের মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিবনাথ পিতার আদেশে দুটি বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি পিতার ভয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু এই বিবাহই শিবনাথের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে ছিন্ন করে দেয়। এই বিবাহের ফলে তাঁর মন যে কি দারুণ-ভাবে উত্তেজিত এবং ব্যাকুল হয় আত্মজীবনীতে শিবনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন।[১২৯]

সচেতনতার এরূপ বিকাশের ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক ইনস্টিটিউশন হিশেবে বহু-বিবাহ, বিশেষত কুলীনদের বহুবিবাহ, দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সচেতনতার উন্মেষ ও বিকাশের পেছনে পাশ্চাত্য শিক্ষার একটা বড়ো ভূমিকা ছিলো, একথা অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজকর্মীগণ পাশ্চাত্য জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের জীবনধারার তুলনা করে অসঙ্গত বিষয়গুলি যুক্তি ও মানবতার আলোকে সংস্কৃত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, শিক্ষা বিস্তারের ফলস্বরূপ আচার-ব্যবহার পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এজন্যেই তিনি সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। তবে ১৮৭১ সালে বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা লেখার সময়ই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইংরেজি বিদ্যার চর্চার ফলে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুবিবাহ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিলো।[১৩০] ১৮৭১ খৃস্টাব্দে প্রস্তাবিত ব্রাহ্মবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজ যে সব বক্তব্য পেশ করে তার মধ্যে একটিতে বলা হয় যে, শিক্ষাগুণে বহুবিবাহ এমনিতেই নিবারিত হচ্ছে।[১৩১] ১৮৭৫ সালে সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়। এতে বলা হয়, বিদ্যার আদর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 'কৌলীন্যের বল ক্ষীণ হইয়াছে, বহুবিবাহ প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে'।[১৩২] বামা-বোধিনী পত্রিকায় কয়েক বছর পরে বলা হয়, 'বিদ্যা ও সভ্যতার আলোক যেখানে বিকীর্ণ হইতেছে, বহুবিবাহ চোরের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে'।[১৩৩] সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সদস্যপদ ত্যাগ করার সময় তারানাথ বাচস্পতিও দাবি

১২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়**, পৃ. ৭-৮।

১২৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৬৮-৭০, ৭৪।

১৩০. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৪১৪।

১৩১. Quoted in 'The Civil Marriage Bill', **তত্ত্ব**, জৈষ্ঠ ১৭৯৪ (মে-জুন ১৮৭২), পৃ. ৪১।

১৩২. (হরনাথ ভঞ্জ), **সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়**, ২খণ্ড, অলোক রায় (সম্পাদক) পুন-র্মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৯৭৬), পৃ. ১৪। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫-৭৭।

১৩৩. **বামাপ**, বৈশাখ ১২৮৮, পৃ. ৪।

করেন যে, বহুবিবাহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমনিতেই হ্রাস পাবে, সরকারের হস্তক্ষেপ এ ব্যাপারে অনাবশ্যক।[১৩৪] মোট কথা, সত্তর দশকে অনেকেই দাবি করেছেন যে, বহুবিবাহবিরোধী এক সচেতনতা সমাজে ক্রমশ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুলীন ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট ঐতিহ্যিক ছিলেন। তিনি এ সময়ে বহুবিবাহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা থেকেই আলোচ্য সচেতনতার গভীরতা অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ স্ত্রীর জীবদ্দশায় কেন মারা যাওয়ার পরেও অগৌরবের বস্তু।[১৩৫] দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর মতে, বিপত্নীকের পুনর্বিবাহও বহুবিবাহেরই নামান্তর এবং অনুকরণের অযোগ্য বিষয়।[১৩৬]

কেবল আদর্শগত এই সচেতনতাই নয়, কুলীনকন্যা এবং তাঁদের অভিভাবকগণ কুলীনস্ত্রীর অধিকার বিষয়েও ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৮৭০ সাল নাগাদ কৃষ্ণমণি নামক এক কুলীন স্ত্রী খোরপোষের দাবিতে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। বিচারে তিনি স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে ১৫ টাকা ডিক্রি পান। কিন্তু দারিদ্র্যহেতু এ অর্থ দিতে না পারায় লক্ষ্মীনারায়ণকে জেলে যেতে হয়।[১৩৭] এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাঁচ বছরের মধ্যে কুলীন স্ত্রী হৈমবতী দেবী স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা করে কলকাতা হাইকোর্টের কাছ থেকে মাসিক দশ টাকা ডিক্রি পান।[১৩৮] আরো কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায় এ জাতীয় মামলায় উৎসাহ দেওয়ার জন্যে ঘোষণা করেন যে, কোনো কুলীনস্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা আনলে, সংশ্লিষ্ট কুলীনস্ত্রীকে তিনি দুশো টাকা পুরস্কার দেবেন।[১৩৯]

১৩৪. 'বহুবিবাহ প্রসঙ্গে শ্রীতারানাথ বাচস্পতির চিঠি'; **সোমপ্রকাশ**, ১১ ভাদ্র ১৩৭৮, **সাবাস** ৪, পৃ. ২৪৯-৫০।

১৩৫. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ' ও 'বহুবিবাহ', **পারিবারিক প্রবন্ধ**, (পঞ্চম সংস্করণ, হুগলী, ১৩০৬), পৃ. ১২৪-২৬, ১২৭-২৯।

১৩৬. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'স্বামী ও স্ত্রী,' **নব্যভারত**, আশ্বিন ১২৯৩, পৃ. ২৫৮।

১৩৭. 'সংবাদসার', **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭৭, পৃ. ১১১। লক্ষ্মীনারায়ণের আরো পাঁচটি স্ত্রী ছিলো।

১৩৮. 'সংবাদসার', **বঙ্গমহিলা**, আশ্বিন ১২৮৩, পৃ. ১২০।

কুলীনস্ত্রীর মামলা করে অর্থপ্রাপ্তির আর-একটি ঘটনা ললিত মোহিনীর। তিনি ধনী স্বামীর বিরুদ্ধে বহু টাকার ডিক্রি পান। ১৮৯০ সালে তিনি মারা যান। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, গ্রন্থ রচনার জন্যে তিনি ৩০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন।—দ্রষ্টব্য 'ললিতমোহিনী দেবী' **বামাপ**, পৌষ ১২৯৮, পৃ. ২৮৫।

১৩৯. **বামাপ**, পৌষ ১২৭৭, পৃ. ২৭২।

কেবল খোরপোষের মামলাই নয়, কুলীন কুমারী ভাবী দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়েছে এমন ঘটনাও আলোচ্য সময়ে ঘটেছে। বিক্রমপুরের শিক্ষিতা যুবতী বিধুমুখীর বিবাহ স্থির হয় বারো-তেরোটি বিয়ে করেছেন এমন একজন কুলীনের সঙ্গে। বিধুমুখী মাতুলদের সহায়তায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পান। এতে তাঁর পিতৃব্য আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। বিধুমুখী আদালতে স্বীকার করেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে বিধুমুখী এরূপ বিবাহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আদালতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।[১৪০] মামলায় শেষ পর্যন্ত বিধুমুখী জয়লাভ করেন।[১৪১] এই জয় তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন করে। দুর্গামোহন দাসের আশ্রয়ে থেকে তিনি লেখাপড়া শেখেন এবং সাড়ে তিন বছর পরে এম. এ. পাশ করা এক যুবক—রজনীনাথ রায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মমতে তাঁর বিয়ে হয়।[১৪২] রজনীনাথ পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Comptroller of Accounts নিযুক্ত হন।

এই ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, বিশেষত আইনের শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিবাহকারী কুলীনগণ আগের চেয়ে সতর্ক হন এবং ভয় পান—এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। এ ছাড়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি, চাকুরিক্ষেত্রে অধিকতর প্রতিযোগিতা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংকট দানা বাঁধে—তার ফলস্বরূপ কুলীনস্ত্রীরা তাঁদের পিতা-মাতা, ভ্রাতা অথবা মাতুলের পরিবারে ক্রমশ বোঝা হিশেবে গণ্য হতে থাকেন। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে যৌথ পরিবারের ভিত্তিমূল এ সময়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ায় কুলীন অভিভাবকগণ অতঃপর ভরণপোষণে সম্মত পাত্রদের হাতে আপনাদের কন্যাকে সম্প্রদান করার সংকল্প গ্রহণ করেন।[১৪৩]

মোট কথা, আইন প্রণীত না হলেও কুলীনদের বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন ১৮৭০-এর দশকে আরম্ভ হওয়ার আগেই সমাজে তার ছাপ ফেলতে সমর্থ হয়, এমন সাক্ষ্য সমকালীন রচনা থেকে পাওয়া যায়। কৌলীন্যের ক্রমবর্ধমান অনাদর দৃষ্টে প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে মন্তব্য করেন,

> কুলীনেরা একণে ক্রমশঃ মর্যাদাশূন্য হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা এখন আর ধর্মের ষাঁড়ের ন্যায় বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জিতধনে সুখী হইবার আশা করিতে পারেন না, নবগুণবিশিষ্ট পূর্বপুরুষদিগের দোহাই দিয়া বিদ্যাশূন্য বেলেল্লা বংশধরদিগের

১৪০. **বামাপ,** কার্তিক ১২৭৭, পৃ. ২১১।
১৪১. **বামাপ,** মাঘ ১২৭৭, পৃ. ৩১৩।
১৪২. **বামাপ,** বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ৩৯।
১৪৩. P. Sinha, **Nineteenth Century Bengal,** p. 78.

আর চলে না। তাঁহারা সাধারণের পরিহাসের পাত্র হইয়া পড়িতেছেন।[১৪৪]

১৮৭১ সালে হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, সে বছরের মাঝামাঝি পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ কৌলীন্যের নিয়ম ভঙ্গ করে কন্যাদের বিয়ে দেবেন বলে পত্রিকায় বিবৃতি দান করেন।[১৪৫] ১৮৭২ সালে প্রকাশিত আর-একটি সংবাদে বলা হয়, পূর্ববর্তী এক বছরের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের বহু কুলীনই কৃতদারপাত্রে কন্যাদান করেননি, বরং তাকে লজ্জাকর কর্ম বলে পরিগণিত করেছেন। এমন কি কুলীনদের মুখে এ রকমের উক্তিও শোনা গেছে যে, তাঁরা কুলীন বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন।[১৪৬] এর পাঁচ বছরের মধ্যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বহু কুলীন ও ভঙ্গকুলীন মেল এবং পর্যায় ভঙ্গ করে নিজেদের পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে শুরু করেন।[১৪৭] এ সব ঘটনা থেকে কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী সচেতনতার বিকাশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশ্য এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, ১৮৭০-এর দশকে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সমস্যার সমাধান হয়। বাস্তবে দেখতে পাই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাজের একাংশকে রীতিমতো পিষ্ট করে।[১৪৮] শতাব্দীর শেষ দিকে কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিষয়ক যে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়, তা থেকেও এ সমস্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলা উপন্যাসে এ সমস্যার প্রথম প্রকাশ হয় নাটকে কৌলীন্যবিরোধী আন্দোলনে ভাঁটা লাগার অনেক পরে। রমেশচন্দ্র দত্ত,[১৪৯] নগেন্দ্রনাথ বসু,[১৫০]

১৪৪. প্যারীচরণ সরকার, 'বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা', **হিতসাধক**, শ্রাবণ ১২৭৫, পৃ. ১৪৬।

১৪৫. 'সংবাদসার', **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ৯৮।

১৪৬. **মধ্যস্থ**, ১৭ বৈশাখ ১২৭৯, পৃ. ৪৬।

১৪৭. **রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত**, পৃ. ১২৭-২৮, ১৩৬-৩৮, ১৪০-৪২।

১৪৮. ১৮৯১ সালের প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বামাবোধিনী পত্রিকা মন্তব্য করে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে কুলীন বহুবিবাহের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেলেও, লুপ্ত হয়নি।—'পীড়া আছে, নিঃশেষ হয় নাই।' —'ললিতমোহিনী দেবী', **বামাপ**, পৌষ, ১২৯৮ (ডিসেম্বর ১৮৯১-জানুআরি ১৮৯২), পৃ. ২৮৪।

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, অল্পকাল আগে বরিশালের কলসকাটী গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক ১০৭টি বিয়ে করেছিলেন। বর্ধমানের ভাটকুল গ্রামের কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় তখনো ৬৫টা স্ত্রী নিয়ে জীবিত। ২০ বৎসর বয়স্ক দুটি ব্রাহ্মণ যুবক ১১ ও ৭টা বিয়ে করেছেন। **বামাপ**, পৌষ ১৩০১, পৃ. ২৮৬।

১৪৯. তাঁর **সংসার** (কলিকাতা, ১৮৮৬) এবং **সমাজ** (১৮৯৪) উভয় উপন্যাসেই এ সমস্যার চিত্র আছে।

১৫০. **একটি চিত্র** (কলিকাতা, ১৮৮৬)।

কুসুমকুমারী দেবী,[১৫১] দীনেশচরণ বসু,[১৫২] সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য[১৫৩] প্রমুখ ঔপন্যাসিক শতাব্দীর শেষ দু দশকে কয়েকটি উপন্যাসে এ সমস্যার চিত্র অঙ্কন করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কৌলীন্যবিরোধী একাধিক পুরোনো নাটক পুনর্মুদ্রিত হয়,[১৫৪] এটাও কম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বিকাশের ফলে কুলীনগণ ধীরে ধীরে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের এবং উপার্জনের পথ খুঁজে পান। ফলে তাঁদের প্রধান অংশই বহুবিবাহরূপ ব্যবসা পরিত্যাগ করেন, এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কিছু পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কৌলীন্য-অভিমান একটি সামাজিক মনোভাব এবং একটি অর্থনৈতিক উপায় হিশেবে বিদ্যমান ছিলো। এর চূড়ান্ত সংস্কারের জন্যে যুগান্তরের আবশ্যক ছিলো।

১৫১. **স্নেহলতা** (কলিকাতা, ১৮৯০)।

১৫২. **নিরাশপ্রণয়** (কলিকাতা, ১৮৮৮-৮৯)। ভূমিকায় লেখক স্পষ্টত বলেন, কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। দ্রষ্টব্য 'বিজ্ঞাপন'।

১৫৩. **কুলীনকুমারী নির্মলা** (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০০)।

১৫৪. **কুলীনকুলসর্বস্ব** (১৯১১) ও **কুলীনকন্যা বা কমলিনী** (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯১২)।

বাংলা নাট্যরচনায় কৌলিন্য ও বহুবিবাহ-বিষয়ক সচেতনতার প্রতিফলন

আমরা দেখেছি, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মধ্যাহ্নে—আইন প্রণীত হওয়ার পরে-সে বিষয়ে কয়েকটি নাটক রচিত হয়। এবং এ ঘটনার কারণও বোধগম্য। কিন্তু কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী সচেতনতা যথেষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের প্রকাশ কিছুটা অকালীয় বলে মনে হয়। আসলে এ ব্যাপারে একজন গ্রাম্য জমিদারের সচেতনতা ও উৎসাহ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। ১৮৫৩ সালে রংপুরের কুণ্ডী গ্রামের জমিদার কালীচরণ চৌধুরী সম্বাদ ভাস্করসহ অন্যান্য পত্রিকায় এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, কৌলীন্য প্রথাহেতু কুলীন কামিনীগণের যে দুর্দশা ঘটেছে, সে বিষয়ে **কুলীনকুলসর্বস্ব** নামে একখানি নাটক রচনা করে, রচয়িতাদের মধ্যে যিনি সর্বোৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনি তাঁকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবেন।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তীব্র সামাজিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসেবে এ নাটক রচিত হয়নি। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা এবং নাটকের নাম উভয়ই রামনারায়ণ পেয়েছিলেন বাইরে থেকে।

কিন্তু কৌলিন্য ও বহুবিবাহ সম্পর্কে রামনারায়ণ তর্করত্নের অভিজ্ঞতা ছিলো অন্তরঙ্গ[২] এবং সমাজের অসঙ্গতি কৌতুকালোকে উদ্ভাসিত করে দর্শন করার শক্তি ছিলো তাঁর অমিত। এ জন্যেই রঙ্গব্যঙ্গের ভিয়াণে চড়িয়ে রামনারায়ণ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেন, পরবর্তী কয়েক দশক তা বহু নাট্যকারের কাছে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে। বস্তুত বাংলা প্রহসন-সাহিত্যে রাম-নারায়ণ পথিকৃৎ এবং অন্যতম প্রধান শিল্পী। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক জনচিত্তকে এতো আকৃষ্ট করে যে, এর ফলে বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন রীতিমতো একটা বড়ো প্রেরণা লাভ করে। এ নাটক প্রকাশিত হওয়ার দু-তিন বছরের মধ্যে এ আন্দোলন নগরের সীমা কিংবা এলিট-ইনটেলিজেন্টশিয়ার গণ্ডী ছাড়িয়ে মফস্বলে

১. রামনারায়ণ তর্করত্ন, **কুলীনকুলসর্বস্ব**, বিজ্ঞাপন, পৃ. ১।

২. রামনারায়ণ নিজেও কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তিনি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বৈদিক ছিলেন। বৈদিকদের মধ্যে বহুবিবাহ তেমন স্ফূর্তি লাভ করেনি। একারণেই তিনি হয়তো নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সমস্যাটি দেখতে পেরেছিলেন।

এবং সাধারণ মানুষদের ভিতরও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, ১৮৫০-এর দশকের শেষ দু-তিন বছর থেকে আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে অধিক সংখ্যক নাটক রচিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

যে সকল বাংলা নাটক-প্রহসনে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সমস্যা আলোচিত হয়েছে,[৩] প্রকাশের সময় ও সংখ্যাভিত্তিক সেগুলির একটি রেখাচিত্র অঙ্কিত হলে বর্তমান আন্দোলনের উত্থান-পতন সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে।

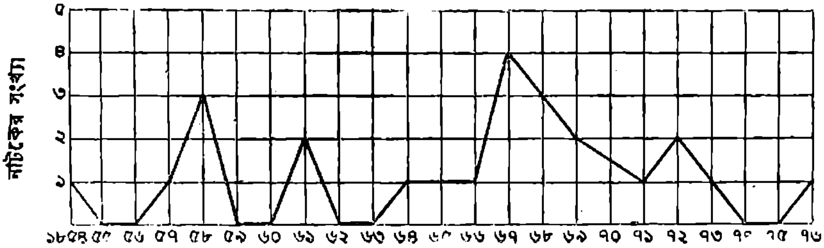

কৌলিন্য ও বহুবিবাহবিষয়ক নাটকের প্রকাশকাল ও সংখ্যা

উপরের রেখাচিত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৮৫৫-৫৭ ও ১৮৬৬-৬৭ সালে যে দুবার বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের চেষ্টা সবচেয়ে জোরদার হয় এবং ১৮৭১-৭২ সালে যখন সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, প্রধানত তখনই আলোচ্য নাটকগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়, কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবই এ সব নাটক রচনার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা। অপর পক্ষে, এ সব নাট্যরচনা বর্তমান আন্দোলনে প্রেরণা দেয় এ কথাও বোধ হয় বলা যায়।

প্রকৃত পক্ষে, এ সব নাটক-প্রহসনে এমন একটি জীবন্ত সমস্যা আলোচিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাট্যকারদের আন্তরিকতা এমন আত্যন্তিক ছিলো যে, নাটকের

৩. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, **চপলাচিত্তচাপল্য**, **সপত্নী নাটক**, নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির **কলি-কৌতুক নাটক** (১৮৫৮), **বিধবা সুখের দশা**, অম্বিকাচরণ বসুর **কুলীনকায়স্থ নাটক** (১৮৬১), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের **কাদম্বিনী নাটক** (১৮৬১), **নবীনবিরহিনী নাটক** (১৮৬৪), পার্বতী-চরণ সিংহের **তরঙ্গমোহিনী নাটক** (১৮৬৫), **নবনাটক**, দীনবন্ধু মিত্রের **লীলাবতী** (১৮৬৭), **সম্বন্ধ সমাধি নাটক** (১৮৬৭), **বল্লালি খাত নাটক** (১৮৬৭), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের **দুই সতীনের ঝগড়া** (১৮৬৭), বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের **বরের কাশীযাত্রা** (১৮৬৮), হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের **বঙ্গকামিনী নাটক** (১৮৬৮), **হিন্দু মহিলা নাটক**, মনোমোহন বসুর **প্রণয়**

পাঠকগণ এবং অভিনীত নাটকের দর্শকগণ সাধারণত মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। এসব নাটকের বিক্রয় এবং অভিনয় উভয়ই এগুলির জনপ্রিয়তার পরিমাপক হতে পারে। প্রকাশিত হওয়ার ছ বছরের মধ্যে কুলীনকুলসর্বস্ব তৃতীয় বার মুদ্রিত হয় এবং সেকালের নাটকের পক্ষে যা একান্ত দুর্লভ ভাগ্য—এ নাটক যথাসময়ে অভিনীত হয়। অভিনয়ের দিক দিয়ে কুলীনকুলসর্বস্ব দ্বিতীয় বাংলা নাটক।[৪] এই অভিনয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই অভিনয়ের সূত্র ধরেই বস্তুত নব্যবঙ্গে যথার্থভাবে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পনেরো বছরের মধ্যে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়।[৫] জনপ্রিয়তাহেতু **কুলীনকুলসর্বস্ব** অল্পদিনের মধ্যে কলকাতায় আরও দুবার এবং চুঁচুড়ায় একবার অভিনীত হয়।[৬] এসব অভিনয় দর্শকদের মনে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিলো সমকালীন ব্যক্তিদের রচনায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সংবাদ প্রভাকর এর অভিনয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করে যে, এর সৌন্দর্য লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।[৭] এ সব অভিনয়ে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় এবং তাঁরা প্রচুর আনন্দ লাভ করেন, তাও প্রভাকরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।[৮] এই নাটকের নটীর গান—'অধিনীকে গুণমণি পরেছে কি মনে হে'—দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং হাটে বাজারে গীত হতে থাকে বলে অক্ষয়চন্দ্র সরকার উল্লেখ করেছেন।[৯] অপর পক্ষে, যে কুলীনদের 'দোষোদ্ঘোষণ' এই নাটকের উদ্দেশ্য[১০] তাঁরা এর অভিনয়কে স্বাগত জানাননি, বরং রামনারায়ণের উপর মারমুখী হন এবং কোনো কোনো স্থানে এঁদের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত এ নাটকের

পরীক্ষা (১৮৬৯), রামনারায়ণ তর্করত্নের **উভয় সঙ্কট** (১৮৬৯), মহেশচন্দ্র দাসের **কুলপ্রদীপ নাটক,** দীনবন্ধু মিত্রের **জামাই বারিক** (১৮৭২), **অবুড়া যুবতী** (১৮৭২), দয়াল চট্টোপাধ্যায় **সুশীলা সরলা সুন্দরী নাটক** (১৮৭৩), এবং **সন্তাপিনী** (১৮৭৬)।

৪. ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে **কুলীনকুলসর্বস্ব** অভিনীত হয়। তার আগে জানুআরি মাসের শেষে **শকুন্তলার** অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,** পৃ. ৩৪, ৩৯। Also see P. Guha-Thakurta, **The Bengali Drama** (London, 1930), pp.51, 69.

৫. পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২।

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,** পৃ. ৩১-৩৩।

৭. **সংবাদ প্রভাকর,** ২৫ মার্চ ১৮৫৮, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৩১।

৮. **সংবাদ প্রভাকর,** ৯ জুলাই ১৮৫৮, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩২-৩৩।

৯. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'পিতা-পুত্র,' পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩।

১০. **কুলীনকুলসর্বস্ব,** বিজ্ঞাপন, পৃ. ২।

অভিনয় হতে পারে নি।[১১] কিন্তু তবু এ নাটকের অনেকগুলি সংস্করণ এবং অভিনয়ের জনপ্রিয়তা কৌলীন্যবিরোধী আন্দোলনের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে।

দীনবন্ধু মিত্রের **লীলাবতী** নাটকের অভিনয় পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেকার তাবৎ অভিনয়ের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট অভিনয় বলে জানা যায়।[১২] ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত এর প্রথম অভিনয় দৃষ্টে দর্শকগণ বালকের মতো কাঁদতে থাকেন এবং ভাটপাড়ার ভট্টাচার্যগণ অভিনয় শেষে নাট্যকার ও অভিনেতাদের মহানন্দে আশির্বাদ করতে থাকেন।[১৩] পরবর্তী মে-জুন মাসের কলকাতায় এর যে অভিনয় হয়, দর্শকগণ সেগুলির দ্বারা খুবই আকৃষ্ট হন। শ্যামবাজারে অনুষ্ঠিত **লীলাবতীর** কয়েকটি অভিনয়ে অভূতপূর্ব দর্শক সমাগম দেখেই জনৈক দর্শক **এডুকেশন** গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বলেন, কলকাতায় একটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়া উচিত।[১৪] আর শেষ পর্যন্ত আলোচ্য অভিনয়ের অভিনেতৃগণই ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করেন।[১৫] **লীলাবতীর** জনপ্রিয়তার পশ্চাতে লীলাবতী-ললিতের আকর্ষণীয় প্রেমই নিশ্চয় সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিলো। কিন্তু লীলাবতীর সঙ্গে ললিতের প্রেমের একমাত্র বাধা ছিলো ললিতের অকুলীন পারিবারিক পটভূমি, এবং নিতান্ত অসভ্য নদেরচাঁদের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার পারিবারিক কৌলীন্যের জন্যে। গুণবান-রূপবান ললিতের সঙ্গে মনুষ্যগুণবর্জিত কদাকার নদেরচাঁদের পার্থক্য এবং কৌলীন্যের আস্ফালন এবং সমাদর সম্পর্কে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে নাট্যকার যে সংলাপ, কোথাও কোথাও বক্তৃতা, জুড়ে দিয়েছেন, আসলে তা জনচিত্তকে অংশত কৌলীন্যবিরোধী না করে পারেনি। **লীলাবতীর** জনপ্রিয়তা এই প্রতিকূল মনোভাবেরই পরিচয় দেয়।

কিন্তু ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি যখন কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে একটি সচেতনতা নাগরিক শিক্ষিত সমাজে জেগে ওঠে এবং আন্দোলনের অনুকূল ফল

১১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, **বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস** (তৃতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৭৮), পৃ. ৪৪৬। Also see H.N. Das Gupta, **The Indian Stage**, Vol. II (Calcutta, 1938), p.34.

১২. **অমৃতবাজার পত্রিকা**, ৪ এপ্রিল ১৮৭২, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৬৬, P. Guha-Thakurta, p. 103.

১৩. অক্ষয়কুমার সরকার, 'পিতা-পুত্র', **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৬৭।

১৪. 'কশ্চিৎ দর্শকঃ'-এর পত্র, **এডুকেশন গেজেট**, ২৪ মে ১৮৭২, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৭৮। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের ধারণা এই প্রথম বার প্রকাশিত হয়নি। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের অগস্ট সংখ্যা **নবপ্রবন্ধ** পত্রিকায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃ. ৮২।

১৫. ঐ, পৃ. ৮৩।

প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তখন কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিষয়ক নাট্যরচনা এবং তার অভিনয়েও ভাঁটা পড়ে। যে লীলাবতীর অভিনয়কে কেন্দ্র করে কলকাতায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে, ১৮৭৪ সালের পরে তার অভিনয়ও বিরল ঘটনায় পরিণত হয়। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত **কুলীনকন্যা বা কমলিনী**[১৬] বলতে গেলে কৌলীন্যবিরোধী সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক।

আলোচ্য নাটকসমূহে সমস্যা হিশেবে কৌলীন্য, বহুবিবাহ ও সপত্নীত্বের প্রতি স্বতন্ত্র মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। নাট্যকারগণ আপনাপন মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কৌলীন্যের এক-একটি দিকের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন। এই নাট্যকারগণ সমস্যার যে সব সমাধান দিয়েছেন, তাও আলাদা। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য ছিলো কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা দেখিয়ে সমাজকে এই দোষ থেকে মুক্ত করা।

রামনারায়ণ তর্করত্ন **কুলীনকুলসর্বস্ব** নাটকের ভূমিকায় স্পষ্টত বলেন যে, কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় বঙ্গদেশে যে দুরবস্থা ঘটছে, তাকে তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য,— রঙ্গরস সৃষ্টি নয়।[১৭] তাঁর নবনাটকের নান্দীতে সূত্রধার বলেছে, 'উপদেশ দেওয়াই নাটক প্রকাশের উদ্দেশ্য'।[১৮] কিন্তু কী উপদেশ? রামনারায়ণ গ্রন্থের নাম-করণ থেকে আরম্ভ করে উপসংহার পর্যন্ত সর্বত্রই বলতে চান যে, বহুবিবাহ করা ভয়ানক অপরাধের কাজ। নাটকের পুরো নাম—**বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক**।[১৯] উৎসর্গপত্রে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন, 'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা নিবারণের সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।' গ্রন্থের উপসংহারে সূত্রধার যে বক্তৃত করে, তাও উল্লেখযোগ্য।

> সভ্যমহোদয়বর্গ! আপনারা গুণগ্রাহী এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গনেশ বাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথার অনুমোদন করবেন। ও দুষ্প্রথা আর রাখতে চাবেন? যাতে ঐ নানা দোষাকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না? যদি করেন, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকর্তা কৃতার্থ হন এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলো তাঁরাও কৃতার্থ হন।[২০]

তারকচন্দ্র চূড়ামণিও সপত্নী নাটকের ভূমিকায় বলেছেন, নাট্যরস সৃষ্টি নয়,

১৬. লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, **কুলীনকন্যা বা কমলিনী** (কলিকাতা, ১৮৭৪)।

১৭. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, বিজ্ঞাপন, পৃ. ২।

১৮. **নবনাটক**, পৃ. ২।

১৯. নাটকটি নবনাটক নামেই পরিচিত বটে; গ্রন্থের অভ্যন্তরেও **নবনাটক** নামেই মুদ্রিত; কিন্তু নামপত্রে এই দীর্ঘতর শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে।

২০. **নবনাটক**, পৃ. ১৫৭-৫৮।

তাঁর উদ্দেশ্য নাট্যচ্ছলে বঙ্গদেশে প্রচলিত কদাচার ও কুব্যবহার বিশেষত বহুবিবাহ-সংক্রান্ত অনিষ্টের চিত্র অঙ্কন করা।[২১]

বল্লালী খাত নাটকের লেখিকা[২২] 'কস্মিন হিন্দু মহীলা' নট-নটীর মুখ দিয়ে তাঁর নাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। নট বলেছে, কৌলীন্যরূপ দুকূল-ভাঙ্গা অগাধ খাতের সর্বানিষ্টকারী প্রবলতা হ্রাসের উপায় খুঁজে বের করা তার উদ্দেশ্য।[২৩] লেখিকা জানেন, 'এই খাতের স্রোত রহিত করিয়া পারাপারের উপায়ের জন্য কুলের নিরাকরণ করিতে আসিয়া কুল-সর্বস্ব' (অর্থাৎ কুলীনকুলসর্বস্ব—গো. মু.) প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাটক কুল সাগরে নিমগ্ন হয়ে গেছে, তবু তিনি তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই কুপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্যে চেষ্টা করতে চান। নটী লেখিকার মনোবলের এবং নাটক রচনার উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা করে বলেছে, বড়োরা যে কাজে হার মেনেছে, কয়েকজন ছোটো মিলে হয়তো তাতে সাফল্য অর্জন করতে পারে।[২৪]

দীনবন্ধু মিত্র **লীলাবতীর** এবং লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী **কুলীনকন্যা বা কমলিনীর** উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামনারায়ণ, তারকচন্দ্র বা 'কস্মিন হিন্দু মহীলা'র মতো স্পষ্ট মন্তব্য করেননি; কিন্তু নাট্যরস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা বিষয়ে তাঁরা পাঠকদের মনে যে ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার উদ্রেক করতে চেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।[২৫] **লীলাবতীর** কাহিনীতে জটিলতা এসেছে প্রধানত কৌলীন্যেরই প্রশ্নে। লীলাবতীর মতো রূপবতী ও বিদুষী পাত্রীর জন্যে ললিতের মতো পাত্রকে সকলের পছন্দ। লীলাবতী নিজে—সে যুগের পক্ষে যা অসাধারণ—ললিতকে ভালোবাসে।

২১. **সপত্নী নাটক**, বিজ্ঞাপন।

২২. সেকালে অনেক পুরুষ লেখকই গ্রন্থের বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে বা জনসাধারণে সমাদর হবে মনে করে নিজেদের নাম গোপন করে কোনো-না-কোনো মহিলার নাম ব্যবহার করতেন। সুকুমার সেন ব্রিটিশ মুজিঅম লাইব্রেরি ক্যাটালগে বর্তমান গ্রন্থের ও রচয়িতার নাম দেখে অনুমান করেন যে, 'কস্মিন হিন্দু মহিলা' লেখা থাকলেও, আসলে রচয়িতা কোনো পুরুষই। সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ড (ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭০-৭১), পৃ. ১০২।

সুকুমার সেন এ নাটকটি নিজে দেখেননি মনে করার একাধিক কারণ আছে। ব্রিটিশ মু্যজিঅম লাইব্রেরি ক্যাটালগের মতোই তিনিও এই গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ লিখেছেন ১৮৬৮। আসলে গ্রন্থের নামপত্রে পরিষ্কার লেখা আছে ৭ আশ্বিন ১২৭৪ অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃস্টাব্দ। তাছাড়া লেখিকা **মহিলা** বানান লিখেছেন মহীলা।

২৩. কস্মিন হিন্দু মহীলা, **বল্লালী খাত নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬৭), পৃ. ৬-৭।

২৪. ঐ, পৃ. ১৬।

২৫. P. Guha-Thakurta, p. 112.

তার পিতা হরবিলাস ললিতকে খুব স্নেহ করে এবং তাকে পোষ্যপুত্র হিশেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। লীলাবতীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণও ললিতের গুণমুগ্ধ। কিন্তু ললিতের একটি মাত্র 'দোষ' সে কুলীন নয়। অপর পক্ষে, তার যতো গুণ নদেরচাঁদের ততো দোষ। সে স্ত্রীঘাতী, লম্পট, মদ্যপ, গুলিখোর, অশিক্ষিত, কুৎসিত, বর্বর। তার সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ের প্রস্তাবকে নাটকের তাবৎ দর্শক ও পাঠক প্রতিবাদ না করে পারে না। ঘটনার এই আবর্তের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বরের মুখ দিয়ে আপন বক্তব্য পেশ করেন :

> কুলীন অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে।...ধর্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান করলে ধর্ম বৃদ্ধি হয় না, এবং অকুলীনে কন্যা দান করলে ধর্মের হ্রাস হয় না।[২৬]

আমরাও এ বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি, এ নাটক রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজের দোষ সংশোধন করা।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর কুলীনকন্যা বা কমলিনী অংশত লীলাবতীরই অনুকরণ। ললিতের মতো দীননাথ নায়িকার গৃহে পালিত ও শিক্ষিত। উভয় ক্ষেত্রেই বিয়ের আগে প্রণয় সঞ্চারিত হয় এবং নায়ক-নায়িকা নিভৃতে প্রণয় নিবেদন ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কিন্তু লীলাবতীর মতোই কমলিনীর বিবাহ স্থির হয় এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে। লীলাবতী ও ললিতের গাঢ় রোম্যানটিক প্রেমের চিত্র অঙ্কন করে এবং কৌলীন্য প্রথাকে এই প্রেমের একমাত্র বাধাস্বরূপ দেখিয়ে দীনবন্ধু মিত্র যেমন কৌলীন্যবিরোধী মনোভাবের উদ্রেক করতে চেয়েছেন, লক্ষ্মীনারায়ণও সেই কৌশল অবলম্বন করেন। এ নাটকে দীননাথের সঙ্গে কমলিনীর প্রণয়চিত্র এমন সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত যে, তা স্বভাবতই দর্শক ও পাঠকের সহমর্মিতা আকর্ষণে সমর্থ হয়। অথচ তাদের মিলনের পথে কৌলীন্য এসে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে। ফলে পাঠক-দর্শকের কাছে কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ সম্পর্কেও দীনবন্ধুর মনোভাব লীলাবতীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। নদেরচাঁদ ভঙ্গকুলীন এবং পাষণ্ডের মতো তার আচরণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম স্ত্রীকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়নি। হেমচাঁদ দু পুরুষে ভঙ্গকুলীন—ইচ্ছে করলে সে হয়তো শ'খানেক বিয়ে করতে পারতো কিন্তু আদৌ দ্বিতীয় বিবাহ করেনি। ভোলানাথ চৌধুরীও নদেরচাঁদের মতো দ্বিতীয় বিবাহ করেনি। অন্য আর-একটি নাটকে—জামাই বারিকে দীনবন্ধু বহুবিবাহের প্রতি ঘৃণা ও তাঁর অননুমোদন প্রকাশ করার জন্যে উল্টো পথ

২৬. দীনবন্ধু মিত্র, লীলাবতী, দীনবন্ধু রচনাসংকলন-এ সংগৃহীত, পৃ. ৪৩২।

অবলম্বন করেছেন। এই নাটকে বগলা ও বিন্দুবাসিনী—এই দুই স্ত্রীর হাতে পদ্মলোচন যেভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, এমনকি প্রহৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তাকে প্রায় শিক্ষামূলক বলে গণ্য করা যায়। কেবল অট্টহাস্যের মোড়কে পরিবেশিত বলেই এ নাটকের এই নীতিবাগীশ চেহারা হঠাৎ চোখে পড়ে না।

পদ্মলোচনের এবং তার দুই স্ত্রীর উপাখ্যানের সঙ্গে তীব্রতার দিক দিয়ে তুলনীয়, এ নাটক প্রকাশিত হওয়ার ছ বছর আগে প্রকাশিত, নবনাটকের গবেশবাবু ও তার দু স্ত্রীর উপাখ্যান। কেবল পার্থক্য এই যে, বগলা ও বিন্দুবাসিনী কেউ কাউকে হারাতে পারেনি, অন্যদিকে সাবিত্রী চন্দ্রলেখার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সাবিত্রী দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে তার সরলতা, সহনশীলতা ও ভালোমানুষী দিয়ে। শেষ পর্যন্ত তার আত্মহত্যা এবং একটি পুত্রের মৃত্যু সামাজিকদের সহানুভূতি উদ্রেক করে। দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রলেখার কাছে গবেশবাবুর নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ এবং তার করুণ পরিণতি ও শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়ে রামনারায়ণ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে পাঠক ও দর্শকদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। বহুবিবাহ যে অত্যন্ত মন্দ কর্ম, এটা বোঝাবার জন্যে নাট্যকার অনেকটা নীল দর্পণের মতো একটার পর একটা মৃত্যু ও আত্মহত্যার চিত্র অঙ্কন করেন এবং পরিশেষে সূত্রধারের মুখে বহুবিবাহবিরোধী বক্তৃতাটি জুড়ে দেন।

বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকের পরিণতিও অনেকটা এ রকমের। তিনটি মৃত্যু ও আত্মহত্যা এবং একজনের বৈরাগ্য অবলম্বনের মধ্য দিয়ে এ কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। নাটকের শেষে বসন্ত সকলের সামনে এবং প্রসন্ন চিঠি লিখে যে অনুতাপ করে, তার মধ্য দিয়েই নাট্যকার আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।[২৭]

মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা নাটকের উদ্দেশ্যও বহুবিবাহের নিন্দা করা। এই নাটকের নায়ক শান্তশীল এবং তার দু স্ত্রী যথাক্রমে মহামায়া ও সরলা। বাইরে তাদের সম্প্রীতিছিলো এবং একটা সময় পর্যন্ত সংসারে তাদের সুখ-শান্তিও ছিলো। কিন্তু মহামায়ার হিংসা সংসারের সকল আনন্দ বিনষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত তার শোচনীয় মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সাপত্ন্যের জটিলতা দূরীভূত হয়। নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নটের গান দিয়ে:

বর্ণ কি বর্ণিতে পারে, হায়! যত দোষ,
বহুবিধ দোষাকর বহু-পরিণয়ে ?
"পরিণয়" এই বাক্য অতি সুধাময় !
"বহু" শব্দ যোগে কিন্তু বিষময় হয়!![২৮]

২৭. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ১১৩, ১১৫-১৬।
২৮. মনোমোহন বসু, **প্রণয় পরীক্ষা নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬৯), পৃ. ২।

পরে নট-নটীর সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য আরো ব্যাখ্যা করে বলেন :

নটী। সে নাটকে কি আছে তা বল ?

নট। বহুবিবাহের বিষ ফল।[২৯]

কেবল নট-নটীর সংলাপেই নয়, শান্তশীলের বক্তব্যেও নাট্যকারের বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সরলাকে হারিয়ে শান্তশীল দারুণ কাতরতার সঙ্গে রসিককে আদেশ করে যে, তার সম্পত্তি দিয়ে

> বহুদোষাকর বহুবিবাহ-রীতি যাতে দেশ হতে দূর হয়, সতত পরন্তঃ তার চেষ্টা পাবেন। সভা স্থাপন, গ্রন্থ প্রকাশ, আমার অভাগ্য জীবনের ইতিহাস প্রচার, এবং রাজধানীস্থ বিজ্ঞমণ্ডলীর পরামর্শে যা কিছু সদুপায় বোলে অবধারিত হবে, সর্বপ্রযত্নে সেই সকল উপায় অবলম্বন কোর্বেন।[৩০]

প্রকৃত পক্ষে, নানাভাবেই মনোমোহন বসু প্রমাণ করেন বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। নটের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন

প্রথম মথনে সিন্ধু দিয়াছিল সুধা,
গরল দ্বিতীয় বারে। হায়, সেইমত,
প্রথম বিবাহে সুখ ; দ্বিতীয়ে বিষাদ,
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চে ক্রমে পরমাদ।[৩১]

কিন্তু নাট্যকার কেবল কৌশলগত একটি ত্রুটি তাঁর রচনায় প্রশ্রয় দিয়েছেন। যদি তিনি দেখাতে চান প্রথম বিবাহে সুধা মেলে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমে গরল, তা হলে নব-নাটকের সাবিত্রীর মতো প্রথম স্ত্রী মহামায়াকে আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী দিয়ে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী সরলাকে চন্দ্রলেখার তাবৎ দোষাবলী দিয়ে চিত্রিত করা উচিত ছিলো। কিন্তু মনোমোহন বর্তমান নাটকে সরলাকে অঙ্কন করেছেন সরলতার প্রতিমূর্তি করে। পাঠক-দর্শকগণ তাকে রীতিমতো ভালোবেসে ফেলে। এমতাবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, শান্তশীলের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ করা যথার্থ হয়েছে, কারণ তার দ্বিতীয় স্ত্রীটি সত্যিকারভাবে রূপবতী, গুণবতী এবং তার প্রথম সন্তানের জননী। এর ফলে নাটকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অংশত ব্যাহত হয় কিন্তু তবু বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা এ নাটকে উজ্জ্বলভাবেই ফুটে উঠেছে—একথা বলা চলে।

উদ্দেশ্য এক হলেও নাট্যকারগণ এক-একজন কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সমস্যার এক-এক দিক বড়ো করে দেখেন এবং এক-এক ধরনের সমাধান নির্দেশ করেন, একথা আমরা

২৯. ঐ, পৃ. ৪।
৩০. ঐ, পৃ. ২১১-১২।
৩১. ঐ, পৃ. ২।

আগেই উল্লেখ করেছি। এবারে নাটকগুলির বিশ্লেষণ থেকে সমস্যার বিভিন্ন দিক এবং নির্দেশিত বিভিন্ন সমাধানের আলোচনা করবো।

বর্তমান নাট্যরচনাসমূহে কুলীনদের বহুবিবাহের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা রীতিমতো ভয়াবহ। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের অধর্মরুচি মুখোপাধ্যায়ের বিয়ের সংখ্যা সাড়ে আঠারো গণ্ডা অর্থাৎ ৭৪টি।[৩২] বল্লালী খাত নাটকে মোহিনী তার মামাতো ভাইদের কারো দশ গণ্ডা, কারো পনেরো গণ্ডা, কারো পঁচিশ গণ্ডা বিয়ের কথা উল্লেখ করে।[৩৩] সপত্নী নাটকে রামব্রহ্ম একশত বিয়ে করে।[৩৪] শ্যামার জামাই এক পোন বিবাহ করে।[৩৫] পূর্বের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, এরকম অধিক সংখ্যায় বিয়ে করা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই অসম্ভব বা অসাধারণ নয়। ধর্মশীল এবং অধর্মরুচির সংলাপ থেকে আমরা অধর্মরুচির ৭৪টি বিবাহ করার কারণ জানতে পারি।

ধর্মশীল। বলুন না কেন কি ব্যবসায় করেন?

অধর্মরুচি। আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?

ধর্ম। [illegible]াহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয়?

অধর্ম। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই— তাতেই আমরা সুখে আছি।[৩৬]

বিপিনমোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমনি আর একজন বিবাহ-ব্যবসায়ী। সে বলে, নিতান্ত জীবিকার দায়ে 'দশ বার ক্রোশ হাঁটিয়া হাঁটিয়া সামান্য ধনাশয়ে শ্বশুর বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করি।'[৩৭]

প্রকৃত পক্ষে, এই কুলীন সন্তানগণ অনেকেই লেখাপড়া শিখতো না। সুতরাং বিলাসবশত নয়, জীবিকা উপার্জনের জন্যেই তারা বিয়ে করতো। অনূঢ়া যুবতী নাটকের সদাশিব মুখোপাধ্যায় চাকুরি করে জীবিকা অর্জনের প্রশ্নে স্পষ্ট স্বীকার করে 'চাকরি কত্তে লেখাপড়া জানে কোন শালা?' তা ছাড়া, তার মতে

চাকরি করা ভারি কষ্ট। বারোমাস বিদেশে পড়ে থেকে হাত পোড়ায়ে ভাত খেতে হয়, অত ক্লেশ কত্তে কে যায়, ...

৩২. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৬২। অধর্মরুচির পিতামহের বিবাহ সংখ্যা চার কুড়ি পনেরো অর্থাৎ ৯৫টি।

৩৩. **বল্লালী খাত নাটক** পৃ. ৩৯।

৩৪. **সপত্নী নাটক** পৃ. ১১২।

৩৫. **বল্লালী খাত নাটক,** পৃ. ১৮।

৩৬. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৬০।

৩৭. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক,** পৃ. ৭০।

সুতরাং সে মনে করে

আমি কুলীনের ছেলে মাসের ভিতরি দুটো বে করবো, সুখে জন্মটা কাটিয়ে যাবো। শুধু আমি কেন, খুঁজে দেখলে কুলীনের দলে আমার মত বিদ্যেসাগরই অনেক পাবো। বলি ভাই আমাদের আর বিদ্যে থাক না থাক বিয়ে করা বিদ্যে সকলেই জানি।[৩৮]

বল্লালী খাত নাটকে উমা ব্যঙ্গ করে এই সত্যই উচচারণ করেছে 'কুলিনের ছেলে পাঁচ গণ্ডা বে করে খাবে, ওর বিদ্যেয় দরকার কি . . .।'[৩৯]

তবে একথা মনে করার কারণ নেই যে, বিবাহ-ব্যবসা থেকে সকল ভঙ্গকুলীন যথেষ্ট উপার্জন করতে সক্ষম হতো। পূর্বোক্ত নবু বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দশ-বারো ক্রোশ হেঁটে সামান্য ধনোপার্জনের কথা উল্লেখ করেছে, তা থেকে তার অর্থ সংকটেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সপত্নী নাটকের এমনি একটি বহুবিবাহকারী কিন্তু অসচ্ছল কুলীনের সাক্ষাৎ লাভ করি। কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা—এই তিন বোনের স্বামী উনপঞ্চাশটি বিবাহ করে কিন্তু তবু তার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এ জন্যেই সে শেষে ডাকাত দলে যোগ দান করে এবং ধরা পড়ে জেলে যায়।[৪০]

কুলীনগণ অবশ্য নানাভাবে শ্বশুর পরিবার থেকে অর্থ আদায় করার চেষ্টা করতো। আগেই লক্ষ্য করেছি, বিয়ের সময় পণ গ্রহণ ছাড়াও পরে প্রত্যেক বার শ্বশুর বাড়ি গমন করে এরা কিছু না কিছু টাকা আদায় করতো। টাকা না পেলে, এরা শ্বশুর বাড়িতে প্রবেশ করতো না, পা ধুতো না, আসন গ্রহণ করতো না, আহার করতো না, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ অথবা সহবাস করতো না। স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পরে তার পুর্ন-বিবাহ উৎসব উপলক্ষে স্বামীকে যখন নিমন্ত্রণ করে আনা হতো, তখন সে মোটা অর্থ দাবি করতো। এ রকমের একটি কাহিনী আমরা অনূঢ়া যুবতী নাটকে দেখতে পাই। কুমুদিনী অকুলীনের মেয়ে কিন্তু অভিভাবকগণ তাকে কুলীনের হাতে সমর্পণ করে। বিয়ের সময় এই কুলীন পাত্র অন্যের অনুরোধে দয়া করে মাত্র ১৩৫ টাকা পণ নিয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করেছিলো। কিন্তু পুনর্বিবাহের সময় সে ৫০০ টাকার কমে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসম্মত হয়। তাকে কেবল কুমুদিনীর পিতা এবং গ্রামবাসিগণই নয়, কুমুদিনী নিজেও তিনশ টাকা নিয়ে অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে হাতে-পায়ে

৩৮. শ্রীমতি নিতম্বিনী, **অনূঢ়া যুবতী নাটক** (ঢাকা, ১৮৭২), পৃ. ১২।
এই নাটকের হস্ত লিখিত কপি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে আমাকে পাঠান ডক্টর আনী আসগর খান। বই-এর বাঁধাই অতিরিক্ত চাপা হওয়ায় মাইক্রোফিল্ম বা জেরক্স কপি সংগ্রহ করা যায়নি।

৩৯. **বল্লালী খাত নাটক**, পৃ. ২৮।

৪০. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ২৪।

ধরে অনুরোধ করে, কিন্তু কিছুতেই কুলীন পাত্রের মনে দয়ার উদ্রেক হয় না। ফলে ঋতুমতী হওয়ার সাত বছর পরেও কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না।[৪১] কুলীনরা এভাবে বিভিন্ন সময়ে অর্থ আদায় করায় কুলীনস্ত্রী এবং তার অভিভাবকদের যে দুর্দশা হতো নাট্যকারগণ তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সেই দিকটিই বিস্তারিতভাবে অঙ্কন করেছেন। বিবাহ ব্যবসার ফলে কুলীনদের 'দেহনির্বাহ' যথার্থরূপে হয় কিনা অথবা এ ব্যবসার ফলে তারা সত্যিকার গ্লানি অনুভব করে কিনা, সে বিষয়ে নাট্যকারগণ নীরব। এমন চিত্রও এসব নাটকে দেখতে পাই যে, বিয়ের সময় চড়া পণ গ্রহণ করে কুলীন পাত্র তা দিয়ে পরে বেশ্যার পারিশ্রমিক দেয়।[৪২] পণ ও নানা উপলক্ষে কুলীন জামাতাকে অর্থ দিতে হতো বলে, কুলীন অভিভাবক কন্যার বিবাহ ব্যাপারে অনেক সময়েই দারুণ বিব্রত বোধ করতো। এ জন্যে কুলীন ঘরে কন্যাদের অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অনূঢ়া অবস্থায় রাখতে হতো। অনূঢ়া যুবতী নাটকে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কুমুদিনীর ভাষায় নিতম্বিনী 'তাল গাছের মতো' বড়ো হয়ে গেছে, তবু তার বিয়ে হয় নি। বিয়ে না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে সে বলে,

> পূর্বে কুলীন সর্বসাধারণের পরস্পর বিবাহ হওয়াতে গোল হরিবোলের মত ভালই ছিল, এই হতভাগা (দেবীবর—গো. মু.) মেল বন্ধ করাতে, এক্ষণে কেমন ধরা হয়েছে জান, এই আমি হয়েছি বল্লাবীলের বাড়ুয্যে মেয়ে, আমাদের ঘর ঐ মেলের মুখুয্যে নিয়ে, এই ঘর ছেড়ে অন্য দিলে জাত যায়! এ জন্যে সকল মেলেই আমার মত অনেক মেয়ে আইবড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ....বাঁধা ঘরে বিনেতো বে হতেই পারে না, একদিকে মেয়ে বারো বছরের হয়ে বসেছে ওদিকে ছেলের বাপ আজ তাকাতি বেও করেনি, তিনি বে করবেন, তবে ছেলে হবে, তবে এ মেয়ের বে হবে, কোন ঘরে ছেলের বয়েস পঁচিশ বৎসর হয়ে রয়েছে, মেয়ের বাপের জন্ম হয়নি, মেয়ের বাপ জন্মিবেন, বে করবেন, মেয়ে হবে তবে এ ছেলে তাঁকে বে করবেন, এই নিয়মে ন বছোরের ছেলের ঠাঁই আইবয়সী, ষাট সত্তর বছোরের কুলীনের মেয়েদের বে হয়। আবার আশী বছোরের বৃদ্ধের সঙ্গে দেড় বছোরের মেয়ের বে হয়, শুধু বুড়ো কেন, কত কানা খোঁড়ার ঠাঁই বে হয়....।[৪৩]

—এই উক্তিতে অতিরঞ্জন আছে; কিন্তু কুলীন বিবাহের মূল/শর্ত এবং তার ফলে যে ব্যাপক অনিষ্টের সৃষ্টি হতো, তার প্রতি যথার্থ ইঙ্গিত আছে।

৪১. **অনূঢ়া যুবতী নাটক**, পৃ. ৬-৭।
৪২. **অনূঢ়া যুবতী নাটক**, পৃ. ১১-১১।
৪৩. ঐ, পৃ. ৩-৪।

প্রকৃত পক্ষে, অনেক ক্ষেত্রেই কুলীনকন্যার হয়তো প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত অনূঢ়া থাকতে হতো। কুলপালকের চারকন্যার জন্যে একটি ষাট বছর বয়স্ক বর যখন পাওয়া গেলো, বড়ো মেয়ের বয়স, কুলপালকের ভাষায়, তেত্রিশ-চৌত্রিশ, মেজো মেয়ের ছাব্বিশ-সাতাশ, সেজো মেয়ের চোদ্দ-পনোর এবং ছোটো মেয়ের আট। কুলধন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাও অবিবাহিত। তার বয়স সম্পর্কে তার পিতার বর্ণনাটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

> বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে তার বড় পিসীর বইসী।[৪৪]

যমুনা এমনি একটি অনূঢ়া কন্যা, তার বয়স ষাট হয়েছে কিন্তু তবু তার বিয়ে হয়নি।[৪৫] তবে অভিভাবকরা কন্যাদের বয়স সম্পর্কে সাধারণত সচেতন থাকতো।[৪৬] এবং সে কারণেই পাত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তারা রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে পড়তো।[৪৭]

পাল্টা মেলের যোগ্য পাত্র জোটানো এবং চড়া পণ দেওয়া—উভয়ই শক্ত ব্যাপার বলে, অভিভাবকরা একটি পাত্র পেলে প্রায়শ তাদের সবগুলি কন্যাকেই একপাত্রে সাম্প্রদান করতো। কুলপালক তার চার কন্যাকে, যশোদাদের পিতা তার সাত কন্যাকে, রমাকান্ত তার তিন কন্যাকে,[৪৮] বন্দ্যোপাধ্যায় তার চার কন্যাকে, চট্টোপাধ্যায় তার দুই কন্যাকে,[৪৯] কুলদাদের পিতা তার সবগুলি কন্যাকে[৫০] একই পাত্রে সম্প্রদান করে।

কুলীন অভিভাবকগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থদণ্ড দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতো, কিন্তু কন্যারা এই বিয়ের ফলে দায়মুক্ত হতে পারতো না। বরং এই বিয়ে থেকেই তাদের দুর্ভাগ্যের সূচনা হতো এবং সাধারণত মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটতো। যশোদার সাত বোনের বিয়ে হয় একটি পাত্রের সঙ্গে পূর্বের অনুচ্ছেদেই আমরা তা উল্লেখ করেছি, যা বলা হয়নি তা হলো পাত্রটি কেমন।

৪৪. **কুলীনকুলসর্বস্ব** নাটক, পৃ. ৭-৮।

৪৫. ঐ, পৃ. ৪৪।

৪৬. **চপলাচিত্তচাপল্য** নাটকে এক ব্রাহ্মণ তার এগারো, আট ও ছ' বছরের তিন কন্যার বিবাহের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে মনে করে। পৃ. ৪-৫।
নিতম্বিনীর অভিভাবকরা অবশ্য তার মতে তার বিয়ের ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন। **অনূঢ়া যুবতী নাটক**, পৃ. ২।

৪৭. এই ব্যস্ততার চিত্র **কুলীনকুলসর্বস্বে** সুন্দর পাওয়া যায়। ৫-৮, ১৯।

৪৮. **সপত্নী নাটক**।

৪৯. **বিধবা সুখের দশা**।

৫০. **বঙ্গালী খাত নাটক**।

পাত্রটি একটি গঙ্গাযাত্রা করা মুমূর্ষু বৃদ্ধ।[৫১] অচিরেই যশোদারা সাত বোন বিধবা হয় এবং বিনা অপরাধে তাদের বৈধব্যের দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনা ভোগ করতে বাধ্য হয়।

যৌবনের শেষ দিকে অথবা প্রৌঢ়ত্বে পেঁছে যে কন্যাদের বিয়ে হতো তারা অবশ্য অবিবাহিত থাকার চেয়ে বৈবধ্যকে শ্রেয়তর মনে করতো। **অনূঢ়া যুবতী** নাটকে নিতম্বিনী বার বার এই বলে আপসোস করেছে যে, তার হাতের জলটা পর্যন্ত শুদ্ধ হলো না।[৫২] বোঝা যায়, সে বিয়ের পর বিধবা হতেও প্রস্তুত কিন্তু আর অনূঢ়া থাকতে চায় না। অপর পক্ষে, পিতামাতাও আজীবন কন্যাকে অবিবাহিত রেখে সমাজে পতিত হতে চায় না। সুতরাং একটি পাত্র--সে কানা, খোঁড়া, বালক, বৃদ্ধ যা-ই হোক না কেন, পেলেই সবগুলি কন্যাকে সেই পাত্রে সম্প্রদান করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তো।[৫৩]

এ জাতীয় বিয়ের ফলে এমনো হতো যে, কৈশোরে উপনীত হয়ে যে বালিকা শুনতে পেয়েছে শৈশবে তার বিয়ে হয়েছে, সে হয়তো সারাজীবন আদৌ স্বামীর দেখা পেতো না।[৫৪] অথবা যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে শুনতে পেতো যে, সে বিধবা হয়েছে। আবার কারো কারো স্বামী হয়তো বছরে-দু বছরে একবার অর্থ প্রয়োজনে এসে স্ত্রীর কাছে হাজির হতো। সেই বিরল এবং ক্ষণিক মিলনের জন্যেও সারাবছর এ সব রমণীরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে চরকা কেটে কিছু অর্থও এসব কুলীনস্ত্রী জমিয়ে রাখতে চেষ্টা করে[৫৫] কিন্তু অনেক সময়ে সকল প্রতীক্ষাই ব্যর্থ হতো।[৫৬] আবার কখনো বহু প্রতীক্ষার পরে যখন স্বামী আসতো, যথেষ্ট অর্থ না পেলে সে হয়তো মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারতো না। ফলে স্ত্রীকে অপমান করে, প্রহার করে, চলে যেতো।[৫৭] প্রকৃত পক্ষে, কুলীনস্ত্রীদের সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে, 'সধবা বিধবা বেশ।'[৫৮]

৫১. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৪৫।

৫২. **অনূঢ়া যুবতী নাটক**, পৃ. ৬।

৫৩. যেমন **কুলীনকুলসর্বস্বের** কুলপালক।

৫৪. যেমন **বল্লালী খাত নাটকে** মোহিনী।

৫৫. রামবন্ধের উক্তি, **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১১৪।

৫৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ **কুলীনকুলসর্বস্ব**-এর চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান স্মরণীয়। পৃ. ৪২-৪৩ বিনদা (**চপলাচিত্তচাপল্য**, পৃ. ২৬) এবং নিস্তারিণীও (**হিন্দু মহিলা নাটক** পৃ. ১০) এ রকমের সধবা বিধবা।

৫৭. ফুলকুমারীর (**কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৫২-৫৩) এবং কামিনীর (**হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৫৫) কাহিনী স্মরণীয়।

৫৮. 'বামাগণের রচনা **কুলীনবহুবিবাহ**' (কবিতা), **বামাপ**, পৌষ ১২৭৮ (ডিসেম্বর ১৮৭১-জানুয়ারি ১৮৭২), পৃ. ২৯০।

যুবতী স্ত্রীদের এই দীর্ঘ অথবা চিরকালীন বিরহের এক দিকে যেমন ছিলো এদের মর্মান্তিক দুঃখ অন্যদিকে তেমনি ছিলো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। **কুলীনকুলসর্বস্ব** নাটক থেকে এই ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব খানিকটা অনুমান করা যায় এবং কুলীনরা এ জাতীয় ব্যভিচারকে যে খুব অসাধারণ বলেও গণ্য করতো না, তাও বোঝা যায়। অধর্মরুচি তার এক কন্যার জন্ম সংবাদে কিছু বিব্রত বোধ করে; পিতার কাছে এ বিষয়ে সে যে মন্তব্য করে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। 'কি বলবো বাবা, লজ্জা হয়; সে দেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই; তাই বলি মেয়েটা হলো।' কিন্তু অধর্মরুচির আইনত পিতা এ ব্যাপারে অনেক বেশী অভিজ্ঞ ও বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন। 'পুত্র'কে সে সান্ত্বনা দেয়—

> (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি?[৫৯]

অধর্মরুচিই বিবাহবণিকের একমাত্র অবৈধ সন্তান নয়, পথের মধ্যে উত্তম মুখোপাধ্যায় বলে একটি তরুণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আলাপ করে বিবাহবণিক বুঝতে পারে এটিও তার একটি অবৈধ সন্তান।[৬০]

রামব্রহ্ম যথার্থই মন্তব্য করে:

> কুলীনের বাবা হন সম্পর্কের বাবা।....
> বালকে ভর্ৎসিয়া বলে কুলবতী বামা।
> বাবা নয়, বাবা নয়, ওবে তোর মামা॥[৬১]

কুলীন নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করে, কুলীন সন্তানরা সবাই পিতৃজাত নয়।[৬২]

সপত্নী নাটকের স্বামী বিরহিণী তিন সহোদরার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তারা যুবতী এবং যৌবনের স্বাদও জানে। আত্মসংযমে অক্ষম হয়ে তারা তাদের বাড়িতে থেকে কামদেব নামক যে ছাত্রটি লেখাপড়া করে, তার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কন্যাদের মাতা হরমোহিনী এবং পিতা রমাকান্ত উভয়ই এই ব্যভিচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু তবু বাধা দিতে পারে না।[৬৩]

৫৯. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৬৬।

৬০. ঐ, পৃ. ৬৭–৬৮।

৬১. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১১৪–১১৫। কুলীনস্ত্রী ভ্রাতার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো এমন কথা অন্যত্রও বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: নারায়ণ চট্টরাজ গুণবিধি, **কলিকুতূহল নামক গ্রন্থ**, পৃ. ৪৬।

৬২. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৭১।

৬৩. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৩৩-৩৪।

বিধবাবিবাহ নাটকের কুলীন স্ত্রী সত্যভামা নিজ মুখেই স্বীকার করে,

ঘরে বসে কি না করি কে দেখে কাহারে।
গঙ্গাজলে ধোয়া মেয়ে আছে কার ঘরে ॥
ছমাস নমাস অন্তে কান্তে দেখা পাই।
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম রক্ষা তাই ॥
বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই।
যেখানে যা করি দেই তাঁহারি দোহাই ॥
বুঝিবার ভুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়।
অমুক যে ভাল নয় এই মাত্র কয় ॥[৬৪]

'বিপদে পড়লে' অর্থাৎ ব্যভিচারের ফলে গর্ভ সঞ্চারিত হলে জামাই নিয়ে এসে তার দোহাই দেওয়া হয় এবং বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে বড়ো জোর লোকে বলে অমুক মেয়েটি ভালো নয়,---এই উক্তি যথার্থই সেকালের কুলীন সমাজের প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরেছে।

স্বামীর সঙ্গে বছরের পর বছর দেখা না হলে সেই রমণীদের পক্ষে সতীত্ব বজায় রাখা শক্ত হতো। **তরঙ্গমোহিনী নাটকের** মোহিনী তার নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলে

> সে মুখপোড়া কেন আমাকে বে করে ফেলে গেল আর আমার কোন উপায় নাই। ইচ্ছা হইতেছে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোন স্থানান্তরে গমন করিয়া এ বিরহানল সিতল করি।[৬৫]

কামিনীর অবস্থাও তথৈবচ। সে কল্পনায় দেখতে পায়, কোনো নবীন পুরুষ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে আসে, 'আমাদের কুলশীলে আর কি প্রয়োজন ?'[৬৬] অতঃপর তারা গৃহত্যাগী হয় এবং মুগ্ধ হয় এক নবীন যুবকের সৌন্দর্যে।[৬৭]

বল্লালী খাত নাটকের মোহিনীও এক বিরহিণী কুলীনস্ত্রী। তার স্বামী, পিতা, মাতুল—সবাই আছে কিন্তু কেউ তার সংবাদ নেয় না, যত্ন করে না। অন্যের সংসারে পাচিকার কাজ করে সে দুবেলা খেতে পায়। কিন্তু শরীরে তার যৌবনের ঢল নেমেছে। সে যখন পুকুরে স্নান করতে যায়, পুরুষরা তার পেছু নেয়, তাকে বিরক্ত করে, এমন কি তার হাত ধরে টানাটানি করে। বহু কষ্টে সে আত্মসংযম করে থাকে।

৬৪. **বিধবাবিবাহ নাটক**, পৃ. ৫৫।
৬৫. পার্বতীচরণ সিংহ **তরঙ্গ মোহিনী নাটক** (হাবড়া, ১২৭২ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১।
৬৬. ঐ, পৃ. ২।
৬৭. ঐ, পৃ. ৩-৮।

অনূঢ়া কুলীন কন্যাও যৌবনের উন্মাদনায় প্রায় আত্মবিস্মৃত হয় এবং কখনো কখনো চিন্তা করে 'কুলকে অকূলে ভাসাই।'[৬৮]—এমন দৃষ্টান্তও আলোচ্য নাটক-প্রহসনে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, অবৈধ গর্ভের সঞ্চার হলে বাস্তবে তার প্রতিকার কেমন করে হতো। নাটকে সেই বাস্তবেরই অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুকরণ দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে অধর্মরুচির উক্তি স্মরণযোগ্য। তার কথায়, অবৈধ গর্ভ হলে আত্মীয়েরা এসে জামাইকে নিয়ে যায় এবং জামাই দশ-বিশ-তিরিশ টাকার বিনিময়ে অবৈধ গর্ভ তার সম্ভূত বলে স্বীকার করে নিতেও দ্বিধা বোধ করে না।[৬৯] আবার গর্ভ হলে জামাতা তার সংবাদ আদৌ পেতো না, একদিন সন্তানেরই সাক্ষাৎ পেতো—অধর্মরুচি ও উত্তম মুখোপাধ্যায়ের উপাখ্যানে তা দেখানো হয়েছে।

অনুমান করা যায়, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনগণ গর্ভ বৈধ করতো--'গতরাত্রে জামাই এসেছিল, সকালে চলে গেছে'—এরকমের কোনো কাহিনী প্রচার করে। চপলাচিত্তচাপল্য নাটকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ভ্রূণহত্যা এবং গর্ভপাত যার ব্যবসা এমন একটি নীচ শ্রেণীর মহিলার সঙ্গে চারুচন্দ্রের কথোপকথন থেকে জানা যায়। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে তার ভ্রূণহত্যার ব্যবসা উঠে যাবে—মালিনী এই আশঙ্কায় মন্তব্য করে :

> তা যদ্দিন না হয় আমার পক্ষেই ভাল।
>
> চারু। তা তোমার লোকসান হবে কেন, কুলীনের মেয়েরা আছে।
>
> মালিনী। তা আর থাকে কই, শুনচি কুলীনের বের ব্যবসা উটে যাবে আর কুলীনেরা বড় ও কার্য করে না। এখন হয়েছে কি, বেঁধে গেলে পরিবারেরা একদিন রাত দুপুরের সময় ধুমধাম করে, বলে তেল নিয়ায়, নুন নিয়ায়, সন্দেশ নিয়ায়, কেন গো না জামাই এসেচে গো জামাই এসেচে, পরের দিন দেখি কেউ কোথাও নেই। কইলো তোদের জামাই কই ? না গেচে, জামাএর ভারি দরকার, ভোর বেলায় গেচে। এইত গোড়া বাঁধনি হলো, তারপর কতক দিন বই একটি মুখুজ্জে কুলীন জন্মালেন, তা তারা ওষুধ খাবেই বা কেন, কড়ি দেবেই বা কেন ?[৭০]

অপর পক্ষে, কাদম্বিনী, নিতম্বিনী চঞ্চলার মতো (সপত্নী নাটক) যে সব ব্যভিচারিণী কুলীনস্ত্রীর সন্তান হতো না অনুমান হয় ভ্রূণহত্যাই ছিলো তাদের পথ।

৬৮. **অনূঢ়া যুবতী নাটক**, পৃ. ৫।
৬৯. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৬২।
৭০. **চপলাচিত্তচাপল্য**, পৃ. ৩৭।

কেবল ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা বা অবৈধ সন্তান জন্মদানই নয়, কুলীনস্ত্রীরা অনেক সময় বেশ্যাবৃত্তিও গ্রহণ করতো। স্বামীর প্রত্যাখ্যানে অপমানিত ও ব্যথিত হয়ে কামিনী সোনাগাছিতে নাম লেখায়।[৭১] বল্লালী খাত নাটকের মোহিনী এবং তার ভগ্নীর বিয়ে হয়েছিলো একই বরের সঙ্গে। মোহিনী আত্মীয়স্বজনের চরম অবহেলার মধ্যে অন্যের সংসারে পাচিকার কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার ভগ্নী গঙ্গা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে।[৭২]

কৌলীন্যপ্রথার ফলে বাল্যবিবাহ বা অসম বয়স্ক বিবাহ সেকালে খুব প্রশ্রয় পেতো। এই বিয়ের ফলাফল একজন ভুক্তভোগীর সংলাপ থেকে শোনা যাক :

বিনদা। ···বোন আমার দুঃখের পরচে দিই শোনা। ···বাপত জুটিয়ে খের বর আনলেন, অম্নি "ওট ছুঁড়ি তোর বে" বে ত হোল, তারপর মাসখানেক পরেই এম্নি হয়েচে। ভাতারের সঙ্গে আলাপও হয়নি, পরচেও হয় নি। সেই শুভদৃষ্টির যা দেখা, আর সুতো খুলতে যা ছোঁয়া, সকল হলো পরে পরে, গুটি কতক মন্তর পোড়ে এই একাদশী লাভ হলো।[৭৩]

বল্লালী খাত নাটকে শ্যামার পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় 'পাঁচ কম একশো বচ্চর বএস' 'এক পোন বে' (অর্থাৎ ৮০টি বিবাহ—গো. মু.) করা এক মস্ত কুলীনের।[৭৪] এর ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

কুলীনদের মধ্যে অনেক সময় বেশি বয়সী কন্যার সঙ্গে কম বয়সী বালকের বিবাহ হতো, পূর্বের আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্য করেছি। রামব্রহ্ম যে এক শত বিয়ে করে তার ভিতর কয়েকটি পাত্রীর বয়স তার চেয়ে বেশি ছিলো। তার উক্তিতে :

এদিকেতে বয়সে সবার বড় নই।
দাঁড়াইলে একত্র সন্তানসম হই।[৭৫]

কেবল সন্তানসম নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর ও কন্যার বয়সের ব্যবধান এতো বেশি হতো যে বরকে কন্যার 'পৌত্রের' মতো মনে হতো। সুলোচনা জাহ্নবীদের ষাট বছরের বর দেখে মন্তব্য করে যে, তার বরের তুলনায় এবর মাথার মণি। কেননা নিজের বরকে দেখে তার নাতির মতো মনে হয় :

৭১. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক পৃ. ৬৮-৬৯।
৭২. বল্লালী খাত নাটক, পৃ. ২৭।
৭৩. চপলাচিত্তচাপল্য নাটক, পৃ. ২৬।
৭৪. বল্লালী খাত নাটক, পৃ. ১৮।
৭৫. সপত্নী নাটক, পৃ. ১১৪।

সে যে অতি শিশু ছেলে কেঁদে উঠে ভয় পেলে
শান্ত করি রাখি তবে রয়।[৭৬]

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সম্পর্কে সমকালীন স্ত্রী-পুরুষের মনোভাব কেমন ছিলো, আলোচ্য নাটকগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত কৌলীন্য ও বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনের আংশিক সফলতা এবং সে বিষয়ে ভুক্তভোগী নরনারীদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার স্বাক্ষর এই বিচিত্র মনোভাবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

স্বামী না থাকাকে সেকালের হিন্দু মহিলারা সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য বলে গণ্য করতেন। কিন্তু কোনো কুলীনস্ত্রী বিবাহিত জীবনের সহস্র বিড়ম্বনার চেয়ে বৈধব্যকে শ্রেয়তর জ্ঞান করতো—এমন কথা বর্তমান নাট্যরচনাসমূহে বলা হয়েছে। কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটকে দেখতে পাই, বহুকাল পরে ফুলকুমারীর স্বামী একদিন এসে শ্বশুর-বাড়ি হাজির হয়। তাকে দেখে যুবতী স্ত্রী স্বভাবতই আনন্দে এবং প্রত্যাশায় উচ্ছ্বসিত হয়। 'কুলমর্যাদা' নিয়ে স্বামীর পা ধোওয়া, গৃহপ্রবেশ, আসন গ্রহণ, অন্নসেবা ইত্যাদি করে। শেষে স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের বহু প্রতীক্ষিত পরম মুহূর্তটি আসে। আগে থেকেই ফুলকুমারী শয্যায় শুয়ে ছিলো। স্বামী গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয় এবং অর্থ চায়। ফুলকুমারী তার যা কিছু পুঁজি ছিলো সব এনে স্বামীর হাতে তুলে দিলো। কিন্তু অর্থের পরিমাণ দেখে স্বামী অপ্রসন্ন হয় এবং বাইরে গিয়ে টোলের মধ্যে রাত কাটায়। সকাল বেলায় সে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ফুলকুমারীর বহু বছরের প্রতীক্ষা এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যায়। গভীর দুঃখ এবং অভিমানে ফুলকুমারী যশোদাকে বলে :

ঠানদিদি। এ থাকাচেয়ে না থাকা ভাল। না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই একি সামান্যি দুঃখু। ঐ যে কথায় বলে 'দুষ্ট গরু থাকাচেয়ে শূন্য গোল ভাল।'[৭৭]

একই ধরনের অপমানের ফলে কামিনীও শুধু বিবাহিত জীবন নয়, সমাজ, সংসার, কুল, মান সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে। প্রায় একযুগ পরে স্বামী এসেছিলো। কামিনী তার কাছ থেকে একটু স্নেহমাখা কোমল ব্যবহার আশা করেছিলো। ফুলকুমারীর স্বামীর মতোই তার স্বামীও 'কুলমর্যাদা' নিয়ে প্রাথমিক আতিথ্য গ্রহণ করে। তারপর শোবার আগে কামিনী তার যথাসর্বস্ব এনে দেয়। কিন্তু তাতে খুশি হতে না পারায়, স্বামী তাকে লাথি মেরে চলে যায়। এই দুঃখে কামিনী সংসার ত্যাগ করে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে এবং

৭৬. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৪৩।
৭৭. ঐ, পৃ. ৫৩।

স্বামী ও সংসারের উপর প্রতিশোধ নেয়। একদিন স্বামীকে পথ দিয়ে যেতে দেখে কামিনী তাকে ডেকে এনে যত্ন এবং সমাদর করে এবং শেষে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে স্বামীর অপমানের শোধ তোলে।[৭৮]

কোনো কোনো স্ত্রীর কাছে স্বামীর অস্তিত্বই কার্যত ছিলো না। বিধবা সুখের দশায় স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে চার বোনের মধ্যে তিনজন বৈধব্য দুঃখে কাঁদতে শুরু করে। তাই দেখে অন্য বোন—সে-ও একই স্বামীর স্ত্রী, মন্তব্য করে :

> আমরা ধবা কোন কালে তা আজ বিধবা হয়েছি বলে সার গেঁতে কান্তে বসেচিস না ? বাবাতো আমাদের বে দিলেন কি বের্ষো ওচ্ছোগগো কল্যেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।[৭৯]

যে স্বামীর সঙ্গে বছরের পর বছর দেখা হয় না এবং যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি কোনো কর্তব্যই পালন করে না, স্ত্রীর পক্ষে সে স্বামীর অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়া, অথবা তাকে অস্বীকার করা কিংবা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার পরিবর্তে তাকে অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। সপত্নী নাটকে তিন বোন—কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা স্বামীর সম্পর্কে এমনি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। স্বামীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কাদম্বিনী বলে যে, উনপঞ্চাশটি বিয়ে করা সত্ত্বেও

> সেটার মদ আবার রাঁড়ের খরচ কুলয়নি বল্যে, ওমা। শেষকালে আবার একটা ডাকাতের দলে মিশে গিয়েয়েছে, পোড়া কপাল মা। তাতেও আবার ধরা পড়্যে আজন্ম কালটা ঐ কি বলে ? সরকারী শ্বশুর বাড়ীতে (কারাগারে) খেট্যে মত্তেছে...।[৮০]

চঞ্চলার মন্তব্যেও খুব প্রেমভাব প্রকাশ পায় না। কথা প্রসঙ্গে স্বামীর নামে একটি নাম বলার প্রয়োজন হলে,[৮১] অবজ্ঞাভরে সে বলে :

> কুলীনের ঘরে আবার ভাতারের নাম ধত্তো নেই ? মরুকগ্যে, কি আমার পরকালের ভাতার রে। মল্যে সাক্ষী দেবে ; সে ব্যে ভুলে গেছি মা।[৮২]

কুলীন স্বামীর প্রতি এরূপ প্রতিকূল মনোভাব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ রকমের স্বামীর জন্যও চিরপ্রতারিত কুলীনস্ত্রীরা বছরের পর বছর সাগ্রহে অপেক্ষা

৭৮. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৫৫, ৬৮-৭৫।

৭৯. **বিধবা সুখের দশা**, পৃ. ৫–৬।

৮০. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ২৪।

৮১. সে যুগে হিন্দু মেয়েরা স্বামীর নামোচ্চারণ করা মহা অপরাধের কাজ বলে মনে করতেন। এই বিশ্বাস এখনো বহু পরিবারে আছে।

৮২. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১০।

করে থাকতো। ঋতুচক্রের আবর্তনে যৌবনের কোঠা থেকে এক-একটি বছর খসে পড়তো, আর বিরহিণী স্ত্রী সখীর কাছে মনোবেদনা ব্যক্ত করে বলতো :

কবে বিয়া করি মোরে, চলে গেছে সই,
কত যে বসন্ত এল তার দেখা কই ?[৮৩]

তরঙ্গমোহিনী নাটকের মোহিনীও কামিনীর কাছে তার চঞ্চল বিরহতাপিত মনের গোপন কথাটি ব্যাকুলতার সঙ্গে ব্যক্ত করে---'এক্ষণে আমাদের গতি কি হইবে'।[৮৪]

প্রকৃত পক্ষে, কোনো প্রেমিকা নারীর প্রতীক্ষার সঙ্গে কুলীনস্ত্রীর প্রতীক্ষার প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। বরং বিরহিণী কুলীন রমণীর সাধনা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হতে হয়। স্বামীকে তুষ্ট করার জন্যে চরকায় সুতো কেটে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা ছাড়াও, বশীকরণের ঔষধ তারা জুটিয়ে রাখতো, গণকের কাছ থেকে স্বামী আসার সংবাদ জানতে চাইতো এবং সন্ন্যাসীর নিকট থেকে ছেলে হওয়ার তাগা ও ঔষধ সংগ্রহ করতো।[৮৫]

কারণ স্বামীর প্রতি অন্য যে কোনো নারীর মতোই তাদেরও একটা ভালোবাসা ও আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। পাশের বাড়ির ভূধর দাদাকে দৈবাৎ তার স্ত্রীকে আদর করতে দেখে পূর্বোক্ত কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার যে প্রতিক্রিয়া হয়, নিতম্বিনী একটু মুখরা, তার সংলাপ থেকেই তা জানা যায়।—

> দিদি, দেখলি ভাই। দেখলি ? কেমন ভাতার দেখলি ? আহা ! স্বামী কেমন সাগগ্গিরী দেখ দেখি বোন। এমন না হলে কি ঘরকন্না করো্যে সুখ জন্যে, না, ভাতার বল্যে সাধ মেটে ? আহা। হাই তুললে হাত পাতে না ? পোড়া কপাল, ভাতার বল্যে কি একদিন চক্ষেও দেখতে পেলুম না! যে খেদ মেটাব ? আজন্ম কালটা কেবল বাপের বাড়ী দাসীপনা কত্তে কত্তেই মারা গেলোম !···· দিদি আর বলবো কি ? অমনি গুমর্যে গুমর্যে মর্যে যাচ্ছি।[৮৬]

অন্ধ-আতুর, মদ্যপ-লম্পট, যোগ্য-অযোগ্য যা-ই হোক না কেন, স্বামী যে দুর্লভ বস্তু, কুলীনস্ত্রী তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সুলোচনার স্বামী সুলোচনার নাতির বয়সী পূর্বেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। এজন্যে সুলোচনার দুঃখও অসীম। কিন্তু চিরবিরহিণী চন্দ্রমুখীর মনে হয়, স্বামী আদৌ কোনোদিন না

৮৩. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক** পৃ. ১০। নিস্তারিণীর উক্তি।
৮৪. **তরঙ্গমোহনী নাটক**, পৃ. ৯।
৮৫. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৩৯-৪৯।
৮৬. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১২।

আসার চেয়ে, নাতির বয়সী স্বামী থাকাও ভালো, কেননা সে তো বড়ো হয়ে একদিন স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।[৮৭]

কুলীনস্ত্রীদের পক্ষে বিয়ে নিতান্তই একটা অর্থহীন ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও অনূঢ়া নাম ঘোচানোর জন্যে কুলীন কুমারীরা উৎসুক হয়ে থাকতো। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের জাহ্নবী, শাম্ভবী এবং কামিনীর মনোভাব বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

জাহ্নবীর মনে হয়, মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যমরাজের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। তবু ভিতরে ভিতরে সে একটা সান্ত্বনা লাভ করে, হয়তো খানিকটা আনন্দও।

মধ্য যৌবনে উপনীত শাম্ভবী বিয়ের কথায় খুব আনন্দিত এবং বিস্মিত হয়। সে এতো বড়ো সুখবরটা বিশ্বাস করতে ভরসা পায় না। মাকে সাবধান করে দিয়ে সে বলে—

বল্লাল বলে, কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বেনাই। তা দেখিস, সাবধান সাবধান।
ব্রাহ্মণী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন মরেচে।
শাম্ভবী। সে বলে কি হবে মা! তাচেচয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচেচ, দেখিস।

নতুন যৌবনপ্রাপ্ত কামিনী বিয়ের নামে চঞ্চল ও উচ্ছ্বসিত হয়। বরের বয়স কতো, কোথায় বাড়ি, দেখতে কেমন ইত্যাদি খবর সে নানাভাবে সংগ্রহ করে। কিন্তু তারও মনে হয়, পাছে এ বিয়ের প্রস্তাবও পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলির মতো মিথ্যা আশ্বাসে পরিণত হয়।

কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বাস নেই, তুই এমন করে আমায় কতবার ভুলিয়েচিস।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।
কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকে গো অনল…
সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।
কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায়॥

ব্রাহ্মণী। না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি।
কামিনী। ও মা? সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস কোথায় মা? চুপি চুপি দেখতে গেলে হয় না, ক্ষতি কি মা?[৮৮]

কুলীন কন্যারা জানতো স্বামী হয়তো কুৎসিত, কদাকার বা বৃদ্ধ হবে এবং জীবনে

৮৭. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৪৩–৪৪।
৮৮. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৩০, ৩১–৩৩

হয়তো মাত্র কয়েকবারই তার সঙ্গসুখ লাভ করতে পারবে। তা সত্ত্বেও বিয়ের কথায় তারা উচ্ছ্বসিত হতো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য কুলীন কন্যাদের মৌল অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে দেখা যায়। চপলাচিত্তচাপল্য নাটকের বিনদা অভিভাবকদের অবিচারে যে ক্ষোভ প্রকাশ করে তা আগেই লক্ষ্য করেছি। বিয়ের এই অর্থহীনতা সম্পর্কে শান্তবীর উক্তিও স্মরণ করা যেতে পারে। তার মতো এ বিয়ের ফলে কৌলীন্য রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু জাত রক্ষা করবে কে।[৮৯] জাত রক্ষা করার শক্তি অবশ্য অবিভাবকের হাতে ছিলো না—তারা সমাজের রীতিকে অন্যভাবে মান্য করতে বাধ্য হতো। অপর পক্ষে সমাজের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই জন্যেই ভাগ্যকে দোষী করে কুলীনকন্যা সান্ত্বনা পেতে চায়। 'কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে।'[৯০]

কন্যারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্যে যে অভিভাবকদেরই দায়ী করতো, তারাও যে কন্যাদের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলো না, তা নয়। কুলীনকন্যার জননী কন্যাদের দুর্গতি দৃষ্টে আন্তরিক ক্ষোভে ব্যাকুল হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আলোচ্য নাটকসমূহে অনুপস্থিত নয়। কাদম্বিনী-নিতম্বিনী-চঞ্চলার মা জেনেশুনে কন্যাদের ব্যভিচার অনুমোদন করতে বাধ্য হয়। এজন্যে সে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয় এবং কৌলীন্য প্রথাকে ধিক্কার জানায় :

হা দেরে বল্লাল তোরে যাই বলি হারি।
কুটিনীর কাছে তুই মানাইলি হারি।।
তারা সব পর নিয়া করে কারবার।
কুলীনের পুঁজি পাটা নিজ পরিবার।।
এরে হৈতে আর কিরে পাতক অধিক।
কন্যার কুটিনী হই ধিক শত ধিক।।[৯১]

হিন্দুগণ কবে এই কুলসিন্ধু পার হয়ে বহুবিবাহের ব্যবসা এবং কুলীনকন্যাদের ব্যভিচার বন্ধ করতে সক্ষম হবে, সেই জিজ্ঞাসা তার মনকে উদ্বেলিত করে।

কুলপালকের স্ত্রী ব্রাহ্মণীও কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সচেতন। এই প্রথার প্রতি আনুগত্যবশত কুলীনকন্যাদের কুল রক্ষা পায় কিন্তু জাত রক্ষা পায় না। কন্যা শান্তবীর মতো সে-ও এ কথা জানে এবং এ জন্যে সে অভিভাবক সমাজ, দেশের শাসক ও বিধাতা সবাইকে দায়ী করে।

৮৯. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৩০।
৯০. ঐ, পৃ. ৩২। কামিনীর উক্তি।
৯১. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৩০।

মেয়েদের জাত রক্ষা প্রথমে মা বাপ করে; মা বাপ না করিলে, রাজা; রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন। তা বাছা, তোদের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে! এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্মে হাত দেন না, অভাগ্যি আর কি! পূর্বে এক রাজা ছিল তার নাম 'বল্লাল' সে ম্লেচ্ছ সকলের জাত নষ্ট কত্যেই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেচে, আর আমাদের জাত যায় বিধাতারও এ ইচ্ছে, সেইত ঐ জন্যেই বল্লালে ম্লেচ্ছকে রাজ্য দেয়। তবে মা, বাপ, রাজা ও বিধাতা, এরা সকলেই যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেচে, তখন জাত রক্ষা আর কে কর্ব্যে মা?[১২]

ব্রাহ্মণীর মতে মিথ্যা কৌলীন্যের নামে কন্যাদের সুখ জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে, ভালো বর দেখে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত। স্বামী কুলপালকের কাছেও সে এ প্রস্তাব করেছিলো। কিন্তু 'কুলপালক' স্বামী কৌলীন্যের নিয়ম কী করে ভঙ্গ করে! তার ধারণা কুল থাকলেই সব থাকে।

তবে কুলপালক যে এ সমস্যা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়, তা নয়। কিন্তু দেশাচারের কঠিন নিগড়ে সে বন্দী। সে দুঃখ করে বলে, 'আঃ পোড়া দেশীয়দের কি দুরন্ত প্রথা। অতি মন্দ, অতি মন্দ, এমন দেখি নাই।' কিন্তু দেশাচারের নিন্দা করলেও তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই, তাই কুলধন মুখোপাধ্যায়ের কাছে সে সমর্থন খোঁজে—'ভাই তুমি বিবেচনা কর দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে' 'যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?'[১৩]

রমাকান্তও এমনি একজন বিব্রত পিতা। কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সে ষোলো আনা সজাগ। এই প্রথার সংস্থাপক বল্লাল সেনকে অভিশাপ দিয়ে সে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করার চেষ্টা করে।[১৪]

প্রকৃত পক্ষে, একটি সামাজিক ইনস্টিটিউশন হিশেবে কৌলীন্যের প্রতি বা এই প্রথার প্রবর্তক বল্লাল সেনের প্রতি কুলীনদের নিজেদেরই মনোভাব ক্রমশ যথেষ্ট প্রতিকূল হয়ে পড়ছিলো। হরমোহিনী এমন উক্তিও করেছে যে, বল্লাল সেন মনুষ্য ঔরসজাত বানর বিশেষ।[১৫]

তবে কুলীনদের মধ্যেও এই প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সকলে যথেষ্ট সচেতন

১২. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৩১।

১৩. ঐ, পৃ. ৬-৭।

১৪. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৩৪।

১৫. ঐ, পৃ. ৩০। প্রসঙ্গত বল্লাল সেন ও বল্লালী প্রথা সম্পর্কে **বল্লালী খাত নাটকের** নাতিদীর্ঘ আলোচনা স্মর্তব্য। **বল্লালী খাত নাটক**, পৃ. ১২–১৬।

হতে পারেনি, এমন অনেকে ছিলো, নাটকে তা দেখতে পাই। কুলীনকুলসর্বস্বের অমৃতাচার্য, শুভাচার্য বা লীলাবতীর ঘটক এমনি কয়েকটি চরিত্র। ঘটক বলে, 'সকল দোষ কুলমর্যাদায় ঢেকে যায়।'[৯৬] একজন ঘটকের পক্ষে এ মনোভাব আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি হরবিলাসের মতো শিক্ষিত এবং কোনো কোনো ব্যাপারে, বেশ আধুনিক একজন মানুষ বিদুষী, রূপবতী, গুণবতী কন্যাকে মনুষ্যাকার একটি জন্তুর হাতে সম্প্রদান করতে উদ্যত হয় এবং ভাবী কুলীন-জামাতার দোষ দেখে মন্তব্য করে, 'তা যাই হক্, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাকতে ত্যাগ কত্তে পারব না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েছেন, তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে?'[৯৭] হরবিলাসের কথা থেকে বোঝা যায়, কুলমর্যাদার প্রতি সমাজের একাংশের বিশ্বাস কী অবিচল ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিলো।

অধর্মরুচি মুখোপাধ্যায় ৭৪টি বিয়ে করার পরে মন্তব্য করে যে, সে ধর্মভীরু এ জন্যেই তার পিতামহের মতো অনেকগুলি বিয়ে করেনি।

৭৪টি স্ত্রীর ধর্মরক্ষা সে একা কীভাবে করে—এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, 'ধর্মই ধর্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্মাধর্ম ধার ধারিনে, অথবা যার ধর্ম সেই রক্ষা করে।' প্রকৃত পক্ষে, সে স্ত্রীদের সতীত্ব বা ধর্ম নিয়ে মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। বরং 'যদি কোথাও বেঁধে যায়' তবে সে বোপ বুঝে কোপ দেয় এবং মোটামুটি সম্মানজনক অর্থ আদায় করে অবৈধ গর্ভ তার সম্ভূত বলে স্বীকার করে নেয়। তার নিজের ভাষায়, 'আমাদের ধর্ম এই যে, আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্মে ধর্মে কিছু পেলে ছাড়িনে....।'[৯৮] রামব্রহ্ম সংক্ষেপে এই মনোভাবকে 'বিবাহ বাণিজ্য করো উদর ভরাই',[৯৯] বলে প্রকাশ করেছে। নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দেয়।[১০০]

সূর্যকান্ত নিজে কুলীন নয়, কিন্তু দেশাচারকে সে সম্মানের চোখে দেখে। কৌলীন্য-বিরোধী আন্দোলন তাই সে সমর্থন করতে পারে না, বরং একে হিন্দু ধর্মবিরোধী খৃস্টানি অনাচার বলে গণ্য করে। তার কথায় তার ক্ষোভ প্রকাশ পায়।

> শুনিতে পাইতেছি, কুলীন মৌলিক নাকি থাকিবেক না, সব একসা হইবে; তবেই বলিতে হইল, আর কি দেশে মানুষ আছে? এসকল কথা কি শুনা যায়।[১০১]

৯৬. **লীলাবতী, দীনবন্ধুরচনাসংকলন**-এ সংগৃহীত, পৃ. ৩৯৮।
৯৭. ঐ, পৃ. ৪৩১।
৯৮. **কুলীনকুলসর্বস্ব** পৃ. ৬২–৬৩।
৯৯. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১১৪।
১০০. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৭০, ৭২।
১০১. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৪৭।

আসলে কৌলীন্য নিষ্কর সম্পত্তির মতো যাদের একটা আয় ও সামাজিক প্রতিপত্তির মূলধন হিশেবে কাজ দিয়েছে, বাইরে থেকে আঘাত আসায় তারা এবং কৌলীন্য যশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ—আতঙ্কিত হয়েছে এবং নাস্তিক্য বা খৃস্টানি বলে প্রগতিশীল আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়েছে। এই বিরোধী মনোভাব অবাঞ্ছিত হলেও, অপ্রত্যাশিত নয়।

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, কুলীনদের কায়েমী স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও নবযুগের পরিবর্তিত মূল্যবোধ কিভাবে সমাজে একটি কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী সচেতনতার জন্ম দেয়। প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ না থাকায় অকুলীনদের মধ্যে এই সচেতনতা সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ধর্মশীল এমনি একজন সচেতন অকুলীন ব্রাহ্মণ। কুলীনদের সে যে-সংজ্ঞা দান করে, তা থেকে তার কৌলীন্যবিরোধী মনোভাব স্পষ্টত প্রকাশ পায়:

> পূর্বে কুলীন শব্দে নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এইক্ষণে আর তাহা নাই; কুকার্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন বলে।[১০২]

প্রকৃত পক্ষে, সেকালের বেশির ভাগ কুলীনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞাকে যথার্থ বলে মনে হয়। কুলীন অকুলীনের ভেদাভেদ বিষয়ে সিদ্ধেশ্বরের মনোভাবও এমনি সুবিচার ও যাথার্থ্যের প্রমাণ দেয়---

> যে সকল সদ্‌গুণের জন্য কতকলোক পূর্বকালে কুলীন বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেচে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটীকেও গ্রহণ করে নাই, বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েচে···। সদ্‌-গুণের অভাব-দোষে কতক লোক সেকালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেচে যে তাঁহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েচে ···। বল্লাল সেন মহত্ত্বের সম্মানের জন্য কুলীন-শ্রেণী সংস্থাপন করেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না।[১০৩]

কৌলীন্যের ফাঁপা অহঙ্কার সম্পর্কে বিধবোদ্বাহ নাটকে কুবিক্রম যে মন্তব্য করে,[১০৪] তা নির্লিপ্ত নয়, কিন্তু তার মধ্যে সত্যের অভাব নেই।

কেবল অকুলীনগণই নয়, কুলীনদের ভিতরও এক নবলব্ধ সচেতনতার স্বাক্ষর অনায়াসে লক্ষ্যগোচর হয়। রামব্রহ্ম এমনি একজন কুলীন। বল্লাল সেন সংস্থাপিত প্রথা সম্পর্কে সে বলে, 'বর্তমানে বল্লালী কুলমর্যাদা লৌহশলাকা (বল্লমে) স্বরূপ হইয়া

১০২. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৬৩।
১০৩. **লীলাবতী**, **দীনবন্ধুরচনাসংকলন**-এ সংগৃহীত, পৃ. ৪৩২।
১০৪. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ২২--২৩।

লোকেরদের অন্তর্ভেদ করিতেছে•••আরও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবেক।... বিবাহ ? বিবাহ ? সকল দোষের ও সকল দুঃখের আকর ঘৃণিত বহুবিবাহ ?'[১০৫]

আমরা আগেই দেখেছি, রামব্রহ্ম নিজে অনেকগুলি বিয়ে করেছিলো। কিন্তু নতুন কালের সচেতনতা তার মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। গল্পের খাতিরে আরোপিত অতিরঞ্জন বাদ দিলে তার সঙ্গে এক দশক পরবর্তী কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অনায়াসে তুলনা চলে। রামব্রহ্ম, বস্তুত পক্ষে, পরিবর্তিত মনোভাবাপন্ন বহু কুলীনেরই প্রতিনিধিস্বরূপ।

সমাজের পরিবর্তন কী করে ঘটানো সম্ভব অথবা আন্দোলনের দ্রুত সাফল্য কোন পথে আসতে পারে, সে নিয়ে আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে মনোভাবের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রামব্রহ্মের মতে, রাজনিয়ম দিয়ে কখনোই ধর্ম রক্ষা হয় না।[১০৬] অপর পক্ষে, কুলীনদের বহুবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে ধর্মশীল 'রাজপুরুষের' মনোযোগ কামনা করে।[১০৭] বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে গ্রামে গ্রামে 'বহুবিবাহবিরোধী সভা' স্থাপিত হয়েছে, এবং আইন প্রণয়নের জন্যে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে, নাটকে তারও উল্লেখ আছে।[১০৮] প্রাচীনরা অবশ্য এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করে। বহুবিবাহ নিবারণী সভার অধ্যক্ষের পুত্র পুকুরে ডুবে মারা যাচ্ছিলো, তাকে উদ্ধার করায় প্রাচীন সমাজের পুরুত-নেতা নিজের পিতার উপর মহাবিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়[১০৯] —এ থেকে বোঝা যায় তাদের মনোভাব কী তীব্র প্রতিকূলতায় পূর্ণ ছিলো। আবার কিছু ঘুষ পেয়ে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের সমর্থন করে,[১১০] তারও উল্লেখ আমরা এ নাটকে খুঁজে পাই। টাকা পেয়েই দণ্ডাচার্যের বক্তব্য পাল্টে যায়। ছোটো একটি উক্তির মধ্য দিয়েই এই পরিবর্তিত মনোভাব ধরা পড়ে।

> এই দেখ বহুবিবাহ নিবারণী সভা যাতে খুব জেঁকে ওঠে তাই কর, ওতে বিস্তর উপকার আছে। আমার তিনটি কন্যা একটা কুলীনকে দিতে হয়েছে, তার আবার একশ দেড়শ বিবাহ, একবার উঁকি মেরে দেখে না, দুঃখের কথা বলেবো কি ! মেয়েদের যাতনা দেখলে বুক ফেটে যায়।

১০৫. সপত্নী নাটক, পৃ. ১১২--১৩।
১০৬. সপত্নী নাটক, পৃ. ১১৯-২০।
১০৭. কুলীনকুলসর্বস্ব, পৃ. ৭৮।
১০৮. নবনাটক, পৃ. ৫৮, ৭৫।
১০৯. ঐ, পৃ. ৮০-৮১।
১১০. ঐ, পৃ. ৮৫-৮৬।

সুধীর। এতো আপনি ভাল বুঝেছেন ?

দন্ত। তাই বুঝি সব, কেবল অভিমান বৈত নয়...।[১১১]

কেবল 'কৌলীন্য-অভিমান' নয়, প্রাচীন প্রথার অন্ধ সমর্থনের পেছনে হয়তো স্থানীয় রক্ষণশীল অর্থ-প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোষকতাও একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া কৌলীন্যকে পবিত্র ধর্মীয় বিধান বলে গণ্য করা এই প্রথা থেকে বাঁধা আয় ইত্যাদি নানা কারণে অনেকেই এ প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে দন্তাচার্যের ন্যায় সচেতন হয়েও এই প্রথাকেই আঁকড়ে থাকে। কিন্তু এরা অনেকে একথা বুঝতে পেরেছিলো যে, 'এ সব ভ্রম আর বড় অধিক দিন রহিবে না, কেবল বুড়া কটা মরিবার অপেক্ষামাত্র।'[১১২]

নাট্যকারগণ এই প্রথার শক্ত বাঁধন থেকে সমাজকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে সব সমাধান দেন প্রসঙ্গত তারও উল্লেখ করা যেতে পারে। কৌলীন্য অর্থহীন এবং বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের ব্যক্তিগত গুণাবলীই বিবেচ্য। সুতরাং কৌলীন্যপ্রথাকে অগ্রাহ্য করে অকুলীন গুণবান পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। দীনবন্ধু মিত্র **লীলাবতী** নাটকে এই সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। **কুলীনকন্যা বা কমলিনী**তে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীও একই সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পার্থক্য এই যে **লীলাবতী**তে হরবিলাস কন্যার যাতনা দেখে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং অকুলীন ললিতের কাছে কন্যা দান করতে সম্মত হয়। অপর পক্ষে, রামজয় দিননাথের সঙ্গে কমলিনীর বিয়ে দিতে সম্মত না হওয়ায় কন্যা গৃহত্যাগ করে প্রথমে বিপদে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত দিননাথের সঙ্গে মিলিত হয়। হরবিলাস ঘটনার আবর্তে পড়ে কৌলীন্যর অর্থহীনতা উপলব্ধি করে কিন্তু রামজয় করেনি। হরবিলাস স্বেচ্ছায় বিয়ে দেওয়ায় তার সম্মান রক্ষা পায়, রামজয় বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় তার সম্মান হানি হয়। দুটির মধ্যে কোন পথ শ্রেষ্ঠতর, পাঠক বা নাটকের দর্শক তা অনায়াসে বুঝতে পারেন। হরিশচন্দ্র মিত্র তাঁর **কন্যাপণ কি ভয়ানক** নাটকে এ বিষয়ে যে সমাধান দেখিয়েছেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি প্রস্তাব করেছেন, অকুলীন পাত্র কুলীনকন্যা গ্রহণকালে কৌলীন্যের মূল্যস্বরূপ একটি মর্যাদাপত্র লিখে দেবেন ; তাতে কুলীনকন্যাকে অকুলীন পাত্রে দান করা যাবে, অথচ কৌলীন্যের ফাঁপা একটি মর্যাদাবোধও তৃপ্ত হবে।[১১৩] **কুলীন কুলসর্বস্ব** নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়ন করে এই

১১১. ঐ, পৃ. ৮৭।

১১২. **সপত্নী নাটক** পৃ. ১১৬।

১১৩. হরিশচন্দ্র মিত্র, **'কন্যাপণ কি ভয়ানক'**, মিত্র প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১২৭৭, পৃ. ২৪।

সামাজিক ব্যক্তি দূরীভূত করার আশা প্রকাশ করেছেন।[১১৪] তবে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন শিশিরকুমার ঘোষ তার নয়শো রূপেয়া নাটকে। এ নাটকে বংশজ ব্রাহ্মণদের কন্যাবিক্রয় সমস্যার পাশাপাশি কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ সমস্যার চিত্র অঙ্কন করে নাট্যকার সাতুলালের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বংশজ কুলীনের ভেদাভেদ না থাকলে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়।[১১৫] কোনো কোনো নাট্যকার এরূপ বিচিত্র সমাধানের উল্লেখ করলেও বেশির ভাগ নাট্যকারই কুলীনদের বহুবিবাহ সমস্যার ব্যাপ্তি নির্দেশ করেন, বিশেষ কোনো সমাধান দান করেননি। আসলে এ নাটকগুলির ভিতর দিয়ে সেকালের বহুবিবাহ সমস্যা এবং সে সম্পর্কে সাধারণ নরনারীর মনোভাবই প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে। সবক্ষেত্রে নাট্যকারগণ নির্দিষ্ট সমাধানের কথা আদৌ চিন্তা করেননি।

১১৪. **কুলীনকুলসর্বস্ব**, পৃ. ৭৭--৭৮।

১১৫. শিশিরকুমার ঘোষ, **নয়শো রূপেয়া** (দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ?), পৃ. ৩০-৩১। দিনাজপুর নাজিমউদ্দীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের যে কপিটি রক্ষিত আছে তার নামপত্রটি ছিন্ন। তবে গ্রন্থটি ১৮৯৫ সালের দিকে প্রকাশিত হয়, চতুর্থ মলাটে মুদ্রিত অন্যান্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকে তা বোঝা যায়। এ নাটকের তৃতীয় সংস্করণের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) একটি মাইক্রোফিল্ম পেয়েছিলাম কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ভাগ

কৌলিন্য ও তার অনিবার্য কুফলসমূহ

কুলীন বহুবিবাহের উল্টোপিঠ ঃ শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদের কন্যাবিক্রয় প্রথা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, কৌলীন্য বজায় রাখার জন্যে আবৃত্তি বা পূর্বোক্ত বিবাহ-আইন মেনে চলা আবশ্যক ছিলো। এই আইন ভঙ্গ করলে কুলীনগণ বংশজে পরিণত হতেন।[১] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিশেষ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অকুলীনদের মধ্যে কুলীনপাত্রে কন্যা দান করার রীতি এবং কুলীনদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে কুল ভঙ্গ করে অকুলীন কন্যা গ্রহণ করার রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করায় বংশজ ব্রাহ্মণদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা যতো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, অকুলীন, বিশেষত বংশজ, ব্রাহ্মণদের ভিতর একটি অদৃশ্যপূর্ব সামাজিক সমস্যা ততোই দানা বাঁধতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যা কন্যাবিক্রয় বা কন্যাপণ নামে পরিচিত হয়।

রামমোহন রায় থেকে বিদ্যাসাগর, এমন কি তার পরেও অনেকেই এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয় উভয় সমস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করলেও, এ দুটি সমস্যা যে আসলে একই কারণে উদ্ভূত এবং এদের সমাধানও যে অভিন্ন, এ বিষয়টি তাঁরা স্পষ্টত লক্ষ্য করেননি। বিদ্যাসাগর তাঁর **বহুবিবাহ** গ্রন্থে কৌলীন্য ও বহুবিবাহের তাবৎ অনিষ্টকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন; কন্যাবিক্রয় রীতিরও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমস্যা দুটি যে একই সূত্রে গ্রথিত, তা তাঁরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। অথচ একটু ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালেই এই সমস্যাদ্বয়ের ঐক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বঙ্গদেশের কুলীন, শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণদের মোট স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা জেনেটিক্স-এর সূত্র অনুসারে কমবেশি সমান, এটা অনুমান করতে পারি।[২] কিন্তু কুলীনরা ইচ্ছে করলে শ্রোত্রিয় ও বংশজ কন্যা বিয়ে করতে পারেন এবং শ্রোত্রিয় ও বংশজগণ কুলমর্যাদা লাভের আশায় কুলীনদের কাছে কন্যা দানে আগ্রহী, অপর পক্ষে, কুলীনকন্যা বংশজ বা শ্রোত্রিয় পাত্রের নিকট এবং শ্রোত্রিয়কন্যা বংশজ

১. সংজ্ঞানুসারে তিন শ্রেণীর বংশজ হতে পারে—শ্রোত্রিয় বা গৌণ কুলীন পাত্রে কন্যাদানকারী, গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণকারী, এবং বংশজ কন্যাগ্রহণকারী কুলীন। **বহুবিবাহ** প. ৩৭৩।

২. লোকগণনার প্রতিবেদনে কুলীন, শ্রোত্রিয় এবং বংশজ প্রত্যেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নারী-পুরুষের সংখ্যা কতো ছিলো তা উল্লিখিত হয়নি।

পাত্রের নিকট দান করা অসম্ভব ব্যাপার—কুলমর্যাদার এই বৈষম্যমূলক রীতির জন্যেই একদিকে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ করার প্রথা বিস্তৃতি লাভ করে ; অন্যদিকে শ্রোত্রিয় ও বংশজদের মধ্যে কন্যার অভাব দেখা দেয়। পাটীগণিতের সাধারণ নিয়ম দিয়েই এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে মোট বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর সংখ্যা সমান হলে এবং কুলীন পাত্ররা অনেকগুলি করে বিবাহ করলে, স্বাভাবিকভাবেই অকুলীন পাত্রদের জন্যে কন্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হবে। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (১৮৭১) বহুবিবাহকারী কুলীনদের দুটি তালিকা দিয়েছেন। প্রথম তালিকায় উল্লিখিত ১৯৭ জন কুলীন মোট ২২৮৮টি বিয়ে করেন।[৩] এর ফলে দ্বিসহস্রাধিক অকুলীন পাত্রের জন্যে পাত্রীর অভাব ঘটার কথা।[৪]

যে সমাজে বর জোগাড় করতে হয় বহু সাধ্যসাধনা এবং অর্থ ব্যয় করে, সেই সমাজেরই একাংশে চড়া দাম দিয়ে পাত্রী ক্রয় করার কারণ কী, এটা E. A. Gait-এর কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। তিনি অনুমান করেন, হয়তো নিম্নশ্রেণীর পাত্রদেরই এরূপ কন্যাপণ দিতে হতো।[৫] কিন্তু কন্যা সংকটের কারণ যে আসলে অন্যত্র নিহিত, তা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদেই লক্ষ্য করেছি।

কুলীনদের বহুবিবাহ করার ফলে অকুলীন পাত্রদের জন্যে কন্যার অভাব ঘটে। এই পরিস্থিতিকেই অকুলীন কোনো কোনো কন্যাদাতা লাভজনকভাবে নিজেদের কাজে লাগান। এঁরা অর্থ ব্যয় করে কুলীনের কাছে নিজেদের কন্যা বিবাহ না দিয়ে বরং উল্টো অর্থ গ্রহণ করে অকুলীনের কাছে নিজেদের কন্যা দান করতে আরম্ভ করেন। বহুবিবাহের প্রাদুর্ভাববশত কন্যার অভাব যতো তীব্র হয়ে ওঠে, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুসারে কন্যাপণও ততো চড়তে থাকে। ফলে আর্থিক প্রলোভন বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের বহু পরিবারকেই কন্যাবিক্রয়ী পরিবারে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে, কুলীনদের বহুবিবাহের মতোই কন্যাবিক্রয় প্রথা অকুলীনদের ব্যবসায় ও জীবিকা অর্জনের উপায় বলে গণ্য হতে থাকে।[৬] অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই প্রথা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশের কোনো কোনো জমিদার, সম্ভবত কুলরীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত, এই প্রথা তাঁদের স্ব স্ব এলাকায় নিষিদ্ধ

৩. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৪০৩-০৯, ৪১০-১৩।

৪. লোকগণনার প্রতিবেদন অথবা অন্য কোনো পরিসংখ্যান থেকেই এই সমস্যার গুরুত্ব বোঝার উপায় নেই। কারণ সেখানে কুলীন-অকুলীন ভেদ রক্ষিত হয়নি।

৫. **Census of India, 1901**, Vol. VI, Pt. I, p. 253.

৬. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৩০৫।

করেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর নাম বিশেষভবে উল্লেখযোগ্য।[৭] কিন্তু এই প্রথার প্রাদুর্ভাব ঘটে সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতেই।

১৮৩৬ সালের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে এ জাতীয় কন্যাবিক্রয়ের উল্লেখ করে পত্রলেখক কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন। তা থেকে দেখা যায়, কন্যার দারুণ অভাবহেতু, অনেক সময় নীচ শ্রেণীর, এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অজ্ঞাত-কুলশীল কন্যাদেরও কম দামে কিনে এনে ব্রাহ্মণকন্যা বলে চড়া দামে অন্যত্র বিক্রি করতো।[৮] এই কন্যাদের কোনো কোনো অঞ্চলে 'ভরার মেয়ে' বলে আখ্যায়িত করা হতো।[৯] অজ্ঞাতকুলশীল কন্যাদেরও এরূপ সমাদর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, কন্যার অভাব তখন খুবই তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিলো।

এই অভাবের সুযোগ কন্যাবিক্রেতা অভিভাবকগণ ষোলো আনা গ্রহণ করতেন। এবং সেকালের তুলনায় উচ্চ মূল্যে কন্যাদের বিক্রি করতেন। পাত্রের কুলগত ও সামাজিক স্ট্যাটাস যতো নীচু এবং কন্যার কুলগত ও সামাজিক স্ট্যাটাস যতো উঁচু হতো, পণের অঙ্ক ততো বৃদ্ধি পেতো বলে মনে হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই পাত্র-অপাত্রের বিবেচনা করা হতো না। কন্যার পিতা মনের-মতো অর্থ পেলে পাত্রের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স প্রভৃতি কিছুই আর বিচার করতেন না।[১০] এবং চার-পাঁচজন ক্রেতা থাকলে নিলাম ডাকের ন্যায় সর্বোচ্চ অর্থদাতাকেই কন্যা দান করা হতো। এমন কি ১৫০ টাকা দিতে প্রস্তুত এমন পাত্র রূপে গুণে আদর্শ স্থানীয় হলেও লোভী কন্যাকর্তা ১৬০ টাকা দিতে প্রস্তুত এমন শত দোষের আকর পাত্রকেই কন্যা দান করতেন, বলে দাবি করা হয়েছে।[১১]

পণের পরিমাণ কন্যার বয়সের উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিলো। একেবারে শিশু একটি কন্যা একশ টাকায় পাওয়া গেলে, বালিকা কন্যা কমপক্ষে তার তিন-চার

৭. ঐ; **F. Buchanan, A Geographical, Statistical, and Historical Description of the District, or Zila of Dinajpur in the Province, or Subah of Bengal** (Calcutta, 1833), p. 96.

৮. **সমাচার দর্পণ**, ২৪ অগস্ট ১৮২২, ৫ মার্চ ১৮২৫, **সাবাস** ১, পৃ. ১১২-১৩, ১১৪-১৫, **সমাচার দর্পণ**, ১ ফেব্রুআরি ১৮৩১, ১৭ জুন, ১৮৩৭, **সাবাস** ২, পৃ. ২৪৩-৪৬, ২৫৪-৫৬।

৯. হরিশচন্দ্র মিত্র, **কন্যাপণ কি ভয়ানক**, পৃ. ৩৩১।

১০. 'দেশাচার : কন্যাবিক্রয়', **বামাপ**, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩ (মে-জুন ১৮৬৬), পৃ. ২৭৩, 'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ—কন্যাপণ', **ভারত সুহৃদ**, ভাদ্র ১২৮৩ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৭৬) পৃ. ১৪৫।

১১. প্যারীচরণ সরকার, 'আসুরবিবাহ—কন্যাবিক্রয়', **হিতসাধক**, ফাল্গুন, ১২৭৪, পৃ. ৪০-৪১, ৪৩।

গুণ দামে বিক্রি হতো।[১২] আট-ন বছরের কন্যার জন্যে পাত্রকে সেকালে সাত-আট শ থেকে আরম্ভ করে হাজার টাকা পর্যন্ত পণ দিতে হতো। কিন্তু কিশোরী কন্যার দাম বারো শ টাকা পর্যন্ত গড়াতো—এমন কথা জানা যায়।[১৩] হান্টারের মতে, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্ররা একটি বালিকাকন্যার জন্যে ১৮৭০-এর দশকে সাত শ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হতেন।[১৪]

শ্রোত্রিয় এবং বংশজদের মধ্যে অর্থলোভে কন্যাকে যুবতী করে বিয়ে দেওয়াও মোটেই অসাধারণ ব্যাপার ছিলো না।[১৫] তবে সাধারণত যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্বেই কন্যাদের বিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার দাম বৃদ্ধি পেতো বলে, অনেক অভিভাবক সে যুগের তুলনায় বেশি বয়সে কন্যার বিয়ে দিতেন।[১৬]

আলোচ্য কালে সাত-আট শ টাকা সাধারণ মানুষের কাছে রীতিমতো বিপুল পরিমাণ অর্থ বলে বিবেচিত হতো।[১৭] দরিদ্র শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদের অনেকের পক্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করে বিবাহ করা সম্ভব হতো না। ফলে অনেকেই সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হতেন।[১৮] এভাবে অনেক শ্রোত্রিয় এবং বংশজ পরিবার লুপ্ত হয় বলেও শোনা যায়।[১৯]

আবার কেউ কেউ বিয়ে করতে না পেরে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত হয়তো কোনো নিম্নশ্রেণীর মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রাখতো। তারপর বৃদ্ধ বয়সে সারা জীবনের সম্বল ও সঞ্চয়টুকু বিক্রয় করে হয়তো দু-তিন বছরের একটি শিশু

১২. ঐ, পৃ. ৪১।

১৩. 'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ—কন্যাপণ', **ভারত সুহৃদ**, পৃ. ১৫০।

১৪. W.W. Hunter, **A Statistical Account of Bengal**, V, 288.

১৫. শিশিরকুমার ঘোষের **নয়শো রুপেয়া**, নাটকের নায়িকা সরলাকে রীতিমতো যুবতী বলে মনে হয়।

১৬. 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', **অবোধবন্ধু**, ভাদ্র ১২৭৬ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৬৮), পৃ. ৯৮।

১৭. প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৮৭০-এর দশকের প্রারম্ভে একজন দিনমজুর দিনে মাত্র দুআনা অর্থাৎ মাসে পৌনে চার টাকা আয় করতো এবং চালের দাম তখন মণ প্রতি পাঁচ সিকে থেকে সাত সিকের মধ্যে ওঠা-নামা করতো। দ্রষ্টব্য : **A Statistical Account of Bengal**, IX, 110, 112.

১৮. Buchanan, p. 96; **A Statistical Account of Bengal**, I. 288.

১৯. তারাশঙ্কর শর্মণের পত্র, **সমাচার দর্পণ**, ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯, সসেক ২, পৃ. ২৫১। 'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ—কন্যাপণ', **ভারতসুহৃদ**, পৃ. ১৪৫-৪৬; কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা**, পৃ. ২৫।

কন্যাকে বিয়ে করে আনতেন।[২০] প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে অবিবাহিত ব্যক্তিরা অনেকেই বংশ লোপ পাওয়ার আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে একটি কন্যা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করতেন আর এজন্যেই নিজেদের যথাসর্বস্ব পণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। উপরন্তু আরো দুটি উপায় অনেকে অবলম্বন করতেন। কেউ কেউ ঋণ করে বিয়ে করতেন এবং চিরজীবন সেই ঋণ শোধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন।[২১] কেউ বা 'পরিবর্ত' অথবা 'বিনিময়' বিবাহ করতেন।

পরিবর্ত বা বিনিময় বিবাহ পদ্ধতি সে যুগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিলো বলে মনে হয়।[২২] বিশেষত কন্যাবিক্রয়বিষয়ক নাটকগুলি থেকে এ প্রথার জনপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়। এই রীতি অনুযায়ী অবিবাহিত কোনো প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ দৈবাত কোনো বালিকার---ধরা যাক---ভ্রাতুষ্পুত্রীর রক্ষক হলে, তাকে একটি পাত্রে সম্প্রদান করে, বিনিময়ে সেই পাত্রের কোনো আত্মীয়-কন্যাকে নিজে বিয়ে করতেন।[২৩] এরূপ ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকেই পণ দিতে হতো না বলে, এ বিষয়কে 'পরিবর্ত বে' বা বিনিময় বিবাহ বলা হতো। অনেক সময় দেখা যেতো, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে এক ভাই হয়তো বিয়ে করতেন, শর্ত থাকতো ভাই-এর কন্যা হলে সেই কন্যাদের বিনিময়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা পরিবর্ত বিবাহ করবেন।[২৪]

পরিবর্ত বিবাহের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্ক বিচার সামান্যই হতো। সম্পর্কে বাধে এমন ক্ষেত্রেও 'পরিবর্ত বিবাহ' হতো বলে জানা যায়। বৃদ্ধ পিতা দ্বিতীয় বার এবং যুবক পুত্র প্রথম বার দুই ভগ্নীকে পরিবর্ত বিবাহ করেন, এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হয়েছে।[২৫]

সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে বা ঋণ করে বিবাহ করার ফল প্রায়শ অত্যন্ত শোচনীয় হতো। এমন অবস্থায় একদিকে পরিবারের ভরণপোষণ ও সামাজিক মান রক্ষা এবং অন্যদিকে প্রভূত ঋণ শোধের কঠোর সমস্যা ভুক্তভোগীদের বিব্রত ও সংকটাপন্ন করতো। শেষে কেউ কেউ সদাচার বিস্মৃত হয়ে যে কোনো রকমের অন্যায় এবং অপরাধ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।[২৬] কন্যাকর্তা ভাবী জামাতার স্থাবর-অস্থাবর

২০. 'বঙ্গীয় বিবাহ', **জ্ঞানাঙ্কুর**, আশ্বিন ১২৮১, পৃ. ৫০৭-০৮।
২১. 'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ—কন্যাপণ', **ভারত সুহৃদ**, পৃ. ১৪৬।
২২. **Census of India, 1901**, Vol. VI, Pt. I, p. 253.
২৩. 'বঙ্গীয় বিবাহ', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৃ. ৫০৬-০৭।
২৪. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা**, পৃ. ২৫।
২৫. **Census of India, 1901**, Vol. VI, Pt. I, p. 253.
২৬. 'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ—কন্যাপণ', **ভারত সুহৃদ**, পৃ. ১৪৬।

যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করে কন্যার বিবাহ দিলে কন্যাও আদৌ সুখী হতে পারতো না। বিবাহের পর কন্যা স্বামীগৃহে গিয়ে অন্নবস্ত্র থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই অভাবে জর্জরিত হতো। বস্তুত, কন্যাবিক্রয়ী 'দস্যু' শ্বশুরের হাতে পড়ে নিরীহ নিরপরাধ জামাতা আপন সহায়-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুখ এবং আশাও বিসর্জন দিতেন।[২৭] সত্যি সত্যি কন্যার পিতা জামাতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করার সময়ে কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেই ভাবিত হতেন না। বরং মনকে এই বলে প্রবোধ দিতেন যে, 'সুখদুঃখ অদৃষ্টাত্ত্ব (Sic) কন্যার অদৃষ্টে সুখ থাকে হইবে, তজ্জন্য আমি এত ক্ষতি স্বীকার করিব কেন?'[২৮] কেবল কন্যা নয়, কন্যার স্বামী, সন্তান—সমগ্র পরিবারই হয়তো শ্বশুরের প্রলোভনের ফলে চিরকালের জন্যে দারিদ্র্যের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতো।

কন্যাবিক্রয় প্রথা প্রচলিত থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে বাল্যবিবাহও স্ফূর্তি পেতো। অনেক কন্যা-ক্রেতা শিশু-কন্যা কিনতে চাইতেন, কেননা তাতে দাম কম দিতে হতো। কন্যার পিতারাও কেউ কেউ নগদ বিদায়ের আশায় সাত-আট বছর পর্যন্তও অপেক্ষা করতেন না। বরং ভাবতেন, 'কন্যার বয়ঃক্রম ইহা অপেক্ষা অধিক হইলেও হয়ত এত অধিক টাকা আর কেহই দিতে চাহিবে না, অথবা তৎকালে যদি ক্রেতৃগণের অল্পতা হয়,...কন্যাটির কোনরূপ অত্যহিত ঘটিলেও ঘটিতে পারে' এবং নিতান্ত শৈশবেই কন্যার বিবাহ দিতেন।[২৯] কন্যার চড়া দাম এভাবে বাল্যবিবাহকে প্রশ্রয় দিতো।

প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের সঙ্গে শিশু বা বালিকা-কন্যার বিবাহের ফলে স্বাভাবিকভাবেই বৈধব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো।[৩০] প্রায়ই দেখা যেতো, বিয়ের পনেরো-বিশ বছরের মধ্যে যখন বৃদ্ধ স্বামী মারা যেতেন, তখন স্ত্রী কেবল যৌবনে উপনীত হয়েছেন।[৩১] এই স্ত্রীরা বাকি জীবন সন্তানদের নিয়ে স্বামীর ঋণের বোঝা বহন এবং বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতেন।

স্বামীর জীবদ্দশায়ও অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক বা সুস্থ থাকতো না। স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের বিপুল ব্যবধান অথবা স্বামীর অতীব দারিদ্র্য কোনোটাই দাম্পত্যপ্রণয়ের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রচনা করতো না।[৩২] তা ছাড়া, পরবর্তী

২৭. প্যারীচরণ সরকার, 'আসুর বিবাহ—কন্যাবিক্রয়', পৃ. ৪৪-৪৫।
২৮. 'সমাজতত্ত্ব: বিবাহ—কন্যাপণ', ভারত সুহৃদ, পৃ ১৫০।
২৯. প্যারীচরণ সরকার, 'আসুর বিবাহ—কন্যাবিক্রয়', পৃ. ৪১।
৩০. ঐ. পৃ. ৪৩-৪৪; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩০৫।
৩১. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা, পৃ. ২৫।
৩২. প্যারীচরণ সরকার, 'আসুর বিবাহ—কন্যাবিক্রয়', পৃ. ৪২-৪৩।

আলোচনায় দেখতে পাবো, চড়া দাম দিয়ে কেনা বলে স্বামী স্ত্রীকে কখনো কখনো ক্রীতদাসীর মতো গণ্য করতেন। এ মনোভাবও প্রণয় সৃষ্টির আনুকূল্য করতো না।

যে শ্বশুর ভাবী জামাতার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করে কন্যাদান করতেন, তাঁর সঙ্গে জামাতার সম্পর্ক সাধারণত ভালো হতো না। বরং কন্যাদানের নাম করে নিঃস্ব করার ক্ষোভে শ্বশুরের প্রতি জামাতার আক্রোশ এবং বিদ্বেষেরই সৃষ্টি হতো।[৩৩] এর ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহে শান্তি বিঘ্নিত হতো।

সমস্যার প্রতি সচেতনতার উন্মেষ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই অন্যান্য অনেকগুলি সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে, কন্যাপণ সম্পর্কেও সমাজকর্মীদের সচেতনতা জেগে ওঠে। সচেতন ও সহানুভূতিশীল একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে রামমোহন রায় যে ১৮২০-এর দশকেই এ সমস্যার প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন, এটা কোনো বিস্ময়ের কথা নয়। কেবল মনোযোগ দান করাই নয়, রামমোহন রীতিমতো শাস্ত্র বিচার করে প্রমাণ করেন যে, কন্যা বিক্রয় করা অথবা কন্যা ক্রয় করে বিবাহ করা উভয়ই ধর্মীয় বিধান অনুসারে মহাপাপাচার এবং এ রকমের স্ত্রী আদৌ স্ত্রী বলে গণ্য হতে পারেন না। এবং তাঁর গর্ভজাত পুত্রও ঔরস পুত্র বলে গণ্য হতে পারে না।[৩৪]

সমাচার দর্পণ ও সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকাও তৃতীয় দশকের গোড়া থেকেই কুলীনদের বহুবিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কন্যাবিক্রয় রীতিরও নিন্দা করতে থাকে। ১৮৩০ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখের সমাচার দর্পন পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদক কন্যাবিক্রয় প্রথার প্রতি পাঠকদের সচেতনতা জাগ্রত করার প্রয়াস পেলে[৩৫] পাঠকদের মধ্যে অনেকেই সমস্যাটির বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব বিষয়ে নিজেদের মতামত সমাচার দর্পণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন।[৩৬]

ইয়ংবেঙ্গলগণও এই দশকেই কন্যাবিক্রয় প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে আন্দোলন আরম্ভ করেন। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার মাধ্যমে এঁরা এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সমাজবাসীদের চৈতন্য উদ্রেক করার চেষ্টা করেন।[৩৭]

৩৩. প্যারীচরণ সরকার, 'আসুর বিবাহ—কন্যাবিক্রয়', পৃ. ৪৪-৪৫।

৩৪ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩০৫।

৩৫. **সমাচার দর্পণ**, ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০, সসেক ২, পৃ. ২৪২।

৩৬. উদাহরণস্বরূপ ১২ ও ১৯ ফেব্রুআরি ১৮৩১, ২১ মার্চ ১৮৩৫ এবং ৪ মার্চ ১৮৩৭ তারিখের **সমাচার দর্পণে** প্রকাশিত পাঠকদের পত্রসমূহ দ্রষ্টব্য। সসেক ২, পৃ. ২৪৩-৪৬, ২৫৩-৫৪।

৩৭. **জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার দর্পণ**, ১৭ই জুন ১৮৩৭,-এ উদ্ধৃত সসেক ২, পৃ. ২৫৪-৫৬।

১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের নাটকের মাধ্যমে এবং পরবর্তী দু দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বহু সমাজ-সংস্কারকই নানা রচনার দ্বারা কন্যাপণ প্রথা এবং তার কুফল বিষয়ে সমাজবিবেককে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন।

কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রচলন কিংবা বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলনের তুলনায় বর্তমান আন্দোলন গণ্ডিবদ্ধ ছিলো নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি পরিধির মধ্যে। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, তা-ও পূর্বোক্ত আন্দোলনের তুলনায় একান্তভাবে সীমিত ছিলো বলে মনে হয়। আসলে বিধবাবিবাহ অথবা বহুবিবাহ যেমন তুলনামূলকভাবে সমাজের একটা বড়ো অংশের সমস্যা ছিলো, কন্যাবিক্রয় রীতি তেমন ছিলো না। এ আন্দোলনের সমর্থনে প্রকাশিত রচনার সংখ্যা এজন্যেই বেশি নয়। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক রচনায় যতোটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, সমস্যাটি ক্ষুদ্র একটি পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, তার তীব্রতা নগণ্য ছিলো না।

সমস্যার এই গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে বিভিন্ন সমাজকর্মী কতোগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কলকাতার প্রধানত রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা,[৩৮] ফরিদপুরের বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণী সভা, বরিশালের রায়েরকাটী নামক স্থানের বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণী সভা এবং বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান[৩৯] কন্যাপণ প্রথা নিবারণ করার জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। এসব প্রতিষ্ঠান কন্যাবিক্রেতা পিতাদের প্রতি সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে, বিনা পণে কন্যাদান করার জন্যে কন্যাদাতাদের উৎসাহিত করে এবং সরকারের নিকট আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে।[৪০]

এই প্রসঙ্গে আলোচ্যকালের কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের অবদানের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। শান্তিপুরের দীনদয়াল এমনি একজন সংস্কারক। কন্যাবিক্রয় প্রথা লোপ করার জন্যে তিনি বিস্তর যত্ন করেন এবং কোথাও কোথাও যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেন। কন্যাবিক্রয়ের অপরাধে কয়েকজনকে তিনি সমাজের

৩৮. **সোমপ্রকাশ**, ২০ আষাঢ় ১২৭৮, সাবাস ৪, পৃ. ২৩৭।

৩৯ **বামাবোধিনী পত্রিকা**, কার্তিক, ১২৭৭, পৃ. ২২১-২২।

৪০. দ্রষ্টব্য : কালিদাস মুখোপাধ্যায়, **কৌলীন্য প্রথা সংশোধনী সভা**, ফরিদপুর (কলিকাতা, ১৮৭১)।

সহায়তায় অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও জাতিচ্যুত করেন।[৪১] ফরিদপুরে বহুবিবাহ ও কন্যা-বিক্রয় নিবারণী সভা স্থাপন করেন সেখানকার ছোটো আদালতের জজ কালীকিঙ্কর রায়। তাঁর আন্দোলনেরও আংশিক সাফল্যের কথা জানা যায়।[৪২] রায়েরকাটীর বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণী সভা স্থাপিত হয় স্থানীয় জমিদার মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরীর উদ্যোগে।[৪৩] এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করেন রাসবিহারী মুখো-পাধ্যায়।[৪৪] প্রকৃত পক্ষে, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে কন্যাপণ সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বহুব্যক্তি এবং বেশ কিছু সংখ্যক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলন অথবা বহুবিবাহ নিবারণের প্রতি বৃহত্তর সমাজের প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রাখলে, কন্যাপণ নিবারণ আন্দোলনের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়াকে অনেক অনুকূল বলে গণ্য করতে হয়। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কে যে ধর্মীয় ভাবা-নুষঙ্গ ও দেশাচার প্রচলিত, তা কাটিয়ে ওঠা সমাজের প্রধানাংশের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। অন্যদিকে কন্যাপণ সম্পর্কে কন্যা বিক্রেতাগণ ছাড়া সাধারণ মানুষের আদৌ কোনো সহানুভূতি ছিলো না, এ বিষয়ে ধর্মীয় ও দেশাচারমূলক কোনো পিছু-টানও ছিলো না। বরং সাধারণ মানুষরা এ প্রথাকে নিন্দার চোখেই দেখতো। কিন্তু আর্থিক প্রলোভনবশত এই প্রথার প্রতি কন্যাবিক্রেতাদের যে প্রবল সমর্থন ছিলো, তা দূর করা সহজ ব্যাপার ছিলো না। অবশ্য সমাজের সামগ্রিক সচেতনতার ফলে ধীরে ধীরে এই প্রথা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষত সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ প্রথার জন-প্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায়, কন্যাবিক্রয় রীতিও স্বভাবতই জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তবে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ রীতি যে কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত ছিলো, তা জানা যায়। এ সময়ে পণের অঙ্ক কমে গিয়ে পাঁচশ টাকাই প্রামাণ্য হার বলে গণ্য হয়।[৪৫]

বাংলা নাট্যরচনায় কন্যাপণ সমস্যাবিষয়ক সচেতনতার প্রতিফলন

আগেই উল্লিখিত হয়েছে বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত কন্যাবিক্রয় সমস্যা খুব জটিল হলেও, সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশকেই স্পর্শ করেছিলো। এ জন্যেই এ সমস্যা নিয়ে খুব বেশি নাটক রচিত হয়নি। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই সমস্যার প্রথম

৪১. **বামাবোধিনী পত্রিকা,** কার্তিক ১২৭১, পৃ. ২১২।
৪২. দ্রষ্টব্য : কালিদাস মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৪৩. **বামাবোধিনী পত্রিকা,** কার্তিক ১২৭৭, পৃ. ২১২।
৪৪. **রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত,** পৃ. ৮৩।
৪৫. **Report on the Census of India, 1901,** Vol. VI, Pt. I, p. 253.

উল্লেখ লক্ষ্য করি **কুলীনকুলসর্বস্ব** নাটকে। তিনি দেখিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি পাঁচটি মেয়ে বিক্রি করে 'কোঠাবাড়ি' করেছে। অন্যদিকে আরেক মহিলার সবকটি সন্তানই পুত্র বলে নিদারুণ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়। কন্যাসন্তান না হওয়ায় তার স্বামী তাকে প্রহার করে। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করা, সে জন্যেই তিনি কন্যাবিক্রয় রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো চিত্র অঙ্কন করেননি। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের **বিধবোদ্বাহ** নাটকে এই সমস্যার প্রতি কেবলমাত্র ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪৬] কন্যাবিক্রয় প্রথাকেই ষোলো আনা গুরুত্ব দিয়ে প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের **কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে**।[৪৭] এরপর এক দশকের ভিতর এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি নাটক-প্রহসন প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে নফরচন্দ্র পালের **কন্যাবিক্রয়** নাটক,[৪৮] জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের **আসুরোদ্বাহ** নাটক,[৪৯] হরিশচন্দ্র মিত্রের **কন্যাপণ কি ভয়ানক** নাটক, বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের **বরের কাশীযাত্রা** নাটক,[৫০] এবং শিশিরকুমার ঘোষের **নয়শো রূপেয়া** নাটক প্রধান। এ ছাড়া বিপিনমোহন সেনগুপ্তের **হিন্দু মহিলা** নাটক, 'কপ্লিন হিন্দু

৪৬. **বিধবোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৪৫।

৪৭. ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, **কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে** (কলিকাতা, ১৮৬৩)। আমি নিজে এ নাটকটি দেখতে পাইনি। বাংলা নাটক-প্রহসনের সমালোচকদের মধ্যে একমাত্র জয়ন্ত গোস্বামীই এ নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর **সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন** (কোলকাতা, ১৯৭৪) গ্রন্থ থেকে আমি এ নাটকের বিষয়বস্তু জানতে পেরেছি।

৪৮. নফরচন্দ্র পাল, **কন্যাবিক্রয় নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬৪)। ডক্টর সুকুমার সেন ও জয়ন্ত গোস্বামী এ নাটকের প্রকাশকাল ১৮৬৩ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য: **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ড (ষষ্ঠ সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৭০-৭১), পৃ. ৫৯; জয়ন্ত পৃ. ৫৯২, ১২৩৫। আসলে তাঁরা কেউই এ নাটকটি দেখেননি, সম্ভবত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে এই তারিখ উল্লেখ করে থাকবেন।

৪৯. জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ (ছদ্মনাম), **আসুরোদ্বাহ নাটক**, (কলিকাতা, ১৭৭৬ বঙ্গাব্দ)। জয়ন্ত গোস্বামী গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: জয়ন্ত, পৃ. ৫৬১-৬৬। তিনি বইটি স্বচক্ষে দেখেছেন কিনা জানিনে। আগাগোড়া নাটকের নামটি তিনি ভুল লিখেছেন এবং কাহিনীর মধ্যেও দু-একটি জিনিস মূলানুগ নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর **বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন** (কলিকাতা, ১৯৬৪) গ্রন্থেও অনুরূপ অশুদ্ধ বানান লিখেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য পূর্বোক্ত জয়ন্ত গোস্বামীর গবেষণা নির্দেশক ছিলেন এবং জয়ন্ত গোস্বামীর গ্রন্থের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন। অনুমান করি তিনি জয়ন্ত গোস্বামীর কাছ থেকেই উপাদান পেয়েছিলেন, নিজে মূল নাটকটি দেখেননি।—পৃ ২৫৪।

৫০. বনমালী চট্টোপাধ্যায়, **বরের কাশীযাত্রা** (কলিকাতা, ১৮৬৮)।

মহীলার' বল্লালী খ্যাত নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের **নবনাটক** প্রভৃতি নাট্যরচনায়ও কন্যা বিক্রয় সমস্যার উল্লেখ ও সমালোচনা আছে। এ সব নাটক প্রকাশের সময় ও নাটকের সংখ্যাভিত্তিক একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করলে দেখা যায় ১৮৬৩ থেকে ১৮৭২– এই দশকেই বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে নাট্যকারগণ তাঁদের সচেতনতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৮৭২ সালের পরে সম্ভবত এ সমস্যার প্রকোপ হ্রাস পায় এবং দীর্ঘকাল আর এ বিষয়ে কোনো নাটক-প্রহসন রচিত হয়নি।[৫১]

সম্মিলিতভাবে এই নাটক-প্রহসনগুলি কন্যাবিক্রয় প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জনচিত্তে একটি সচেতনতার উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিলো বলে মনে হয়। বিশেষত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে **নয়শো রূপেয়া** নাটকের পুনঃ পুনঃ সফল অভিনয়[৫২] দর্শকদের মনে এই প্রথা সম্পর্কে একটা ঘৃণাবোধ জাগ্রত হওয়ার পরোক্ষ প্রমাণ। পঠিত গ্রন্থ হিশেবেও **নয়শো রূপেয়া** যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, লক্ষ্য করা যায়। সেকালের নাটকের পক্ষে যা দুর্লভ ভাগ্য– এ নাটকটির কম পক্ষে তিনটি সংস্করণ হয়েছিলো।[৫৩] অন্যান্য নাটক-প্রহসনগুলির মধ্যে **কুলীনকুলসর্বস্ব** ও **নবনাটক** বহুবার অভিনীত এবং একাধিকবার মুদ্রিত হয়। সুতরাং এসব অভিনয়ের দর্শকগণ এবং মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠকগণ স্বভাবতই এই প্রথার কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়। **আসুরোদ্বাহ** নাটকের একাধিক সংস্করণ হয়নি অথবা নাটকটি আদৌ অভিনীতও হয়নি, কিন্তু সেকালের তুলনায় এই নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। *Calcutta Review* পত্রিকায় সমকালীন অসংখ্য মূল্যহীন নাট্যরচনার তুলনায় এ নাটকের প্রশংসা করা হয়। বিশেষত নাট্যকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ তা উল্লিখিত হয়।[৫৪] ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, 'ইহা পাঠ করিয়া যদি এক ব্যক্তির মনেও কন্যাবিক্রয়ের দোষ উপলব্ধি হইয়া তৎপ্রতিকার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল হইল বোধ করিব।'[৫৫] প্রকৃত পক্ষে, এই নাটক পড়ে কোনো পাঠকের মনে কন্যাবিক্রয় প্রথা সম্বন্ধে সচেতনতার উদ্রেক হয়েছিলো কিনা, তার প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় না নাট্যকারের শ্রম সফল হয়েছিলো কিনা। কিন্তু তিনি যে কন্যাবিক্রয়ের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করার জন্যে যথার্থই শ্রম স্বীকার করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫১. রাধাবিনোদ হালদার, **ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি** (কলিকাতা,১৮৮৬) নাটক একটি ব্যতিক্রম।
৫২. **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃ. ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪।
৫৩. এ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩-২৪)
৫৪. 'Critical notices', **Calcutta Review**, Vol. II, No. 98 (1969), p.239.
৫৫. **আসুরোদ্বাহ নাটক**, পৃ. বিজ্ঞাপন ১।

এ সব নাট্যরচনায় কন্যাবিক্রয় রীতির যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা এ অধ্যায়ের প্রথমাংশের অনুরূপ। বস্তুত, সমাজ সংস্কারকগণ এই প্রথার অনিষ্টকারিতা বিষয়ে যে সকল বক্তব্য পেশ করেছিলেন, এসব নাটক-প্রহসন সেগুলিরই পোষকতা করে।

কন্যার অভাবে এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে কন্যা ক্রয় করে বিবাহ করার সামর্থ্যের অভাবে অনেক শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণের যে আদৌ বিয়ে হতো না, আলোচ্য নাট্যরচনা-সমূহে তা বারংবার দেখানো হয়েছে। নয়শো রূপেয়ায় কান্তিচন্দ্র ও তার কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতার বংশ লোপ হওয়ার উপক্রম হয় কন্যার অভাবে। কান্তিচন্দ্র অন্য তিন ভাই-এর সম্পত্তি বিক্রি করে একটি বিয়ে করেছিলো। কথা ছিলো তার কন্যা হলে সেই কন্যাদের একে একে বিক্রি করে তিন ভাই বিয়ে করবে। কিন্তু অকালে কান্তিচন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, সকল ভাই-এর বংশ রক্ষার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। এখন, কান্তিচন্দ্রের ভাষায়, 'চার ভাই ভাগে যোগে কাজ করি। কেও তরকারী বানাই, কেও জল আনি, কেও রান্ধি, বাড়িতে মেয়ে মানুষ নাই, ছেলেপিলেও নাই। কয় ভাই সুখে স্বচ্ছন্দে আছি।' কান্তি-চন্দ্র কপট 'সুখস্বাচ্ছন্দ্যে'র কথা উল্লেখ করলেও, সাতুলাল যথার্থই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, 'চারি চারিটা ভাই, এক্কি কারও বংশ থাকিবে না?'[৫৬]

সাতুলালের নিজের অবস্থাও শোচনীয়। তারা দু ভাই। দু ভাই-এর সম্পত্তি বিক্রি করে বড়ো ভাই রামধন মজুমদার বিয়ে করেছিলো। কিন্তু সাতুলাল নিজে বুড়ো হয়ে গেলেও বিয়ে করতে পারেনি। রামধনের কন্যা সরলা যুবতী হয়েছে, এখন তার বিয়ে হলে যে অর্থ লাভ হবে, তা দিয়ে সাতুলাল বিয়ে করতে পারবে।

কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকের মাখনলাল, বিন্দুমাধব, নবীন, রাজীব ও প্রেম-চাঁদেরও যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও, অর্থাভাবে তারা কেউই বিয়ে করতে পারেনি। বিপিনমোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের ষষ্টিদাস যখন অর্থ সংগ্রহ করে বিয়ে করতে সমর্থ হয়, তখন তার বয়স ষাট ছাড়িয়ে যায়। আসুরোদ্বাহ নাটকের অন্নদাপ্রসাদ গঙ্গো-পাধ্যায় স্কুল-শিক্ষক। সেও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু এসব অনূঢ় ব্যক্তিদের সকলকে হার মানায় কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে নাটকের বর। সে অতিবৃদ্ধ। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে বিয়ে করতে উদ্যত হয়। নয়শো রূপেয়ার রঞ্জনকে দিতে হয় ন শো টাকা; কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকের দীননাথকে সাত শো টাকা; বরের কাশীযাত্রা নাটকের নিত্যানন্দ রায়কে এক হাজার টাকা; আসুরোদ্বাহ নাটকের অন্নদাপ্রসাদকে ছ শো পাঁচ টাকা এবং কেদারনাথকে ছ শো টাকা; কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে বরকে আটশো টাকা।

৫৬. নয়শো রূপেয়া পৃ. ২৮।

আসল পণ ছাড়াও বিভিন্ন খাতে বরকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হতো। প্রায়ই দেখা যেতো বিয়ের আসরে এই নিয়ে কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষের মধ্যে দর কষাকষি এবং তর্কবিতর্ক হতো। পাত্রের কুৎসিত চেহারা, ঘটকালি, মানসিক, কন্যার মাতার প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদি বহু ছুতো করে কন্যাপক্ষ বরের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতো। এর চরম দৃষ্টান্ত আছে আসুরোদ্বাহ নাটকে।[৫৭] হিন্দু মহিলা নাটকেও অনুরূপ চিত্র দেখতে পাই।[৫৮] নয়শো রূপেয়ার কথাও স্মরণযোগ্য।[৫৯]

পাত্রপক্ষের হতাশার পাশাপাশি এসব নাটকে কন্যাপক্ষের অর্থলোভ ও আশার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, কন্যাবিক্রেতারা 'কশাই'-এর হাঁস পালনের মতো পরম যত্নে কন্যাকে মানুষ করে, তারপর একদিন চড়া দামে তাকে বিক্রি করে।[৬০] এ রকমের পিতাই রামধন মজুমদার কিংবা রায়মহাশয়। তারা উভয়েই মেয়েকে বিয়ের আগে বড়ো হতে দেয়, কারণ বয়স্কা কন্যার জন্যে বেশি দাম পাওয়া যায়। রায় মহাশয়ের ভাষায় 'আমাদের ঘরে মেয়ে একটু ডাঁশিয়ে না উঠলে আমরা বেচিনে।'[৬১] সে জন্যেই এগারো বছর বয়সে সে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। আর রামধনের কন্যা সরলা রীতিমতো যৌবনে উপনীত এবং শিক্ষিতা। এ কারণে রামধনের দাবিও রায়মহাশয়ের তুলনায় বেশি। এর মধ্যে সে কোনো অন্যায় দেখতে পায় না, কারণ 'যেমন মাল তেমনি দাম' না দিলে চলবে কেন।[৬২] কন্যাবিক্রয় নাটকে মালতীও বয়ঃসন্ধিতে উপনীত এবং তাকেও লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। সুতরাং পাঁচ শো টাকা দাবি করা, কন্যাকর্তার কাছে মোটেই অযৌক্তিক মনে হয় না।[৬৩]

কন্যাবিক্রেতা পিতাদের প্রলোভনের যে কড়া রঙের চিত্র বর্তমান নাটকসমূহে অঙ্কিত হয়েছে, তা ঘৃণার উদ্রেক না করে পারে না। সরলার মতো সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতীকে কলকাতায় নিয়ে নিলামে বিক্রি করলে সোনার বেনেরা তাকে পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে পারে,—সাতুলালের এ ঠাট্টাকে রামধন সত্য বলে মনে করে। রামধনের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার কাছে কন্যার সুখ, জাত ইত্যাদি অর্থহীন,

৫৭. **আসুরোদ্বাহ নাটক** পৃ. ৪৫-৫৪।

৫৮. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক** পৃ. ১৪-১৫।

৫৯. **নয়শো রূপেয়া** পৃ. ৬৭।

৬০. **কন্যাপণ কি ভয়ানক**, পৃ. ২৪৩-৪৪।

৬১. **কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে**, জয়ন্ত-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৫৫০-৫১।

৬২. রামধন সরলার দাম হাজার টাকা সাব্যস্ত করে, তবে ন্যূনতম নয় শো টাকায় বিক্রি করতে রাজি। **নয় শো রূপেয়া**, পৃ. ৬-৭।

৬৩. **কন্যাবিক্রয় নাটক**, পৃ. ২-৪, ১৯।

একমাত্র টাকাই আসল।[৬৪] কোনের মা কাঁধে আর টাকার পুটলি বাঁধে নাটকের রায়মহাশয়ও কৌলীন্যের চেয়ে অর্থকেই বেশি মূল্যবান মনে করে। বরের কাশীযাত্রা নাটকে কন্যাকর্তা রূপনারায়ণ পাকড়াশি বলে যে, কুলীনকে কন্যা দান করতে পারলে অবশ্যই নিজেকে ধন্য মনে করতো। কিন্তু পরক্ষণেই বরের বয়সের প্রশ্নে সে বলে, জাতের চেয়ে পেট ভরানোটাই তার কাছে বড়ো সমস্যা।[৬৫] এ থেকে বোঝা যায় আসলে অর্থকেই সে কৌলীন্যের চেয়ে শ্রেয় জ্ঞান করে। এ নাটকের চন্দ্রকুমার হাজরা কেবল জাত নয়, অর্থের জন্যে পরকাল বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। স্ত্রী ফুলমণির সঙ্গে আলাপ থেকে তার মনোভাব ব্যক্ত হয় :

> ফুলমণি। (সক্রোধে) হাঁ এ বেশ কথা, যাতে বংশ থাকবে, জলপিণ্ডী পাবে, তা না ; টাকা পেলেই সব হবে।।
>
> চন্দ্র। ধুত্তোর পিণ্ডীর মুখে পিণ্ডী ; এখন যদি দশ পাঁচ টাকা নাড়াচাড়া করতে না পারলাম, শেষে মরে পিণ্ডী পেয়ে, একেবারে কৃতার্থ হব ?[৬৬]

কেবল পরকাল নয়, ছেলের বিয়ের কথাও সে অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত যদি কন্যা-বিক্রয়ে কিছু বেশি টাকা পাওয়া যায়। বিয়ের পর জামাতা পণের পুরো টাকা শোধ করতে না পারায় কন্যাবিক্রেতা কন্যাকে জামাতার বাড়িতে পাঠায়নি এবং হঠাৎ একদিন জামাতা এসে উপস্থিত হলে তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে,—এমন কি জামাতার কক্ষ থেকে কন্যাকে বেরিয়ে আসার জন্যে আদেশ করে,—এ রকমের একটি দৃশ্য আছে নয়শো রূপেয়া নাটকে। শ্বশুর গোপীমোহন যে কতো বড়ো পাষণ্ড এবং অর্থান্ধ তা বুঝতে হলে পাঠককে পুরো দৃশ্যটিই পড়তে হয়। অনাদায়ী টাকার জন্যে সে জামাতার নামে মামলা করতেও উদ্যত হয়েছিলো। জামাতাকে সে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, সত্বর টাকা শোধ না করলে মেয়েকে সে পুনরায় বিয়ে দেবে। তার কথা থেকে জানা যায়, তাদের গ্রামের রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী সত্যি সত্যি মেয়েকে দুবার বিয়ে দিয়েছিলো এবং দুবারই তার জন্যে পণ গ্রহণ করে।[৬৭] বৈধব্যের কথা গোপন রেখে দ্বিতীয়বার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে অর্থ লাভ করার কথা জানা যায় আসুরোদ্বাহ নাটক থেকে।[৬৮]

৬৪. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ১০, ২৭।

৬৫. বরের কাশীযাত্রা, পৃ. ৪৯-৫০।

৬৬. ঐ, পৃ. ২৪।

৬৭. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ১১-১৩।

৬৮. নাটকের নায়িকা কুমুদিনী বিধবা হয় তার শিশু বয়সে। তার বৈধব্যের সংবাদ সে জানতো না। তার মামা কালীপ্রসাদ তার মায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এ বিয়ে দিয়ে টাকা হস্তগত করে। পরে টাকা না দিয়ে কুমুদিনীর মাকে তাড়িয়ে দেয়।

আসলে এই লোভী অভিভাবকগণ কন্যাকে বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। ঘটকের সঙ্গে রামধনের আলাপ থেকে এ ধরনের মনোভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়।

হলধর। আমি একটি সম্বন্ধ এনেছি।

রামধন। কত টাকা?

হলধর। কত টাকা। আগে ঘর বর কেমন, তা শুনুন।

রামধন। ঘর বর ভাল হয়, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি কত টাকা দিতে পারবেন?

হলধর। ঘর বর ভাল হওয়াকে কি আপনি দুর্ভাগ্য মনে করেন? আপনি বলিতেছেন "আপত্তি নাই" ইহার মানে কি?

রামধন। কথা কি, আগে টাকা, তারপর অন্য।... টাকার কথা ঠিক হলে পরে আর কথা।[৬৯]

পাত্রের বয়স ২০ বছর, ইংরেজি লেখাপড়া জানে, চেহারা ভালো, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান —এ সকল সংবাদ রামধনের কাছে অবান্তর, কতো টাকা পাত্রপক্ষ দিতে পারবে সেটাই তার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য।

কমবেশি একই চিত্র নফরচন্দ্র পালও অঙ্কন করেছেন। ঘটকের সঙ্গে কন্যা-কর্তার যে আলাপ হয়, তা অনেকটা রামধনেরই অনুরূপ।[৭০]

ঘটক। মশয়, আমি সাত গাঁ ঘুরে আপনার কন্যার বেস একটী পাত্র জুটিয়ে এসেচি।

কর্তা। (ব্যগ্র হইয়া) কত পণ দিবে হে?

ঘটক। বাঃ পণের কথাটাই যে আগে। পাত্র দেখে এলুম তাঁর বয়স কত, কেমন গুণবান, দেক্তে শুন্তে কেমন, তাই আগে জিজ্ঞাসা কত্তে হয়। তা না, ঐ যে কে বলেছিল "আগে মাথাটা থো, তবে পাঁটা কাট" আপনার দেখি তাই হল। পণে এত লোভ ক্যান?

কর্তা। তুমি জান না হে, পণের কথা না শুনে, বরের রূপগুণের কথা শুনতে নাই।[৭১] এই ঘটক মাত্র দুশো টাকা দিতে চাওয়ায় সেখানে বিয়ে হয় না। অপর পক্ষে দ্বিতীয় ঘটক যখন পাঁচশ টাকা পণ দেওয়ার কথা বলে, কন্যাকর্তা সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে

৬৯. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ৬।

৭০. এ মিল এতো বেশি স্পষ্ট যে, অসম্ভব নয় শিশির কুমার হয়তো নফরচন্দ্রকে এই একটি দৃশ্যে সজ্ঞানে অনুকরণ করেছিলেন।

৭১. কন্যাবিক্রয় নাটক, পৃ. ১-২।

দিতে রাজি হয়। যখন শোনা গেলো বর পঞ্চাশোত্তীর্ণ, দ্বিতীয় বিবাহ করতে যাচ্ছে, তখনো কর্তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না। এমন কি, বিবাহ-সভায় যখন দেখা গেলো বরের সব চুল পাকা, দাঁতগুলো সব পড়ে গেছে, লাঠিতে ভর না দিয়ে হাঁটতে পারে না, চশমা ছাড়া চোখে দেখে না এবং কানে শুনতে পায় না, তখন ঘাবড়ে গেলেও কর্তাঠাকুর অর্থলোভে বিয়ে বন্ধ করতে পারে না। সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণীকন্যাকে দান করে, মেয়েদের ভাষায়, কন্যার মায়ের 'পিতার পিতামহের' বয়সী কুৎসিত, জীর্ণদেহ অতিবৃদ্ধের কাছে।[৭২]

ক্ষোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে নাটকের রায়মশায়ও আইন অধ্যয়ন-রত যুব পাত্রকে অগ্রাহ্য করে অতিবৃদ্ধ (মেয়েরা বরকে দেখে বরের ঠাকুরদাদা মনে করেছিলো) পাত্রের সঙ্গে বিবাহ ঠিক করে। কারণ এই বৃদ্ধই বেশি অর্থ দিতে রাজি হয়।

আসুরোদ্বাহ নাটকে হরিহর চক্রবর্তী যুবক কেদারনাথকে বাদ দিয়ে কুৎসিত অন্নদাপ্রসাদকে বর নির্বাচন করে। মুখে বলে, কেদার পূর্ব থেকেই আত্মীয়, সে কারণে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। কিন্তু আসল কারণ কেদার পণ বাবদ চারশ টাকা দিতে সম্মত হয়, অন্যদিকে অন্নদাপ্রসাদ দিতে চায় চারশ আশি টাকা।[৭৩]

এ সব পিতারা কন্যাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আদৌ ভাবিত নয়। কন্যাদের প্রতি তাদের কোনো স্নেহ আছে, তাও তাদের আচরণ থেকে প্রকাশ পায় না। এ জন্যেই একান্ত হৃদয়হীন পাষণ্ডের মতো তারা অসহায় কন্যাকে হাত-পা বেঁধে সুনিশ্চিত বৈধব্যের অকূল সাগরে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। রামধন মজুমদার এহেন পিতা বলেই ভাবতে পারে যে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকলে মেয়েকে সে প্রথমে বুড়ো মুখার্জীর কাছে বিয়ে দিতো এবং তাতে ৮০০ টাকা পেতো। মুখার্জী ক্ষয়কাশীর রোগী সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই মরে যেতো। তখন পুনরায় কন্যাকে পাঁচ-সাতশ টাকার বিনিময়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে দিতে পারতো।[৭৪] সরলা অসুস্থ হলে রামধন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এই ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্নতার কারণ কন্যার প্রতি তার ভালোবাসা নয়, বরং একান্ত স্বার্থচিন্তা। সে ভাবে, সরলা মারা গেলে তার নগদ এক হাজার টাকা লোকসান হবে। সরলার শয্যাপার্শ্বে বসে সে আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে, 'তখনি যদি ৮০০ টাকায় মেয়েটি ছাড়তাম। তা পোড়া অদৃষ্ট।'[৭৫]

৭২. কন্যাবিক্রয় নাটক, পৃ. ১৪।
৭৩. আসুরোদ্বাহ নাটক, পৃ. ২২।
৭৪. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ৩৮-৩৯।
৭৫. ঐ, পৃ. ৪১।

অতিবৃদ্ধ নিত্যানন্দ রায়কে কন্যা নিয়ে সুনিশ্চিত বৈধব্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রস্তাবে রূপনারায়ণ পাকড়াশির কষ্ট হয়নি, অথচ আকস্মিকভাবে কন্যা যখন বিয়ের কিছুক্ষণ আগে সর্প দংশনে মারা যায়, তখন তার দুঃখ উছলে পড়ে। কিন্তু তার কথা থেকেই এ দুঃখের স্বরূপ বোঝা যায়—

রূপনারায়ণ। (স্বগত) আরে পোড়া কপাল। চার দণ্ডের জন্যে আমার হাজার টাকা গেল রে; (প্রকাশ্যে শিরে করাঘাত করিয়া) হা মা ভয়বারিণী তুই কি আমারে ছেড়ে গেলি—ও-তোর বাপকে নিলি নে। ওরে! মারে! (ভূমে পতিত হইয়া রোদন)[৭৬]

কন্যাবিক্রেতা পিতাদের নির্লজ্জলোভ প্রকাশ পায় আরো একটি বিষয়ে,—তারা স্ত্রীদের প্রতি অযৌক্তিক অত্যাচার করে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যে। কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকের এমনি একটি কন্যাবিক্রেতার স্ত্রী মালতী। তার একটি কন্যা হয়েছিলো; সেটি সাতশ টাকায় বিক্রি হয়। কিন্তু সম্প্রতি তার একটি পুত্র সন্তান হওয়ায় স্বামী তাকে গালাগাল ও প্রহার করে। মালতী মন্দিরে এসে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায়, যাতে তার তার পুত্র না জন্মে।[৭৭]

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের গর্ভবতীও মালতীর মতো স্বামীর তিরস্কার ভোগ করে। তার উক্তি থেকেই এ তিরস্কারের কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর মেয়ে বেচে কোটা করে-ছেন, আরো এখনো দুটো আছে। আমার চারিটিই ছেলে, মেয়ে হয়নি তাই আমাদের সেই মিন্‌সে আমারে সর্বদা তাড়না করে, বলে "এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।" এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমারে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে, "এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর করে দেবো"- - -।[৭৮]

নয়শো রূপেয়া নাটকের রামধন এবং গোপীমোহনের চরিত্র এর চেয়েও নিকৃষ্ট। কন্যা জন্ম না দেওয়ার জন্যে গোপীমোহন তার স্ত্রীকে কেবল তাড়না এবং প্রহারই করে না, সে মনে করে প্রয়োজনবোধে তার স্ত্রী অন্যের ঔরসজাত কন্যাও ধারণ করতে পারে। গোপীমোহনের বেজায় ক্ষোভ স্ত্রী তার একথা মান্য করে না, 'আমি ওকে দুবেলা বলি, তবু আমার কথা কানে করে না, হারামজাদি। উনি লজ্জায় মরেন, উনি জিব কাটেন।'[৭৯]

৭৬. বরের কাশীযাত্রা, পৃ. ৮৩।
৭৭. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৩৪-৩৫।
৭৮. কুলীনকুলসর্বস্ব, পৃ. ৭৪।
৭৯. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ৪০।

রামধনও স্ত্রীর সতীত্বের তুলনায় তার গর্ভে পরপুরুষের ঔরসজাত কন্যা ধারণ করাকে শ্রেয় মনে করে। তার নিজের বয়স ষাট, সুতরাং তার পক্ষে সন্তান জন্ম দেওয়া শক্ত ব্যাপার। তবে তার স্ত্রী, তার ভাষায়, 'বিলক্ষণ ডাঁট আছে, আর পাঁচ ছটি অনায়াসে হতে পারত।' কিন্তু রামধনের আপসোস—'তা—তা সে হাবী, তা দ্বারা যে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, সে বড় কথার কথা। আজ প্রকারান্তরে বোলব এখন।'[৮০]

রামধন 'পোষানি শর্তে' কন্যা সরলার বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে। 'পোষানি শর্ত' মানে জামাতার সঙ্গে চুক্তি থাকবে বিনা পণে বা অল্প পণে কন্যা দান করা হবে কিন্তু কন্যা সন্তানগুলোর অধিকারী হবে সে নিজে—জামাতা নয়। তখন সবগুলি কন্যা বিক্রি করে শ্বশুর অনেক উপার্জন করতে পারবে।

কন্যাবিক্রেতা অভিভাবকগণ বিয়ের সময় ভাবী জামাতার যথাসর্বস্ব নিয়ে কন্যা দান করতো। আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি। নাটকেও এর সমর্থন মেলে রঞ্জন প্রেমের দায়ে তার সর্বস্ব দিয়ে বিয়ে করতে রাজি হয় বটে, কিন্তু ভাবী স্ত্রী সরলাকে জানিয়ে রাখে, 'আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তবে তোমার গাছতলায় থাকতে হবে, কারণ আমার কিছুই নাই, সব গ্যাছে।'[৮১]

কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে দীননাথ তার সব কিছুর বিনিময়ে বিয়ে করে। আর বিন্দুমাধবের পিতা কেবল সবর্স্ব দিয়ে নয় সেই সঙ্গে ঋণ গ্রহণ করে একটি কন্যা সংগ্রহে সমর্থ হয়। আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে কন্যার পিতার অর্থলোভকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে, কন্যার মাতা, অপর পক্ষে, প্রায়শ কন্যার ভবিষ্যৎ বিষয়ে অংশত সজাগ। কন্যাবিক্রয় নাটকে কন্যার পিতা পাঁচ শ টাকা পণের কথা শুনে কন্যার বিয়েতে রাজি হয়। কিন্তু কন্যার মা পাত্রের বয়স, চেহারা, বিদ্যা-বুদ্ধির কথা জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করে।[৮২] বিয়ের আসরে যখন দেখা গেল বর সত্যি সত্যি বৃদ্ধ, তখন কন্যার মা রীতিমতো বেঁকে বসে এবং মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকার করে।[৮৩] কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে নাটকে কন্যার মা বৃদ্ধ বরকে দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকার করে।[৮৪] বরের কাশীযাত্রা নাটকেও বৃদ্ধ বর দেখে শাশুড়ী ঘোরতর আপত্তি জানায়।[৮৫]

৮০. ঐ, পৃ. ৩৯।
৮১. **নয়শো রুপেয়া**, পৃ. ৩৫।
৮২. **কন্যাবিক্রয় নাটক**, পৃ. ৬-৮।
৮৩. ঐ, পৃ. ১৪-১৭।
৮৪. **জয়ন্ত**, পৃ. ৫৫১।
৮৫. **বরের কাশীযাত্রা**, পৃ. ৬৬।

কিন্তু সবক্ষেত্রেই মায়েরা শেষ পর্যন্ত কন্যাদের বিয়ে দিতে রাজি হয়—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে। আর তা ছাড়া সেকালে এ জাতীয় সাংসারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহিণীদের প্রভাব বড়ো একটা খাটতো না,—হতে পারে এটাও তাদের শেষ পর্যন্ত রাজি হওয়ার কারণ। কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে নাটকের গৃহিণী বরকে দেখে কান্নাকাটি করে আপত্তি জানায় বটে, কিন্তু স্বামী যখন তাকে বলে 'টাকাগুলি তুমিই নাও, আমার মান রাখ,' তখন তার আপত্তি শিথিল হয় এবং সে কাঁদতে কাঁদতেই টাকার পুটলি বাঁধতে বসে।[৮৬] বরের কাশীযাত্রা নাটকে গৃহিণীর আপত্তি শিথিল হয় যখন তার স্বামী তাকে অলঙ্কার তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।[৮৭] কেবল কন্যাবিক্রয় নাটকে মা শেষ পর্যন্ত তার অসম্মতিতে অটল থাকে।[৮৮]

কন্যাবিক্রেতা অভিভাবকগণ তাদের আচরণে কোনো অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করে না। বরং মনে করে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় সমাজের উপকার হচ্ছে। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলে, এর ফলে সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণরা ইচ্ছে করলেই বহু-বিবাহ করতে পারে না। অপর পক্ষে, যারা অন্যথায় বিয়ে করতে পারতো না—সেই কুৎসিত পাত্ররাও পণ দিয়ে বিয়ে করতে সমর্থ হয়। সর্বোপরি, কন্যাপণ তুলে দিলে কোনো উপকার হবে—এ তারা মনে করে না। কেননা, তখনো দরিদ্র বরকে কে কন্যা দিতে চাইবে?—তারা প্রশ্ন করে।[৮৯]

কন্যার অভিভাবকদের প্রলোভন, স্বার্থপরতা এবং পাশাপাশি নাট্যকারগণ বিবাহার্থী-দের দুর্দশা ও করুণ অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে একদিকে পাঠক-দর্শকদের ঘৃণা অন্য-দিকে অনুকম্পা ও সহানুভূতির উদ্রেক করতে চেয়েছেন। এসব নাটক-প্রহসনে দু ধরনের বিবাহার্থীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এক শ্রেণীতে আছে সুন্দর, সুস্থ যুবক—যারা অর্থাভাবে বিয়ে করতে পারছে না। অন্য শ্রেণীতে আছে কুৎসিত, নির্বোধ, ভগ্নদেহ বৃদ্ধ যারা সারা জীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত নয়শো রূপেয়ার রঞ্জন, কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকের বিন্দুমাধব, নবীন ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হিন্দু মহিলা নাটকের ষষ্টিদাস, কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধের বর, বরের কাশীযাত্রার নিত্যানন্দ, কন্যাবিক্রয় নাটকের বর ইত্যাদি। ষষ্টিদাস সম্পর্কে অর্থলোভী শ্বশুর স্বয়ং মন্তব্য করে যে, সে

৮৬. জয়ন্ত, পৃ. ৫৫১-৫২।
৮৭. বরের কাশীযাত্রা, পৃ. ৬৬।
৮৮. কন্যাবিক্রয় নাটক, পৃ. ১৬-১৭।
৮৯. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৪১।

'মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারে না,' 'ষাট বছরের একটা হাবা,' 'কদর্য কোথাকার'।[৯০] কিন্তু নিতান্ত অর্থের জোরেই এ ধরনের বিবাহার্থীরা এক-একটি সুশ্রী, সুন্দরী বালিকা-বধূ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। যুবক বিবাহার্থীদের বিবাহ করতে না-পারা এবং বৃদ্ধ কদর্য বরের বিয়ে করা—উভয়ই কন্যাবিক্রয় প্রথা সম্পর্কে পাঠকদের ঘৃণা সৃষ্টি করে।

যারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতো, এসব নাটকে দেখানো হয়েছে, তারা স্বাভাবিক জৈবিক প্রবৃত্তিবশত কেউ বেশ্যা, কেউ বা কোনো নীচকুলোদ্ভবা রমণীর প্রতি আসক্ত হতো। কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকের নবীন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে নিয়ে পলায়ন করে। প্রেমচাঁদ আকৃষ্ট হয় তাদের বাড়ির চাকরের কন্যার প্রতি। নবনাটকে কৌতুক আকৃষ্ট হয় প্রতিবেশিনী গোয়ালিনী রসবতীর প্রতি। তাদের সংলাপ থেকে তাদের প্রকৃত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৯১] এ জাতীয় অনাচার একটা কৃত্রিম অস্বাভাবিক পরিবেশে মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

ঋণ করে বিয়ে করার কুফল দেখানো হয়েছে কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে। দীননাথ ঋণ করে সাত শ টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে। এ ঋণ সে আর কোনো কালে শোধ দিতে পারেনি। অন্য দিকে তার সংসার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং সে ক্রমাগত ঋণজালে জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের জন্য সে খাদ্য পর্যন্ত জোটাতে পারে না। বাকির দায়ে দোকানদার এসে তাকে শাসিয়ে যায়। ডিক্রির দায়ে পেয়াদা এসে তাকে আদালতে ধরে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অকালে সে মারা যায় এবং তার সাত বছরের আদরের পুত্র ভিক্ষে করতে বের হয়। এই নাটকের বিন্দুমাধব ২০-২২ টাকার একটি চাকুরি করে। তার উপার্জনের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে সে তার পিতার ঋণ শোধ করে। তার পিতা ঋণ করে বিয়ে করেছিলো, কিন্তু ঋণ শোধ করতে পারার আগেই পিতার মৃত্যু হয়। পুত্রের জন্যে কোনো সম্পত্তি নয়, মৃত্যুর সময় সে রেখে যায় ঋণের বোঝা।[৯২]

আগেই বলেছি, কেউ ধীরে ধীরে অর্থ সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে একটি বালিকা-বধূ ঘরে নিয়ে আসতো। এই বালিকা যৌবনে উপনীত হতে না হতেই বৃদ্ধ স্বামী মারা যেতো। এরূপ স্বামীর দৃষ্টান্ত দীননাথ এবং বিন্দুমাধবের পিতা।[৯৩] হিন্দু মহিলা নাটকের ষষ্টিদাস এবং কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে নাটকের বরেরও এই পরিণাম আমরা অনুমান করতে পারি।

৯০. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ১৪-১৫।
৯১. নবনাটক, পৃ. ৬৬-৭৩।
৯২. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৩৭-৩৮।
৯৩. কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটক দ্রষ্টব্য।

এরূপ অসমবয়স্ক বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় ও স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত হতো—এমন চিত্রও আলোচ্য নাট্যরচনায় লক্ষ্য করা যায়। কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকের সৌদামিনী বৃদ্ধ চণ্ডীপ্রসাদকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারেনি। চণ্ডীপ্রসাদও তাকে জুতো-পেটা থেকে আরম্ভ করে নানা অত্যাচার করে। অত্যাচার ও অপ্রণয় হেতু সৌদামিনী কুলবধূ হওয়া সত্ত্বেও নবীন নামক এক যুবককে ভালোবাসে এবং একদিন অলঙ্কার ইত্যাদি নিয়ে নবীনের সঙ্গে পলায়ন করে। এই অলঙ্কার একে একে ফুরিয়ে গেলে নিরুপায় সৌদামিনী একদিন বাধ্য হয়ে বেশ্যা হিশেবে নাম লেখায়।

কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতো—এ রকমের দৃষ্টান্ত আমরা বর্তমান নাটক-প্রহসনে একাধিক স্থানে দেখতে পাই। আসুরোদ্বাহ নাটকের জ্ঞানদার বিয়ে হয় তিন—সাড়ে তিন বছর বয়সে। বিপিন-মোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের মনোরমার বিয়ে হয় সাত বছর বয়সে।

অনেক সময় নগদ অর্থের বদলে 'পরিবর্ত বিবাহ' হতো, পূর্বেই তার আলোচনা করেছি। নিকট আত্মীয়দের মধ্যেই এরূপ পরিবর্ত বিবাহ হতো মোহিনী, গোলাপি, নিস্তারিণী প্রভৃতির সংলাপ থেকে আমরা তা জানতে পারি।

মোহিনী। দূর ছুঁড়ি, পরিবর্ত বুঝিসনে? এই তোদের বাড়ীতে আমার যেমন বিয়ে হয়েছে, তেমনি আমার দাদার সহিত আবার বটঠাকুরঝির বিয়ে হয়েছিল; তাই পরিবর্ত হলো, এখন বুঝলি?

গোলাপি। ...শুনচি একদলের ভাইবোন আর অন্য দলের ভাইবোন বিয়ে হয়ে থাকে।

নিস্তারিণী। বলি এই বুঝি বড় আশ্চয্যি হলো, কতলোক যে খুড় ভাইঝি আর ভাইবোনে বিয়ে করে।

গোলাপি। সে আবার কেমন লো?

নিস্তারিণী। বুঝলিনে, পরিবর্তে সবাই হয়, খুড় বিয়ে কল্যেন জামায়ের বোনকে, আর জামাই বিয়ে কল্যেন ভগ্নীপতির ভাইঝিকে।[১৪]

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হওয়াকে কন্যাবিক্রেতাগণ আদৌ দূষণীয় বলে গণ্য করতো না, বরং একে ভদ্রপথ বলেই মনে করা হতো। যাদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করে বিয়ে করা সম্ভব হতো না, তাদের কেউ কেউ পরিবর্ত বিবাহের দ্বারাই অনূঢ়ত্ব ঘোচাতো। পরিবর্ত বিবাহের এইরূপ মাহাত্ম্য নিয়ে কয়েক বন্ধুকে আলাপ করতে দেখি বল্লালী খাত নাটকে।

১৪. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৯।

উমেশ। সে কি হে এখন তোমার বিবাহ হয় নাই।

রমেশ। আমার বড় দাদার হয়েছে তা আমার হবে খুড়রা এখন আইবড় আছেন।

বরদা। ভাগ্যে তোমার বাপের বিয়ে হয়েছিল।

রমেশ। পিশি না জন্মিলে তা-ও হত না।

বরদা। তোমার বাবা কি জগন্নাথ।

রমেশ। কি মিছে গাল দেও পিসিকে পরিবর্ত করে বাবার বিয়ে হয়েছিল।[৯৫]

যারা খুব লোভী কন্যাবিক্রেতা বলে পরিচিত ছিলো, তারা পরিবর্ত বিবাহকে মোটেই পছন্দ করতো না, কারণ পরিবর্ত বিবাহের ফলে নগদ টাকা হাতে আসতো না। বরের কাশীযাত্রা নাটকে চন্দ্রকুমার দুই মেয়ের পরিবর্ত বিবাহ দিয়ে পরে অনেক অনুতাপ করে এবং সংকল্প করে ভবিষ্যতে আর এ ভুল করবে না। —'যদি আর কিছু দিন পরে মেয়ে দুটির বে দিয়ে সুদের লোভ না করিতাম, তাহলে আজন্মকাল গড হয়ে বসে থাকতে পারতাম। ঐ যে পরিবর্ত পরিবর্ত করে মরে যাক, এখন পরিবর্ত করা হবে না, আগে মেয়ের বে দেবোতার পর ছেলের কপালে যা থাকে তাই হবে।'[৯৬]

বিয়ের ব্যাপারে এমন দারুণ সংকট হিন্দু সমাজকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আলোচ্য নাটকসমূহে তার প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে বিন্দুমাধবকে নবীন পরামর্শ দিয়ে বলে যে, সে যদি অনাচারপূর্ণ হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করে তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আমি তোমায় বারবার বলচি, যে এই পোড়া হিন্দুসমাজের—এই স্বার্থপর—সহস্র দোষের আধার হিন্দু সমাজের মায়া পরিত্যাগ কর, করো চল দুজনের নব্য দলের ভুক্ত হই। কোন গোলই থাকবে না-না বিবাহে পণ দিতে হবে, না ধর্ম পালনে ক্লেশ হবে—না সমাজে কোনরূপে ক্লেশ হবে, এত ব্রত —এত নিয়ম —এত তর্পণ — এত সন্ধ্যা—এত পূজাআজা কিছুই কর্তে হবে না; মনের মতন পাত্রী দেখে অসবর্ণে বিবাহ করে দাম্পত্য সুখে সুখী হব; সুশিক্ষিত সমাজে গণ্য হব।[৯৭]

নয়শো রূপেয়া নাটকে দেখতে পাই, বিয়ে হচ্ছে না বলে কান্তিচন্দ্রের কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতার মন বিচলিত হয় এবং হিন্দুসমাজের চিরাচরিত রীতিনীতির প্রতি আর আস্থা রাখতে পারে না। দ্বিতীয় ভাই বিধবাবিবাহ করার কথা চিন্তা করে এবং সেই সূত্রে বিদ্যাসাগরের নিকট যাওয়া-আসা আরম্ভ করে। তৃতীয় ভাই ভেক ধারণ করে বৈরাগী হওয়ার পরিকল্পনা করে,—তার মতে, এর ফলে 'ইহকালও হবে, পরকালও

৯৫. বাঙ্গালী খাত নাটক, পৃ. ৩০।

৯৬. বরের কাশীযাত্রা, পৃ. ২৪।

৯৭. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৩৮-৩৯।

হবে।'[৯৮] চতুর্থ ভাই ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মিকা বিবাহ করার কথা ভাবে। এ জন্যে সে দাড়ি রাখে এবং চোখ বুঁজে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে।

যে হতাশাবশত নবীন কি কান্তিচন্দ্রের তিন ভাই ধর্মান্তরের কথা চিন্তা করে, বিন্দুমাধবের সংলাপ থেকে তার স্বরূপ খানিকটা উপলব্ধি করা যায়।

বিন্দু। না, ভাই ঠাট্টার কথা নয়, আমি যে আজো বিবাহ কর্তে পেলাম না, তার জন্যে বড় দুঃখিত নই, আমার দুঃখ এই যে,আমা অভ্যন্তরে আর বাপ পিতামহের বংশ থাকবে না, একেবারে পৃথিবী চিহ্ন শূন্য হবে, পিতৃপরুষদিগের জলপিণ্ডের আশা যাবে।

তর্পণের তরে তুলিলে জল, /ছল ছল করে নয়নে জল;
ভাবি মনে আমি ত্যজিলে কায়,/ কে তর্পণ করি তুষিবে হায়!
পিতৃদেবগণে কে দিবে জল? / কে থাকিবে পিণ্ড-ভরসা স্থল?
আঁখি অশ্রু আর রাখিতে নারে, / দুজলে তর্পণ সলিল বাড়ে।
পিতৃগণে খেদে সম্বোধি বলি, / তৃপ্ত হও লয়ে এ তিলাঞ্জলি,
আমি মলে আর পাবে না জল! / ফুরাইবে জলপিণ্ডের স্থল।[৯৯]

কান্তিচন্দ্রের তৃতীয় ভাইও একান্ত হতাশায় বলে ফেলেছে, 'আমি বুঝি চিরকাল এখানে বসে ভাত রাধবো'?[১০০]

কন্যাপণ প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সমাজে যে সচেতনতা ক্রমশ জাগ্রত হচ্ছিলো আলোচ্য নাটক-প্রহসনে তারও স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। মাধবনারায়ণ কন্যাবিক্রেতা পরিবারের সদস্য। কিন্তু সে জানে, সাধারণ লোকেরা তাকে দেখলে অযাত্রাজ্ঞান করে এবং অন্য পথ দিয়ে গমন করে। 'আমার পূর্বপুরুষেরা কন্যাপণ গ্রহণে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন বলেই আমাকে এইরূপ তিরস্কার সহ্য করতে হলো'।[১০১] এই সচেতনতা সৌভাগ্যক্রমে তার মধ্যে জেগে ওঠে। সে জন্যই হাজার টাকায় বিক্রয়যোগ্য তার কন্যাটিকে সে বিনে পণে দান করবে বলে সংকল্প গ্রহণ করে। তার স্ত্রীও এ ব্যাপারে খুব সচেতন। সে বলে, মরে গেলেও সে তার কন্যা মোহিনীকে বিক্রি করতে দিবে না।[১০২] মাধবনারায়ণ শেষ পর্যন্ত তার কন্যাটিকে দয়াল চক্রবর্তীর বি.এ. পাশ করা ছেলের কাছে বিনা পণে বিয়ে দেয়। সামাজিকগণ এতে তার

৯৮. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ২৯।
৯৯. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৩৮।
১০০. নয়শো রূপেয়া পৃ. ২৯।
১০১. কন্যাপণ কি ভয়ানক পৃ. ২৩০-৩১।
১০২. ঐ, পৃ. ২৩১।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।[১০৩] এ সমস্ত নাটকে কমপক্ষে দুজন পুরোহিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা হিন্দু শাস্ত্র উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে যে, কন্যাবিক্রয় করা কিংবা কন্যাক্রয় করে বিবাহ করা উভয়ই গুরুতর অপরাধের কাজ। এ রকমের বিবাহ আদৌ সিদ্ধ নয় এবং এ জাতীয় বিবাহ থেকে জাত সন্তানরা বৈধ নয়—এ রকমের কথাও এদের উক্তি থেকে জানা যায়।[১০৪]

মেয়েরাও কেউ কেউ কন্যাবিক্রয় প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে খুব সচেতন। কন্যাবিক্রয় নাটকের কর্তাঠাকুরের স্ত্রী কর্তাঠাকুরকে অর্থলোভী এবং স্নেহমমতাশূন্য পিত বলে আখ্যায়িত করে। স্বামী যে গুণাগুণ বিচার না করে কেবল মাত্র অর্থলোভে কন্যাকে অতি নিকৃষ্ট পাত্রে সম্প্রদান করে, এ জন্য সে স্বামীর নিন্দা করে।[১০৫] প্রতিবেশিনী এয়োস্ত্রীগণও কর্তাঠাকুরের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়।

> পণ লয়ে কি মেয়েকে বে দিতে আছে? পণে বে দিলে মেয়ে বিক্রয় করা হয়, মেয়ে বিক্রয় করা যে কত পাপ তা কি তিনি কিছুই জানেন না? কি লজ্জা। কি! বেটা ছেলের ভালমন্দ বোধ নাই!!
>
> *
>
> ছি! ছি! এমন নির্বোধ পুরুষতো কোথাও দেখিনি। কন্যাবিক্রয় কললে নানা রকম পাপে মজে মত্তে হয়, তার আর উদ্ধার নাই, তাকে চিরকাল নরকে ডুবে থাকতে হয়। আই আই মালতীর বাপ যে শাস্ত্রের মাথা খেয়ে কাজ কললে!![১০৬]

বিক্রীতা কন্যা মালতী দুঃখ করে ছোট বোনের কাছে চিঠি লেখে—

> বোন! ভেবেছিলাম পতির নিকট বিদ্যার পরিচয় দিব, ধর্মনীতি শিক্ষা করিব। পতি যখন যে পুস্তক চাহিবেন সমাদরে তাহা লইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিব; কিন্তু সে আশা বঞ্চিত হইয়া এখন অহোরাত্র তাঁহার হস্তের যষ্টি হইয়াছি, তাঁহার হস্তের উপর অঙ্গুলি দ্বারা লিখিয়া মনের ভাবসমূহ জ্ঞাত করাইতেছি, দু বেলার নস্যির কৌটা যোগাইতেছি এবং অবিরত নেত্রসলিলে আর্দ্র হইতেছি।[১০৭]

মালতীর ছোটবোন মোহিনী পিতার ব্যবহার দৃষ্টে বিয়ের আগেই ভয় পায়। সুশীলার কাছে তাই আশঙ্কাপ্রকাশ করে—

> বাপের টাকার লোভ নয়নে হেরিয়া।
> কাঁদিয়া উঠিছে মন থাকিয়া থাকিয়া।।

১০৩. ঐ, পৃ. ২৭৫।
১০৪. ঐ. পৃ. ২৩৬-৩৭; **আসুরোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ১১-১৩।
১০৫. **কন্যাবিক্রয় নাটক**, পৃ. ৬, ১৪।
১০৬. **কন্যাবিক্রয় নাটক**, পৃ. ১৪।
১০৭. ঐ. পৃ. ১৯।

লাঠী ধরা বুড়ো এক, ডাকিয়া আনিবে।
টাকা লয়ে তার কাছে, আমারে বেচিবে ॥
চিরকাল দুঃখ পাব, হইয়া বিধবা।
কেমনে কাটিবে বোন, একাদশী দিবা ॥[১০৮]

নির্জলা উপবাস এবং নিরামিষ আহারের কথা চিন্তা করে এখন থেকেই সে শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়। দুঃখ করে সে সুশীলাকে বলে, পূর্বজন্মে সে নিশ্চই অনেক পাপ করেছে, নয়েত্য 'তোমাদের বাপের মত বাপের মেয়ে হোতাম।'[১০৯] তার মতে, তার নিজের পিতা একেবারে দয়ামমতাশূন্য। যারা ছাগল-গোরু বিক্রি করে উপার্জন করে, তারাও দু পয়সা কম নিয়ে ভাল লোকের কাছে ছাগল গোরু বিক্রি করে, কিন্তু তার পিতা দু পয়সা বেশি পেলে মন্দ লোকের কাছেই হয়তো তাকে বিক্রি করবে।[১১০] প্রতিবেশিনী বিনোদিনী কন্যা বিক্রয়ের পাপের কথা চিন্তা করে শিউরে ওঠে, 'মেয়ে ব্যাচা কি সামান্য পাপের কথা? যারা মেয়ে ব্যাচে তাদের আর একালে উদ্ধার নাই। তাদিগকে নরকের মধ্যে পচে থাক্তে হয়'।[১১১] সুশীলা পাপের কথাটা বড়ো করে ভাবে না, সামাজিকগণের বিকারগ্রস্ত আচরণের কথা মনে করে সে ক্ষুব্ধ হয়। তার মতে, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি ভালো কাজের উদ্যোগ দেখলেই সমাজবাসীরা অমনি খড়্গহস্ত হয়। অথচ কন্যাবিক্রয়ের মতো পাপাচার দৃষ্টে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।[১১২]

আসুরোদ্বাহ নাটকের ক্ষীরদাও নিজেদের সকল দুঃখের জন্য কন্যা-বিক্রয়প্রথাকে দায়ী করে। 'মা বাপ যদি পাঁটি ছাগলের মত না বেচতো, তাহলে কি ও রকম দুঃখ হত—না অমন নিরেট মুখ্খের হাতে পড়তে হতো? তা তাদের টাকার লোভইতো এ দুঃখ ভোগের কারণ।'[১১৩]

কেবল পাত্রপাত্রীর সচেতনতার স্বাক্ষরই নয়, কন্যাপণ নিবারণের জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে এমন সংবাদও এ সকল নাট্যরচনা থেকে জানা যায়। কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে রাজীবের কথা থেকে শুনতে পাই, বিক্রমপুরে

১০৮. ঐ, পৃ. ২০।
১০৯. ঐ, পৃ. ২১।
১১০. ঐ, পৃ. ২৩।
১১১. ঐ, পৃ. ২২।
১১২. ঐ।
১১৩. আসুরোদ্বাহ নাটক, পৃ. ২। অকাল বৈধব্যের জন্যেও ক্ষীরদা এই প্রথাকে দায়ী করে। পৃ. ৪।

কন্যাপণ ও কৌলীন্যপ্রথা নিবারণী সভা স্থাপিত হয়েছে এবং কলকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভাও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[১১৪]

নয়শো রূপেয়া নাটকের সাতুলাল কন্যাবিক্রেতা পরিবারের সদস্য। তদুপরি সে নিজে প্রভূত গাঁজা খায়। এবং কখনো কখনো অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে। কিন্তু সেও অনুভব করে যে, কন্যা বিক্রয় এবং অর্থের প্রতি অতিরিক্ত প্রলোভন ভালো নয়। কন্যাবিক্রেতা ভাইকে সে এ ব্যাপারে ঠাট্টা করে। গোপীমোহনকে ফাঁকি দিয়ে সে তার মেয়ে-জামাই-এর মিলন ঘটায় এবং সবশেষে সরলার পণ হিশেবে পাওয়া পুরো টাকাটাই বরকর্তা কানাই ঘোষালকে ফেরত দেয়। বলে, তার নিজের বিয়ের জন্যে এর মধ্য থেকে কানাই ঘোষাল যেন সমান্য ব্যয় করে।[১১৫]

কন্যাবিক্রয় প্রথা দূর করার জন্যে, আলোচ্য নাটক-প্রহসন রচয়িতাগণ বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। কুলীনকুলসর্বস্ব প্রণেতা এর জন্যে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[১১৬] কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে মালতীও আশকা করে, ইংরেজ সরকার এই কদাচার দূর করায় জন্যে সচেষ্ট হবে।[১১৭] এই নাটকের বিন্দুমাধব অতি সহজ সমাধানের পরামর্শ দেয়। আমরা আগেই দেখেছি, তার মতে, কুলপ্রথা রক্ষার জন্যে যিনি যার কাছ থেকে যতো টাকা পণ পাওয়ার যোগ্য, তাকে ততো টাকার একটি মর্যাদাপত্র লিখে দেবে। তাহলে অর্থাভাবে যোগ্য পাত্রের বিয়েও বন্ধ থাকবে না আবার কৌলীন্যের মর্যাদাবোধ ও চরিতার্থ হবে।

নাট্যকার শিশিরকুমার দেখিয়েছেন কুলীন-অকুলীন ভেদাভেদ তুলে দিলেই কৌলীন্য এবং কন্যাবিক্রয় উভয় প্রথার সুচারু সমাধান হতে পারে। নয়শো রূপেয়ায় সাতুলাল চারটি কুলীন অনূঢ়া যুবতী এবং চারটি বংশজ অবিবাহিত পুরুষকে একত্রিত করে। তাদের বিয়ে সে দিতে পারে না, কিন্তু তার ইঙ্গিত কুলীন কন্যাগণ এবং অকুলীন পাত্রগণ সবাই বুঝতে পারে। সাতুলালের মতে, প্রয়োজন কেবল 'কুলধর্মের' মিথ্যা অভিমান মোচন করা।[১১৮]

কাহিনী পরিকল্পনায় বর্তমান নাটকসমূহে আশ্চর্য রকমের মিল লক্ষ্য করা যায়। সব নাটকেই অর্থলোভে কন্যার পিতা কন্যাকে নিকৃষ্ট পাত্রের হাতে সমর্পণ

১১৪. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৩৯।
১১৫. নয়শো রূপেয়া পৃ. ৮০।
১১৬. কুলীনকুলসর্বস্ব, পৃ. ৭৮।
১১৭. কন্যাপণ কি ভয়ানক, পৃ. ২৩৬।
১১৮. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ৩০-৩১।

করে পাত্রীর দুর্দশা দেখিয়েই নাট্যকারগণ পাঠকদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার এবং কন্যাবিক্রয়ের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার প্রয়াস পান। বরের কাশীযাত্রা নাটকে একটু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। অতিবৃদ্ধ বরকে দেখে পাত্রী মৃত্যু কামনা করে এবং সত্যি সত্যি আকস্মিকভাবে একটি সাপ এসে তাকে দংশন করে। এর ফলে সে এই অবাঞ্ছিত বিবাহ থেকে সে রক্ষা পায়; আর বিয়ে না হওয়ায় নিত্যানন্দ রায়ও দারুণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে কাশীবাসী হয়। সম্ভবত এই অপমৃত্যু এবং অপমানের চিত্র অঙ্কন করেই নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনো নাট্যকারই এমন চিত্র অঙ্কন করেননি, যাতে দেখা যায় কোনো সহানুভূতিশীল ব্যক্তির চেষ্টায় পাত্রীটি অবাঞ্ছিত পাত্রের হাত থেকে রেহাই পায় অথবা কন্যাবিক্রেতা পিতা নাজেহাল হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

কৌলীন্য ও তার অনিবার্যকুফলসমূহ : আদ্যরস

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, কৌলীন্যপ্রথা কেবল ব্রাহ্মণ সমাজকে প্রভাবিত করেছিলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৌলীন্য প্রথা সংক্রামক ব্যাধির মতো, কায়স্থ সমাজকেও আক্রমণ এবং জীর্ণ করেছিলো। 'আদ্যরস' কায়স্থদের কৌলীন্যজাত দুষ্টক্ষত।

বলা হয়ে থাকে, কনৌজ থেকে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও এই পাঁচটি কৌলিক পদবি বিশিষ্ট পাঁচজন কায়স্থও এদেশে আগমন করেন।[১] বল্লাল সেনের আমলে, মতান্তরে আদিশূরের আমলে, এই কায়স্থগণের মধ্য থেকে ঘোষ, বসু ও মিত্র—এই তিন ঘর কৌলীন্য মর্যাদা লাভ করেন।[২] কায়স্থ-কৌস্তুভ মতে দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ—এই আট ঘর শুদ্ধ বা সিদ্ধ মৌলিক বলে পরিচিত।[৩] নাগ, পাল, আদিত্য, ধর, ভঞ্জ, নন্দী, গুপ্ত, রাহা, আইচ, রুদ্র, চন্দ্র, শীল, কুণ্ড, ভদ্র প্রভৃতি বাকি বাহাত্তরটি উপাধিবিশিষ্ট কায়স্থগণ বাহাত্তুরে বা সাধ্য কৌলিক নামে পরিচিত।[৪]

কুলীন কায়স্থদের বিবাহ-রীতি অনুসারে কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তানকে কুলীনকন্যা বিয়ে করতে হয়। অন্যান্য পুত্ররা মৌলিক কন্যা বিয়ে করতে পারেন এবং সচরাচর তা-ই করে থাকেন।[৫] অবশ্য জ্যেষ্ঠপুত্রও প্রথমে কুলীনকন্যা বিয়ে করার পরে দ্বিতীয় বার মৌলিক কন্যার পাণি গ্রহণ করতে পারেন।

কুলীনপুত্রের কাছে কন্যা দান করতে পারলে মৌলিকদের পক্ষে তা গৌরবজনক হতো এবং তার ফলে কৌলীন্য মর্যাদা বৃদ্ধি পেতো। কুলীন জ্যেষ্ঠপুত্রসহ যে কোনো পুত্র কন্যা সম্প্রদান করতে পারলেই এই গৌরব ও মর্যাদা লাভ করা যায়। কিন্তু কোনো কোনো মৌলিক পরিবার কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে কন্যা দান করে বিশেষ গৌরব লাভ

১. লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৩৩; এবং নগেন্দ্রনাথ বসু, **রাজন্যকাণ্ড, প্রথমাংশ** (কলিকাতা, ১৩২১), পৃ. ১২৫।

২. **বহুবিবাহ**, পৃ ৪১৭; লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৩৭; এবং নগেন্দ্রনাথ বসু, **রাজন্যকাণ্ড**, পৃ. ৩৩০–৩১।

বঙ্গজ কায়স্থদের মধ্যে কুলীন তিন ঘর—ঘোষ, বসু ও গুহ। লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৫১।

৩. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৪১৭; লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৩৮।

৪. **বহুবিবাহ** পৃ. ৪১৭; লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৪১।

৫. **বহুবিবাহ** পৃ. ৪১৭।

করতে চান। অথচ জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলিক কন্যা গ্রহণ করতে পারেন দ্বিতীয় স্ত্রী হিশেবে—প্রথম স্ত্রী হিশেবে নয়। এ জন্যেই বিশেষ গৌরবাকাঙ্ক্ষী মৌলিক কন্যাকর্তাদের স্বভাবতই নিজেদের কন্যাদের দান করতে হতো জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বিতীয় স্ত্রী হিশেবে। এই রীতিকে পারিভাষিক শব্দে 'আদ্যরস' বলে।[৬]

আদ্যরসের অর্থ দাঁড়ায়, প্রধানত অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের কাছে আর-এক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মৌলিক অভিভাবক তাঁর কন্যাকে সপত্নী হিশেবে বিবাহ দেন। এদিকে কায়স্থদের কৌলীন্যের অন্য একটি নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রই কুলীন—পারিভাষিক শব্দে—'জন্মমুখ্য কুলীন'।[৭] এই জন্মমুখ্য-কুলীনের মাতামহ হওয়ার আশায় মৌলিক শ্বশুর জামাতাকে সমাদরপূর্বক নিজগৃহে আবদ্ধ রাখতেন।[৮] ফলে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে জামাতার যোগাযোগ ঘটতো না এবং যথাসময়ে অকুলীন দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এভাবে ধনী মৌলিক শ্বশুরের অহমিকা চরিতার্থ হয়।

কিন্তু এর ফলস্বরূপ একটি নিরপরাধ কুলীনকন্যা (প্রথম স্ত্রী) স্বামী থাকতেও বিধবার মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। মৌলিক শ্বশুরও জামাতাকে (বা জামাতা-দেরকে) বশীভূত রাখতে গিয়ে অর্থ ব্যয় করে ধীরে ধীরে নিঃস্ব হন। কোনো কোনো মৌলিক পরিবার এভাবে অর্থ ব্যয় করে চিরদিনের জন্যে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতো।[৯]

এই প্রথার আর একটি কুফল দেখা যেতো যখন মৌলিক পরিবার আদ্যরস-করা জামাতাকে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট অর্থ দিয়ে নিজেদের গৃহে ধরে রাখতে পারতো না। এর ফলে জামাতা দু স্ত্রী নিয়ে নিজ গৃহে বাস করতে বাধ্য হতেন। এমতাবস্থায় দুই পত্নীর অপ্রণয় সংসারকে বিষময় ও জীবনকে দুঃসহ করে তুলতো।[১০]

মোট কথা, আদ্যরস কৃত্রিম এবং আরোপিত একটি অযৌক্তিক সমস্যা। এর দ্বারা কন্যাদাতা, কন্যা এবং পাত্র—কেউই উপকৃত হতো না। সামগ্রিকভাবে সমাজও

৬. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৪১৮; লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৪৩।

লালমোহন তার রচনার অংশবিশেষ হুবহু বিদ্যাসাগর থেকে নিয়েছেন; কিন্তু কোথাও উদ্ধৃতি চিহ্ন অথবা স্বীকৃতি নেই। অন্যত্রও, বিশেষত কৌলীন্যের ইতিহাস বর্ণনায়, লালমোহন বিদ্যাসাগরের **বহুবিবাহ** গ্রন্থ থেকে বড়ো বড়ো অংশ উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়াই সরাসরি গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু এই সকল অংশ আবার লালমোহন থেকে স্বীকৃতিসহ গ্রহণ করেন। মনে হয়, তিনি জানতেন না যে, এ সব রচনা বিদ্যাসাগরের।

৭. লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃ. ১৪৪-৫৫।

৮. **বহুবিবাহ**, পৃ. ৪১৮-১৯।

৯. ঐ, পৃ. ৪১৯।

১০. এ অধ্যায়ের পরবর্তী ভাগ দ্রষ্টব্য।

এই প্রথার গ্লানিতে পঙ্কিল হতো। তবে কায়স্থ গণ যেহেতু সমগ্র হিন্দু সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ[১১] এবং মোট ৮৩টি উপাধিবিশিষ্ট কায়স্থদের মধ্যে মাত্র তিনটি (অথবা চারটি) পরিবারই কুলীন, এবং খুব স্বল্প সংখ্যক জ্যেষ্ঠ পুত্র আদ্যরসে স্বীকৃত হতেন, সে কারণে এ সমস্যা সমাজে তেমন ব্যাপ্তি লাভ করেনি। তা ছাড়া কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের সঙ্গে তুলনা করলে মাত্রার দিক দিয়েও এ সমস্যা তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। কুলীন ব্রাহ্মণদের যাঁরা বহুবিবাহ করতেন, তাঁরা যথার্থই অনেকগুলি বিবাহ করতেন, কিন্তু আদ্যরসকারী কুলীন কায়স্থ মাত্র দুটি বিয়েই করতেন। এই সব কুলীনপুত্ররা প্রথম স্ত্রীর ভরণপোষণও করতেন। এ জন্যেই আদ্যরস কুলীন বহুবিবাহের ন্যায় সমাজকে একেবারে ক্লেদাক্ত করে তোলেনি অথবা এ নিয়ে সে অর্থে কোন আন্দোলনও হয়নি।

শিক্ষা তথা নতুন মূল্যবোধের বিকাশের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যখন পরিবার ও সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে সচেতনতা এবং আত্মসমীক্ষার বোধ সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়, তখন—সমস্যাটি যতোই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকুক না কেন—ভুক্তভোগী ব্যক্তি এবং সমাজ-সংস্কারকগণ এর প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পান। অম্বিকাচরণ বসু এবং দীনবন্ধু মিত্র দুটি নাটকের মাধ্যমে[১২] এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি প্রবন্ধের দ্বারা[১৩] আদ্যরস প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সমাজবিবেককে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। এ ছাড়া আদ্যরস বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা সেকালে আর হয়নি। আসলে, সমস্যাটির দ্বারা এতো কম ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং শিক্ষিত কায়স্থগণ এতো দ্রুত এই প্রথার মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন যে, এ নিয়ে কোনো আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি।

বাংলা নাটকে অদ্যরস সমস্যা

বাংলা নাট্যসাহিত্যে অম্বিকাচরণ বসু এবং দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত অন্য কেউ কুলীন কায়স্থদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন বলে আমাদের জানা নেই।

১১. ১৯০১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুসারে তখনকার কায়স্থদের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গদেশের হিন্দুদের মাত্র শতকরা পাঁচভাগ।

Census of India, 1901, Vol. VI, Pt. I, P.459.

১২. অম্বিকাচরণ বসু, **কুলীন কায়স্থ নাটক** (কলিকাতা, ১৮৬১); দীনবন্ধু মিত্র, **জামাই বারিক** (কলিকাতা, ১৯২৯ সংবৎ, ১৮৭২)।

১৩. **বহুবিবাহ** গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৪১৭--২১।

দীনবন্ধু মিত্র[১৪] কলকাতার কোন এক বিখ্যাত পরিবারের ঘর-জামাই রাখার রীতি[১৫] এবং প্রসঙ্গত আদ্যরস প্রথাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেন তাঁর **জামাইবারিক** নাটকে। এই নাটকে ঘরজামাই রাখার এবং আদ্যরস করার রীতিকে তিনি এমন তীব্র এবং সফলভাবে আক্রমণ করেন যে, এ বিষয়ে তাঁর একটি নাটকই অনেকগুলি নাটকের ভূমিকা পালন করে। বহুলপঠিত[১৬] ও পুনঃপুন অভিনীত[১৭] এই নাটক পাঠক ও দর্শকদের মনে আদ্যরস প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে একটি সচেতনতা সার্থকভাবে জাগিয়ে তুলেছিলো বলে আমরা অনুমান করতে পারি।[১৮]

আলোচ্য নাটকে বিজয়বল্লভ নামক এক জমিদার-পরিবারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই পরিবারে 'আদ্যরস ভিন্ন, একটীও মেয়ের বিয়ে হয়নি'।[১৯] সুতরাং বিজয়বল্লভের পক্ষে কুলক্রিয়ার রীতি ভঙ্গ করে তার পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া সম্ভব নয়। একটি কুলীন পাত্র পাওয়া গেছে রূপে, গুণে, বিদ্যায় যে খুব ভালো। বিজয়ের ইচ্ছে ছিলো 'একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তারপরে পৌত্রীটি সম্প্রদান' করে; কিন্তু 'ছেলেটা দুই বিয়ে কত্তে চায় না'।[২০] এ জন্যে কুঁচিল বাবুর ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করার পরামর্শ দেয়। এই ছেলেটি যেমন কদাকার ও কুৎসিত, লেখাপড়া এবং আচার-ব্যবহারেও তেমনি মন্দ। কিন্তু আদ্যরস করার পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যবশতই কন্যাটি অপাত্রে দান করার পরিকল্পনা হয়।

১৪. আদ্যরস সমস্যার ভুক্তভোগী না হলেও, দীনবন্ধু মিত্র নিজে কুলীন কায়স্থ ছিলেন এবং সে কারণে এ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যে দীনবন্ধু **নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, লীলাবতী** প্রভৃতি নাটকে সমকালীন সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে যেমন সচেতনতার পরিচয় দেন তাঁর পক্ষে এ নাটক রচনা খুব স্বাভাবিক।

১৫. সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩

১৬. প্রকাশিত হওয়ার দশ বছরের মধ্যে নাটকটি পঞ্চম বার মুদ্রিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের তারিখ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

১৭. নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার ন মাস পরে ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে এর অভিনয় হয়। জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হবে এই আশা নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালকগণ প্রথম সপ্তাহে **নীলদর্পণের** অভিনয় করেন, আর দ্বিতীয় সপ্তাহে করেন **জামাই-বারিক**। দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃ. ৯১।

১৮. সংস্করণ থেকে পাঠ্যনাটক হিশেবে এর জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। আর এর অভিনয় যে সাধারণ দর্শকদের খুব তুষ্ট করেছিলো তারও সমসাময়িক প্রমাণ আছে। দ্রষ্টব্য: **অমৃতবাজার পত্রিকা**, ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭২, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৯২।

১৯. **জামাই-বারিক** পৃ. ২।

২০. ঐ, পৃ. ১।

আদ্যরস করার জন্যে বিজয়বল্লভকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সকল জামাতাকে সে এক-একটি জমিদারি লিখে দেয়। তাছাড়া স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ জামাতাদের, এমন কি জামাতাদের ভরণপোষণের তাবৎ ব্যয় বহন করে। জামাতাদের বসবাস করার নিমিত্তে সে একটি ব্যারাক নির্মাণ করে দেয় এবং সেই ব্যারাকে সাড়ে বাহান্ন জন[২১] জামাতা সারা বছর বাস করে।

অপর পক্ষে, জামাতারা প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে কার্যত ত্যাগ করে আদ্যরস করতে রাজি হয় অথবা বাধ্য হয় দারিদ্র্যবশত, অর্থ প্রলোভনে। এ নাটকের নায়ক, অন্যতম জামাতা, অভয়কুমারও খুবই দরিদ্র– তার স্ত্রী কামিনীর কথা থেকে তা জানা যায়। অভয়কুমার রাগ করে বাড়ি চলে গেলে কামিনী তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না; কেননা সে জানে জঠরের তাড়নায় সে আবার ফিরে আসবে।[২২] অভয় নিজেও পদ্মলোচনের কাছে স্বীকার করে—'যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হলে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ গুলিটে আভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িছি; জামাই বারিকে অক্লেশে উপযুক্ত আহার মেলে'।[২৩] জামাইরা যখন মাঝে মাঝে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে, তখন দেখা যায় তাদের চুলে তেল নেই, গায়ে গন্ধ। অর্থাৎ দারিদ্র্যবশত তারা তেল বা সাবান কিনতে সমর্থ হয় না।

বিজয়বল্লভের ব্যারাকে পরান্নভোগী জামাতাদের কোনো বিষয় চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু তবু তারা সুখী নয়। স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করার যে আনন্দ, তারা তা থেকে বঞ্চিত। বিজয়বল্লভের বাড়ির কিছু সংখ্যক নারীর যৌন চাহিদা মেটানোর জন্যে তারা পোষা-পুরুষের মতো– দ্বিতীয় জামাতার ভাষায় 'নাগা সন্ন্যাসী'—ব্যারাকে বাস করে।[২৪] কারো তিন দিনে, কারো চার দিনে, কারো সপ্তাহে, কারো মাসে একবার রাতের বেলায় বাড়ির ভিতরে ডাক পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঐ পর্যন্তই। এ নাটকের কোথাও সন্তানদের প্রত্যক্ষ করি না। জামাতাদের জীবনে তাদের ভূমিকা হয়তো না-থাকার মতোই।

মদ খেলে জামাতাদের ব্যারাক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। অন্তঃপুরে ঢোকার পথে দারোয়ানের হাতে ঘাড়-ধাক্কা খাওয়ার কথাও জানা যায়।[২৫] এ থেকে মনে হয়, বিনে পয়সায় আহার এবং বাসস্থান পাওয়া ছাড়া, জামাতারা কোন সম্মান বা সমাদর

২১. যে জামাতার স্ত্রী মারা গেছে, তাকে আধ-জন ধরা হয়।
২২. জামাই-বারিক, পৃ. ১৮।
২৩. ঐ, পৃ. ৩২-৩৩।
২৪. ঐ, পৃ. ৫২।
২৫. ঐ, পৃ. ৪০।

পেতো না। সন্ধ্যায় জামাতারা গাঁজা টানে, গুলি খায় এবং হৈ হল্লোড় করে; কিন্তু সে তারা মনের আনন্দে করে, না দুঃখ ভুলে থাকায় জন্যে করে তা ঠিক বোঝা যায় না। মোট কথা, অদ্যরসের জামাতা প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ নিজের বাবামা, ভাইবোনে প্রভৃতি আত্মীয়দের সাহচর্য লাভের এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম করার সকল রকমের স্বাধীনতা হারিয়ে অফুরন্ত বিশ্রামের স্রোতে ভাসমান অনিকেত প্রাণীতে পরিণত হয়, দীনবন্ধু মিত্র বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে প্রচুর হাস্যরসের জোগান দিয়ে, সার্থকতার সঙ্গে তা চিত্রিত করেন। কিন্তু পাঠক বা দর্শক হাসতে হাসতে বেসামাল হয়ে পড়লেও, সম্মানহীন জামাতাদের জন্যে সহানুভূতি বোধ না-করে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে, জামাতাদের প্রতি কেউই সম্মান প্রদর্শন করতো না। হাবার মার মতো পরিচারিকাও তাদের জন্যে অনুকম্পা বোধ করে। স্ত্রীরা তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখায়, ঘর থেকে বের করে দেয়, সময় বিশেষে লাথি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। জামাইরা সাধারণত স্ত্রী-মনিবের হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত---'জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে'।[২৬] কিন্তু কোন জামাতা স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলতে না পারলেই গোল বাধে। অভয়কুমার কিছু ব্যতিক্রমধর্মী এবং সে কারণেই স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে।

অবশ্য স্ত্রীরাও (দ্বিতীয় স্ত্রী) যে খুব সুখী তা নয়। স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে স্বতন্ত্র সংসার করার যে সুখ, স্বভাবতই তারা তা থেকে বঞ্চিত। স্বামীদের দারিদ্র্য এবং নিজেদের ঐশ্বর্যবশত তারা হয়তো স্বামীদের প্রতি মাঝে মাঝে হম্বিতম্বি করতে পারে, কিন্তু পিতা ও ভ্রাতাদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় স্বামীদের মতোই তাদের ভাগ্যেও আসলে সম্মান দুর্লভ বস্তু। কামিনী যে বলে 'ঘর জামায়ে ভাতার যার,/ কানের সোনা নিন্দে তার।'[২৭] সে কথা সম্পূর্ণ সত্য।

আদ্যরস প্রথার প্রতি এ নাটকের নরনারীদের যে মনোভাব প্রসঙ্গত তা-ও উল্লেখ-যোগ্য। প্রাচীনপন্থী হলেও বিজয়বল্লভ মনুষ্যত্ব ও সুস্থ বোধবর্জিত নয়। অভয়-কুমারের সঙ্গে তার ব্যবহার বরং উল্টোটাই প্রমাণ করে। তবু প্রচলিত প্রথার প্রতি তার আনুগত্য অন্ধ এবং অত্যন্ত প্রবল। বংশের সকল কন্যার যেহেতু আদ্যরস করে বিয়ে হয়, সে জন্যে পৌত্রীটির বিয়েও তেমন করেই হতে হবে—এ তার বিশ্বাস। তার জন্যে যদি রূপবান, গুণবান, বিদ্বান পাত্র বাদ দিয়ে কুৎসিত, গুণহীন এবং মূর্খ পাত্রকেও বরণ করতে হয়, সে তাতেও প্রস্তুত। এ বিষয়ে তার পুত্ররা, ঘটক কিংবা সমাজের পাঁচ ব্যক্তি যে ক্রমশ পরিবর্তিত মানসিকতা লাভ করেছে, এটা তার কাছে

২৬. ঐ, পৃ. ১৯।
২৭. ঐ।

বিস্ময়কর এবং বিরক্তিকর। ঘটকের মুখে কুঁচিল বাবুর পুত্রের কদাকার চেহেরা ও গুণহীন চরিত্রের বর্ণনা শুনে সে যে-মন্তব্য করে, তা থেকেই তার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তুমি শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চো ; ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটির সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েছ।[২৮]

যুগ পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু তাই বলে সুপাত্রের জন্যে কুলক্রিয়া ত্যাগ করে সে 'কুলঙ্গার' হতে পারবে না[২৯]—এ তার স্পষ্ট স্বীকৃতি এবং মনোভাবের স্বচ্ছ প্রকাশ।

অধিকাংশ জামাতা এ প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পায় না। প্রথম স্ত্রীর কথা তারা যে একবারও স্মরণ করে বা তাদের প্রতি স্বামী হিশেবে দায়িত্ব পালন করে, তার কোন প্রমাণ আমরা কোথাও পাইনে। বস্তুত, ব্যারাকের জীবনকেই তারা সুখদুঃখ বর্জিত জীবের মতো স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। অন্তঃপুর থেকে ডাক এলে যখন তারা স্ত্রীদের কাছে যায়, তখন স্ত্রীর কথামতো গায়ে গোলাপ-জল দেয় (ব্যারাকে রোজ আধমন গোলাপ-জল খরচ হয়)।[৩০] আতর-ল্যাভেণ্ডার মাখে, স্ত্রী বাইরে গেলে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেয়, দরজা খোলে, বন্ধ করে, জল এনে দেয় ইত্যাদি।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভয়ের মতো কোনো কোনো জামাতার মনোভাবের পরিবর্তন শুরু হয়। কামিনীর ভাষায় অভয় হলো 'বিশ্বের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর, কথায় কথায় তেজ'।[৩১] তাকে সুগন্ধি মাখতে বললে সে রাজি হয় না, বলে—

আমি তা করবো না।

কামিনী। অন্য অন্য জমাইরা তো করে।

অভয়। তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান, তাই করে।—ও কথাগুলিন আমি ভাল বাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়।[৩২]

—এই অপমান বোধ হওয়া জিনিশটা নতুন এবং এই সচেতনতাবশতই অভয়কুমারকে আমরা অন্তত দু বার রাগ করে ব্যারাক ছেড়ে চলে যেতে দেখি। কিন্তু কামিনীর কথায় জানতে পারি, সে অতীতেও অনেক বারই 'অমন রাগ' করে।[৩৩] অভয়ের

২৮. ঐ, পৃ. ৩।
২৯. ঐ, পৃ. ২।
৩০. ঐ, পৃ. ৫৮।
৩১. ঐ, পৃ. ১৭।
৩২. ঐ, পৃ. ৫৭।
৩৩. ঐ, পৃ. ১২-১৮।

কাছে শেষ বারের অপমান অসহ্য বোধ হয় এবং চোখের জল ফেলে সে শ্বশুরের কাছে নালিশ জানিয়ে নিজের বাড়ি চলে যায়। প্রকৃত পক্ষে, তার আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায়, আদ্যরস-করা অর্থাৎ দাসখৎ লিখে দেওয়া জামাতাদের মনোভাব ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছিলো।

মনোভাব পরিবর্তনের সংবাদ নাট্যকার আমাদের নাটকের প্রারম্ভেই সরবরাহ করেন। যে ভালো কুলীন পাত্রটি পাওয়া গেছে আদ্যরস করার ব্যাপারে তার পিতার সম্মতি আছে; কিন্তু নতুন কালের পাত্র দু বিয়ে করতে স্বীকার করে না, ফলে বিয়ে ভেঙে যায়।[৩৪] আমরা আরো জানতে পাই—রামকানাই তাই পুত্রকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য করায় সমাজের চোখে নিন্দার পাত্র হয়।—'কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না; ভদ্র সমাজে তাঁর হুঁকা বন্দ।' বিশেষত রামকানাই শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এই অপকর্মটি করায় যথেষ্ট নিন্দা হয়।

ঘটক। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে করতো? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই! এক কামড়ে তিনটি মাথা খেলে।"

চতুর্থ পরিষদ। কার কার?

ঘটক। পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানষের মেয়ের।[৩৫]

সমাজের ক্রমবর্ধমান সচেতনতাই আসলে এই নিন্দার কারণ। এই সচেতনতার মুখেই—ঘটকের ভাষায়--'আদ্যরস প্রায় উঠে গেল।'[৩৬] এবং নতুন মানসিকতা প্রাপ্ত অভয় তাই কামিনীর সঙ্গে পুনর্মিলনের সময়ও জামাইদের ব্যারাক ত্যাগ করার সংকল্প জানিয়ে বলে, 'দেশে যাব কিন্তু জামাই-বারিকে আর যাব না'।[৩৭]

আদ্যরসের প্রতি নারীদের, বিশেষত দ্বিতীয় স্ত্রীর, মনোভাব লক্ষ্যযোগ্য। কামিনী যে তার স্বামীকে ভালোবাসে না তা নয়, বরং যথেষ্টই বাসে, সে কারণেই শেষে তার অত অনুশোচনা এবং কৃচ্ছ্রসাধনা। কিন্তু সেই কামিনীও স্বামীর প্রতি বিভিন্ন সময়ে যে মনোভাব দেখিয়েছে, তার মধ্যে তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞাই প্রধান। গায়ে সুগন্ধি মাখার আদেশের মধ্য দিয়েই এই অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায় না, আসলে কামিনী এবং অন্যান্য স্ত্রীরা সকলেই স্বামীকে অনেকটা ক্রীতদাসের মতোই গণ্য করতো। সেবা দূরে থাক, তারাই বরং স্বামীর কাছ থেকে সেবা আশা করতো। বৃন্দাবনে পুনর্মিলনের সময়ে কামিনী তার স্বামীকে অনুতপ্ত হয়ে বলে—

৩৪. ঐ, পৃ. ১-২।
৩৫. ঐ, পৃ. ২।
৩৬. ঐ।
৩৭. ঐ, পৃ. ৭৩।

অভয় তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে, আর আমি খাস গ্যাদারি কোচে বসে থাকতাম-- এখন ভাবি কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কলকে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাত মুছিয়ে দিতাম না।[৩৮]

সে যা করতে পারতো এবং বাস্তবে সে যা করতো-- এই দুটো হলো সেকালের স্বামী-গত প্রাণ ও আদ্যরসের দ্বিতীয় স্ত্রীর পার্থক্য।

আসলে কেবল সেবা নয়, স্বামীর আচরণ মনের মতো না হলেই, কামিনীর মতো স্ত্রী স্বামীকে ধমক দিতে পারতো।—'খাটে উঠবে আর নদিদির মত করবো,—নাতি মেরে নাবয়ে দেব।'[৩৯] স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের এই অশ্রদ্ধার মনোভাব কেবল সেবার প্রশ্নে নয়, অন্যত্রও প্রকাশ পেতো। অভয়কে কামিনী পছন্দ করতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণের মধ্যেই অভয় অন্তঃপুরে আসবে-- মিলনের সেই পূর্বক্ষণে--কামিনী তাকে লক্ষ্য করে যা বলে, তা দিয়েও তার মনোভাব বোঝা যায় :

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলে না ;
স্যাওড়া গাছের কেলে সোনা,
গাঁজার খবর ষোলো আনা,
তারি হাতে এই ললনা।[৪০]

কামিনীর আরো মনে হয়, এমন 'চাসা' স্বামীর জন্য, চুল বাঁধা, কবরীতে মল্লিকার ফুল দেওয়া, অলকে মুক্তাপুঞ্জ ঝোলানো, রাঙা পায়ে আলতা দেওয়া, কটিতটে চন্দ্রহার পরা, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা, মেহেদি দিয়ে হাত রাঙানো একেবারে অর্থহীন।[৪১] কারণ তার স্বামী 'গোড়া বাঙ্গারাম'—

ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্ছে ঘাস
বারমাস করে জ্বালাতন ;

*

থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাতায় বিচালি বাঁধি আনে ;
এমন চাসার কাছে, আমার কি সুখ আছে।[৪২]

৩৮. ঐ, পৃ. ৭২।
৩৯. ঐ. পৃ. ৫৯।
৪০. ঐ, পৃ. ৫৫।
৪১. ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯।
৪২. ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।

কামিনীর আরো দুটি মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—যার মধ্য দিয়ে তার মনোভাব স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়।

১. 'ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ / মরা বাঁচা সমান সুখ।'[৪৩]

২. ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসী সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরাল।[৪৪]

আসলে শ্বশুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল মর্যাদাহীন স্বামী নিয়ে স্ত্রীর পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়; এজন্যেই কামিনী বা তাঁর ভগ্নীরা ধনসম্পদ, হাতের কাছে ভৃত্যসদৃশ অনুগত স্বামী থাকা সত্ত্বেও সুখী হতে পারেনি। এক জামাই মদ খাওয়ায় চাকর তাকে অপমান করে। এতে তার স্ত্রী—কামিনীর মেজদিদি—আত্মহত্যা করে মনের দুঃখ ও ক্ষোভ জুড়োয়। কামিনীর কথা থেকে মনে হয়, তার মেজদিদি স্বামীকে ভালোবাসতো, কিন্তু আদ্যরসের ব্যারাক-জীবনই তাকে অসুখী করে।[৪৫]

প্রকৃতপক্ষে, আদ্যরসের ফলে কি জামাতা, কি স্ত্রী কেউ সুখী হয় না, জামাই-বারিক থেকে তা স্পষ্টত দেখা যায়। কায়স্থদের এই অনিষ্টকারী সামাজিক প্রথা সম্পর্কে বাংলা নাটকে বিস্তৃত কোনো চিত্র অঙ্কিত হয়নি বটে, কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র রচিত এই একটি নাটকই এর মন্দ দিকগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত করতে পেরেছে।

অম্বিকাচরণের কুলীনকায়স্থ নাটক জামাইবারিকের তুলনায় অতি দুর্বল রচনা। মাত্র ৩৯ পৃষ্ঠার এবং চারটি দৃশ্যে (নাট্যকারের মতে অঙ্কে) বিভক্ত এই নাটকটি সাহিত্য এবং সামাজিক উপকরণ উভয় দিক দিয়েই অতি নগণ্য। ভূমিকায় নাট্যকার বলেন, 'অদ্যাপি কি দক্ষিণ দেশস্থ, কি বঙ্গদেশস্থ কুলীনকায়স্থদিগের বর্তমান চরিত্র সম্পর্কে কেহ কোন প্রস্তাব লেখেন নাই। এমন গুরুতর বিষয়ে মৌন থাকা নিতান্ত অনুচিত বিবেচনায়' তিনি 'বহু পরিশ্রম ও যত্নসহকারে' এই নাটক রচনা করেন।[৪৬]

এই নাটকে তাই বলে আদ্যরস সমস্যা বিষয়ে নাট্যকার আদৌ কিছু বলেননি। কিন্তু কুলীনকায়স্থদের অন্য একটি সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি দেখান, মৌলিক কায়স্থগণ জাতে ওঠার জন্যে কুলীনকায়স্থ গৃহ থেকে কন্যা আনার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। কুলীনকায়স্থগণ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ

৪৩. ঐ, পৃ. ১২।

৪৪. ঐ, পৃ. ১১।

৪৫. ঐ, পৃ. ১০-১১।

৪৬. অম্বিকাচরণ বসু, কুলীনকায়স্থ নাটক (কলিকাতা, ১৮৬১), 'বিজ্ঞাপন'।

গ্রহণ করতেন। তাঁরা অকুলীনের নিকট কন্যা দান করে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করতেন। 'সৌভাগ্যক্রমে' কারো অনেকগুলি কন্যা থাকলে সে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতো। এ নাটকের দলপতি এমনি একটি কুলীন কায়স্থ। সে একের পর একটি কন্যা বিক্রয় করে সংসার চালায়। বংশধর সেন মৌলিক কায়স্থ। সে দলপতির একটি কন্যা তার পুত্রের জন্য নিতে চায়। পাছে গ্রামের লোকেরা বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় স্থির হয় দলপতি কন্যাকে নিয়ে পাত্রের বাড়িতে গিয়ে সম্প্রদান করবে। যথারীতি গোপনে এই বিবাহকর্ম সম্পন্ন হয়। দলপতির স্ত্রী, বামা, উমা, শ্যামা প্রভৃতি মহিলার আলাপ থেকেও কন্যা থাকা যে আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক তা বোঝা যায়। বামার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'আমি যদি অত মেয়ে বিউতে পাত্যেম, তাহলে আমার ভাতার কানে সোনার গেঁঠে গড়িয়ে দিতো।'[৪৭]

নাট্যকার কুলীনকায়স্থদের অন্য আর-একটি দোষ দেখান। তাঁর অঙ্কিত বেশির ভাগ কুলীন কায়স্থের আর্থিক অবস্থা খারাপ। এ জন্যে তারা অনেকেই নিমন্ত্রণ ভোজন ও কুলমর্যাদা লাভকে প্রধান আয় বলে গণ্য করে। তারা নিমন্ত্রণ লাভের জন্যে যে কোনো নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করতে কিংবা অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়। কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, অভয়, ভীরু প্রভৃতি এই ধরনের কুলীন। এর মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ সামান্য অর্থের জন্যে মিথ্যা কথা বলা, ছলনা করা থেকে আরম্ভ করে যে কোনো ধরনের অপকর্ম করতে প্রস্তুত। নবীনের ভাষায়, 'কুলীনের কুলেতে জন্ম হইয়াছে যার। / পুত্রকন্যা বিক্রয় ব্যবসা তার সার।।'[৪৮] আর কৃষ্ণপ্রসাদের ভাষায়, '...ভাই সকলেতে সদা দিয়ে বহু ধন। / যতন করিয়া করো থাকে নিমন্ত্রণ।। / এমনি সামগ্রী মোর সবে ভালবাসে। / জামাতা করিয়া কেহ রাখে নিজ বাসে।।'[৪৯]

৪৭. ঐ, পৃ. ১৬।
৪৮. ঐ, পৃ. ৬।
৪৯. ঐ, পৃ. ৮।

তৃতীয় ভাগ

কৌলীন্য ও তার অনিবার্য কুফলসমূহ ঃ সাপত্ন্য

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী বন্ধ্যা, রুগ্না, সুরাপায়ী, অপ্রিয়বাদিনী অথবা বিকৃত মস্তিক হলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায়।[১] অন্যত্র বলা হয়েছে যে, প্রিয় স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে, প্রথম স্ত্রীকে আপন ধনের এক তৃতীয়াংশ দান করতে হবে।[২] প্রকৃত পক্ষে বহু-বিবাহ নিরুৎসাহিত করার জন্যে শাস্ত্রকারগণ এ রকমের আরো অনেক বিধান দিয়ে-ছিলেন।[৩] কিন্তু এসব সত্ত্বেও, ধনী বা রাজগৃহে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না।[৪]

পুরাণে বা প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার যে সব দৃষ্টান্ত আছে, প্রায়শ সেগুলি প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়ার জন্যে। অপর পক্ষে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ কিংবা আদ্যরসকারী কায়স্থদের অনুকরণে, অবস্থাপন্ন কিছু অকু-লীন ব্যক্তিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বহুবিবাহ—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটি বিবাহ করা শুরু করেন। তবে কুলীন ব্রাহ্মণ ও আদ্যরসের জামাতাদের মতো এঁরা অর্থলোভে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন না, বরং অর্থ ব্যয় করে যৌন সম্ভোগ এবং জীবনে বৈচিত্র্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই বিবাহ করতেন। এ কারণে এঁরা কুলীনদের মতো স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়িতে ফেলে রাখতেন না—উল্টো একাধিক স্ত্রী নিয়েই সংসার করতেন। আবার আদ্যরস করা যে সব জামাতা শেষ পর্যন্ত শ্বশুর বাড়িতে আবদ্ধ থাকতেন না। তাঁরাও দু স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন। মোট কথা, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে দু স্ত্রীর সংসার আদৌ অসাধারণ ব্যাপার ছিলো না।

১. যাজ্ঞবলক্য সংহিতা, ১/৭৩, **বহুবিবাহ,** দ্বিতীয় পুস্তক (কলিকাতা, ১৮৭৩)-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৯৪।

২. মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়, 'বহুবিবাহ', **বিদ্যাদর্শন,** শ্রাবণ ১৭৬৪ (জুলাই-অগস্ট ১৮৪২) প্রবন্ধে, উদ্ধৃত, **সাবাস ৩,** পৃ. ৫৫৯।

৩. দ্রষ্টব্য **বহুবিবাহ** দ্বিতীয় পুস্তক, পৃ. ৮৩-৯০, ৯৪-১০৫, ১৪২-১৪৯, ১৫৯ এবং যত্রতত্র।

৪. S. Bandyopadhya, **Foreign Accounts of Marriage in Ancient India,** pp. 3-4.

দুই বা ততোধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে গেলে একান্নবর্তী পরিবারে কতোগুলো সমস্যা দেখা না দিয়ে পারে না। বিশেষত, স্ত্রীদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বেষবশত সংসারে সাধারণ অশান্তি ও কলহ থেকে আরম্ভ করে আত্মহত্যা এবং হত্যা পর্যন্ত বহু অনিষ্টের সৃষ্টি হতো। উনবিংশ শতাব্দীতে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে যে, সপত্নীগণ পরস্পর কলহ করে উভয়ই আত্মহত্যা করার প্রয়াস পান।[৫] উভয়ের মধ্যে মারামারি ও ঝগড়া-ঝাঁটির দৃষ্টান্ত, বলা বাহুল্য, অনেক বেশি সাধারণ। এ শতাব্দীর চতুর্থ পাদেও সাপত্ন্য হেতু সংসারে যে অমঙ্গল ঘটে সে বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশিত হয়।[৬] এ থেকে বোঝা যায়, সাপত্ন্য যথেষ্ট মাত্রায় প্রচলিত ছিলো এবং সমাজের একটি অংশে তখনো এ সম্পর্কে খুব বেশি সচেতনতার উদ্রেক হয়নি।

তবে একাধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার করার ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হতো সে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে সমাজ-বিবেককে জাগিয়ে তোলা সমাজ-সংস্কারের সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগে খুব শক্ত কাজ ছিলো না। বাস্তবিক পক্ষে, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে,[৭] প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপন্যাস রচনার মাধ্যমে[৮] এবং দীনবন্ধু মিত্র, তারকচন্দ্র চূড়ামনি, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ নাটক রচনার মাধ্যমে যখন এই প্রথার বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস পান, তখন রক্ষণশীল সমাজও তার বিরোধিতা করেনি। বাধা এসেছে কুলীন ব্রাহ্মণদের এবং কায়স্থদের আদ্যরস—এই দুটি ধর্মীয় সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশন পাছে ভেঙে পড়ে[৯] — এ জন্যে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার করা ভালো একথা—কেউই বলেননি।

৫. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪, পৃ. ৫১৯।

৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: হরচন্দ্র ঘোষ; **সপত্নীসরো** (কলিকাতা, ১৮৭১); দামোদর মুখোপাধ্যায়, **সপত্নী** (কলিকাতা, ১৯০৪); হরিশচন্দ্র মিত্র, **সপত্নীকলহ** (ঢাকা, ১৮৭২)।

৭. বর্তমান প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা **ধর্মনীতি**, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের **বহুবিবাহ**, দুই খণ্ড।

৮. প্যারীচাঁদ মিত্রের **আলালের ঘরের দুলাল** (দ্বিতীয় সং; কলিকাতা, ১৮৭০)-এ বলা হয়েছে, 'এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ।...যদ্যাপি ইহার উল্টো কোনো শাস্ত্র থাকে সে শাস্ত্রমতে চলা কখনই কর্তব্য নহে।' সপ্তদশ অধ্যায়; পৃ. ১০৬-০৭।

বঙ্কিমচন্দ্রের **বিষবৃক্ষ** (কলিকাতা, ১৮৭৩) ও **কৃষ্ণকান্তের উইল** (কলিকাতা, ১৮৭৮) বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

৯. ১৮৬৬ সালে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাতে এ দুটি ইন্‌স্টিটিউশন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। দ্রষ্টব্য **বাহুবিবাহ**, দ্বিতীয় ও পঞ্চম আপত্তি।

আসলে বহু বিবাহ সম্পর্কে শিক্ষিত এবং ভদ্রপরিবারে একটা প্রতিকূলতা গত শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এ জন্যে দেখতে পাই সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার, মহেন্দ্রলাল সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি—কেউই এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। বরং প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো লোকও বিরল ছিলেন না যাঁরা প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলেও দ্বিতীয় বার বিবাহ করেননি। দ্বিতীয় বার বিবাহ করা আসলে প্রথম স্ত্রীর পবিত্র-প্রণয়ের অপমান করা—এ ধারণাও কারো কারো মধ্যে দানা বাঁধছিলো।[১০]

আত্মসচেতনতা ও সমাজ-সংস্কারের স্বর্ণযুগ—১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকেই সপত্নী সমস্যা সম্পর্কে এদেশীয় নাট্যকারগণ তাঁদের সজাগ মনের পরিচয় দান করেন। ১৮৫৮ সালের জানুআরি মাসে প্রকাশিত সপত্নী নাটকে তারকচন্দ্র চূড়ামণি এই সমস্যা যে ভয়ঙ্কর বস্তু সেদিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বিপিনবিহারী সেনগুপ্তের **হিন্দু মহিলা নাটক** (১৮৬৮, রচিত ১৮৬৬) এবং দীনবন্ধু মিত্রের **জামাইবারিক** (১৮৭২) নাটকেও অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সাপত্ন্য সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়। কিন্তু **নবনাটকে** (১৮৬৬) রামনারায়ণ তর্করত্ন সর্বপ্রথম সাপত্ন্যকে কেন্দ্রীয় ভাববস্তু হিশেবে গ্রহণ করেন। তিন বছর পরে মনোমোহন বসুও **প্রণয় পরীক্ষা নাটকে** দুই স্ত্রীর সংসার চিত্রকে নাটকের প্রধান কাহিনীরূপে অঙ্কিত করেন। এই নাটকগুলির মধ্যে **নবনাটক, প্রণয়পরীক্ষা নাটক** এবং **জামাইবারিক** জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।[১১] পাঠ্য নাটক হিশেবেও এগুলি বহুল প্রচলিত হয়েছিলো।[১২]

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকারগণ সমস্যাটিকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। সাপত্ন্য সংসার জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করে তার চিত্র প্রত্যেক নাটকেই কমবেশি

১০. দ্রষ্টব্য : ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ', 'বহুবিবাহ', 'বৈধব্যব্রত', **পারিবারিক প্রবন্ধ**, পৃ. ১২৪-২৬, ১২৭-২৯, ১৩০; দেবীপ্রসন্নরায় চৌধুরী, 'স্বামী ও স্ত্রী', **নব্যভারত**, আশ্বিন ১২৯৩, পৃ. ২৫৮।

১১. **নবনাটক** জোড়াসাঁকো থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে বহুবার অভিনীত হয়। দ্রষ্টব্য : **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃ. ৫৪-৫৬। সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও **নবনাটক** একাধিক বার অভিনীত হয়েছিলো। ঐ, পৃ. ১৭৭, ১৭৯।

১২. **নবনাটক** ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। **প্রণয়পরীক্ষা নাটক** দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে; তৃতীয়বার ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে।

স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। আসলে প্রত্যেক নাট্যকার আপনাপন অভিরুচি অনুযায়ী এক একটি বিন্দুতে ফোকাস নিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সপত্নীত্বহেতু সংসারে অশেষ অনিষ্ট ও সম্যক অসুখ জন্যে, সকলেরই এই একটি প্রতিপাদ্য।[১৩]

সপত্নী নাটকের ভূধর চরিত্রটি সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নাটকের শুরুতে অন্তত কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার কথোপকথন থেকে, বোঝা যায়, স্ত্রী সৌদামিনীর প্রতি তার আদর বা আকর্ষণ ন্যূন নয়।[১৪] কিন্তু পরে জানতে পারি, সৌদামিনী একে সন্তানহীন, তদুপরি দুটি কারণে তার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ভূধরের মা এবং বোনেরা মনে করে যে, ভূধর অতিমাত্রায় স্ত্রীর বশবর্তী এবং এই আনুগত্য দূর করার জন্যে তাকে আর একটি বিয়ে করানো উচিত। দ্বিতীয়ত অভিভাবকের মতে বাল্যকালে বিয়ে করায় এখন সৌদামিনীকে ভূধরের আর ভালো লাগে না। অন্য একটি মেয়েকে সে পছন্দ করে। সে তাকে বিয়ে করতে চায়।[১৫]

নবনাটকের গবেশ বাবু দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী কিছু ভিন্ন কারণে। গবেশ বাবুর বয়স পঞ্চাশোর্ত্তীর্ণ এবং তার স্ত্রীও প্রৌঢ়া। এখন একটি কম-বয়সী মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়।[১৬]

প্রণয়পরীক্ষা নাটকের শান্তশীল প্রথম স্ত্রী মহামায়ার সন্তান হয়নি বলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। এ ব্যাপারে তার মা এবং প্রথম পত্নী মহামায়ারও আপাত সমর্থন ও উৎসাহ ছিলো।[১৭] তবে লক্ষণীয় এই যে, দ্বিতীয় বিবাহ করে তখন মহামায়া ২৪ বছরের যুবতী এবং তার সৌন্দর্যের আকর্ষণ মোটেই হ্রাস পায়নি অথবা সন্তান সম্ভাবনাও একেবারে লোপ পায়নি।

বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকে প্রসন্নের প্রথম স্ত্রী মোহিনীর দেরিতে সন্তান হয়। এ জন্যে প্রসন্নের মাই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পুত্রকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য করে।

১৩. এ নাটকগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত অন্যান্য নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকের ভূমিকায় স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজের দোষ সংশোধনই তাদের উদ্দেশ্য।

১৪. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১১-১৩।

১৫. ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।

১৬. দ্বিতীয় বিবাহ করার ব্যাপারে তার মনে যে দ্বিধা নেই তা নয়; বরং এ জন্যেই সে পরিষদগণের কাছে নৈতিক সমর্থন চায়। পৃ. ১৫-১৯, ২৩-২৫, ২৮-২৯।

১৭. **প্রণয়পরীক্ষা নাটক** পৃ. ১৪৭, ১৫২।

জামাইবারিক নাটকের পদ্মলোচন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে প্রথম বিয়ের পাঁচ বছর পরে; সম্ভবত সন্তান না হওয়ার জন্যেই।[১৮]

দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার ফলে সংসার যে বিষময় হয়ে যায়, তা দেখানোর জন্যে আলোচ্য নাটকসমূহে প্রথমত দ্বিতীয় স্ত্রীর চরিত্রকেই কুটিল, ঈর্ষাকাতর ও কলহ-পরায়ণ করে চিত্রিত করা হয়েছে। সপত্নী নাটকের প্রথম স্ত্রী সৌদামিনী সম্পূর্ণ স্বামীগতপ্রাণ, নবনাটকে সাবিত্রী 'সাবিত্রী' নামের যোগ্য আদর্শ স্ত্রী, নবীন বিরহিণী নাটকের প্রথম স্ত্রী বিরহিণী সৌদামিনী এবং সাবিত্রীর মতোই স্বামীর প্রতি অনুগত 'সোনার পুতুল', 'ঘরের লক্ষ্মী,[১৯] বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দুমহিলা নাটকের প্রথম স্ত্রী মোহিনীও তার মোহ দিয়ে ননদ, শ্বাশুড়ী সকলকে মুগ্ধ করে রাখে। কেবল প্রণয়পরীক্ষা নাটকেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। এখানে প্রথম স্ত্রী মহামায়ার চরিত্রকে কুটিল এবং নীচ বলে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রী সরলা সরলতা, কোমলতা এবং পবিত্রতার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।[২০] জামাইবারিকে বগলা ও বিন্দুবাসিনীর মধ্যে তারতম্য নেই, কলহপরতা, ঈর্ষাকাতরতা এবং চুলো-চুলিতে উভয়ই সমান।

নাটকগুলির কাহিনীর ভিতর একটা প্যাটার্ন সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় স্ত্রী আসায় সংসারে কলহ-বিবাদ আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে। গবেশ বাবুর সাজানো সংসার দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমনে অচিরেই শুকিয়ে যায়। সাবিত্রীর চরম লাঞ্ছনা এবং আত্মহত্যা, গবেশবাবুর শোচনীয় মৃত্যু এবং মায়ের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণে পুত্র সুবোধের আকস্মিক মৃত্যু বহুবিবাদের কুফল একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এর সঙ্গে তুলনীয় বিপিনমোহনের হিন্দু মহিলা নাটকের শোচনীয় পরিণতি। দ্বিতীয় স্ত্রী শশিমুখীর অত্যাচার ও গঞ্জনায় এবং সম্ভবত স্বামীর অবহেলার জন্য মোহিনী গলায় ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যা করে। কতকটা এই কারণে, কতকটা বিধবাকন্যা গোলাপির পলায়নের জন্যে মোহিনীর শ্বশুরও আত্মহত্যা করে এবং তার স্বামী সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করে। শান্তশীলের সুখী জীবন ও সংসারকে প্রবলভাবে

১৮. এ প্রসঙ্গে বিন্দুবাসিনীর উক্তি স্মরণীয়। সে ঝগড়ার সময় বগলাকে বলে যখন তার স্বামী 'দেখলে তুই হিজড়ে' তখন দ্বিতীয় বিবাহ করে। পৃ. ২৮-২৯।

১৯. নবীন বিরহিণী নাটক (কলিকাতা, ১৮৬৪-৬৫), পৃ. ২৮-২৯।

২০. এর ফলে নাট্যকার নাটকের কাহিনীতে খানিকটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও কৌশলগত দিক দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি খানিকটা অবিচার করেন। প্রথম স্ত্রীর চেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী ভালো হলে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ অন্যায় বা অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করা শক্ত হয়।

আন্দোলিত করে পলায়নের সময়ে মহামায়া যেভাবে বাঘের মুখে পড়ে যায় সে-ও কম দুঃখের নয়।[২১]

দীনবন্ধু মিত্র একেবারে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি বগলা ও বিন্দু-বাসিনীকে তৌলমূল্যে অঙ্কন করেন বলে, পাঠকের সহমর্মিতা দুজনের কেউই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় না। এদের হাতে স্বামী পদ্মলোচন ও চোরের[২২] চরম লাঞ্ছনা ও প্রহার— একই সঙ্গে অট্টহাস্য এবং দুই স্ত্রীর প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়। বস্তুত, স্ত্রীদের প্রতি নয়, অসহায় পদ্মলোচনের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়েই বোধ হয় দীন-বন্ধু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। শেষ পর্যন্ত হতভাগ্য পদ্মলোচন সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে বৈরাগী হতে বাধ্য হয়। আমরা অবশ্য তাঁর ভাইপোর চিঠি থেকে জানতে পারি যে, তার স্ত্রীদ্বয় স্বামীর বিরহে শোকাতুর হয়ে সন্ধি করে এবং এখন 'অবিরল-বিগলিত-জলধারাকুল লোচনে গলাগলি লইয়া রোদন করিতেছেন; শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীননেত্র, আলুলায়িত কেশ।' তারা একে অন্যের সেবা করে এবং একে অন্যেকে সান্ত্বনা দেয় তা-ও এ পত্র থেকে জানা যায়।[২৩] যখন আর সকল পাত্রপাত্রীর মিলন হয় তখন পদ্মলোচন ও তার স্ত্রীদ্বয়ের একটা হিল্লে করা প্রয়োজন, —এ কথা মনে করেই হয়তো দীনবন্ধু এই পরিণতি নির্দেশ করেন, নয়তো বগলা ও বিন্দুবাসিনীর যে চিত্র আমরা নাটকের প্রারম্ভে দেখি, তাতে এ পরিণতি, কাম্য হলেও, স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

সপত্নী সমস্যা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন,—সেকালের বঙ্গদেশে স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের কার্যত কোনো উত্তরাধিকার ছিলো না। সুতরাং বৈষ-য়িক ক্ষতির আশঙ্কায় সপত্নীগণ পরস্পরের প্রতি অপ্রীতি ও শত্রুতার ভাব পোষণ করতো বলে মনে হয় না। বরং স্বামীর ভালোবাসা, তার উপর আধিপত্যের মাত্রা, আপনাপন সন্তানাদির অধিকার ইত্যাদির কথা বিবেচনা করেই হয়তো সপত্নীরা কলহপরায়ণ হয়ে উঠতো। সামগ্রিকভাবে গোটা সংসারই এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও,

২১. **প্রণয়পরীক্ষা** নাটকের এই পরিণতি দৃষ্টে দর্শকগণ বেদনা অনুভব না করে বরং কুটিলা স্ত্রীর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ হতে দেখে আনন্দ এবং স্বস্তিই বোধ করেন। অন্যান্য নাট্যকারের সঙ্গে মনোমোহন বসুর এখানেও অনৈক্য। অন্য নাট্যকারগণ গুণবতী স্ত্রীর শোচনীয় পরিণতির চিত্র অঙ্কন করে পাঠক ও দর্শকদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলেন, অপর পক্ষে মনোমোহন বসু ষড়যন্ত্রকারী কপট স্ত্রীর শোকাবহ পরিণতি প্রদর্শন করে পাঠক ও দর্শকদের ঘৃণার উদ্রেক করতে চান।

২২. চোরের উপখ্যানটি দীনবন্ধুর মৌলিক কল্পনা নয়। **নবনাটকে** রামনারায়ণ চিত্ত-তোষের মুখ দিয়ে চোরের জবানিতে গল্পটি বিবৃত করেছেন। পৃ. ৬১-৬৩।

২৩. **জামাইবারিক**, পৃ. ৬৬।

বিশেষত স্ত্রীদের কাছেই এ সমস্যা বিশেষ মানসিক জটিলতা নিয়ে দেখা দিতো। জামাইবারিকে হাবার মা যে বলেছে, 'ময়না ময়না ময়না। সতীন যেন হয় না।'[২৪] —তা সেকালের সকল স্ত্রীরই মনের কথা।

স্বামী ভূধর দ্বিতীয় বিবাহ করতে যাচ্ছে শুনে সৌদামিনীর যে কাতরতা, প্রবাসী স্বামী ঘরে ফিরে আসার পরে মিলনের উষ্ণ মুহূর্তেও তার যে শোকাবেগ, তা থেকে বোঝা যায় সাপত্ন্যকে স্ত্রীরা কতো বড়ো অভিশাপ বলে গণ্য করতো। সৌদামিনীর পিতা তাকে কুলীনের কাছে বিয়ে না দিয়ে বংশজের কাছে বিয়ে দিয়েছিলো। সে সুখী হবে–সৌদামিনীর এ ছিলো আন্তরিক বিশ্বাস। আর স্বামীকে সে নিবিড় এবং অন্তরঙ্গভাবে পেয়েও ছিলো। কিন্তু সতীন আসবে শোনা অবধি তার 'প্রাণটা যেন কেমন জ্বল্যে জল্যে উঠতেছে, কিছু আর ভাল লাগতেছে না...।'[২৫]

প্রণয়পরীক্ষা নাটকের সরলা শান্তশীলের দ্বিতীয় স্ত্রী। পাঁচ বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু আজো তাদের সন্তান হয়নি। এক পূর্ণিমা রাতে বিশ্রম্ভালাপের সময় স্বামী তাকে বলেছিলো, সরলারও যদি প্রথম স্ত্রীর মতো সন্তান না হয় তা হলে হয়তো তাকে তৃতীয়বার বিবাহ করতে হবে। সরলা এতে ব্যথিত, বিহ্বল এমনকি মূর্ছিত হয়ে পড়ে। স্বামীর ভালোবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত এবং নিঃসন্দেহ, সরলা সেই ভালোবাসা অনাগত তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায় না। তার দুর্ভাবনা মোচন এবং অভিমান ভাঙার জন্যে হঠকারী এবং বাচাল স্বামীর, প্রকৃত পক্ষে, তার পা ধরতে হয়।

পুনর্বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে সরলার মতো সপত্নী নাটকের সৌদামিনীও স্বামীর কাছে শোক এবং বিলাপ করে। আসলে কোনো স্ত্রীই একাজে স্বামীকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময়ই স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করতো কিংবা অভিভাবকের তাড়নায় করতে বাধ্য হতো। এমতাবস্থায় সতীন ঘরে এলে, প্রথম স্ত্রীর পক্ষে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। কারণ সেকালের শিক্ষাবর্জিত এবং সহায়সম্বলহীন মেয়েদের এ বিষয়ে সামাজিক মর্যাদা প্রায় কিছুই ছিলো না। স্বামীকে ত্যাগ করার বা আত্মসম্মান নিয়ে স্বতন্ত্র বাস করার রীতি সে যুগে প্রচলিত হয়নি। এরূপ অবস্থায় সপত্নীদের সহাবস্থানের ফলে যা অনিবার্য, কলহ এবং অশান্তি জন্ম নিতো।

প্রথম স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে গণ্য করতো তার সুখশান্তিবিনষ্টকারী বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে। একটা প্রবল শত্রুতার মনোভাব নিয়েই এজন্যে দুই

২৪. ঐ, পৃ. ১৫।
২৫. সপত্নী নাটক, পৃ. ২৭।

সতীনের সম্পর্কের গোড়াপত্তন হতো। তাকে অবহেলা করে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করায় স্বামীর প্রতিও তার মনোভাব অনুকূল থাকতো না। কিন্তু তাই বলে স্বামীকে পুরোপুরি দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়ে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকার মনোভাবও প্রথম স্ত্রীর দেখা যায় না। বরং নিজের অংশ বুঝে নেওয়ার জন্যেই সে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। স্বামীর ভাগ নিয়ে মোহিনী ও শশিমুখীর (হিন্দু মহিলা নাটক) এবং বগলা ও বিন্দুবাসিনীর (জামাইবারিক) কোঁদল বর্তমান প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মহামায়া (প্রণয়পরীক্ষা নাটক) স্বামীর ভাগের জন্যে সরলার সঙ্গে ঝগড়া করেনি; কিন্তু স্বামী সরলাকে বেশি ভালবাসে এ চিন্তা তাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে। তার কথা থেকে জানা যায় যে, সরলাকে সে অনেকটা ছোটবোনের মতো মনে করে এবং তাদের সম্পর্কও আপাতদৃষ্টিতে সদ্ভাবপূর্ণ। কিন্তু স্বামীর ভালোবাসার প্রশ্নে সে আপোশহীন। সে বলে

> আমরা দু সতিনে যেন তৌলে উঠবো, আর তাঁর মন যেন তার কাঁটা হবে, সেই কাঁটা যদি আমার দিক ঝোঁকে, তবে সব বজায় থাকবে; যদি সমান থাকে, তাতেও থাকবে, আর যদি ছোটবৌর দিকে ঝোঁকে, তবে সব মজবে।[২৬]

সত্যি সত্যি বেদেনীর ঔষধ খাইয়ে সে যখন দেখলো, অচেতন অবস্থায় স্বামী তার ঘরে না এসে গেলো সরলার ঘরে, এবং এ ঘটনা বার বারই ঘটতে থাকলো, তখন স্বামীর ভালোবাসা যে সরলার প্রতিই অধিক সে তা বুঝতে পারলো। প্রেমের প্রতিযোগিতায় তার পরাজয় প্রত্যক্ষ করে মহামায়া পাঁচ বছরের আপাতমধুর সতীন সম্পর্ক আর বজায় রাখতে পারে না।

অপর পক্ষে, মহামায়া-সরলার স্বামী শান্তশীল মুখে অন্তত বলতো এবং বাহ্যত এমন আচরণও দেখাতো যে, মহামায়া এবং সরলা উভয়ই তার কাছে সমান ভালোবাসার বস্তু। কিন্তু অধিকাংশ স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতিই পক্ষপাত দেখাত। জামাইবারিকে পদ্মলোচন অভয়ের কাছে স্বীকার করে, ছোট স্ত্রী বিন্দুবাসীনীর বয়স কম, সুতরাং তার কাছে স্বভাবতই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা থাকা হয়।[২৭] নবনাটকে গবেশবাবুর চন্দ্রলেখার প্রতি; সপত্নী নাটকে ভূধর ও ব্রজবিলাস উভয়ই স্ব স্ব দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি; এবং বিপিনমোহন রচিত হিন্দুমহিলা নাটকের প্রসন্ন শশীমুখীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট। ফলে এসব ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই ব্যথিত ও ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। সৌদামিনী (সপত্নী নাটক), মাহেশ্বরী (সপত্ন নাটকী), সাবিত্রী (নবনাটক) এবং মোহিনী (হিন্দুমহিলা নাটক)

২৬. প্রণয়পরীক্ষা নাটক, পৃ. ১১-১২।
২৭. জামাইবারিক, পৃ. ২৪।

এজন্যেই মর্মান্তিক বেদনায় কাতর হয়ে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়াতে উদ্যত হয়। সাবিত্রী ও মোহিনী আত্মহত্যা করতে সক্ষম হয় আর সৌদামিনী ও মাহেশ্বরী আত্মীয়দের চোখে পড়ায় আত্মহত্যা করতে পারেনি।

ছোটো স্ত্রী পরে এসে তার সুখশান্তি আশাআকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করায় বড়ো স্ত্রী ছোটোকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে না। বরং এক সর্বব্যাপী ঘৃণা এবং ঈর্ষা সে তার প্রতি পোষণ করে। বিশেষত ছোটো বৌ-এর নবীন বয়স এবং রূপের প্রতি বড়োর ঈর্ষা অত্যন্ত বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে বগলার (জামাইবারিক) বাক্-যুদ্ধে বারংবার যে কথাটি প্রাধান্য লাভ করে সে বিন্দুবাসিনীর বয়স। অবশ্য, ছোটো স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর বয়স অনেক বেশি—বাবার মতো—একথা বলে বগলা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে বগলা এ কথাও উল্লেখ করে যে, স্বামীর যথার্থ যৌবনের সঙ্গ সে-ই পেয়েছে, বিন্দুবাসিনী যে স্বামীকে পেয়েছে, সে পদ্মলোচনের ছিবড়ে মাত্র। ছোটো বৌ-এর রূপ ও বয়স সম্পর্কে ঈর্ষাসূচক ইঙ্গিত নবনাটকের আলো ও চন্দ্রকলা এবং প্রণয়পরীক্ষা নাটকের মহামায়ার উক্তির মধ্যেও স্পষ্ট।[২৮]

কিন্তু তুলনামূলক বিচার করলে দেখতে পাই, প্রথম স্ত্রীর চেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর মনোভাব অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল। দোজবরে স্বামী পেয়ে কোনো তরুণী, বলা বাহুল্য খুশি হয় না। পূর্ব থেকে আর এক স্ত্রী বর্তমান, সেই সংসারে যেতে কিশোরী কিংবা তরুণীর সংকোচ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটি নারীর স্পর্শে যে পুরুষ পুরোনো হয়ে গেছে, তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে না পারা অযৌক্তিক নয়,—এমন কি স্বামী নবাগতার প্রতিই বেশি মনোযোগ দিলেও।

এমনি একটি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চন্দ্রকলা (নবনাটক)। তার স্বামী তাকেই বেশি ভালোবাসে, তার এক সখীর ভাষায় সে তার স্বামীর সবটা 'একেবারে ঘুচিয়ে পুচিয়ে' নিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও চন্দ্রকলা যে মনোভাব পোষণ করে, তা তার সংলাপ থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।—

> চন্দ্র।. . . উনি বল্যেন ঘুচিয়ে পুচিয়ে নিছি, তা পেয়েছি কি—যে ঘুচিয়ে পুচিয়ে নবো—ঐ যে বলে "আলতার গুটি আর তুলোর মাকাটি" ওতে ভাই কি দরকার। ওয় কাজ কি ? নিতু শোলোক কর্য়ে ছিল শুনবি—
> পুরুষ পরশমণি সত্যি দিদি বটে,
> পরশে কাঞ্চন তার তাও লোকে রটে।
> কিন্তু সে পরশ যদি অন্যে গে পরশে,

২৮. নবনাটক, পৃ. ৩৮ ; প্রণয়পরীক্ষা নাটক, পৃ. ৮-১০।

অমনি পরুষ হ'য়ে সে পরশ বসে।

*

কদাচ কটাক্ষ পাত অন্যে যার নাই,
সহস্র বদনে দিদি তার গুণ গাই।
কাণা, খোঁড়া, কুজো, অন্ধ, হয় বা বধির,
অথবা নির্ধন কিম্বা কুৎসিত শরীর।
অন্য নারী পিশাচীতে যে আবিষ্ট নয়,
তাহার রমণী ধন্য সর্বলোকে কয়।[২৯]

প্রকৃত পক্ষে, চন্দ্রকলা যে স্বামীকে যথার্থ ভালোবাসে, অথবা স্বামীর ভালোবাসার বিশেষ মূল্য দেয় তা তার কথা থেকে মনে হয় না। তার সতীনের কাছে স্বামী কখনো যায় কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সে বলে—

তা কেন চায় না? চাউক সে —আমার পানে চেয়ে কায নেই, আমি তো তাই বলেইছি, আমার কাছে আসে কেন? ঐ যে বিদ্যেসুন্দরে লিখেছে। "নইলে নয় তাই করি কষ্টেতে শয়ন, রোগী যেন নিম খায় মুদিয়ে নয়ন" তাই ভাই আমার অদেষ্টে ঘটেছে, ও ছেঁড়া চুলের খোঁপায় কাজ কি?[৩০]

গবেশবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রলেখার মনোভাবও অনেকটা এ রকমের। স্বামী তাকে তুষ্ট করার জন্যে প্রথম স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আলাদা একটা চালা ঘরে থাকতে দেয়। দুর্ভাগিণী বড় স্ত্রী দুঃখ বেদনায় কাঁদতে থাকলেও সে একবার তাকে সান্ত্বনা দিতে তার কাছে যায় না। গবেশবাবু তার জমিদারির প্রধান অংশও ছোটো বৌ-এর নামে লিখে দেয়। কিন্তু এতো সত্ত্বেও চন্দ্রলেখা স্বামীর প্রতি কোনো ভালোবাসা, মমতা অথবা শ্রদ্ধা অনুভব করে না। চন্দ্রকলার সঙ্গে আলাপ থেকে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩১] ভুল করে স্বামী ভেবে সে যেভাবে পূজারী ব্রাহ্মণকে ঝাঁটা-পেটা করে, তা থেকেও স্বামীর প্রতি তার অশ্রদ্ধা ও আক্রোশের মাত্রা বোঝা যায়। বস্তুত, স্বামীর ভালোবাসা নয়, সে চায় স্বামীর পূর্ণ অধিকার। এ কারণেই সে স্বামীকে বশীকরণের ঔষধ খাওয়ায়। চন্দ্রকলা এবং চপলার সঙ্গে তার সংলাপ থেকে তার মনোভাব পরিষ্কার হয়ে ওঠে:

চন্দ্রলেখা। কিন্তু ভাই, এখনো মিন্সেকে ভাল করে্য হাত কত্যে পারিনি, তারি নিমিত্তে গোয়ালা দিদিকে বলেছিলেম, তা সেও আবার এক রকম ঔষধ

২৯. নবনাটক, পৃ. ৩৯-৪০।
৩০. ঐ, পৃ. ৪২।
৩১. ঐ, পৃ. ১০৪-১০৬।

দেবে বলে গিছিল এতেই ও বিষয়ের শেষ হবে। তা তাও খাইয়ে দিছি, দেখি যদি এতে কিছু হয়।

চন্দ্রকলা। আর কি তোমার হাত কত্যে আরো বাকি আছে? ঐ যে বলে 'বসতে পেলে শুতে চায়,' তাই তোমার।

চন্দ্রলেখা। না ভাই, মিন্সের এখনো ও দিগে টানটী বিলক্ষণ আছে।

চপলা। হঁা থাকতে পারে পুরোণ পীরিত কি না? ও কি শীঘ্রি ভোলবার—

চন্দ্রলেখা। কাল বড় রঙ্গ হয়ে ছিল।

চপলা। কি? বড় গিন্নীর ঘরে গিছিলেন না কি?

চন্দ্রলেখা। হঁা, তা কি পারে? সে গুড়ে বালি।[৩২]

রঙ্গের বর্ণনা দিয়ে চন্দ্রলেখা বলে, প্রথম স্ত্রীর কান্না শুনে গবেশবাবু তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব অপ্রস্তুত হয়। 'তারপর রাত্তিরে এত ডাকাডাকি কত সাধ্যি সাধনা, কোন মতেই দোর খুলে দিইনি।' চন্দ্রকলাও দ্বিতীয় স্ত্রী, সে-ও চন্দ্রলেখার মনোভাবের পোষকতা করে। তারা উভয়ই মনে করে, যদি প্রথমার প্রতি এতো টান, তাহলে তারই কাছে থাকা উচিত, তাদের কাছে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদের কাছে আসার কী প্রয়োজন।[৩৩]

সতীনদের চরিত্রে সত্যিকারভাবে স্বামীকে অধিকারের মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করে। এর জন্যে দরকার হলে বশীকরণের ঔষধ খাওয়াতেও তারা দ্বিধা করে না। নবনাটকে চন্দ্রলেখা, সপত্নী নাটকে ক্ষেত্রমোহিনী এবং প্রণয়পরীক্ষা নাটকে মহামায়া এই কৌশল অবলম্বন করে। এবং তিনজনই আপাতভাবে বশীকরণের ঔষধ দিয়ে স্বামীকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু বশীকরণের ঔষধ ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রী অনেক সময় কেবল তার নবীন যৌবন ও লাবণ্যময় রূপ দিয়েও স্বামীর মন জয় করতে সক্ষম হতো। বিন্দুবাসিনী (জামাই-বারিক), চন্দ্রলেখা (নবনাটক), শশিমুখী (হিন্দু মহিলা নাটক), ক্ষেত্রমোহিনী (সপত্নী নাটক) প্রভৃতি এর প্রমাণ। নবীনবিরহিণী নাটকের নবীনের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম পর্যন্ত আমরা জানতে পাইনে, তাকে দেখা তো দূরের কথা; কিন্তু স্বামীর উপর তার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। নবীনের উক্তি থেকে প্রভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়:

আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, যে বড় বৌ আমার জীবনেশ্বরী ছোট স্ত্রীকে কত কষ্ট দেয়। এতদিন ইহার বিষয় আমি ত স্বপ্নেও ভাবি নাই।

৩২. ঐ পৃ. ১০৪।

৩৩. ঐ, পৃ. ১০৫-০৬।

...এই পাপীয়সীকে শীঘ্র ত্যাগ করাই শ্রেয়।[৩৪]

কিন্তু আমরা অন্যের কথা থেকে জানতে পারি নবীন 'সুশীলা ধর্মপত্নীকে ...সামান্য সতিনের মিথ্যা অপবাদে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন'।[৩৫] দ্বিতীয় স্ত্রী বশীকরণের ঔষধ দিয়ে স্বামীকে ভোলায় না—'নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া' এবং 'সতিনের যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা' দেখিয়ে স্বামীর মন জয় করে।[৩৬] এবং নবীন বিরহিণীকে গৃহ থেকে বহিস্কার করে দেয়।

কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তুক-তাক, রূপযৌবন, নয়ন-জল কোনো কিছুই স্বামীর গোটা অধিকার কোনো একজনকে দিতে পারে না, সেখানে স্বামীর অধিকার নিয়ে, বিশেষত স্বামী কার সঙ্গে রাত্রিবাস করবে এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে। বেশির ভাগ সময় এর মীমাংসা হয় পালা করে। পদ্মলোচন (জামাই-বারিক) পালা করে বগলা এবং বিন্দুবাসিনীর ঘরে শোয়, খায়। প্রসন্ন (হিন্দুমহিলা নাটক) সপ্তাহে তিনদিনই থাকে বড় বৌ মোহিনীর কাছে, আর চারদিন শশিমুখীর কাছে। প্রণয়পরীক্ষা নাটকে শান্তশীলও এমনি পালা করে কখনো মহামায়া, কখনো সরলার সঙ্গে কাল যাপন করে।

সতীনদের পারস্পরিক মনোভাব ব্যতীত তাদের প্রতি শাশুড়ী-ননদের মনোভাবও কৌতূহলোদ্দীপক। হিন্দুমহিলা নাটকে শাশুড়ী কমল এবং ননদ গোলাপী ও সুমতি প্রথম স্ত্রী মোহিনীর প্রতি অনুকূল, প্রতিকূল দ্বিতীয় স্ত্রী শশিমুখীর প্রতি; কারণ মোহিনীর সন্তান হয়েছে এবং তার আনুগত্য ও বিনয় অধিক। অপর পক্ষে শশিমুখী নিঃসন্তান, এবং ঝগড়াটে। সপত্নী নাটকের সৌদামিনীকে শাশুড়ী হরিপ্রিয়া ও ননদ হরিমণি অপছন্দ করে, কারণ তাদের ধারণা বশীকরণের ঔষধ দিয়ে সে ভূধরকে বাধ্য করেছে। প্রকৃত পক্ষে, পুত্র বা ভ্রাতা তার স্ত্রীর বাধ্যগত হোক, এটা সেকালের শাশুড়ী বা ননদ আদৌ কেউ আশা করতো না।

পরিবারের বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সাধারণত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার বিষয়টি খুব ভালো চোখে দেখতো না। আসলে আলোচ্য নাটকসমূহ রচনাকালে, সমাজমানসের এমন পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় বিবাহ করার বিষয়টি সমাজ ধীরে ধীরে প্রত্যাখ্যান করতে আরম্ভ করেছিল। হিন্দুমহিলা নাটকে রাইমণি প্রসন্নের দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করার জন্যে তার মাকে রীতিমতো দোষারোপ করে। গবেশবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে অমলা,

৩৪. **নবীনবিরহিণী নাটক**, পৃ. ৯।
৩৫. ঐ, পৃ. ১১।
৩৬. ঐ, পৃ. ৯।

কমলা, বিমলা, চন্দ্রকলা প্রভৃতি যে আলাপ করে, তা থেকে দ্বিতীয় বিবাহবিরোধীর মনোভাবই প্রকাশ পায়।

> চন্দ্রকলা।...তোমরা জাননা দিদি, সতিনের হাড় সামান্যি হাড় নয়। কামাখ্যার চণ্ডালিনীর হাড়, ও হাড় যে সংসারে থাকে সে সংসারে দিবানিশিই ভেল্কী লাগে, তা এখন বাবুর বাড়িতেও আবার দেখতে পাবে, তখন বলবে যে চন্দ্র বলে ছিল বটে।
>
> অমলা। না না, তা এ বাড়িতে আর তত হবে না, গিন্নী ভাল।
>
> কমলা। আরে হোক গে ভাল, ভালো আবার কালো হয়ে উঠবে দেখো। বলে, "যমকে দেওয়া যায় তবু সতিনকে দেওয়া যায় না।"[৩৭]

সতীনের কথায় 'নবীনবিরহিণী' নাটকে নবমালিকা, মোহনী এবং সুরমাও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। জামাইবারিক নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, হাবার মা যে সাধারণ পরিচারিকা সেও দারুণ সতীন বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। আসলে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাপত্ন্য সমস্যা সম্পর্কে একটি সচেতনতা ক্রমশ বৃহত্তর পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ছিলো।

পুরুষদের মধ্যেও সপত্নীত্ব সম্পর্কে পরিবর্তিত মনোভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা দিচ্ছিলো। হিন্দুমহিলা নাটকের প্রসন্ন নিঃসন্দেহে তার দ্বিতীয় স্ত্রী শশিমুখীকে বেশি পছন্দ করে।[৩৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও সে উপলব্ধি করে যে, একাধিক বিবাহ করা মন্দ কাজ। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রীর আকর্ষণ ত্যাগ করে সে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয়। জামাইবারিকে পদ্মলোচনও বৈরাগ্য গ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর প্রতি তার ভালোবাসা অধিক ছিলো, কিন্তু সে ভালোবাসা তাকে সংসারের ভিতর বেঁধে রাখতে সমর্থ হয় না। প্রথম স্ত্রীর আত্মহত্যা, পুত্রদ্বয়ের গৃহত্যাগ এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে গবেশবাবুও (নবনাটক) একাধিক বিয়ে করার দোষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ছোটো স্ত্রীর মৃত্যুতে নবীনেরও (নবীনবিরহিণী)

৩৭. নবনাটক, পৃ. ৪৩।

৩৮. প্রসন্ন সপ্তাহের তিন দিন কাটায় মোহিনীর সঙ্গে, চার দিন শশিমুখীর সঙ্গে। তা ছাড়া মনোরমার বিয়ের আগরে পেঁছে শশিমুখী স্বামী সোহাগের যে বর্ণনা দেয় তা-ও প্রসন্নের পছন্দ প্রমাণ করে।

> নিস্তারিণী। আ মরি, আনিগনে এতক্ষণ ভাতারের কোলে ?
>
> জগৎ। তবে কি সত্যি সত্যি ভাতারের কোল থেকে উঠে এলি ?
>
> শশী। মরণ আর কি ? তারা কি আসতে দেয়, কত বোলে ছোলে এইচি।...

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দুমহিলা নাটক, পৃ. ১৭।

ভুল ভাঙে। সেও সপত্নীত্ব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শান্তশীলের (প্রণয়পরীক্ষা নাটক) উপলব্ধি। মহামায়ার ষড়যন্ত্রে তার সুন্দর সুখী পরিবার হঠাৎ ভেঙে পড়লে সেও বুঝতে পারে বহুবিবাহ অত্যন্ত অপরাধের কাজ। সে এতো অনুতপ্ত হয় যে, নিজের সম্পত্তির একটি অংশ পর্যন্ত বহুবিবাহবিরোধী প্রচার কার্যোপলক্ষে দান করে।

ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যান্য পুরুষ চরিত্রেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার প্রতি বিরূপ মনোভাব লক্ষণীয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দ্বিতীয় বিবাহ করানোর জন্যে সপত্নী নাটকে ভুবনেশ্বর আপন পিতাকে তিরস্কার করে। হিন্দুমহিলা নাটকে বসন্তও জ্যেষ্ঠভ্রাতার দু বিবাহ করার বিষয়টি অত্যন্ত অপ্রসন্নতার সঙ্গে মেনে নেয়। নবীন বিরহিণী নাটকের মাধব আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে মন্তব্য করে, 'সতিনের বিষম জ্বালা, এমন সর্বনাশী সতিন যেন শত্রুরও না হয়'।[৩৯] কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে আপোশহীন সুধীরের (নবনাটক) মনোভাব। সে কেবল গবেশবাবু আর তার পরিষদবৃন্দের কাছেই বহুবিবাহের নিন্দা করে না, বরং গ্রামে একটি বহুবিবাহবিরোধী সভাও স্থাপন করে। এ সভার উদ্যোগে গ্রামবাসীর মধ্যে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রামের পঞ্চাশ-ষাট ঘর এই সভার পোষকতা করতে আরম্ভ করে। অপর পক্ষে, গ্রামের মাত্র ষোলো ঘর বহুবিবাহের প্রতি সমর্থন জানায়। গ্রামবাসীরা সুধীরের উৎসাহে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছেও আবেদনপত্র প্রেরণ করে।[৪০]

আসলে সাপত্ন্যের কুফল এতো স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ গোচর যে, শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কে একটা সচেতনতা সহজেই সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সেই সচেতনতার দলিল হিশেবে এ নাটকসমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৩৯. নবীনবিরহিণী নাটক, পৃ. ১১।
৪০. নবনাটক পৃ. ৭৫, ৮৪-৮৫।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম ভাগ

ইহলৌকিকতার আলোকে বিবাহবিষয়ক সংস্কার

বৈদিক ভারতবর্ষে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিশেবে বিবাহরীতি বোধহয় মোটামুটি যুক্তি ও ঔচিত্যের উপর রচিত হয়েছিলো। সেকালে কন্যাদের বিবাহ হতো যৌবনে, স্বয়ংবর ছিলো স্বাভাবিক এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথাও অপ্রচলিত ছিলো না।[১] সহমরণ অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার ছিল; বরং বিধবাবিবাহ এবং নিয়োগ যথেষ্ট মাত্রায় প্রচলিত ছিলো।[২] কিন্তু পৌরাণিক যুগে যখন অধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনধারণা-সমূহ আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত সম্পৃক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন বিবাহ বিষয়ে কেবল মনোভাবেরই পরিবর্তন হয়নি, সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত বিকার ঘটে।[৩] ধর্মের নামে শাস্ত্রকারগণ এই বিকারসমূহকেই অবশ্যপালনীয় বিধানে পরিণত করেন। বিবাহের যোগ্য বয়স, পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক দায় ও অধিকার, বিবাহের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয় নিলে এ সময়কার বিবাহ পদ্ধতির যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

পৌরাণিক বিবাহ একটি ধর্মীয় স্যাক্রামেন্ট এবং সবটাই প্রায় পারলৌকিক মুক্তির উপায় বলে গণ্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পুত্র দ্বারা পুন্নাম নরক থেকে রক্ষা পাওয়া যায়[৪] এবং পিতৃঋণ মুক্ত হওয়া যায়।[৫] পুত্রের দ্বারা স্বর্গলাভ হয় এবং পৌত্রের দ্বারা স্বর্গের আসন স্থায়ী হয়, এ-ও শাস্ত্রের আশ্বাস।[৬] প্রকৃতপক্ষে এতো বড়ো দায়িত্ব পুত্রের উপর অর্পিত থাকায় পুত্রার্থেই বিবাহ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।[৭] এই বিবাহ দেবতার ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয়[৮] এবং বিক্রয় কিংবা

১. S. Sen Gupta, **A Study of Women of Bengal, p.** 169 ; S. Bandyopadhyay, **Foreign Accounts of Marrige in Ancient India.** pp. 23-33, 51-54.

২. দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়।

৩. S.Sen Gupta, pp. 170-74.

৪. মনুসংহিতা, ৯/১০৬, ৯/১৩৮, পৃ.৫৪৭, ৫৫৭।

৫. ঐ, ৩/৩৭-৩৯, ৯/১০৭, পৃ. ১২১-২২, ৫৪৭।

৬. ঐ, ৯/১৩৭, পৃ ৫৫৭।

৭ ঐ, ৯/৯৬, পৃ. ৫৪৪।

৮. ঐ, ৯/৯৫, পৃ. ৫৪৪।

ত্যাগ দ্বারা,[৯] এমন কি মৃত্যুর দ্বারা—কোন অবস্থায়ই পতির ভার্যাত্ব লুপ্ত হয় না।[১০]

বিবাহের বয়স সম্পর্কে শাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী বহু ধারণা আছে। ঋতুমতী হওয়ার তিন বছরের মধ্যে অভিভাবক বিবাহ না দিলে কন্যা নিজেই স্বামী বেছে নেবেন,[১১] যাবজ্জীবন ঋতুমতী হয়ে পিতৃগৃহে অবস্থান করবেন সেও ভালো কিন্তু অযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান শ্রেয় নয়,[১২] কিংবা অষ্টপ্রকার বিবাহের অন্যতম গান্ধর্ব বিবাহ[১৩] প্রভৃতি বহু বিধান থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রকারদের পক্ষপাত বোধ হয় কন্যাকে নিতান্ত বালিকা অবস্থায় বিবাহ দেওয়ার দিকেই।[১৪] মনু বয়সের উল্লেখ না করলেও ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে কন্যার বিবাহদান শ্রেয় বলে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫] পরাশর সংহিতায় বয়সের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আট বছর বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে গৌরীদান, নবছর বয়সে দিলে রোহিণীদান এবং দশ বছরে দিলে কন্যাদানের পুণ্য হয়।[১৬] অপর পক্ষে বারো বছর বয়সেও কন্যা বিবাহ না দিলে কন্যার পিত্রাদি অভিভাবকগণ মাসে মাসে ঐ কন্যার মাসিক আর্তব পান করেন। এবং অবিবাহিতা অবস্থায় কন্যা রজস্বলা হলে কন্যার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজনই নরকগামী হন।[১৭] যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতে এরূপ ক্ষতযোনি কন্যা বিবাহ করেন তিনি পতিত হয়ে শূদ্রপতি বলে গণ্য হন।[১৮] এ সমস্ত বিধান বালিকা বা শিশু কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার রীতিকে জনপ্রিয় করে।

পাত্রের বয়স সম্পর্কে শাস্ত্রকারগণ তেমন ভাবিত নন। মনুর মতে, অধ্যয়ন শেষে ব্রাহ্মণ পাত্র চব্বিশ কিংবা ত্রিশ বছর বয়সে যথাক্রমে আট এবং বারো বছর বয়স্কা কন্যা বিয়ে করবে।[১৯] কিন্তু এ ছাড়া পাত্রের বয়স সম্পর্কে অন্য কোনো

৯. ঐ, ৯/৪৬, পৃ. ৫৩১।

১০. ঐ, ৫/১৫৭-৬০, পৃ. ১৬০।

১১. ঐ, ৯/৯০, পৃ. ৫৪২-৪৩।

১২. ঐ, ৯/৮৯, পৃ. ৫৪২।

১৩. ঐ, ৩/৩২, পৃ. ১১৯।

১৪. S. Bandyopadhyay, **Foreign Accounts of Marriage in Ancient India**, pp. 23-33.

১৫. **মনুসংহিতা**, ৯/৪, ৯/৮৮, ৯/৯৩, পৃ. ৫১৯-২০, ৫৪২, ৫৪৩।

১৬. **পরাশর সংহিতা**, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনূদিত (কলিকাতা, ১৮৭৮), সপ্তম, অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা/৬, পৃ. ৫৯।

১৭. ঐ, ৭/৭-৮, পৃ. ৫৯।

১৮. ঐ, পৃ. ৭/৯, পৃ. ৫৯-৬০।

১৯. **মনুসংহিতা**, ৯/৯৪, পৃ. ৫৪৩-৪৪।

বিধান নেই। অব্রাহ্মণ পাত্র কোন বয়সে বিয়ে করবেন, এ বিষয়ে মনু নীরব।

পাত্রপাত্রীর গুণাগুণ বিচারেও স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ লক্ষণীয়। পাত্রকে বেদজ্ঞ শিক্ষিত হতে হবে, শাস্ত্রে এমন কথা থাকলেও[২০] নারীদের জন্য কোন মানসিক গুণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। পাত্রীর গুণের উল্লেখ করে মনু বলেন, তার চোখ বা চুলের রং যেন পিঙ্গল না হয়, শরীর যেন লোমশূন্য বা লোমবহুল না হয়, যেন রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত না হয়, নাম যেন নক্ষত্র, বৃক্ষ নদী পর্বত প্রভৃতির অনুরূপ না হয়,[২১] এবং কন্যা যেন বিকলাঙ্গ না হয়; বরং তার নাম যেন শ্রুতিমধুর হয়, তার গমনের ভঙ্গি যেন হংস বা গজের ন্যায় হয়, তার যেন সুন্দর দন্ত, লোম, কেশ থাকে এবং তার অঙ্গ যেন কোমল হয়।[২২]

আলোচ্যকালের বিয়ের রীতি এবং শাস্ত্রকারদের বিধান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কন্যার বিয়ে সাধারণত অভিভাবকই দিতেন। মনু এবং পরাশর উভয়ই যথাসময়ে কন্যার বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর অর্পণ করেন। তবে সেকালে বয়স্থা কন্যার বিবাহ একেবারে বিরল কিংবা নিষিদ্ধ ছিলো না। সীতা, সাবিত্রী প্রমুখের দৃষ্টান্ত থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। এবং এও মনে হয় যে, এ জাতীয় প্রাপ্ত-বয়স্কা বিবাহে কন্যার পছন্দ করার অধিকার অংশত স্বীকৃত হতো। পাত্রীদের পছন্দ করার বিষয়ে বলা যায়, কন্যা সম্প্রদানের কথা উল্লিখিত হলেও প্রাচীন ভারতে পুত্র দানের প্রথা প্রচলিত ছিলো না। মনে হয়, পুত্র নিজের ইচ্ছাতেই বিবাহ করতেন।[২৩]

পাত্রপাত্রীর বর্ণ সম্পর্কে শাস্ত্রকারগণ খুবই সতর্ক ছিলেন। সবর্ণ কন্যাকে বিয়ে করার রীতিকে মনু পছন্দ করতেন।[২৪] তবে অবস্থাবিশেষে নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিয়ে করার নিয়ম স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু উচ্চতর বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।[২৫]

পণপ্রথা সেকালেও প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রে তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। মনু যে অষ্টপ্রকার বিবাহের কথা বলেন তার মধ্যে আর্য ও আসুর বিবাহে পণ দেওয়ার

২০. ঐ, ৩/১-৪, পৃ. ১০৯-১১।

২১. ঐ, ৩/৮-৯, পৃ. ১১২।

২২. ঐ ৩/১০, পৃ. ১১২-১৩।

২৩. অক্ষয়কুমার দত্ত, **ধর্মনীতি**, পৃ. ৯৯-১০০। Ramabai Sarasvati, **The High-Caste Hindu Woman**, pp. 30-31.

২৪. **মনুসংহিতা**, ৩/১২, ১৫-১৮, পৃ. ১১৪-১৬।

২৫. ঐ, ৩/১৩, পৃ. ১১৪।

রীতি ছিল। আর্যবিবাহে পাত্র কন্যার পিতাকে একটি গাভী ও একটি বৃষ দিতেন। আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষের সন্তোষজনক পণ দিতে হতো।[২৬] শুল্ক গ্রহণ করে কন্যা দান করাকে মনু কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করেন।[২৭] তা থেকেও বুঝা যায়, কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত ছিলো।[২৮] কিন্তু বরপক্ষকে অর্থ অথবা দ্রব্যসামগ্রী উপহার দেওয়ার কোনো উল্লেখ নেই।[২৯]

পৌরণিক বিবাহরীতির অনেক কিছুই যুক্তিনির্ভর অথবা পাত্রপাত্রীর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ মিলনের অনুকূল ছিলো না। কিন্তু এ রীতির মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিশুপাত্রের বিবাহ কিংবা চড়া বরপণরীতি সমর্থিত হয়নি। অকারণে বহুবিবাহ অথবা সহমরণ সমর্থিত হয়নি। এমনকি, যৌবনে উপনীত হয়ে কন্যা আপন পছন্দ অনুসারে বিয়ে করবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বামীকে ত্যাগ করতে পারবে—এ রকমের স্বাভাবিক বিধানও অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে পৌরাণিক বিবাহরীতির যে কয়েকটি ভালো দিক ছিলো, তাও অবলুপ্ত হয়।[৩০]

মুসলিম-পূর্ব ও মুসলিম আমলের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৩১] ষোড়শ শতাব্দীতে য়োরোপীয় ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচের মতে তখনকার বঙ্গদেশে পাঁচ বছর বয়সেও কন্যার বিয়ে হতো।[৩২] তবে সাত বছরেই বিয়ের জন্য আদর্শ বয়স বলে বিবেচিত হতো। এগার বছরের কন্যাকে রীতিমতো বয়সী বলে গণ্য করা হতো।[৩৩] বারো বছরের মেয়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, আঠারো বছরের সময় তাঁরা সৌন্দর্য হারাতে আরম্ভ করতেন এবং পঁচিশ বছর নাগাদ বয়সের ছাপ তাদের উপর স্পষ্টভাবে লক্ষিত হতো বলেও জানা যায়।[৩৪]

মধ্যযুগের বাল্যবিবাহের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কেবল কন্যার নয়, এ সময়ে পুরুষদেরও বাল্যকালে বিবাহ হতে শুরু করে। শাস্ত্রে পুরুষের বয়স ২৪ অথবা ৩০ বলে উল্লিখিত হলেও, আলোচ্যকালে আট-দশ বছরের বালকদের বিবাহ দেওয়ার রীতিও প্রর্বতিত হয়। পঁচিশ বছর বয়সেও বিয়ে না হলে তেমন পুরুষকে অবিবাহিত

২৬. ঐ, ৩/২৯, ৩১, পৃ. ১১৮-১৯।
২৭. ঐ, ৩/৫১, পৃ. ১২৫।
২৮. S. Bandyopadhyay, pp. 34-35.
২৯. **স্বামী ভূমানন্দ, সনাতন ধর্ম,** প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৩৫), পৃ. ৮৫-৮৬।
৩০. S. Sen Gupta, p. 175.
৩১. **History of Bengal**, I, 601-02.
৩২. M.A. Rahim, I, 283.
৩৩. T Ray Chaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, p. 186.
৩৪. Luke Srafton, p. 17.

বৃদ্ধ বলে মনে করা হতো।[৩৫] আইন-ই-আকবরীতে ষোল বছরের চেয়ে কম বয়সী বালকের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে, তা থেকেও বাল্যবিবাহের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৬]

যে সমাজে বাল্যবিবাহ এতো জনপ্রিয় ছিলো, পাত্রপাত্রীর পছন্দ-অপছন্দ সেখানে অবান্তর ছিলো।[৩৭] অভিভাবকগণই পাত্রপাত্রীর পক্ষে বর ও কন্যা নির্বাচন করতেন। সম্রাট আকবর ঘোষণা করেছিলেন, বিয়েতে পাত্রপাত্রীর মতামত যেন অবশ্যই বিবেচিত হয়।[৩৮] কিন্তু সম্রাটের আদেশ কেউ পালন করতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বঙ্গদেশে কুলীনদের বহুবিবাহ এবং সাধারণভাবে একাধিক বিবাহ করার রীতি অপ্রচলিত ছিলো না। কিন্তু এক বিবাহই স্বাবাবিক বলে গণ্য এবং প্রশংসিত হতো।[৩৯]

কন্যাপণ বেশ জনপ্রিয় ছিলো। তবে পণ গ্রহণ না করে কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যাকর্তা সমাজে সুখ্যাতি লাভ করতেন।[৪০] বরপণ তখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি অথবা আধুনিককালের পণপ্রথার কঠোরতাও দেখা দেয়নি।

বাল্য বা শৈশবে বিয়ে হতো বলে এ সময়ে স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পর 'পুনর্বিবাহ' বা 'পুষ্পোৎসব' অনুষ্ঠান করা হতো। অনেক ক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠান শোভন কিংবা শ্লীল হতো না।[৪১]

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর এই বিবাহপ্রথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কেবল বহুবিবাহ আরো বেশি উৎসাহিত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদিক ও পৌরাণিক বিবাহরীতির চরম বিকার লক্ষ্য করা যায়। খারাপ দিক ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীয় বিবাহরীতি সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় রীতিরবিবাহ মিল তেমন কিছুই ছিলো না। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে পুত্রকন্যা উভয়েরই বিবাহযোগ্য বয়স অত্যন্ত হ্রাস পায়। সদ্যোজাত,[৪২] দু-তিন মাস

৩৫. T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir,** p. 186.
৩৬. Blochmann, **The Ain-I-Akbari,** I, 195, 203, 277.
৩৭. M.A. Rahim, I, 284.
৩৮. **The Ain-I-Akbari,** I, 277.
৩৯. T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir,** p. 186.
৪০. **Ibid.**
৪১. **Ibid.,** p. 187.
৪২. 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', অবোধবন্ধু ভাদ্র ১২৭৬ পৃ. ৯৯।

বয়স্ক[৪৩] এমন কি গর্ভস্থ শিশুর[৪৪] বিবাহ দেওয়ার রীতিও এ সময়ে প্রচলিত হয়। তবে এ সকল ব্যতিক্রম বলেই গণ্য হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে দশ বছর বয়স্ক বালককেই বিবাহযোগ্য মনে করা হতো। কুলীনরা 'অদ্য ভূমিষ্ঠ বালক'কেও বিয়ের উপযুক্ত বলে জ্ঞান করতেন।[৪৫] শতাব্দীর সপ্তম দশকে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় বিবাহের প্রচলিত গড় বয়স কন্যার পক্ষে সাত-আট এবং বরের পক্ষে চোদ্দ-পনেরো বলে উল্লেখ করেন।[৪৬] ১৮৭২ খৃস্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় বলা হয় যে, দেশের আট আনা কন্যার বিবাহ হয় দশ-এগারো বছর বয়সে, সাত আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া দুক্রান্তি কন্যার বিয়ে হয় বারো-তেরো বছর বয়সে। আর কেবল এক ক্রান্তির বিয়ে হয় বেশি বয়সে—এঁরা হয় কুলীনকন্যা নয়তো ব্রাহ্ম।[৪৭] শিক্ষিত ও ধনী পরিবারগুলিও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। নিম্নের পাঠিকা থেকে দেখা যাবে, যাঁরা সেকালে সমাজ-সংস্কারক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁরাও বাল্যবয়সে এবং অভিভাবকের ইচ্ছায় বিয়ে করেছিলেন।

পাত্রের নাম	বয়স	পাত্রীর বয়স
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪/১৫	৬
রাজনারায়ণ বসু	১৭	১১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৪	৮
কেশবচন্দ্র সেন	১৮	৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১	৫
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী		৬
শিবনাথ শাস্ত্রী	১২/১৩	১০
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৬	১১
অক্ষয়কুমার দত্ত	১৫	
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৪	

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠকন্যার সন্তান জন্মে বারো বছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ

৪৩. অক্ষয়কুমার দত্ত, **ধর্মনীতি**, পৃ. ৬৯; 'স্ত্রীস্বাধীনতা', **বঙ্গমহিলা**, মাঘ ১২৮৩, (জানুআরি-ফেব্রুআরী ১৮৭৭), পৃ. ২৩১।

৪৪. (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ?), 'বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা', **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, কার্তিক ১৭৭৬ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৫৪), পৃ. ১৮৩; অক্ষয়কুমার দত্ত, **ধর্মনীতি**, পৃ. ৬৯. পাটী; 'স্ত্রীস্বাধীনতা', **বঙ্গমহিলা**, পৃ. ২৩১।

৪৫. তত্ত্বপ, আষাঢ়, ১৭৬৮ (জুন-জুলাই ১৮৪৬), পৃ. ২৯৮।

৪৬. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় **মাতৃশিক্ষা**, (কলিকাতা, ১৮৭০), পৃ. ২৯১।

৪৭. **বামাপ**, আশ্বিন ১২৭৯, পৃ. ১৯২।

তেইশ বছর বয়সে পিতার ইচ্ছায় এগারো বছরের একটি কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম দু মেয়ের বিয়ে দেন যথাক্রমে চোদ্দ এবং সাড়ে দশ বছর বয়সে।[৪৮] —এসব থেকেই অনুমান করা যায়, উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহের কী দারুণ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।

শতাব্দীর শেষ দিকেও শিক্ষিত সমাজের একাংশ বাল্যবিবাহের সমর্থন করেছিলেন, সে থেকেও এই প্রথার প্রতি সমাজের আস্থা যে কতো গভীর ছিলো, তা বোঝা যায়। বেশি বয়সে বিবাহ হলে স্বামী-স্ত্রীর কলহ জন্মে, সুতরাং বাল্যবিবাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, বাল্যবিবাহের ফলে বিদ্যাচর্চায় ব্যাঘাত ঘটে না, বর্তমানে অভিভাবকের মত অনুসারে বিবাহ হয়, সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ হওয়াই শ্রেয় কারণ বাল্য বয়সে বিবাহ হলে অপছন্দের আশঙ্কা থাকে না, বিয়ের সময় প্রায়শ পাত্রের গুণাগুণ বিচার হয় না, ফলে অপ্রীতির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বাল্যকালে বিবাহ হলে দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলে প্রণয় জন্মে,[৪৯] বাল্যবিবাহ হলে ব্যভিচার ঘটে না,[৫০] পরিণত বয়সে বিবাহ হলে প্রণয় জন্মে না, এবং 'বয়োধিকদিগের বিবাহটা যেন কেমন দেখায়'[৫১] ইত্যাদি নানা কারণ দেখিয়ে রক্ষণশীল সমাজ বাল্যবিবাহের প্রতি সমর্থন জানাতেন।

বাল্যবিবাহবিরোধী সচেতনতার উন্মেষ

বাল্যবিবাহ যে সত্যি সত্যি পাত্রপাত্রীর শারীরিক ও মানসিক মিলনের যথার্থ আনুকূল্য করে না বরং এর ফলে বহু সামাজিক অকল্যাণ ঘটে—এই বোধ সংস্কার-সচেতনতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে ১৮৪২ খৃস্টাব্দে বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর এবং বিদ্যাদর্শন পত্রিকাদ্বয় প্রকাশিত হলে উভয় পত্রিকায় বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে রচনাদি প্রকাশিত হতে থাকে। 'কস্যচিৎ বঙ্গোঃ'-স্বাক্ষরিত এক পত্রে বাল্যবিবাহের দোষের উল্লেখ করে এই প্রথা নিবারণ করার আহ্বান জানানো হয়।[৫২] কিন্তু সে সময়ে কস্যচিৎ বঙ্গোঃ-র কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ।

১৮৪৩ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাল্যবিবাহ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশের একটি জোরালো মাধ্যম পাওয়া যায়। এই পত্রিকাকে

৪৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, **রবীন্দ্রজীবনী**, প্রথম খণ্ড (চতুর্থ সং; কলকাতা, ১৯৭০), পৃ. ১৯০-৯২; দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সং; কলকাতা, ১৯৬১), পৃ. ২৮, ৩০।

৪৯. 'আমাদের যথার্থ অভাব কি', **রহস্য-সন্দর্ভ**, প্রথম কল্প, নবম সংখ্যা, ১২৮০, পৃ. ১৪১-৪২।

৫০. **সোমপ্রকাশ**, ১১ শ্রাবণ ১২৯৩, সাবাস ৪, পৃ. ৩৬২-৬৩; যতীনাথ নন্দী, বাল্যবিবাহ (২), **নব্যভারত** শ্রাবণ, ১২৯৩, পৃ. ১৪৭-৪৮।

৫১. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, **পারিবারিক প্রবন্ধ**, পৃ. ২।

৫২. পত্র, **বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর**, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ১৮৪২, সাবাস ৩, পৃ. ১৮৪-৮৫।

কেন্দ্র করে অক্ষয়কুমার দত্ত বাল্যবিবাহের অযৌক্তিকতা, অনৌচিত্য ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল আলোচনা করেন। ১৮৪৫ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি এ সম্পর্কে লেখেন,

> শৈশবকাল গত না হইতেই পিতামাতা কন্যাদানের উদ্যোগ করেন। বিবেচনা কর, যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় একত্র থাকিতে হয়, যাহার চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্র দুষ্ট হইলে জীবনের সকল সুখ অবসন্ন হয়, এবং যাহার দুঃখেই দুঃখ ও যাহার সুখেই সুখ, সেই স্বামি শব্দের অর্থ না জানিতেই যখন বিবাহ হয়, . . . সুতরাং দম্পতির বয়োবৃদ্ধির সহিত কলহেরও অঙ্কুর বৃদ্ধির হয়। . . . মৌলিকেরা কুলক্রিয়ার কল্পিত মর্যাদার আশ্বাসে পঞ্চাশৎ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকারও বিবাহ দেন . . .।[৫৩]

বাল্যবিবাহবিরোধী মনোভাব একবার স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়ার পর আলোচ্য দশকেই আরো কয়েকজন এ সম্পর্কে আলোচনা করে এর অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করার প্রয়াস পান। ১৮৪৭ সালে 'ডেভিড হেয়ার স্মৃতি তহবিল' থেকে পুরস্কার দানের ঘোষণা করে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়।[৫৪] হিন্দু কলেজের ছাত্র ও জগবন্ধু পত্রিকার সম্পাদক সীতানাথ ঘোষ এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে পরের বছর পুরস্কার লাভ করেন।[৫৫] বাল্যবিবাহের দোষ বর্ণনা করে এ সময়ে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় চার কিস্তিতে একটি পত্রও প্রকাশিত হয়।

বাল্যবিবাহবিরোধী সচেতনতা তুলনামূলকভাবে ব্যাপকতর পরিধিতে সমাজে পরিকীর্ণ হয় পরবর্তী দশকে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ যোগ্য ব্যক্তির পোষকতা লাভ করে এই সচেতনতা বর্তমান দশকে প্রায় আন্দোলনের মর্যাদা পায়। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজমানস যেকালে জাগ্রত হয়, সেই সময়ই বিবাহপ্রথাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য যে সমস্ত অযৌক্তিক ও অনিষ্টকারী আচার প্রচলিত ছিলো, সেগুলোর প্রতিও সমাজবিবেক কমবেশি সজাগ হয়। সর্বশুভকরী পত্রিকাকে অবলম্বন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[৫৬] এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার[৫৭], বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকাকে অবলম্বন

৫৩ তত্ত্বপ. ১ ভাদ্র. ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫।

৫৪. সংবাদ প্রভাকর, ৪ জুন ১৮৪৭, সাবাস ১, পৃ. ৪০৭।

৫৫. সংবাদ প্রভাকর. ১ বৈশাখ ১২৫৫ (এপ্রিল ১৮৪৮), বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯০।

৫৬. সর্বশুভকরীর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এঁর প্রবন্ধ—'বাল্যবিবাহের দোষ'।

৫৭. সর্বশুভকরীর, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত এঁর প্রবন্ধ—'স্ত্রীশিক্ষা'।

করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং **ধর্মনীতি** শীর্ষক পুস্তক ও **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্ত আলোচ্য দশকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের চৈতন্য জাগ্রত করার প্রয়াস পান। তা ছাড়া এ সময়ে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করে কয়েকটি নাটকও রচিত হয়।[৫৮]

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি সমাজ-সংস্কারকগণ উপস্থাপিত করেন, সেগুলি হলো—বাল্যবিবাহের ফলে পরিণত বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও অপ্রণয়ের সৃষ্টি হয়, প্রথম সন্তান স্বল্পায়ু হয়, বংশপরম্পরায় শারীরিক অবনতি হয়, বালবিধবার সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, পাত্র-পাত্রী উভয়ের বিদ্যাশিক্ষা বিঘ্নিত হয়, উপার্জন ক্ষমতা লাভের পূর্বেই বিয়ে করায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা যায় না বলে প্রায়শ অযোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পিত হয়, একান্নবর্তী পরিবারে অভিভাবকের আয়ের উপর নির্ভরশীল বিবাহিত অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্রের স্বাধীনতা লোপ পায়, বিয়ের তাৎপর্য বুঝতে পারে না ফলে বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়[৫৯] ইত্যাদি।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে স্থাপিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের সমাজোন্নতি বিধায়িনী বন্ধুবর্গ সভা, ১৮৬০-৬১ সালে স্থাপিত কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গত সভা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**, **ধর্মতত্ত্ব**, **বামাবোধিনী পত্রিকা** প্রভৃতি সাময়িক-পত্র ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে বাল্যবিবাহবিরোধী মনোভাব জনপ্রিয় করার জন্যে নিরন্তর প্রয়াস চালাতে থাকে। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** ও **বামাবোধিনী পত্রিকায়** বিবাহের সংবাদ পরিবেশন কালে পাত্র-পাত্রীর বয়স একটু বেশি হলেই প্রাসঙ্গিক-ভাবে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতো।[৬০]

৫৮. পরে আলোচিত।

৫৯. দ্রষ্টব্য **তত্ত্বপ**, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাল্যবিবাহের দোষ,' **সর্বশুভকরী পত্রিকা**, ভাদ্র ১৭৭২, (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫০), **সাবাস ৩**, পৃ. ৫৩৬; 'বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা, **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, কার্তিক ১৭৭৬ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৫৪), পৃ. ১৮৩; 'কন্যাদায়', **সোমপ্রকাশ**, ১৪ বৈশাখ ১২৭১, **সাবাস ৪**, পৃ. ২০৬, 'দেশাচার:—বিবাহপ্রণালী—বাল্যবিবাহ', **বামাপ**, অগ্রহায়ণ, ১২৭১, পৃ. ২২১; 'বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার', **বঙ্গমহিলা**, চৈত্র ১২৮২, পৃ. ২৭৯; অক্ষয়কুমার দত্ত, **ধর্মনীতি**, পৃ. ৬৮, 'বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজে পরিবর্তন', **সোমপ্রকাশ**, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫, **সাবাস ৪**, পৃ. ২১৩, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, **বিবাহ সংস্কার** (কলিকাতা, ১৮৮৯), পৃ. ২-৫। পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজচিন্তা**, পৃ. ১১১।

৬০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য **তত্ত্বপ**, ভাদ্র ১২৮৬ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৬৪), পৃ. ৭৯। পঁচিশ বছর বয়সী পার্বতীচরণ গুপ্তের সঙ্গে সতেরো বছর বয়সী কামিনী দেবীর বিয়ের সংবাদ

১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি সভা স্থাপিত হয়।[৬১] এই সভা মহাপাপ বাল্যবিবাহ নামক একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা যদিও মন্তব্য করে, মহাপাপ বাল্যবিবাহে প্রকাশিত রচনাদির মান খুব উন্নত নয়,[৬২] তবু রচনার মান যেমনি হোক না কেন, সেকালে এরূপ একটি পত্রিকা প্রকাশের ঘটনাকে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হয়। সমাজের একাংশে বাল্যবিবাহবিরোধী মনোভাব কতো প্রবল হয়ে উঠেছিলো, এ ঘটনা তার নির্ভুল প্রমাণ দেয়।

১৮৭২ সালের তিন আইন গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে এ দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রায় সকলেই বাল্যবিবাহের বিশেষত বালিকা কন্যার বিবাহ সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন।[৬৩] কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান ডাক্তার-দের কাছে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো জাতীয়তাবাদী হিন্দু-চিকিৎসকও এ সময়ে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করেছিলেন যে, ষোল বছর বয়সের আগে বিয়ে হলে তা মেয়েদের পক্ষে শারীরিকভাবে ক্ষতি-কারক।[৬৪] গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, ঋতুমতী হওয়ার দু বছর পরে বিয়ে দিতে পারলেই উত্তম হয়।[৬৫] ১৮৭২ সালের তিন আইন সম্পর্কে অনেকেরই নানা আপত্তি ছিলো, কিন্তু এই আইন গৃহীত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকেই ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, কন্যা ঋতুমতী হওয়ার আগে বিবাহ হওয়া অনুচিত।

পরিবেশন কালে এতে বলা হয়, 'এতদ্বারা...উপযুক্ত বয়সে বিবাহের প্রথা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ট হইল'।

রাজনারায়ণ বসুর তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স্ক বড়ো মেয়ের বিয়ের সংবাদ দান কালে **বামাবোধিনী** পত্রিকার মন্তব্য—'এই বিবাহ কার্যটী উপযুক্ত বয়সেই হইয়াছে'। **বামাপ,** জ্যৈষ্ঠ ১২৭১, পৃ. ১৩২।

৬১. সোমনাথ বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখিয়ে নিজে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন— **বাল্যবিবাহ** (ঢাকা, ১৮৭০)।

৬২. 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন', **জ্ঞানাঙ্কুর**, মাঘ, ১২৮০, পৃ. ১৪৩-৪৪; 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন,' **জ্ঞানাঙ্কুর**, মাঘ ১২৮১, পৃ. ১৪৩-৪৪।

৬৩. See S.Sastri, **History of the Brahmo Samaj** (2nd ed., Calcutta, 1974), pp. 158-59.

৬৪. 'স্ত্রীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম', **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ১১১-১৪।

৬৫. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৫।

প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে শতাব্দীর তৃতীয় পাদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সচেতনতার একটি অভ্রান্ত স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, পনেরো বছর আগে সবাই মনে করতেন যে, ন বছর বয়সের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া উচিত, নয়তো পূর্বপুরুষেরা নরকস্থ হন, কিন্তু এখন 'নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কে না বাল্যবিবাহকে অতি অনুচিত কার্য বলিয়া ঘৃণা করেন'?[৬৬] বাল্যবিবাহের অনৌচিত্য সম্পর্কে এই সচেতনতা যে কারো কারো মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিলো, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৮৭৫ সালে পূর্ণচন্দ্র বসু যখন বলেন, বাল্যবিবাহ আদৌ বিবাহ নয়, কারণ অজ্ঞান অবস্থায় যা কৃত তা বৈধ নয় এবং এভাবে বিবাহিত কন্যা পরিণত বয়সে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন।[৬৭]—তখন আমরা এই সচেতনতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হই।

রামতনু লাহিড়ী এই সচেতনতার দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে ১৮৬৮ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেন ১৬ বছর বয়সে[৬৮] এবং ১৮৬৯ সালে ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ দেন ২০ বছর বয়সে।[৬৯] তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা ইন্দুমতী অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান ২১ বছর বয়সে।[৭০] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যবিবাহের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনিও ১৮৬০-এর দশকে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ দেন সাড়ে তেরো বছর বয়সে।[৭১] রাজনারায়ণ বসুর দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয় ১৩ বছর বয়সে।[৭২] অন্নদাচরণ খাস্তগির তাঁর কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ দেন ১৬ বছর বয়সে।[৭৩]

এ জাতীয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা ছাড়াও, আমরা বলতে পারি যে, ১৮৭০-১৮৮০-র দশকে বেশি বয়সে কন্যা দান করলে সেই অভিভাবককে অন্তত সমাজচ্যুত হতে হতো না।[৭৪] আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিন আইনের বিরোধিতা উপলক্ষে ১৮৭০-এর দশকের প্রারম্ভে দাবি করা হয় মেয়েদের বিবাহের

৬৬. প্যারীচরণ সরকার, 'দৃষ্টান্তের ফল', **হিতসাধক** আষাঢ় ১২৭৬, পৃ. ১২৬।
৬৭. পূর্ণচন্দ্র বসু, 'বঙ্গবাসার ধর্মনৈতিক অবস্থা,' **আর্যদর্শন**, চৈত্র ১২৮১, পৃ. ৫৪৬-৪৭।
৬৮. **বামাপ**, ফাল্গুন ১২৭৪, পৃ. ৭০৩।
৬৯. **বামাপ**, কার্তিক ১২৭৬, পৃ. ১৩৭-৩৮
৭০. **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, পৃ. ২০৩, ২৯৭-৯৮।
৭১. **তত্ত্বপ**, পৌষ ১৭৮৯, পৃ. ১৭৭।
৭২. **তত্ত্বপ**, বৈশাখ, ১৭৮৯, পৃ. ১৯।
৭৩. 'শোচনীয় ঘটার বিবাহ,' **বামাপ**, কার্তিক ১২৭৯, পৃ. ২২৩।
৭৪. 'বাল্যবিবাহ', **সোমপ্রকাশ**, ৮ পৌষ ১২৯১, সাবাস ৪, পৃ. ৩২৬।

যথার্থ বয়স চোদ্দর নিচে।[৭৫] কিন্তু ১৮৭৫ সালে এই পত্রিকায়ই বলা হয় যে, কন্যাদের সঠিক বিবাহের বয়স চোদ্দ। এই বয়সে বিবাহ হলে বাল্যবিবাহের-উভয় দোষ লাঘব হয়।[৭৬] কট্টর জাতীয়তাবাদী মনোমোহন বসু ১৮৭২ সালে জাতীয় সভায় প্রবন্ধ পাঠ করে পরিণত বয়সে কন্যার বিবাহ দান করার রীতি অত্যন্ত অনুচিত বলে মন্তব্য করেন, কিন্তু তিনিও স্বীকার করেন যে, ভদ্রঘরে দশ-এগারো-বারো-তেরো বছর বয়স্ক কন্যার বিয়ে হচ্ছে এবং খুব কম বয়সী বালক-বালিকার বিবাহ হওয়া অনুচিত।[৭৭]

কিন্তু এই সচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের প্রচলন ১৮৭০-এর দশকে তো বটেই, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও রুদ্ধ হয়নি। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের লোকগণনার হিশেব থেকে দেখা যায়, তখন ৫ বছর পর্যন্ত বয়স এমন মেয়েদের শতকরা ১৩.৩ জনের, ১০ বছর পর্যন্ত বয়স এমন মেয়েদের শতকরা ৬৬.৬ জনের এবং ১৫ বছর পর্যন্ত বয়স এমন মেয়েদের শতকরা ৮৭.১ জনের বিয়ে হয়ে গেছে। এ সময়ে ১০ ও ১৫ বছর পর্যন্ত বয়স এমন ছেলেদের যথাক্রমে শতকরা ৫.৪ ও ২৩.৪ জনের বিয়ে হয়েছিলো।[৭৮] এই পরিসংখ্যান দিয়েই আমরা সংস্কার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে, ১৮৭২ সালের তিন আইন গৃহীত হওয়ার পরেও হিন্দুসমাজে এমন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, যার পাত্রীর বয়স এক বছর এক মাস এবং পাত্রের তিন বছর দু মাস। সম্প্রদানের সময়ে সোজা হয়ে না বসতে পারায় 'বধূকে একটি ধামার মধ্যে বসাইয়া কার্যনির্বাহ' করা হয়।[৭৯]

পূর্ববর্তী পরিসংখ্যান ও বিবাহসমূহের দৃষ্টান্ত দেখে এ প্রশ্ন কেউ করতে পারেন--বাল্যবিবাহবিরোধী সচেতনতা কি একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলো? উত্তরে বলতে হয়, বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ না হলেও, এই আন্দোলনের ফলে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত অভিভাবক নতুন এক সচেতনা লাভ করেন এবং কন্যাদের বেশি বয়সে বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে বিবাহের গড় বয়স বৃদ্ধি পায়। পূর্বে উদ্ধৃত প্যারীচরণ সরকার ও মনোমোহন বসুর উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বলা হয়, ২০ বছর আগে মেয়েদের সাধারণত সাত-আট বছর বয়সে বিয়ে হতো, এখন হয় দশ-এগারো

৭৫. 'The Civil Marriage Bill,' তত্ত্বপ, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ (মে-জুন ১৮৭২), পৃ. ৪১।
৭৬. 'সমাজ সংস্কার', তত্ত্বপ, পৌষ ১৭৯৭ (ডিসেম্বর, ১৮৭৫-জানুয়ারী ১৮৭৬), পৃ. ১৬২।
৭৭. মনোমোহন বসু, হিন্দু আচার-ব্যবহার, প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৫।
৭৮. **Census of India, 1901**, Vol. VI, Pt. I, p. 266.
৭৯. 'সংবাদ : সামাজিক', মধ্যস্থ, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ১১৭।

বছর বয়সে।[৮০] ১৮৮০-র দশকের রচনা থেকেও এই বয়স বৃদ্ধির সংবাদ জানা যায়।[৮১] বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাল্যবিবাহ করেছিলেন এবং বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন[৮২], কিন্তু আলোচ্য কালে তাঁর কোনো কোনো নায়িকারও বয়স পূর্বের তুলনায় বেশি দেখানো হয়েছে।[৮৩]—এই পরিবর্তিত মানসিকতা আসলে বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের পরোক্ষ ফল। ১৮৮৯ সালে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী তিন আইনের উল্লেখ করে বলেন, ১৪ বছরের বালিকা ও ১৮ বছরের বালকের বিবাহও আসলে বাল্যবিবাহ।[৮৪] এ মন্তব্য থেকেও আমরা একটি বিশেষ পরিধির মধ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

অসমবয়স্ক বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতার উন্মেষ

শিশু বয়সে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া অযৌক্তিক, সংস্কারকগণ কেবল মাত্র এটুকুই বলেননি। বালিকা কন্যার সঙ্গে মধ্যবয়স্ক অথবা বৃদ্ধ পাত্রের বিবাহে কিংবা অধিক বয়স্ক কন্যার সঙ্গে কম বয়সী পাত্রের বিবাহও তাঁদের সমালোচনার বিষয় হয়। সেকালে বিধবাবিবাহ এবং পরিণত বয়সে কন্যার বিবাহরীতি প্রচলিত না থাকায়, স্বভাবতই বিপত্নীক ও মধ্যবয়স্ক পাত্র দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাইলে, বালিকা কন্যাই গ্রহণ করতে হতো। ইচ্ছে থাকলেও এরূপ ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা পাওয়া যেতো না। ফলে, অসমবয়স্ক বিবাহ সে সমাজে আদৌ বিরল ছিলো না। অনেক সময় আবার কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বেশি বয়সী কন্যার অসমবয়স্ক বিবাহ হতো।[৮৫]

সমাজ সংস্কারকগণ বাল্যবিবাহের মতো এ জাতীয় অসম বিবাহরীতির অনিষ্টকারিতা সম্পর্কেও, সীমিত মাত্রায় হলেও, তাঁদের সচেতনতা ১৮৫০-এর দশক থেকেই প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ১৮৫৬ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত

৮০. 'বাল্যবিবাহ ও হিন্দুহিতৈষিণী', **সোমপ্রকাশ**, ২৫ ভাদ্র ১২৮৫, **সাবাস ৪**, পৃ. ২৮৫-৮৬।

৮১. 'নববর্ষ', **বামাপ**, বৈশাখ ১২৮৯, পৃ. ৮০; দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, **বিবাহ সংস্কার**, পৃ. ১২।

৮২. তাঁর এক নায়িকা—ইন্দিরা বলে, 'যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করো, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি?'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **ইন্দিরা**, **বঙ্কিমরচনাবলী**, প্রথম খণ্ড (পঞ্চম সং; কলিকাতা, ১৯৭০), পৃ. ৩৭৪।

৮৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **রাধারাণী**, **বঙ্কিমরচনাবলী**, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭, ৪৮১।

৮৪. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, **বিবাহ সংস্কার**, পৃ. ২-৫, ৬, ৭।

৮৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়।

বলেন, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য অল্প হওয়া উচিত। কারণ তাদের সম্বন্ধ বন্ধুর মতো।[৮৬] চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পুরুষের ন-দশ বছরের বালিকা বিবাহ করার প্রচলিত রীতির নিন্দা করে তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের মতো এ-ও গুরুতর পাতক। এরূপ বিষম সম্মেলনজাত সন্তান ক্ষণজীবী ও জীর্ণ দেহ প্রাপ্ত হয়, এ ধরনের বিবাহ অকাল বৈধব্য ঘটায়, দম্পতির মধ্যে অপ্রণয়ের জন্ম দেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধ স্বামীতে অতৃপ্ত তরুণী ভার্যা ব্যভিচারিণী হয় বলে অক্ষয়কুমার মত প্রকাশ করেন।[৮৭]

বামাবোধিনী পত্রিকায় বলা হয়, এদেশে পাঁচ বছরের কন্যাকে আশি বছরের অতিবৃদ্ধের কাছে সম্প্রদান করা হয়। এর ফলে দুর্বল, রুগ্ন ও অল্পায়ু সন্তান জন্মে, বন্ধ্যাত্ব ঘটে এবং অকাল বৈধব্য বৃদ্ধি পায় পত্রিকায় তা-ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।[৮৮] আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, কৌলীন্যবিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গেও বৃদ্ধের শিশু কন্যা বিবাহ এবং বালকের পরিণত বয়স্ক কন্যা বিবাহ করার রীতিকে নিন্দা করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বৈদিক ও পৌরাণিক কালে পাত্রপাত্রী ইচ্ছে করলে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী উভয়ের সম্মতিক্রমে বিয়ে করতে পারতেন। স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব রীতির বিবাহে পারস্পরিক এই পছন্দের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে পাত্রীর পছন্দ তো দূরের কথা পাত্রের পছন্দ করার অধিকার স্বীকৃত হয়নি। সমগ্র সমাজের তুলনায় অতি বিদগ্ধ, চিন্তার দিক দিয়ে প্রাগ্রসর ঠাকুর পরিবারের অতি আধুনিক, বিলেত-ফেরত, কবি, বিলাসী 'বাবু' রবীন্দ্রনাথও অভিভাবকের ইচ্ছায় একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত থেকেই সেকালের পাত্রপাত্রীদের পছন্দের অধিকার সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করা সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে, সে সময়ে পাত্রপাত্রীর পরিবর্তে অভিভাবকগণ তাঁদের পক্ষে পছন্দ করতেন।[৮৯] পছন্দের ব্যাপারে পাত্রের অর্থ, সম্মান, কৌলীন্য এবং পাত্রীর গৃহকর্মে নৈপুণ্য--এসবই বিচার করা হতো।[৯০] বিয়ের আগে কন্যাকে দেখার ইচ্ছে

৮৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, পৃ. ৬৭।

৮৭. ঐ, পৃ. ৬৮, ৭০-৭১।

৮৮. 'দেশাচার : বিবাহপ্রণালী—বার্ধক্যবিবাহ', বামাপ, মাঘ ১২৭১, পৃ. ১৫৩।

৮৯. 'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ,' বিদ্যাদর্শন, কার্তিক ১৭৬৪ (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৪২), সাবাস ৩, পৃ. ৫৭৩; 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা,' বামাপ, পৌষ ১২৭২, পৃ. ১৬১; 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', অবোধবন্ধু, ভাদ্র ১২৭৬, পৃ. ১১০, 'বিবাহ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৪, পৃ. ৫৮১।

৯০. তত্ত্বপ, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাল্যবিবাহের দোষ', পৃ. ৫৩৭; অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, পৃ. ৬১-৬২, 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা', বামাপ, পৃ. ১৬১।

প্রকাশ করলে পাত্র নির্লজ্জ বলে তিরস্কৃত হতেন।[৯১] আর কন্যার পক্ষে ভাবী পাত্রকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করার কথা সে যুগে বোধ হয় কেউ চিন্তাও করতেন না।

সমাজের প্রচলিত রীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাজ-শাসনের প্রতি ভীতিবশত সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ সংস্কারক পর্যন্ত নিজের নিজের ইচ্ছা অনুসারে পছন্দ করতে পারেননি। এমন কি, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র কিংবা কেশবচন্দ্র তাঁদের কন্যাদের বিয়ে কন্যাদের পছন্দ অনুসারে দেননি। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের পছন্দ অনুসারে বিবাহ করাতো দূরের কথা প্রবল আপত্তি জানানো সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য হন।[৯২]

প্রকৃত পক্ষে, পাত্রপাত্রীর মতামত স্বীকৃত হয় একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে। এই বছর ছোটো মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে রাজনারায়ণ বসু এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি নিজের মতের বিরুদ্ধে কন্যার মত অনুসারে তাঁর বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহ সভায় নিজে অনুপস্থিত থাকেন।[৯৩] সম্ভবত এই প্রথম বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরিবারে বিবাহে কন্যার মতামতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এরূপ ঘটনা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই বিরল। ব্রাহ্মসমাজকে বাদ দিলে ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত কী পাত্র কী পাত্রী কারো পছন্দ করার অধিকারই হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়নি।

কিন্তু পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক পছন্দ-অপছন্দ সুখী বিবাহের জন্যে যে আবশ্যিক শর্ত— এ ধারণা যুক্তিবাদ ও উদারনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ

৯১. 'বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার', **বঙ্গমহিলা**, পৃ. ২৭৯; সীতানাথ নন্দী, 'স্বাধীনতা, ও স্বেচ্ছাচার', **নব্যভারত**, ফাল্গুন, ১২৯১, পৃ. ৫০৭।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৪ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত **কুলীনকন্যা বা কমলিনী** নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন যে, ভাবপ্রবণ অপরিণত বয়সে নিজের চিত্তাবেগ সংযত করে কন্যার গুণাগুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা বিবাহার্থী বালকের কর্ম নয়। সুতরাং নাটকের নায়ক দিননাথ বঙ্গীয় যুবকের আদর্শ নয় এবং নায়িকা কমলিনী 'কুমারীবর্গের অনুকরণীয়া নহেন।' **বঙ্গদর্শন**, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২৪০।

৯২. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৬৭-৭৮।

৯৩. রাজনারায়ণ বসু জামাতা হিসেবে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে মনোনীত করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের রীতি অনুযায়ী ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বিয়ে করতে চান; রাজনারায়ণ বিয়ে দিতে চান আদি সমাজের ব্রাহ্ম-বিবাহরীতি অনুযায়ী। ফলে বিবাহ এক প্রকার ভেঙে যায়। এই পর্যায়ে রাজনারায়ণ কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কন্যা কৃষ্ণকুমারকে বিবাহ করতে চান। রাজনারায়ণ এই পছন্দের মূল্য দিতে গিয়ে বিবাহে সম্মত হন; কিন্তু নিজে বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জন করেন।—**তত্ত্বপ**, ভাদ্র, ১৮০৩ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮১), পৃ. ৯৮; **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৮৮, পৃ. ১২৫-২৮।

সমাজ-সংস্কারদের মনে দৃঢ়মূল হতে থাকে। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ খৃস্টাব্দেই লিখেছিলেন,

> এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামি বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না। পিতা বা মাতা, বা ভ্রাতা ইত্যাদি ব্যক্তি বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নিশ্চয় করেন, এবং সেই নির্ণয়ানুসারে পাণি গ্রহণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্যতর প্রথা কি আছে? যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় সংযুক্ত রহিতে হয়, যাহার গুণের প্রতি জীবনের অধিক সুখ নির্ভর করে,·· এ এবম্প্রকার স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের ভার যে পরের প্রতি অর্পণ হয়, ইহা আক্ষেপের বিষয়।

অক্ষয়কুমার আরো বলেন যে, এ জাতীয় বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপ্রণয়ের সৃষ্টি হয়।[৯৪] তিন বছর পরে তিনি পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর 'চিরকাল এক শরীরের ন্যায় একত্র' থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে পারস্পরিক পছন্দ করার প্রথা না থাকায় নানা অনিষ্ট হয়।[৯৫] আসলে অক্ষয়কুমার দত্ত এ বিষয়ে একটি অবিচল ধারণা পোষণ করতেন। ১৮৫৬ প্রকাশিত ধর্মনীতি গ্রন্থে তুলনামূলকভাবে আরো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে লেখেন,

> কন্যা ও পাত্রের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞ্চয় হওয়া অবশ্যক।

যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, সারা জীবন যারা পরস্পর মিলিত থাকতে চায়,তারা উভয় উভয়কে প্রথমে না জানলে এবং প্রণয় ব্যতীত তাদের বিয়ে হলে কলহ এবং ক্লেশের সৃষ্টি হতে পারে; এদেশের পছন্দ না করে বিবাহ করার রীতি যে অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত, তিনি সে সম্পর্কেও মন্তব্য করেন।[৯৬]

অক্ষয়কুমার দত্তের মতো প্রাগ্রসর চিন্তা অন্তত ১৮৪০-এর দশকে অন্য কেউ প্রকাশ বা প্রচার করেননি। ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে বামাবোধিনী পত্রিকায় অভিভাবকের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করার রীতির সমালোচনা করে বলা হয় এটা 'কি ভয়ানক কথা'।[৯৭] কালীপ্রসন্ন ঘোষ এ সময়ে বলেন, মেয়েদের আর কোনো স্বাধীনতা না থাকলেও অন্তত মনোনীত করে বিবাহ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।[৯৮]

৯৪. **বিদ্যাদর্শন**, কার্তিক ১৭৬৪ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৪২), **সাবাস ৩**, পৃ. ৫৭৩।
৯৫. **তত্ত্বপ**, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫।
৯৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, **ধর্মনীতি**, পৃ. ৬১-৬২।
৯৭. 'বিবাহ', **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৪, পৃ. ৫৮১-৮২।
৯৮. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব** (কলিকাতা ১৮৬৯), পৃ. ২২৮-২৯।

১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যস্থ পত্রিকায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী কবিতায় বলা হয় যে, একদিন স্বয়ংবর প্রথা প্রচালিত ছিলো অথচ এখন অভিভাবকগণ পাত্রপাত্রীর মতামত না নিয়ে হয়তো সাপবর এবং বেজিমেয়ের বিয়ে দেন। দেশাচারের নিন্দা করে কবি বলেন,

চিরকাল সুখ দুঃখ ভার ; সমর্পিত হবে করে যার,
হেন পতি বেছে নিতে, নাহি শক্তি মত দিতে,
ধন্য ধন্য দেশাচার।[৯৯]

আলোচ্য কালে এরূপ একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায়। এতে অক্ষয় দত্তের প্রতিধ্বনি করে বলা হয়, বিয়ের মত একটি অতি-ব্যক্তিগত ব্যাপারেও বর ও কন্যার কোনো স্বাধীনতা নেই। 'তাঁহাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা যখন ইচ্ছা ও যাহার সঙ্গে ইচ্ছা, যোজনা করিয়া দেন। তাহাতে ভবিষ্যতে দম্পতির সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে কি না, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও বিচার করা হয় না।... (পাত্রপাত্রীকেও) সুযোগ দেওয়া হয় না।' এর ফলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হয় না, বিশেষত স্ত্রীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, প্রসঙ্গত এ মন্তব্য ও করা হয়।[১০০]

অন্য একজন সংস্কারক প্রায় অক্ষয় দত্তের ভাষায় সমস্যাটির আলোচনা করে বলেন,

কি আশ্চর্য! যাহারা যাবজ্জীবন একত্রে বাস করিবে, যাহাদিগের পরস্পর প্রণয় সদ্‌ভাব চিরসুখের কারণ, তাহারা বিবাহের পূর্বে কেহ কাহার মুখাবলোকনেও সমর্থ হয়েন না। ইহাতে প্রকৃত প্রণয়নের অধিক সম্ভাবনা নাই। যাহাকে বিবাহ করিলাম, তাহার কি গুণ আছে, কি গুণ নাই, তাহার স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের কত দূর সাদৃশ্য আছে, প্রভৃতি বিষয়গুলি অবগত না হইয়া পরিণীত হওয়াতে সম্পূর্ণ মিলনের কিছুই সম্ভাবনা থাকে না।[১০১]

কিন্তু এসব রচনা সে সময়ের পরিপেক্ষিতে নিতান্ত ব্যতিক্রমধর্মী। কেননা এ বিষয়ে সমাজবিবেক তখন পর্যন্ত সামান্যই জাগ্রত হয়েছিলো। রক্ষণশীল সমাজ বিয়ের বয়স সম্পর্কে সামান্য সচেতন হলেও, বিবাহে পাত্রপাত্রীর মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করেননি। বরং এই মনোভাবকে বিদ্রূপ এবং নিন্দা করতেন।[১০২] অভিভাবকগণের ইচ্ছায় বিয়ে করাই সে সমাজে স্বাভাবিক ও শ্রেয় বলে বিবেচিত হতো।

৯৯. মনোরঞ্জন গুহ, 'স্বয়ংবর', (কবিতা), মধ্যস্থ, পৌষ, পৃ. ৩৯৭।
১০০. 'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র', জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ২৬১-৬২।
১০১. 'নবীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার', বঙ্গমহিলা, পৃ. ২৭৯।
১০২. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য 'প্রণয়রোগ', মধ্যস্থ, ২০ শ্রাবণ ১২৭৯, পৃ. ২৬৭; 'কুলীন

আসলে বিবাহার্থী পাত্রের অপরিণত বয়স, উপার্জন বিষয়ে অক্ষমতা, এবং সেকালের একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন তাকে অভিভাবকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে রাখতো। ফলে বিয়ের ব্যাপারে স্বভাবতই সে অভিভাবকের নির্দেশ এবং ইচ্ছা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য হতো। কন্যার পক্ষে, বলাই বাহুল্য, এই নির্ভর-শীলতা ছিলো আরো বেশি। সে যুগে এ বিশ্বাস ছিলো বদ্ধমূল যে, হিন্দুকন্যার বিয়ে হয় কেবল একটি ব্যক্তির সঙ্গে নয়, সমগ্র পরিবারের সঙ্গে।[১০৩] এই ধারণার ফলে বিবাহে বাঞ্ছিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত ইচ্ছেই বেশি গুরুত্ব পেতো।

অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা

বিবাহ তখনো দুটি নরনারীর মানসিক ও শারীরিক আকর্ষণহেতু সামাজিক মিলন বলে গণ্য হয়নি। এ জন্য পারস্পরিক সম্মতি থাকলেও দুটি নরনারী তাঁদের ইচ্ছে অনুসারে বিবাহ নামক একটি সামাজিক চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ বর্ণগত বাধার উল্লেখ করা যায়। আবার লক্ষ্য করেছি, মনুর বিধান অনুযায়ী উচ্চবর্ণের পুরুষ অবস্থাবিশেষে নিম্নবর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন। কেবল নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু উনিশ শতকের বঙ্গদেশে অসবর্ণ বিবাহ পুরাপুরি অপ্রচলিত ছিলো। অথচ যুক্তির আলোকে এই বাধানিষেধ অসঙ্গত।—দু-একজন সমাজ-সংস্কারক এ বিষয়ে সচেতনও হন। বিশেষত ব্রাহ্মগণ, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, জাতিভেদ প্রথা মানতেন না বলে তাঁদের কেউ কেউ অসবর্ণ বিবাহকে অন্যায় বা অসঙ্গত বলে আখ্যায়িত করতে পারেনি।

ব্রাহ্মদের এই মনোভাব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্র থেকে বোঝা যায়। দেবেন্দ্রনাথ অসবর্ণ বিবাহের যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়ে বলেন, 'রাজনিয়ম দ্বারা যাহাতে সঙ্করবর্ণে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা এক্ষণে বিহিত বোধ হইতেছে'।[১০৪] দেড় বছর পরে পুনরায় তিনি লেখেন, ব্রহ্মবিবাহ অসমান জাতির

কন্যা বা কমলিনী', **বঙ্গদর্শন**, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২৩৯-৪০; 'সমাজ সংস্কার', তত্ত্বপ, পৌষ ১৭৯৭, (ডিসেম্বর ১৮৭৫-জানুআরি ১৮৭৬), পৃ. ১৬৩।

১০৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না'. **সাবিত্রী** (কলিকাতা, ১২৯৩), পৃ. ১৭০-৭১; Ramabai Sarasvati **The High-Caste Hindu Woman**, pp. 39-40; M. M. Urquhart, **Women of Bengal** (London, 1925), pp. 37, 29–40.

১০৪. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ৭ আষাঢ় ১৭৮৩ (জুন, ১৮৬১), **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ. ৪২।

মধ্যেই হতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু 'তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্ন জাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মই আহলাদিত হইবেন এবং এমত পাত্রও আছে যে, সে কন্যাকে গ্রহণ করতে পারে'।[১০৫] রাজনারায়ণ বসুও নীতিগতভাবে অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করেন; কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, রাজনিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার আগে এরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।[১০৬]

অপর পক্ষে, কেশবচন্দ্র সেন কেবল অসবর্ণ বিবাহের যুক্তিযুক্ততা মেনে নিলেন না, ১৮৬২ সালের অগস্ট মাসে তিনি বাস্তবে একটি অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লেখেন, বাধা না দিলেও এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সায় ছিল না।[১০৭] এ মন্তব্য কতোটা যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা আমরা লক্ষ্য করেছি, আলোচ্য সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থনই জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মতো সংস্কারকের মনোভাব যা-ই হোক না কেন, গোটা হিন্দুসমাজ এবং প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মগণ এ ঘটনাকে আপত্তিকর বলে মনে করেছিলেন।[১০৮]

১৮৬৪ সালের ২ অগস্ট তারিখে কেশবচন্দ্রের উদ্‌যোগে আরো একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, যা কলকাতার সমগ্র হিন্দুসমাজকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। কারণ এই বিবাহের পাত্রী ছিলেন বিধবা এবং বরের চেয়ে নিম্নবর্ণের।[১০৯] সামাজিক উত্তেজনা এই উপলক্ষে এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, বিয়েতে পুলিশের সহায়তা নিতে হয়।[১১০] কেশবচন্দ্র এখানেই থেমে যাননি। অতঃপর তাঁর পরিচালিত *mirror* পত্রিকার মাধ্যমে অসবর্ণ বিবাহকে জনপ্রিয় ও প্রচলিত করার জন্যে নিয়মিতভাবে উৎসাহ দান করতে থাকেন।[১১১]

কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যায়, সেকালের হিন্দুসমাজ অসবর্ণ বিবাহসম্পর্কিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। এমন কি তুলনামূলকভাবে অনেক প্রগতিশীল আদি সমাজের ব্রাহ্মগণও এ রীতির অনুমোদন করেননি। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা হেমলতার

১০৫. ঐ, ১৩ মাঘ ১৭৮৪ (জানুআরি ১৮৬৩), পৃ. ৩৮।

১০৬. দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, ৭ আষাঢ় ১৭৮৩ (জুন ১৮৬১), পৃ ৩২।

১০৭. P. C. Mazoomdar, pp. 156-57.

১০৮. P. Sinha, **Nineteenth Century Bengal**, p. 121.

১০৯. তত্ত্বপ, শ্রাবণ, ১৭৮৬ (জুলাই–আগস্ট ১৮৬৪), পৃ ১৬১; বামাপ, শ্রাবণ ১২৭১, পৃ. ১৬৫; অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩৬৩।

১১০. B.C. pal, **Memories of My Life and Times**, p.333.

১১১. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২৭।

বিবাহ উপলক্ষে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ১৮৬৭ সালে **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়** যে মন্তব্য করা হয়, তা থেকে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদের মনোভাব খানিকটা বোঝা যায়। এ বিবাহ হয় অপৌত্তলিক ব্রাহ্মমতে, তার সমর্থন করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বলে, 'কিন্তু যদি এইটি অসবর্ণ বিবাহ হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই হিন্দু সমাজের সহনীয় হইত না'।[১১২] কিন্তু নব্য ব্রাহ্মদের মধ্যে ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে বেশ কয়েকটি অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা এ রীতিকে মোটামুটি সমর্থনও জ্ঞাপন করেন।[১১৩]

বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা

বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা সম্পর্কেও সে যুগে কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন। যেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর আদৌ মিল হয় না, স্বামী স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর একজন চিররুগ্ন, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অথবা কারারুদ্ধ—সেক্ষেত্রে স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদ করে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে—এই শ্রেয়তা বোধ খুব স্বল্পসংখ্যক সংস্কারকের মনে দানা বেঁধেছিলো। যিনি জগৎ ও জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি জিনিশকে দেখেছিলেন যুক্তির আলোকে—সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৫৬ সালে এ সম্পর্কে লেখেন, ব্যভিচার ঘটলে, যাবজ্জীবন কাররুদ্ধ হলে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা উচিত।[১১৪] এমন কি যে দম্পতির মোটেই মনের মিল হয় না, তাদেরও বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া উচিত।[১১৫] যুক্তি দেখিয়ে অক্ষয়কুমার বলেন, এসব ক্ষেত্রে স্বামী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে বিধবার মতো শোচনীয় জীবন যাপন করতে হয়। প্রাচীন ভারতে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতে পারতেন, তিনি সে কথারও উল্লেখ করেন।[১১৬]

১৮৭২ সালের তিন আইন গৃহীত হওয়ার আগে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারের কথা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও আলোচনা করেছিলেন। তিনি লেখেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে অথবা স্বামী অত্যাচারী হলে পরস্পরকে পরিত্যাগ করে বিবাহ করতে পারবে এমন অধিকার থাকা উচিত।[১১৭]

১১২. **তত্ত্বপ.** বৈশাখ ১৭৮৯ (এপ্রিল-মে ১৮৬৭), পৃ. ১৯।
১১৩. দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট চ।
১১৪. অক্ষয়কুমার দত্ত, **ধর্মনীতি**, পৃ. ৯৮--৯৯
১১৫. ঐ, পৃ. ১০০।
১১৬. ঐ, পৃ. ৯৯-১০০।
১১৭. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 'ব্রাহ্মদিগের বিবাহের আইন', **সোমপ্রকাশ**, ৫ বৈশাখ ১২৭৮, **সাবাস** ৪, পৃ. ২২৯।

সেকালের সামাজিক নিয়ম অনুসারে স্ত্রীকে পিতৃগৃহে ফেলে রেখে স্বামী নিজে পুনরায় বিবাহ করতে পারতো, কিন্তু স্বামীর শত দোষ থাকলেও স্ত্রী তাকে ত্যাগ করতে পারতো না।—এই বৈষম্যমূলক রীতির সমালোচনা করে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মন্তব্য করে যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরকে পরিত্যাগ করার বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়।[১১৮]

কিন্তু এই সচেতনতার উন্মেষ সত্ত্বেও গত শতাব্দীতে এরূপ আইন প্রণীত হয়নি (১৮৭২ সালের ৩ আইনে অবশ্য এ অধিকার স্বীকৃত হয়; কিন্তু সে আইন, প্রকৃত পক্ষে, হিন্দুদের জন্যে প্রণীত হয়)। বিবাহবিচ্ছেদের রীতি বলা বাহুল্য হিন্দুদের মধ্যে আদৌ জনপ্রিয় হয়নি। আসলে এ ধরনের মনোভাব শাস্ত্রীয় বিধান ও দেশাচারের এতো বেশি পরিপন্থী ছিলো যে, এরূপ সংস্কারের জন্যে যুগান্তরের আবশ্যকতা ছিলো।[১১৯]

পণপ্রথাবিরোধী সচেতনতার উন্মেষ

আলোচ্য কালের হিন্দুসমাজে আর একটি বড়ো দোষ অনুপ্রবেশ করে বরপণ ও কন্যাপণের রূপ ধরে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে পণপ্রথা সমর্থিত হয়নি এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কন্যাপণের কিঞ্চিৎ প্রচলন থাকলেও বরপণ প্রথা প্রায় অজ্ঞাত ছিলো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে পণপ্রথা দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত বরপণ ও শ্রোত্রিয় বংশজদের মধ্যে প্রচলিত কন্যাপণ সমাজকে যে আষ্টেপৃষ্ঠে আচ্ছন্ন করেছিলো এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কায়স্থদের আদ্যরসের সঙ্গে যুক্ত পণপ্রথার অনিষ্টকারিতাও বিশ্লেষিত হয়েছে।

কিন্তু বণিক, বসাক, অকুলীন কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও পণপ্রথার ক্রমশ প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশেষত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদেই বরপণের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১২০] আলোচ্য সময়ে একদিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যেমন কৌলীন্য প্রথার

১১৮. 'বঙ্গীয় বিবাহ', জ্ঞানাঙ্কুর, পৃ. ৪৯৯-৫০২।

১১৯. ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে ভারত সরকার প্রণীত হিন্দুবিবাহ আইনে প্রথম এই অধিকারের সংস্থান রাখা হয়।

১২০. ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকের শ্রেষ্ঠ সংস্কারকগণ অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৮৬০-এর দশকের সংস্কারক প্যারীচরণ সরকার, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ এই সমস্যা সম্পর্কে আদৌ কিছু উল্লেখ করেননি; এ থেকেই বোঝা যায় তখনো এ সমস্যা কুলীন ও বংশজ ব্রাহ্মণ এবং স্বর্ণ বণিক ও বসাকদের সীমানা ডিঙিয়ে সাধারণ হিন্দুসমাজে ছড়িয়ে পড়েনি অথবা এর অনিষ্টকারিতা প্রকট হয়ে ওঠেনি।

প্রকোপ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, অন্যদিকে সকল বর্ণের মধ্যেই, বিশেষত শিক্ষিত ও বিত্তবানদের মধ্যে বিদ্যা ও বিত্তের নবকৌলীন্য প্রকাশ পায়।[১২১] এই নবকৌলীন্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকের পুত্রবিক্রয় একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়।[১২২] এসব ক্ষেত্রে বিত্তের পরিমাণ ও পরীক্ষা-পাশের সংখ্যার সঙ্গে পণের দাবি আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পেতো।[১২৩] ১৮৬০-এর দশকের কলকাতায় সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণের কমে কন্যার বিবাহ বড়ো একটা হতো না।[১২৪] আর বণিকদের মধ্যে ১৮৭০-এর দশকে কমপক্ষে এক হাজার টাকা না দিলে বরকর্তা বিবাহে সম্মত হতেন না।[১২৫] এ থেকে সেকালের বরকর্তাদের দাবি সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করা যায়।

প্রকৃত পক্ষে, পণের দাবি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সময় থেকে কন্যার অভিভাবকগণ নিজেদের কন্যাদায়গ্রস্ত এবং কন্যার জন্মকে দুর্ভাগ্য বলে গণ্য করতে আরম্ভ করেন।[১২৬] অপর পক্ষে, এক বা একাধিক শিক্ষিত পুত্রের পিতা নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা করেন।[১২৭]

বরপণ প্রথার বহুল প্রচলনের জন্যে সমাজে যেসব অনিষ্ট ঘটছিলো, সে সম্পর্কে ১৮৬০-এর দশক থেকেই একটা সচেতনতার উদ্রেক হচ্ছিলো। ১৮৬৪ সালে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় সুবর্ণ বণিকদের বরপণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সামাজিক নিয়ম প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।[১২৮] একটি সামাজিক 'কমিটি' স্থাপন করে বরপণ নিয়ন্ত্রণের একটি প্রস্তাবও কয়েক বছরের মধ্যে এ পত্রিকায় উত্থাপিত হয়।[১২৯] কলকাতার বণিকদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি কমিটি স্থাপিত হয়। কিন্তু সে কমিটির নির্দেশ কেউ তেমন মানতেন বলে মনে হয় না।[১৩০] কেবল বণিকদের মধ্যেই নয়, শতাব্দীর শেষ দু দশকে পণপ্রথা পুরো হিন্দু সমাজেই যথেষ্ট বৃদ্ধি

১২১. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ৩৮১-৮২; G.Murshid, 'Co--existence in a Plural Society : Hindu-Muslim Relations in Bengal', **Journal of the Institute of Bangladesh Studies**, Vol. No. 1 (1976), pp.121-28.

১২২. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম', **নব্যভারত**, ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ২২৯।

১২৩. 'বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয়', **সোমপ্রকাশ**, ১০ আষাঢ় ১২৯১, সাবাস ৪, পৃ. ৩১২।

১২৪. 'কন্যাদান', **সোমপ্রকাশ**, ১৪ বৈশাখ ১২৭১, সাবাস ৪, পৃ. ২০৭।

১২৫. 'কন্যাসন্তান বিষয়ে', **সোমপ্রকাশ**, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, সাবাস ৪, পৃ. ২৬০।

১২৬. 'কন্যাদায়', **সোমপ্রকাশ**, পৃ. ২০৬।

১২৭. 'কন্যাসন্তান বিষয়ে', **সোমপ্রকাশ** পৃ. ২৬০।

১২৮. 'কন্যাদায়', **সোমপ্রকাশ**, পৃ. ২০৭।

১২৯. 'কন্যাসন্তান বিষয়ে', **সোমপ্রকাশ** পৃ. ২৬১।

১৩০. 'রূপচাঁদ পক্ষীর গান', **সোমপ্রকাশ**, ১০ আষাঢ় ১২৯১, সাবাস ৪, পৃ. ৩১৫।

পায়।[১৩১] হয়তো সে কারণেই এ প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে একই সময়ে একটা সচেতনতারও উদ্রেক হচ্ছিলো।

যুক্তিবাদের আলোকে বিবাহ সংস্কারের প্রয়াস

আসলে বিচ্ছিন্নভাবে কেবল পণপ্রথা, কি বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, কি অসবর্ণ বিবাহ, কি পাত্রপাত্রীর পছন্দ করার অধিকার, কি বিবাহের বয়স নিয়েই শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সচেতনতার উদ্রেক ও মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি, বিবাহ সম্পর্কে সংস্কারকদের মধ্যে মৌলিক ধারণাসমূহই পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিলো। বিবাহ, নারী ও যৌনতা সম্বন্ধে এ সময়ের হিন্দুমনোভাব নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখানে কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বিবাহে তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, গোষ্ঠীচেতনাই প্রধান ছিলো। এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি যুক্তি, উদারনীতি ও ইহলৌকিকতার উপর নয়,—স্থাপিত ছিলো কতোগুলো কুরীতি ও দেশাচারের উপর। স্ত্রী কেবল বিবেচিত হতেন সন্তান গর্ভে ধারণ করার পাত্রী ও সাংসারিক কাজকর্ম করার দাসী হিশেবে।

এই পরিবেশেই অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৫৬ সালে লেখেন, 'পত্নীকে আপনার ইন্দ্রিয় সেবার সাধন-স্থান করা মূঢ়তা ও অসভ্যতার লক্ষণ' এবং ব্যভিচার দোষ ঘটলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।[১৩২] ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে অন্য একজন সংস্কারক লেখেন, 'যাঁহারা পরিণীত হয়েন তাঁহারা পরিণয় কার্যের প্রকৃত গাম্ভীর্য না বুঝিয়া তাহাকে কেবল ইন্দ্রিয় সেবায় পরিণত করেন।...পশুদিগের ব্যবহারের সঙ্গে তাঁহাদিগের ব্যবহারের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না'।[১৩৩] উভয় উক্তিই সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী এবং উভয়ই প্রমাণ করে সেযুগের হিন্দুমনোভাবে কতো বড়ো পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিলো।

এই পরিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি সমকালীন আরো একাধিক উক্তি থেকে। বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রায় একই সময়ে বলা হয়, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা" হিন্দুদের এই আদর্শ নীচ ও অপবিত্র।[১৩৪] 'দাম্পত্যপ্রেমশূন্য যে বিবাহ পৃথিবীর বায়ুকে কলুষিত করিতেছে, তাহা নরকের জিনিস। তাহা রিপু সেবনের

১৩১. এই প্রথার প্রদুর্ভাববশত কন্যার বিবাহ দেওয়া দরিদ্র ভদ্রলোকের পক্ষে একান্ত শক্ত কাজে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য: রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহলতা (কলিকাতা, ১৩২০)।

১৩২. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, পৃ. ৯০-৯৩।

১৩৩. 'বিবাহ' ধর্মতত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৭ (মে-জুন ১৮৬৫), পৃ. ২৪৭।

১৩৪. 'বিবাহ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৪, পৃ. ৫৮১-৮২।

উপকরণ মাত্র। সমাজের এবম্বিধ লাইসেন্স প্রথার কোনই মূল্য নাই।'[১৩৫] এ উপলব্ধি সমাজের একটি বিদগ্ধ পরিমণ্ডলে ১৮৫০-এর দশক থেকেই ব্যপ্ত হতে থাকে। এবং এই চেতনার দ্বারা উদ্বোধিত সংস্কারকগণ ধর্ম ও দেশাচারের অনুরোধে কলুষিত বিবাহপ্রথাকে চরম অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পান।

আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে প্রভাবিত নব্য সংস্কারকগণ সমগ্র বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে যুক্তি, উদারনীতি ও ইহলৌকিকতার আদর্শে সংস্কৃত করার প্রেরণা এবং আদর্শ কেবল এই প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় দৃষ্টেই লাভ করেননি। নিজেদের সমাজের চরম বিকৃত ও কলুষিত বিবাহপ্রথার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রথার তুলনামূলক বিচার করে পাশ্চাত্যপ্রথার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনে এঁরা সমর্থ হন। বিশেষত ১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকে ইংলণ্ডের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকগণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে পুরোপুরি ধর্মীয় সংস্কার ও বিধানমুক্ত করার জন্যে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, এবং তার ফলস্বরূপ ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে যে সিভিল ম্যারেজ আইন গৃহীত হয়,[১৩৬] সম্ভবত তার দ্বারা নব্য বঙ্গের সংস্কারকগণও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৮৩৬ সালে প্রণীত ইংলণ্ডের সিভিল ম্যারেজ আইন অনুসারে অ্যাংলিকান চার্চের অনুমোদন ছাড়াই বিবাহ আইনত সিদ্ধ হয় এবং বিবাহ ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আসে। এর ফলে ধর্মীয় স্যাক্রামেন্টের স্থলে বিবাহ একটি সেক্যুলার চুক্তি হিসেবে গণ্য হয়। এই আইন প্রণীত হওয়ায় সনাতন ধর্ম ও আচারে বিশ্বাসবর্জিত ব্যক্তিগণ কোনোরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই একজন জাস্টিস অব পীসের সম্মুখে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার লাভ করেন।[১৩৭]

ভাবলোকের কেন্দ্রভূমি ইংলণ্ডের প্রগতিশীল সংস্কারকদের বিবাহসংক্রান্ত এই আদর্শ দৃষ্টে নব্যবঙ্গের সংস্কারকগণও মানবতার আলোকে সমগ্র বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে রীতিমতো আধুনিকীকরণের প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা বিবাহের বয়স, পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক পছন্দ, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, বর্ণবিচার ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। একই উদ্দেশ্যে তাঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সঙ্গে বৈদিক কিংবা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ভারতবর্ষের এক প্রদেশের অধিবাসীর সঙ্গে অন্য প্রদেশের অধিবাসীর বিবাহের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন করেন। এ রকমের

১৩৫. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'স্বামী ও স্ত্রী', নব্যভারত, আশ্বিন ১২৯৩, পৃ. ২৫৮।

১৩৬. E. Halevey, **History of the English People in the Nineteenth Century.** Vol. III (First paperback ed.; London, 1961), pp. 200–01.

১৩৭. **Ibid.,** p. 201.

অভিনব বিবাহ অনুষ্ঠিত হলেই সংস্কারকগণ উৎসাহ জোগাতেন।[১৩৮] এক কথায় বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিই তাঁরা যুক্তির উপর স্থাপিত করতে চান। এই সংস্কারকদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের ভূমিকাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো।

১৮৬০-এর দশকের প্রারম্ভ থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের পোষকতায় বিবাহ রীতির বিশেষ সংস্কার ও পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আচারের এতোই পরিপন্থী ছিলো যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খৃস্টাব্দেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলনের জন্যে রাজনিয়মের প্রার্থনা করতে হবে। এর কয়েক দিন আগে তাঁর অন্যতম কন্যা সুকুমারীকে প্রচলিত পৌত্তলিকরীতি বর্জন করে তিনি বিবাহ দেন।[১৩৯] এই বিবাহ উপলক্ষে তিনি দারুণ বিরোধিতার সম্মুখীন হন,—তাঁর ভাষায়, 'জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই' তাঁকে ত্যাগ করেন, এমন কি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না।[১৪০] পৌত্তলিকতা ছাড়াও, ব্রাহ্মদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে, দেবেন্দ্রনাথ এ সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মনে হয়, পৌত্তলিকতাবর্জিত বিবাহ কিংবা সঙ্কর বিবাহ কোনোটাই সম্ভবত হিন্দু-রীতিতে সিদ্ধ নয়। এই জন্যেই তিনি ব্রাহ্মবিবাহ আইনের কথা চিন্তা করেন। অথচ দেবেন্দ্রনাথ মনুর বিধান অনুসারেই তাঁর সংস্কৃত-বিবাহরীতির নাম দেন ব্রাহ্মবিবাহ। নামটিও তিনি মনু থেকেই সংগ্রহ করেন।[১৪১] কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের ফলেই হিন্দুসমাজ এই রীতিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি।[১৪২]

তবে অচিরেই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সঙ্কর বিবাহ প্রচলন কিংবা জাতিভেদ লোপ করার বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।[১৪৩] অতঃপর বিবাহ, জাতকর্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান থেকে পৌত্তলিকতা বর্জন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। কেবল তাই নয়

১৩৮. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : 'ব্রাহ্মবিবাহ' **তত্ত্বপ**, অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৬৭) পৃ. ১৬৩; 'বঙ্গীয় বিবাহ', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৃ. ৫৫৫--৫৬।

১৩৯. **তত্ত্বপ**, শ্রাবণ ১৭৮৩ (জুলাই–আগষ্ট ১৮৬১)।

১৪০. **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ. ৩৩।

সুকুমারীর বিবাহের পরে পুত্র হেমেন্দ্রনাথের জন্যে কন্যা সংগ্রহ করা শক্ত হয়ে পড়ে। হরদেব চট্টোপাধ্যায় সাহস করে কন্যা দিতে সম্মত হন। কিন্তু সমাজের বিরোধিতার মুখে পুলিশ ডেকে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।—অজিতকুমার চক্রবর্তী, **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর**, পৃ. ৩২৩।

১৪১. **মনুসংহিতা**, ৩/৩, ৩/২৭, পৃ. ১১০, ১১৮।

১৪২. **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ. ৪৮–৪৯।

১৪৩. এ ব্যাপারে রাজনারায়ণ বসুর পরামর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয়। দ্রষ্টব্য : **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পত্র সংখ্যা ২৫ ও ৩৯, পৃ. ৩২, ৫০-৫১।

কয়েক বছরের মধ্যে তিনি জাতিভেদ প্রথায় পূর্ণ আস্থা ফিরে পান।[১৪৪] সুতরাং অবসর্ণ বিবাহের প্রশ্ন তাঁর কাছে আর প্রশ্রয় পায়নি।

কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে যুবক ব্রাহ্মগণ বিবাহ কর্মটিকে পুরোপুরি যুক্তি দিয়ে বিচার এবং বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে চান। পূর্বেই লক্ষ্য করছি, এঁরা ১৮৬২ ও ১৮৬৪ সালে দুটি অবসর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন;[১৪৫] প্রকৃত পক্ষে, বিধবাবিবাহ, অবসর্ণবিবাহ, আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ, তথা যথোচিত বয়সে বিবাহ এবং পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে এঁরা উদার মনোভাব গ্রহণ করেন। এঁদের মুখপত্র ধর্মতত্ত্ব, বামাবোধিনী পত্রিকা, অবলা-বান্ধব, সুলভ সমাচার, *mirror* প্রভৃতি পত্রিকায় বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিকী-করণের জন্যে নিয়মিত উৎসাহ দেওয়া হয়।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দে 'উন্নতিশীল' 'কৈশব' ব্রাহ্মগণ বিবাহ পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরি-বর্তন আনয়ন করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত কন্যার অভিভাবক কন্যাকে পাত্রের কাছে সম্প্রদান করতেন। কিন্তু নতুন পদ্ধতি অনুসারে বর ও কন্যার পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়।[১৪৬] এ নিয়ম অসবর্ণ

১৪৪. জাতিভেদে অবিশ্বাস হওয়ায় ১৮৬০-এর দশকের প্রারম্ভে দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করেছিলেন এবং উপনয়নের আবশ্যকতা অস্বীকার করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ৩৯, পৃ. ৫০।

কিন্তু ১৮৭১ সালে তিনি নতুন উৎসাহে কনিষ্ঠ দুই পুত্র — সোমেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-নাথের উপনয়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবং নিজের প্রবর্তিত নতুন উপনয়ন দানের রীতি ভঙ্গ করে এঁদের উপবীত দান করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, যে রাজনারায়ণ বসু জাতিভেদ প্রথা বজায় রাখার জন্যে দেবেন্দ্রনাথকে একদা অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। এই উপনয়ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাতিভেদের কারণে তিনি অপমানিত হন। যে দালানে উপনয়ন অনুষ্ঠান চলছিলো রাজনারায়ণ সেখানে গিয়ে আসন গ্রহণ করলে, তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজনারায়ণ জানতেন না যে ওখানে শূদ্রের বসার অধিকার ছিলো না।—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত্র, পৃ. ১৯৯।

আরো দ্রষ্টব্য গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ—পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা (ঢাকা: ১৯৮১), পৃ. ২২-২৪।

১৪৫. এ নিয়মে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় প্রসন্নকুমার সেন ও রাজলক্ষ্মী মৈত্রের মধ্যে। U.Chakraborty, **Condition of Bengali Women Around the 2nd half of the 19th Century** (Calcutta 1963), p.11

ঊষা চক্রবর্তীর মতে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু আসলে বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বরে — ১২৭৩ সালের ২ অগ্রহায়ণ তারিখে। — বামাপ, অগ্রাহায়ণ, ১২৭৩, পৃ. ৪০০।

বিবাহের চেয়েও যুগান্তকারী, কারণ এর ফলে বিবাহ ধর্মীয় স্যাক্রামেন্টের পরিবর্তে পারস্পরিক সামাজিক চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই রীতি হিন্দু সমাজের মোটেই অনুমোদন লাভ করতে পারে নি।

আসলে নতুন যুগের চেতনা বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তন অনিবার্য করে তুলেছিলো। ব্রাহ্মকন্যাদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশের ফলে স্বমতে বিয়ে করার প্রবণতা আলোচ্য সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এখানেও পারিপার্শ্বিক সমাজের সঙ্গে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিলো। এসব অসুবিধে দূরীকরণের জন্যেই নতুন বিবাহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। অথচ এই পদ্ধতি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী সিদ্ধ নয় বলে, এসব বিয়ের ফলে জাত সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা, পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সংশয় দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক ছিলো না। এই কারণে নতুন বিবাহ রীতিকে সরকারী আইনের দ্বারা সিদ্ধ করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কেশব-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই নতুন রীতির বিবাহ আইনসঙ্গত কিনা অ্যাডভোকেট-জেনারেলের কাছে সে সম্পর্কে জানতে চান। অ্যাডভোকেট-জেনারেল জানান,

> In the present state of the law, such marriages are not binding upon the parties, and the (so-called) wife would have no legal redress if deserted by her husband, nor would the off-springs of such unions be legitimate or have any rights of succession . . .[১৪৭]

এই অবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত বহু বিরোধিতা ও বাকবিতণ্ডার পরে ১৮৭২ সালের মার্চ তারিখে Act III of 1872 নামে এই আইন গৃহীত হয়।[১৪৮]

১৪৭. Quoted in 'The Brahmo Samaj and the Native Marriage Act', **Calcutta Review**, Vol. LIV, No. 108 (1872), p. 286.

১৪৮. ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের এক সভায় (৫ জুলাই ১৮৬৮) সদস্যগণ এই আইন প্রণয়ন করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বেশির ভাগ মফস্বল ব্রাহ্মসমাজ এই আবেদন সমর্থন করে। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ তারিখে এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। খসড়াটি ২৭ নভেম্বর তারিখে একটি সিলেক্ট্ কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। বলা হয়, কমিটি দু মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। কিন্তু বাস্তবে দু বছর চার মাস পরে ১৮৭১ সালের ২৭ মার্চ কমিটি এক প্রতিবেদন পেশ করেন। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে এবং সরকারী মহলে এ বিল নিয়ে দারুণ

এই আইন প্রণীত হওয়ার ফলে অন্তত সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে বিবাহ সম্পর্কে কয়েকটি সংস্কার প্রচেষ্টা অনুমোদন লাভ করে। এগুলো হলো :

১. পাত্রপাত্রীর বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ (ন্যূনতম) বলে নির্ধারিত হওয়ায় বাল্যবিবাহ অংশত নিবারিত হয় ;
২. বহুবিবাহ পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয় ;
৩. অসবর্ণ ও ভিন্নধর্মাবলম্বীর বিবাহ স্বীকৃত হয় ;
৪. বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয় ;
৫. নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় কিন্তু 'সেকেণ্ড কাজিন'দের মধ্যে বিবাহ স্বীকৃত হয় ;
৬. কন্যার বয়স আঠারো বা তদূর্ধ্ব হলে বিবাহে তার স্বাধীন মতামত স্বীকৃত হয় ; এবং সর্বোপরি
৭. বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে মুক্ত হয়ে সেক্যুলার সামাজিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

প্রকৃত পক্ষে, আজকের বিচারেও বয়স ছাড়া আলোচ্য আইনের শর্ত আধুনিক, যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিক বলে বিবেচিত হতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে অশেষ শ্রদ্ধাবান অজিতকুমার চক্রবর্তী এই আইন প্রণীত হওয়ার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে দেবেন্দ্রনাথের জীবনী রচনা করতে গিয়ে এই আইনের সবগুলি শর্তেরই প্রশংসা করেন, 'কেবল অহিন্দু স্বীকারোক্তিটুকুই ইহার মধ্যে বিশেষ আপত্তিকর' বলে মন্তব্য করেন।[১৪৯]

স্যাক্রামেন্টের পরিবর্তে বিবাহ পদ্ধতি সেক্যুলার অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ায় সমসাময়িক হিন্দু এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ এ আইন সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলো। মনোমোহন বসু একে 'চুক্তি অথবা মুক্তি' বিবাহ বলে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ

আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, পার্শি সম্প্রদায় এবং শেষে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে নানা আপত্তি উত্থাপন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক, এমন কি, বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : **ধর্মতত্ত্ব**, আশ্বিন ও কার্তিক ১৭৯৩ (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৮৭১), **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ (এপ্রিল-জুন ১৮৭২) ; 'The Brahmo Samaj and the Native Marriage Act' **Calcutta Review**, pp. 294-305 ; **মধ্যস্থ**, ৬ শ্রাবণ ১২৭৯, পৃ. ২৩৪ ; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড**, পৃ. ৮৮২-৯১১ ; অজিতকুমার চক্রবর্তী, **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর**, পৃ. ৫০১-২৫ ; S.Sastri, **History of Brahmo Samaj**, pp. 155-60.

১৪৯. অজিতকুমার চক্রবর্তী, **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর**, পৃ. ৫২৫।

করেন।[১৫০] এটা অবশ্য রক্ষণশীল সমাজের একজন জাতীয়তাবাদী লেখকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিস্ময় লাগে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচরণ দেখে। একদিন দেবেন্দ্রনাথ নিজেই ব্রাহ্মবিবাহ আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও তাঁর পরিচালিত আদি সমাজ ব্রাহ্মবিবাহ আইনের তীব্র বিরোধিতা করে। ব্যবস্থাপক সভার নিকটে এই সমাজ অব্রাহ্মদের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করে এবং মেয়েদের পক্ষে ১২ বছরকে বিবাহযোগ্য বয়স বলে ঘোষণা করে। দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি যে হিন্দু নিয়মে সিদ্ধ বিবাহ এটা প্রমাণ করার জন্যে তাঁরা কাশীর পণ্ডিতগণের নিকট থেকে একটি ব্যবস্থাপত্রও সংগ্রহ করেন। এ বিবাহ পদ্ধতি সিদ্ধ নয় বলে যাঁরা এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর দান করেছিলেন[১৫১] তাঁদের নামও এঁরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন। মোট কথা আদি ব্রাহ্মসমাজের আচরণ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।[১৫২] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই আইনের দুটি প্রধান দোষের উল্লেখ করা হয়; ১. এর ফলে হিন্দু সমাজ থেকে ব্রাহ্মগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন,[১৫৩] এবং ২. এ বিবাহ নিরীশ্বর বিবাহ।[১৫৪]

সে যুগের বিচারে এই বিবাহ আইনকে যুগান্তকারী বলে আখ্যায়িত করতে হয়। এর ফলে একদিকে বিবাহ ইহলৌকিক চুক্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়, অন্যদিকে এই আইনের পক্ষে যে জনমত সৃষ্টি হয়; তা থেকে তৎকালীন সমাজে যুক্তিবাদী এক-শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের কেউ কেউ তিন আইনের তুলনায়ও অনেক প্রাগ্রসর চিন্তা করতেন বলে মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত যুবক দলের কথা বলা যায়। 'Every social custom or convention that interfered with the legitimate freedom of social intercourse between sexes'—এঁদের আক্রমণের বিষয়-

১৫০. মনোমোহন বসু, **হিন্দু আচার ব্যবহার**, প্রথম ভাগ, পৃ. ২২-২৩; মনোমোহন বসু, 'চুক্তি বিবাহ বা মুক্তি বিবাহ', **মধ্যস্থ**, ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৮৪-৯৯।

১৫১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩-১৫; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৯-৯০, ৮৯৩।

১৫২. ১৮৬০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটছিলো, তাই আদি সমাজকে হয়তো সংস্কার আন্দোলনের প্রতি বিমুখ করছিলো।

১৫৩. 'নিরীশ্বর বিবাহ', **তত্ত্বপ**, পৌষ ১৭৯৮ (ডিসেম্বর ১৮৭৬-জানুআরি ১৮৭৭), পৃ. ১৫৬-৫৮।

১৫৪. 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও তত্ত্বকৌমুদী', **তত্ত্বপ**, আষাঢ় ১৮০১ (জুন-জুলাই ১৮৭৯), পৃ. ৫৮-৬০; 'তত্ত্বকৌমুদী ও ব্রাহ্মসমাজ', **তত্ত্বপ**, আশ্বিন ১৮০১ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৭৯), পৃ. ১০৬-০৯।

বস্তুতে পরিণত হয়।[১৫৫] এঁরা তিন আইনের বিশেষত বয়সসম্পর্কিত বিধানকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে পারেননি। তাই এঁরা প্রতিজ্ঞা করেন ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সী মেয়েকে এঁরা বিয়ে করবেন না বা বিয়ে দেবেন না, এবং নিজেদের বয়স ২১ বছরের নিচে এঁরা বিয়ে করবেন না অথবা ২২ বছরের চেয়ে কম বয়সী ছেলেকে এঁরা বিয়ে দেবেন না।[১৫৬]

এ আইন প্রণীত হওয়ায় বহু ব্যক্তিই সমাজের রক্ষণশীলতা ও দেশাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ পান। মনোমোহন বসু ব্যঙ্গ করে বললেও, যথার্থভাবে এ বিবাহ অংশত 'মুক্তি বিবাহ' বলে গণ্য হতে পারে। ১৮৮৪ সালে রূপচাঁদ পক্ষী তাঁর একটি গানে হিন্দুবিবাহরীতির সমালোচনা করে বলেন, হিন্দুবিবাহের নিগড় থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম হন। ব্রাহ্মদের বিবাহের বরপণ কিংবা কন্যাপণের বালাই নেই, পছন্দ করে প্রণয় করে বিবাহ করা যায়, অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদিত হয়—এসব কারণে তিনি এই বিবাহ পদ্ধতির প্রশংসা করেন।[১৫৭] অনুরূপ কারণে হরিশচন্দ্র মিত্রও ব্রাহ্মবিবাহরীতির প্রশংসা করেছিলেন।[১৫৮]

আলোচ্য আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে এর পক্ষে 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্মগণ (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ) যেরূপ ব্যাপক সমর্থন জানান এবং আইন গৃহীত হওয়ার পরে এই আইনানুসারে তাঁরা যেভাবে বিয়ে করেন, তা থেকেও বিবাহ সম্পর্কে সমাজমানসের পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাকথিত 'নিরীশ্বর বিবাহ' সম্পর্কে কোনো পাপবোধ তাঁদের স্পর্শ করেনি বরং বিপুল উৎসাহ নিয়ে এই পদ্ধতিতে তাঁরা বিবাহ করেন।[১৫৯]

এই আইন অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহের জন্যে বিশেষ অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন থেকে কিছু জানা যায় না, কিন্তু ১৮৮২-৮৩

১৫৫. B.C.Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 314.

১৫৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৪২ ; হেমলতা দেবী, **পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত** (কলিকাতা, ১৯২১), পৃ. ১৫৬-৫৭ ; B.C.Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 314.

১৫৭. রূপচাঁদ পক্ষী, 'আ মরি নাকাল' (গান), **সোমপ্রকাশ**, ১০ আষাঢ় ১২৯১, সাবাস ৪, পৃ. ৩১৫।

১৫৮. **কন্যাপণ কি ভয়ানক**, পৃ. ২৩৮-৩৯।

১৫৯. আইন গৃহীত হওয়ার পর প্রথম বছরই এ আইনানুসারে ২৯টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র একটি সমাজে এতোগুলো বিবাহ নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। See **Report on the Administration of Bengal for 1882-83** (Calcutta, 1883), p. 497.

সাল পর্যন্ত আইন প্রণীত হওয়ার পরের প্রথম এক দশকে এই আইন অনুসারে যে ১০৬টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ৩৬টিই বিধবাবিবাহ।[১৬০] পরবর্তী দশকে এই আইন অনুসারে ১৯২টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে বিধবাবিবাহ ৩৬টি।[১৬১] এই আইন বিবাহের বয়সও যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়।[১৬২] এ জাতীয় বিবাহ যে কেবল কলকাতা ও ঢাকা নগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিলো তাও নয়।[১৬৩] ধীরে ধীরে বিবাহসম্পর্কিত নবলব্ধ সেক্যুলার ধারণা ব্যাপকতর জনগোষ্ঠী ও বৃহত্তর অঞ্চলে পরিকীর্ণ হয়।

উনিশ শতকীয় বিবাহ সংস্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, রামমোহন থেকে এই সংস্কার-সচেতনার সূচনা হয়। প্রথমদিকে প্রধানত বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণ সম্পর্কেই সাধারণ সংস্কারকগণ বেশি ভাবিত ছিলেন। ক্রমশ বিবাহসম্পর্কিত অন্যান্য অনিবার্য বিষয়গুলিও তাঁদের মনোযোগ অধিকার করে। ১৮৬০-এর দশক থেকে বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু বিবাহকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করে তাকে একটি পূর্ণ সেক্যুলার রূপ দিয়ে আধুনিকীকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কেশব সেনের নেতৃত্বে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, ১৮৬২ সালে যে আন্দোলনের সূচনা দশ বছরের মধ্যে ১৮৭২ সালে তা কেবল কতিপয় সংস্কারকের নয়, রীতিমতো সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।

১৬০. Ibid.

১৬১. Report on the Administration of Bengal 1892-93 (Calcutta, 1894), p. 582.

১৬২. ১৮৯২-৯৩ সালে যে ৩২টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির পাত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বয়স যথাক্রমে ৪০ ও ২১ এবং পাত্রীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বয়স ছিলো যথাক্রমে ২৪ ও ১৪।

১৬৩. ১৮৭২ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে পদাধিকার বলে ২০ জন এবং তা ছাড়াও কলকাতা ঢাকা ও হুগলিতে মোট চারজন রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন (কলকাতায় দুর্গামোহন দাস ও নরেন্দ্রনাথ সেন, হুগলিতে শিবচন্দ্র দেব, ঢাকায় গোবিন্দচন্দ্র দাস)। ১৮৯২-৯৩ সালে এই রেজিস্ট্রারদের সংখ্যা দাঁড়ায় পদাধিকার বলে ২৬ এবং অন্য ১৯। রেজিস্ট্রারের অফিসের পাঁচ মাইলের মধ্যে বিয়ে হলে চার টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি মাইলের জন্যে চার আনা মাশুল নির্ধারিত হয়। দ্রষ্টব্য: বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, পৃ. ৬২; Report on the Administration of Bengal, 1892-93, p. 582.

ব্রাহ্মরা মূলত নাগরিক সম্প্রদায় বলে বিবাহগুলি প্রধানত কলকাতায়ই হতো, তবে মফস্বল শহরগুলিতেও দুটি একটি করে হতো। যেমন ১৮৯২-৯৩ সালে রঙ্গপুরে ১টি, জলপাইগুড়িতে ১টি, ২৪ পরগণায় ২টি, ফরিদপুরে ২টি, ঢাকায় ২টি, বাঁকিপুরে ২টি, বরিশালে ১টি, বীরভূমে ১টি ও কোন্নগরে ১টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

তবে বিস্তৃত হিন্দুসমাজ এই সংস্কারের প্রতি বিমুখ ছিলো সন্দেহ নেই। এই আইনানুসারে বিবাহ করায় পাত্র ও পাত্রের পিতা হিন্দু সমাজ কর্তৃক একঘরে হন, এমন দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত নয়।[১৬৪] হিন্দু সমাজ তো বটেই এমনকি আদি ব্রাহ্মসমাজও একে স্বাগত জানায়নি। প্রকৃত পক্ষে, সময়ের তুলনায় এই আইন এতো প্রাগ্রসর ছিলো যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। এমন কি 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্মদেরও কেউ কেউ অবস্থাবিশেষে পুরনো রীতির সঙ্গে আপোষ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা সৌদামিনী[১৬৫] এবং ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর[১৬৬] বিবাহের কথা উল্লেখ করা যায়। অন্নদাচরণ ও কেশব উভয়ই তিন আইনের প্রধান নেতা ছিলেন। কিন্তু আই.সি.এস. জামাতা পেয়ে অন্নদাচরণ এবং মহারাজা জামাতা পেয়ে কেশব তিন আইন ভঙ্গ করে প্রায় পুরোপুরি হিন্দু মতে আপনাপন কন্যার বিবাহ দেন।

অপর পক্ষে হিন্দু সমাজ তিন আইনের দ্বারা পাত্রপাত্রীর বয়সের ব্যাপারে প্রভাবিত হওয়া ছাড়া বোধ হয় আদৌ প্রভাবিত হয়নি। বরং তিন আইনকে পুরোপুরি 'অহিন্দু' গণ্য করে হিন্দু সমাজ এর প্রতি পূর্ণ অবজ্ঞাই প্রদর্শন করেছে। সুতরাং বলা যায়, সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে বিবাহ-প্রতিষ্ঠানটি বৈপ্লবিকভাবে সংস্কৃত হলেও, ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত হিন্দু বিবাহ রীতির তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

১৬৪. দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ১০৪-১০৫।

১৬৫. এই বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য 'শোচনীয় ঘটার বিবাহ' **বামাপ**, **কার্তিক** ১২৭৯, পৃ. ২২৩-২৪ : **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ১৯৭-৯৮।

১৬৬. সুনীতি দেবীর বয়স তখন ১৩, মহারাজার ১৫/১৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৮০-১২০০ ; **কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত**, পৃ. ১৫৬-৫৭ : হেমলতা দেবী, **পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত**, পৃ. ১৬২-৬৫ ; P.C. Mazoomdar, pp. 321-32 : S.Sastri, **History of Brahmo Samaj**, pp. 173-81.

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলা নাট্যরচনায় বিবাহসংস্কার বিষয়ক সচেতনা

বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমাংশে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির সংস্কারের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতনতার উদ্রেক হয় ১৮৫০-এর দশক থেকে। বাংলা নাট্যরচনায়ও এই দশক থেকে সচেতনতার উন্মেষ লক্ষ্য করি। এই দশকে প্রকাশিত কুলীনকুলসর্বস্ব, বিধবোদ্বাহ নাটক, চপলাচিত্তচাপল্য নাটক, সপত্নী নাটক প্রভৃতি নাট্যরচনায় কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি সমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে। ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকেও এমনি আরো অনেক নাটক-প্রহসন প্রকাশিত হয় যেগুলি পূর্বোক্ত সমস্যাসমূহে তাদের 'ফোকাস' নিবদ্ধ রাখে। কিন্তু এসব নাটকেই প্রসঙ্গত বিবাহের উপযুক্ত বয়স, পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক মনোনয়ন ইত্যাদি প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। আসলে এদেশের বিবাহসম্পর্কিত সমাজচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বাল্যবিবাহ এবং অসমবয়স্ক বিবাহের কথা উল্লেখ না করে উপায় ছিলো না। কারণ কুলীনদের কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত সেকালের সব বিয়েই ছিলো বাল্যবিবাহ।

নিম্নলিখিত নাট্যরচনাসমূহে বিবাহের উপযুক্ত বয়স সম্পর্কে সচেতনতার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়, যদিও এসব রচনার কেন্দ্রে আছে অন্য কোনো সমস্যা।

১. কুলীনকুলসর্বস্ব; ২. বিধবোদ্বাহ নাটক; ৩. চপলাচিত্তচাপল্য নাটক; ৪. সপত্নী নাটক; ৫. বিধবা সুখের দশা; ৬. কলিকৌতুক নাটক; ৭. অগত্যা-স্বীকার প্রকরণ; ৮. পুনর্বিবাহ; ৯. কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে; ১০. কন্যাবিক্রয় নাটক; ১১. বিয়ে পাগলা বুড়ো; ১২. নবনাটক; ১৩. হিন্দু মহিলা নাটক (বিপনমোহন রচিত); ১৪. বরের কাশীযাত্রা; ১৫. আসুরোদ্বাহ নাটক; ১৬. আলালের ঘরের দুলাল নাটক; ১৭. মাগসর্বস্ব নাটক; ১৮. নয়শো রূপেয়া; ১৯. সাধের বিয়ে; এবং ২০. বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

এ ছাড়া কেবল বাল্যবিবাহকে প্রধান সমস্যা করেও কয়েকটি নাটক-প্রহসন রচিত হয়েছিলো। যেমন—১. শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় রচিত বাল্যবিবাহ নাটক। (১৮৬০ সালের পূর্বে প্রকাশিত এবং ১৭৮১ শকাব্দের কার্তিক সংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় সমালোচিত)[১]

১. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সমালোচনায় বলেন, তিনি নাটকটি আদ্যন্ত পাঠ করেছেন; যদিও

২. শ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০)।
৩. অজ্ঞাতনামা রচিত সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্ (১৮৬৭)।[২]
৪. রামচন্দ্র দত্ত রচিত বাল্যবিবাহ (১৮৭৪)।

আলোচ্য নাটক-প্রহসনের সংখ্যা থেকে একটি বিষয় অনুমান করা যায়—সমস্যাটি যতো গুরুতর ও ব্যাপক ছিলো, বাল্যবিবাহ অথবা অসমবয়স্ক বিবাহ সম্পর্কে নাট্যকারদের সচেতনতা এবং প্রতিক্রিয়া তেমন প্রবল ছিলো না। আসলে সেকালের সমাজে স্ত্রীশিক্ষার অভাব এবং বাল্যবিবাহ ও অসমবয়স্ক বিবাহই ছিলো সর্বব্যাপী। সুতরাং কতিপয় সংস্কারক এ বিষয় নিয়ে আন্দোলন করলেও, সাধারণ মানুষের কাছে বাল্যবিবাহ এবং অসমবয়স্ক বিবাহ তখনো একটা সমস্যা বলে মনে হয়নি। এটাই বিবেচিত হয়েছে স্বাভাবিক বলে। এ জন্যেই সমাজ সংস্কারের সেই স্বর্ণযুগে—১৮৫০, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে বর্তমান বিষয়ে না বেশি নাটক রচিত হয়, না এ সব রচনা জনমনে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক নাট্যরচনা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

এসব নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বলা যায়, সেকালের সমাজ-সংস্কারবিষয়ক অনেক নাটক সোৎসাহে অভিনীত হলেও, বাল্যবিবাহবিষয়ক পূর্বোক্ত চারখানি নাটকের একখানিও অভিনীত হয়নি। তবে কুলীনকুলসর্বস্ব, বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটক, নয়শো রূপেয়া প্রভৃতি নাটকের অভিনয় উপলক্ষে বাল্যবিবাহ, অসমবয়স্কবিবাহ প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে দর্শকগণ অবশ্যই সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, বাল্যবিবাহ ও অসমবয়স্কবিবাহ সেযুগের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রধান বিষয় বলে গণ্য হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে যুবকপাত্রের সঙ্গে বালিকা ও শিশুকন্যার বিবাহই ছিলো স্বাভাবিক। এ জন্যে বাংলা নাট্যরচনায় একে মোটেই সমস্যা বলে চিত্রিত করা হয়নি। বরং যে নাটক-প্রহসনগুলিতে বিবাহের বয়স সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার স্বাক্ষর লক্ষ্য করি, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে সমস্যাটির অন্য তিনটি দিক আমাদের চোখে পড়ে।—পাত্রপাত্রী উভয়ই শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্ক; কোথাও পাত্রটি

সমসাময়িক খুব কম গ্রন্থই তিনি এভাবে পাঠ করেন। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের সৎ সংকল্পের তিনি প্রশংসা করেন; কিন্তু নাটক হিশেবে বাল্যবিবাহ নাটকের ব্যর্থতার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এ বিষয় নিয়ে নাটক না লিখে উপন্যাস লিখলে হয়তো তা সাহিত্য হিশেবে উত্তম হতে পারতো। —'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা', বিবিধার্থ সংগ্রহ, কার্তিক ১৭৮১ (অকটোবর-নভেম্বর ১৮৫৯), পৃ. ১৬৬-৬৭।

২. সুকুমার সেনের মতে নাটকটি রামনারায়ণ তর্করত্ন অথবা তাঁর ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কর্তৃক রচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭।

প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, পাত্রীটি শিশু অথবা বালিকা, এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কোথাও পাত্র বালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পাত্রী যুবতী অথবা প্রৌঢ়া।

শ্যামাচরণ শ্রীমানি পাত্রপাত্রী উভয়কেই নিতান্ত অপ্রাপ্তবয়স্করূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর নায়কের পিতামাতারও বিবাহ হয়েছিলো শিশু বয়সে। এ নাটকের লজ্জাহীন স্ত্রৈণ এবং বিদ্যাহীন দাম্ভিকও শিশু বয়সে বিবাহ করেছিলো।

রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটকে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হয় কৈশোরে। সম্বন্ধ সমাধি নাটকে সদ্যজাত একটি কন্যার বিবাহ স্থির হয় অন্য একটি শিশুপুত্রের সঙ্গে। তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটকে দু জোড়া পাত্রপাত্রীর (ভূধর-সৌদামিনী এবং ব্রজবিলাস-মোহিনী) বিবাহ হয় নিতান্ত বাল্যবয়সে। বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকেও মোহিনীর সঙ্গে প্রসন্নের এবং প্রমদার সঙ্গে বসন্তের বিবাহ হয় বাল্যকালে।

বালিকা পাত্রীর সঙ্গে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের বিবাহের চিত্র অঙ্কনের সময়ে নাট্যকারগণ সমধিক উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচুর রঙ্গ-ব্যঙ্গ মিশিয়ে তাঁদের ছবি আঁকেন। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে আট বছরের বালিকার সঙ্গে ষাট বছরের পাত্রের বিবাহ হয়। বিধবোদ্বাহ নাটকে মনোরমার বিপত্নীক পিতা বিবাহ করে আনে একটি বালিকাকে। পুনর্বিবাহ নাটকে বালিকা সৌদামিনীর বিবাহ হয় তার ভাষায় 'বাবা কি জ্যাটা মশাই-এর বয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে।'[৩] কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলী বাঁধে নাটকে রায় মহাশয়ের এগারো বছরের মেয়ের বিয়ে হয় এক অতি বৃদ্ধের সঙ্গে। কন্যাবিক্রয় নাটকের বরও অতিবৃদ্ধ—তার ভ্রূ পর্যন্ত পাকা। অথচ পাত্রী মালতী কিশোরী মাত্র। বরের কাশীযাত্রা নাটকের পাত্রপাত্রীর বয়সও অনুরূপ—পাত্র নিত্যানন্দ রায় আশি বছরের বৃদ্ধ, পাত্রী ভবতারিণী চতুর্দশী মাত্র। হিন্দু মহিলা নাটকে সাত বছরের মনোরমার বিয়ে হয় ষাট বছরের ষষ্ঠিদাসের সঙ্গে। আসুরোদ্বাহ নাটকে তিন সাড়ে তিন বছরের জ্ঞানদাকে বিবাহ দেওয়া হয় প্রৌঢ় অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে।

যুবতী বা প্রৌঢ়ার সঙ্গে বালক বরের বিবাহের কথাও এসব নাটকে কৌতুকের সঙ্গে বলা হয়েছে। কুলীনকুলসর্বস্বে সুলোচনার বর—তার ভাষায়—তার নাতির বয়সী,—'সে যে অতি শিশু ছেলে,/কেঁদে উঠে ভয় পেলে/শান্ত করি রাখি তবে রয়।'[৪] কলিকৌতুক নাটকে ষোড়শী যুবতী মধুর সঙ্গে বিয়ে হয় আট বছরের বালক চণ্ডীর সঙ্গে।

৩. পুনর্বিবাহ নাটক, পৃ. ৮।
৪. কুলীনকুলসর্বস্ব, পৃ. ৪১।

এই তিন ধরনের বাল্যবিবাহের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো কী কী কারণে, নাট্যকারগণ তার বিশ্লেষণ বড়ো একটা করেননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, মায়ের ইচ্ছেতেই বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাল্যোদ্বাহ নাটকে মায়াবতী ছেলের গোপালের বিবাহের ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। অথচ গোপালের বয়স মাত্র ৯, তার নিজের ২০ এবং তার স্বামীর ২৪। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়াবতী এই বয়সেই পুত্রকে বিবাহ করানোর জন্যে স্বামীর সঙ্গে জেদ করে। তার স্বামী যে এ বিয়েতে তার সমান উৎসাহী নয় এ জন্যে তার ক্ষোভ কম নয়।— 'আহা বাছা আমার ন' বচরের হোলো গো, তবু তিনি কি একবারও সে সব কথা মুখে আনেন, আপনার কাজেই ব্যস্ত থাকেন ...।'[৫] মালিনীর কাছে সে দুঃখ করে বলে,

> গোপাল আমার গেল বশেকে নয়ে পা দেছে তা কত্তাকে এর কত দিন আগে থেকে বোলচি, ও গো আমার বড় সাদ আমি বোর মুখ দেকবো, কবে মরে যাব তা হোলে মনের সাদ মনেই থাকবে।[৬]

তবে স্বামীর ঔদাসীন্য জয় করার কৌশল তার জানা আছে। সে পণ করে, 'আমি খাব না, উঠবো না কিছু কর্ব্যো না—এতেও কি হয়--না হোলে গলায় দড়ি দেবো—।'[৭] সত্যি সত্যি সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে। ফলে 'গোপালের বাপ কত সেদে পেড়ে কিচুতে কিচু না পেরে, শেষে নাকাল হোয়ে--ঘটক ডেকে তাকে কনে দেকতে' পাঠায়।[৮]

আলালের ঘরের দুলাল নাটকে লক্ষ্য করি স্কুলের বখাটে ছাত্র মতিলালকে বিবাহ করানোর জন্যে তার মাই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার কথায় এমন ইঙ্গিত আছে যে, মতিলাল নারীদের সম্পর্কে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েছে।[৯] কিন্তু মূল কারণ যাই হোক না কেন, মতিলাল-এর পিতা তার বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যবশত।

রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটকে মহেন্দ্রের বিয়ে হয় কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে। তার পিতার উক্তি থেকে জানা যায় যে, মহেন্দ্রের মায়ের উৎসাহেই সে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।[১০]

৫. শ্যামাচরণ শ্রীমানি, **বাল্যোদ্বাহ নাটক** (কলিকাতা ১৮৬৩), পৃ. ৪।
৬. ঐ, পৃ. ৫।
৭. ঐ, পৃ. ৪।
৮. ঐ, পৃ. ২০।
৯. হীরালাল মিত্র, **আলালের ঘরের দুলাল নাটক** (কলিকাতা, ১৭৯১ শকাব্দ, ১৮৬৯-৭০), পৃ. ৬৬। বর্তমান নাটকটি প্যারীচাঁদ মিত্রের **আলালের ঘরের দুলালের** নাট্যরূপ ; কিন্তু নাট্যকার পানাসক্তিসহ কয়েকটি প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ মৌলিকত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।
১০. রামচন্দ্র দত্ত, **বাল্যবিবাহ নাটক**, পৃ. ৯।

অবশ্য কেবল পুত্রের মায়েরাই নয়, পিতাদের উৎসাহও কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। রামচন্দ্র বাল্যবিবাহ নাটকে পিতাদের এই প্রবণতার কথা 'নাগরিক-গণ' উল্লেখ করেন। এই অভিভাবকগণ যে সাধারণত ধনী, তাও এরা উল্লেখ করে।

২য় নাগরিক।...যত উঁচু দলেই এদের প্রাদুর্ভাব। ওরাই প্রতিপালন কচ্চেন। ছেলেটী ১২/১৪ বৎসরের না হতেই বিবাহ না দিলে নয়।

১ম নাগরিক। তা দেবে না, আমোদপ্রিয় বাবুরা ত তাই চায়। ছেলেদের বিবাহে নাচ, তামাসা, কনসার্ট, খানা, ভোজ, ইংরেজি বাজনা, বাঁধা বা চলতি রোসনাই ইত্যাদি করে বাহবা নেবার ইচ্ছা—অমুকের চেয়ে অমুক ছেলের বিবাহে বিলক্ষণ খরচ করেচে, এই নামটী বার করাই অভিপ্রেত কিনা। যদি বাল্যবিবাহ উঠে যায় তা হলে ওঁদের আমোদ হয় কৈ? বুড়ো মিন্সে বর ত আর সুখাসনে যেতে পারে না।[১১]

বালকপুত্রের বিয়েতে আমোদ-আহ্লাদ, আড়ম্বর-উৎসব করা এবং সেই উপলক্ষে নাম কেনার প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দীর ধনী পিতাদের অনেকের মধ্যেই ছিলো,[১২] সুতরাং 'প্রথম নাগরিকের' মুখ দিয়ে রামচন্দ্র যে উক্তি করিয়েছেন, তা অসঙ্গত কিংবা অবাস্তব নয়।

অনেক সময়ে বালকরা নিজেরাও, বাল্যবিবাহকে লোভের চোখে দেখতো। যৌনজীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলেও, এ রকমের বালক-বর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে একটা কৌতূহল পোষণ করতো এবং নারীদের সান্নিধ্যও মোটামুটি উপভোগ করতো। বাল্যোদ্বাহ নাটকের বিদ্যাহীনের মুখে বালক পাত্রের এই মনোভাব জানতে পারি। তার মতে,

ছেলেবেলা বিয়ে হোলে হয় বড় মজা।/শ্বাশড়ী তুলিয়া দেয় খায় খাজা গজা।।

কিন্তু তার চেয়েও প্রলোভনের বস্তু হলো—

আদর করিয়া বড় শালী লয় কোলে।...
কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।/যাহাতে করিবে পরে রমণীরে বশ।।
ঠারে ঠোরে কণেটীর মুখ পানে চায় /আধো আধো হাসি দেখে নয়ন যুড়ায়।।...
ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুলনারী।/রতি শাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি।।
কোমল কামিনী কর গাত্রেতে বুলায়।/কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায়।।[১৩]

১১. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ নাটক, পৃ. ৯২।

১২. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (কলিকাতা, ১৩০৭,) পৃ. ২১৮-১৯।

১৩. বাল্যোদ্বাহ নাটক, পৃ. ৩২-৩৩।

বাল্যবিবাহে পুরোহিতগণও উৎসাহ দিতেন বলে জানা যায়। তাঁদের উৎসাহের কারণ নগদ বিদায়ের লোভ। এমনি একটি পুরোহিতের চরিত্র পাই বাল্যোদ্বাহ নাটকে। এই পুরোহিত শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বাল্যবিবাহের সমর্থন করে। ব্রাহ্মণের নাম অর্জনস্পৃহ ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের মতো তার নামটি প্রতীকী এবং বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তার উৎসাহের কারণ তার নাম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বালিকা পাত্রীর সঙ্গে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পাত্রের বিবাহের কারণ বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুটি বিষয় চোখে পড়ে। এক. বিপত্নীক পাত্রের বালিকা কন্যা বিবাহ, এবং দুই. শ্রোত্রিয় এবং বংশজ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পাত্রের বালিকা কন্যা বিবাহ। সেকালে যেহেতু কয়েকটি কুলীনকন্যা ছাড়া আর সকল মেয়েরই বিয়ে হতো বালিকা বয়সে, সে জন্যে ইচ্ছে না থাকলেও বিপত্নীকরা বালিকা কন্যা বিয়ে করতে বাধ্য হতো।

বরের কাশীযাত্রা নাটকে আশি বছর বয়সী নিত্যানন্দ রায় তৃতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর চতুর্থ বার বিয়ে করার জন্যে ঘটক নিয়োগ করে। ঘটকের সঙ্গে তার আলাপ থেকে বোঝা যায়, একটি যুবতী কন্যা পেলেই সে সবচেয়ে খুশি হয়। প্রস্তাবিত পাত্রী ভয়বারিণীর বয়স চোদ্দ-পনেরো শুনে সে রীতিমতো পুলকিত হয়।[১৪] ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, পাত্রীটির বয়স অত বেশি নয়; কিন্তু তবু সে সেই পাত্রীকেই বিয়ে করতে রাজি হয়। কন্যাবিক্রয় নাটকের বৃদ্ধ বর কিশোরী মালতীকে বিয়ে করতে আসে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে। যুবতী পাত্রীর অভাবে সে একটি কিশোরী বালিকাকেই বিবাহ করতে বাধ্য হয়। বিয়ে পাগলা বুড়ো নাটকে ষাট বছরেরও চেয়ে বেশি বয়সে রাজীব মুখুয্যে বিপত্নীক হয়ে এমন একটি বালিকার সন্ধান করে। কিন্তু ঘটকের মুখে সে যখন শুনলো পাত্রীটি ঋতুমতী, তখন আশাতিরিক্ত বস্তু লাভের আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহ করতে গিয়ে নবনাটকের গবেশ বাবু, নয়শো রুপেয়ার কানাই ঘোষাল, বিধবোদ্বাহ নাটকের বিশ্বভণ্ড ভট্টাচার্য—সকলেই যুবতী কন্যার পরিবর্তে বালিকা কন্যা বিবাহ করতে বাধ্য হয়।

নাট্যকারগণ অবশ্য বাল্যবিবাহের কারণ বিশ্লেষণ যতোটা করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি স্ফূর্তির সঙ্গে চিত্রিত করেন বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা। শ্যামাচরণ শ্রীমানি দেখান যে, বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অকাল বার্ধক্য ও অস্বাস্থ্য দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই নাটকের নায়ক গোপালের যখন জন্ম হয়, তখন তার পিতা বলহীনের বয়স ১৫, মাতা মায়াবতীর ১১। ফলে বলহীন ২৪ এবং মায়াবতী ২০ বছর বয়সের বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। এদের অপরিণত বয়সের সন্তান গোপালও

১৪. বরের কাশীযাত্রা, পৃ. ৫।

বেঁচে আছে অস্বাস্থ্য এবং দুর্বলতা নিয়ে। ঘটকের ভাষায় সে 'মৃত বোল্যেই হয়'।[১৫] তার এ বয়সে এবং স্বাস্থ্যের এ অবস্থায় তার বিয়ে হয় এবং দুমাসের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখে বরহীনও আকস্মিকভাবে মারা যায়। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যায়, নাট্যকার রামমণির মুখ দিয়ে এ সত্যও উচ্চারণ করেন।[১৬]

অগত্যাস্বীকার প্রকরণ নাটকে কৃষ্ণদাসও এই সত্যের প্রতিধ্বনি করে বলে, 'শৈশবাবস্থায় বিবাহ দেওয়া—পাণি পীড়ন ত পাণি পীড়নই বটে—দেহের খর্বতা, শরীরের চিররোগীতা—বলের অভাব—পরমায়ুর অপ্রশস্ততা—মনের সাহস-বিহীনতা, সকল কর্মে অতৎপরতা' ঘটে।[১৭]

বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকে দেখানো হয়েছে বসন্তের বালিকা স্ত্রী প্রমদা চোদ্দ বছরে পা দিতে না দিতেই গর্ভবতী হয়। বসন্ত নিজেও কলেজের তরুণ ছাত্র। এই কম বয়সী দম্পতির যে পুত্র সন্তান জন্মে সেটি প্রসবের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই মারা যায়। বাল্যোদ্বাহ নাটকে শ্যামাচরণ শ্রীমানি বৈদ্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, অপরিণত দম্পতির সন্তান ভালো হয় না।—'জীর্ণ বীজেতে কোন ক্রমেই উত্তম শস্য উৎপাদন করে না।'[১৮] রামচন্দ্র দত্ত তাঁর বাল্যবিবাহ নাটকে জনৈক নাগরিকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, অকালমৃত্যুসহ বহু অনিষ্ট বাল্যবিবাহ থেকে ঘটতে পারে।[১৯]

বিপিনমোহন প্রমদার মৃতপুত্র প্রসব করার ঘটনা প্রসঙ্গে আরো দেখাতে চেয়েছেন যে, বালিকা-স্ত্রীর পক্ষে প্রসব করার কষ্ট স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। তিন দিন অসহ্য যন্ত্রণার পরে সে প্রসব করে এবং প্রসবের পরে মুমূর্ষ হয়ে পড়ে।

শ্যামাচরণ শ্রীমানি নাটকে বাল্যবিবাহহেতু দুটি অকালমৃত্যুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এর ফলে দুটি মহিলাও অকাল বৈধব্য বরণ করে। বাল্যবিবাহের অন্যতম কুফল যে বালবৈধব্য শ্যামাচরণ শ্রীমানি এই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত দান করেন।

বাল্যবিবাহের ফলে সাংসারিক ও মানসিক যেসব কুফল ফলতো, তারও পরিচয় আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটকে দেখতে পাই মহেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিয়েতে সরলার পিতা বর পক্ষের সন্তুষ্টির জন্যে—

১৫. **বাল্যোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ২৭।
১৬. ঐ, পৃ. ৯।
১৭. **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ**, পৃ. ৫৮।
১৮. **বাল্যোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৬০।
১৯. রামচন্দ্র দত্ত, **বাল্যবিবাহ নাটক**, পৃ. ৯২।

মহেন্দ্রের পিতার ভাষায়—চন্দ্রসূর্য ছাড়া সবই দিয়েছিলো।[২০] তা ছাড়া সরলা সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। মহেন্দ্র সরলার সঙ্গে একত্রে থাকে না, মধ্যে মধ্যে রাতে আদৌ বাড়িতে ফেরে না। সে মদও পান করে। সর্বোপরি সে সরলাকে অশ্লীল ভাষায় গালগাল করে এবং জুতো দিয়ে অমানুষিকভাবে প্রহার করে।

সপত্নী নাটকে দু জোড়া দম্পতি—ভূধর এবং সৌদামিনী, ব্রজবিলাস এবং মোহিনী—বাল্যবিবাহহেতু অসুখী। ব্রজবিলাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনেশ্বরের মুখে ব্রজবিলাস এবং মোহিনীর অপ্রণয়ের কারণ জানতে পাই—'পিতা, আমার জ্যেষ্ঠের অতি বাল্যকালে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে উপযুক্ত বয়ঃক্রম সময়ে সে বধূটি দাদার নিতান্ত অমনোনীত হইল। সুতরাং তিনি আর একটি মনোনীতা কন্যা বিবাহ করিলেন। এবং সেইটীতেই নিতান্ত রত হইলেন।'[২১]

অপর পক্ষে ভূধরও বাল্যকালে বিবাহ-করা তার স্ত্রীকে ধীরে ধীরে অবহেলা করতে আরম্ভ করে এবং আর একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলে। বহুবিবাহে তার পিতা সম্মত নয় বলে সে ঘুষ দিয়ে এক গণককে মিথ্যা কথা বলতে রাজি করায়। ঠিক হয় যে গণক বলবে, প্রথম স্ত্রী সৌদামিনীর কোন সন্তান হবে না। এর পর যথারীতি ভূধরের দ্বিতীয় বিবাহ আয়োজিত হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার পরে সৌদামিনীর প্রতি স্বামীর অবহেলা ও অনাদর বৃদ্ধি পায়।

অগত্যাস্বীকার প্রকরণ নাটকে কৃষ্ণদাসও বাল্যবিবাহজনিত অপ্রণয়ের কথা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করে বলে যে, এর ফলে 'অনেক স্থানে পরস্পরে কিছুমাত্র প্রণয় হয় না—কেহ বা কর্তব্যতা সাধন করতে হবে বলেই স্বামী সেবায় নিযুক্ত হয়, কেহ বা মনের গতি নিবারণ করতে না পেরে, স্বামীর প্রতি অপ্রীতি প্রকাশ করে, এবং যাবজ্জীবন আপনাকে দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করে।'[২২]

বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় স্বামীর অপ্রণয়ের চিত্র নাট্যকারগণ অঙ্কন করেন অনেক বেশি উৎসাহের সঙ্গে। বিশেষত স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্যে বৃদ্ধ স্বামীর আপ্রাণ প্রয়াস প্রচুর রঙ্গব্যঙ্গের সঙ্গে এঁরা বিবৃত করেন। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত মোহন্তের এই কাজ নাটকে বামুনপিসীর উক্তি থেকে এ ধরনের প্রয়াসের কথা জানতে পারি। এরূপ স্বামীরা কেঁচে যুবা হন, যে চিরকাল সাদা থান ফাড়া পরে কাটিয়েছে, কিন্তু এখন কালাপেড়ে ধুতি না হলে আর পরা হয় না, পাকা চুলে কলপ

২০. রামচন্দ্র দত্ত, **বাল্যবিবাহ নাটক**, পৃ. ১৩।
২১. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৭৫।
২২. **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ**, পৃ. ৫৭-৫৮।

দ্যান, দাঁত বাঁধিয়ে আসেন, বুড়দের সঙ্গে না মিশে ছেলেছোকরাদের সঙ্গেই বসা দাঁড়ান।'[২৩]

নবনাটকের গবেশ বাবু নিজেই স্বীকার করে যে, 'তরুণী স্ত্রীর প্রণয়পিপাসায় এই প্রবীণ বয়সেও আমি নবীনজন সেব্য পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকি, যার জন্য বিসদৃশ সামান্য আলাপ, সামান্য কথা লয়ে বালকের মত এখন রহস্য করতে হচ্চে, এমন কি, এ অবস্থায় নিধুর টপ্পার বই পর্যন্ত কিনিছি, আর আপনার পূজা আহ্নিকের সময়কেও সঙ্কোচ করো সেই অসার ঘৃণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করেছি, যার জন্য এত দূর পর্যন্ত হলো সেই বা আমার প্রতি প্রসন্ন কৈ'?[২৪] বৃদ্ধ বয়সে যুবক সাজার প্রচেষ্টা ছাড়াও, গবেশ বাবু তার তরুণী স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রথম স্ত্রীকে ঘর থেকে এবং দু পুত্রকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এ ছাড়া নিজের জমিদারি পর্যন্ত সে বেনামী দ্বিতীয় স্ত্রীকে হস্তান্তর করে কিন্তু তা সত্ত্বেও, তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। নয়শো রূপেয়ার কানাই ঘোষালও দ্বিতীয় স্ত্রীর হৃদয় জয় করার জন্যে নবীন হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে স্ত্রীর মন তার প্রতি অনুকূল হওয়া তো দূরের কথা সাধারণ সহানুভূতিতেও সিক্ত হয় না। স্ত্রীর উক্তি থেকে তার প্রতি অবজ্ঞার স্বরূপ ও পরিমাণ বোঝা যায়।

> কেন রে বুড় ড্যাকরা, তোকে আমার বে কোরতে বোলেছিল কে? তুই কেন না বুড় হোয়েছিস, আমাদের অল্প বয়স, আমরা একটু হাসব না, আমোদ করবো না? তোর পান ছেঁচলে স্বর্গে যাব নাকি? ওর একটাতে পোষালো না।...
> পুরুষের ক্রমেই নবীন বয়স হচ্ছে, এদিকে যে সত্তর গড়াল, তা জেনেও জান না? আবার পাড়ওয়ালা ধুতি পরা হয়। কত সাধই যায়। পুরুষ আবার বলেন এস, একটু আমোদ করি। মর।
> তোকে নিয়ে আমি কি আমোদ কোরব রে? তুই যে আমার বাবার দশ বছরের বড়?

এবং এ জন্যেই সে চাকরের সঙ্গে 'হেসে কথা' বলে।[২৫]

হরিমোহন কর্মকার রচিত মাগসর্বস্ব নাটকের নায়ক রমাকান্ত দত্তও বৃদ্ধ বয়সে একটি তরুণীকে বিবাহ করে বিপদে পড়ে। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে সে ভাইপো, ভাদ্রবধূ, বিধবাভগ্নী এমন কি মাকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও স্ত্রীকে সে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অফিসের তহবিল তসরুফ করে অলঙ্কার তৈরি করে দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের চেষ্টাও তার বিফল হয়।[২৬]

২৩. **জয়ন্ত গোস্বামী**, পৃ. ৩৫১।
২৪. **নবনাটক**, পৃ. ১২৪।
২৫. **নয়শো রূপেয়া** পৃ. ৫০।
২৬. **জয়ন্ত** গোস্বামী, পৃ. ৩৭৪-৭৫।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্যালারে মোর বাপ এবং রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের এই একরকম প্রহসনদ্বয়েও এরূপ দুটি বৃদ্ধের সাক্ষাৎ মেলে। তারাও আত্মীয়-স্বজন এবং যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে তরুণী স্ত্রীর মন জয় করতে চায়। কিন্তু তারাও অসাধ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।[২৭] আসলে কিশোরী বা যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ কখনোই সুখের হতে পারে না, বর্তমান নাট্যকারগণ বোধ হয় সেই সত্যটারই উচ্চারণ করতে চেয়েছেন। নফরচন্দ্র পালও এই সত্যের প্রতিধ্বনি করেন। তবে তিনি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। তাঁর নায়িকা মালতী ছোটো বোনের কাছে যে চিঠি লেখে তা থেকেই জানা যায়, বিবাহিত জীবনের কোনো সাধ তার পূর্ণ হয়নি ; কেবল 'অবিরল নেত্রসলিলে আর্দ্র' হওয়াই তার পক্ষে সার হয়েছে।[২৮]

অজ্ঞাতনামার বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা প্রহসনে অসমবয়স্ক বিবাহের আরো একটি মারাত্মক ফলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই প্রহসনের নায়ক বৃদ্ধ জমিদার রাজীব তৃতীয় স্ত্রী হিশেবে তরুণী হেমাঙ্গিনীকে গ্রহণ করে। এই তরুণীর প্রণয়ক্ষুধা বৃদ্ধকে দিয়ে তৃপ্ত হয় না বলে সে একাধিক যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।[২৯] রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটকেও সরলাকে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখি। স্বামীর প্রতি তার অপ্রণয়ের কারণ হিশেবে বাল্যবিবাহকেই ভূষণ দায়ী করে।[৩০]

দাম্পত্যজীবনে চরম অপ্রণয়হেতু সপত্নী নাটকে মোহিনী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শ্বশুর দেবর, শাশুড়ি ইত্যাদির চোখে পড়ায় তার জীবন রক্ষা পায়। সৌদামিনীও পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে কিন্তু সেও শেষ মুহূর্তে শ্বশুর ও দেবরের সহানুভূতিতে রক্ষা পায়। রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটকের সরলাও আত্মহত্যার চেষ্টা করে দ্বিতীয় বার কৃতকার্য হয়।

পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীর উপর অভিমান করে অথবা ক্রুদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করা অস্বাভাবিক—নাট্যকারগণ তাই এ পরিণতি কোথাও দেখাননি। কিন্তু তরুণী স্ত্রীর প্রণয় লাভে ব্যর্থ হয়ে চণ্ডীপ্রসাদ (কন্যাপণ কি ভয়ানক) বা রাজীবের (বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা) মতো অনেকেই জীবনকে অর্থহীন মনে করে। বাল্যকালেবিবাহ করা স্ত্রীকে যৌবনে আর ভালো না লাগায় ব্রজবিলাস ও ভূধরের (সপত্নী নাটক)

২৭. ঐ, পৃ. ১০২৫-৩১।
২৮. কন্যাবিক্রয় নাটক, পৃ. ১৯।
২৯. জয়ন্ত গোস্বামী, পৃ. ৩৫৬-৬০।
৩০. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ নাটক পৃ. ২৩।

মতো অনেকেই দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। মহেন্দ্রও (বাল্যবিবাহ নাটক) দ্বিতীয় বার বিবাহ করার সংকল্প করে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর না হওয়ায় সে পানাসক্তি ও লাম্পট্যে গা ভাসিয়ে দেয়।

বাল্যবিবাহের অন্য দুটি কুফল নাট্যকারগণ দেখিয়েছেন—এর ফলে বিদ্যা-শিক্ষায় বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যেমন বাল্যবিবাহ নাটকে মহেন্দ্রের বেলায়, আলালের ঘরের দুলালে মতিলালের বেলায় এবং বাল্যোদ্বাহ নাটকে গোপালের বেলায়। বাল্যবিবাহের দ্বিতীয় কুফল দারিদ্র্য ও অনটন। যেমন বাল্যোদ্বাহ নাটকে বিদ্যাহীন অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করে এবং লজ্জাহীন চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে কারারুদ্ধ হয়।

বাল্যবিবাহ এবং অসমবয়স্ক বিবাহের কুফল চিত্রিত করে নাট্যকারগণ এক-দিকে যেমন এ ধরনের বিবাহের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের সচে-তনতা জাগিয়ে তোলেন অন্যদিকে আবার তাঁদের রচনা থেকেই প্রকাশ পায় যে, সাধারণদের মধ্যে এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ সচেতনতা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিলো।

রামচন্দ্ররচিত বাল্যবিবাহ নাটকে জয়গোপাল বালকপুত্র মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়ে নিজেই বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়। অনুতপ্ত হয়ে সে বলে, 'মনে ছোঁড়া একেবারে গোল্লায় গেল। তোমাদের পাঁচজনের চক্রে পড়ে বিবাহ দিয়ে পরকালটা খেয়ে দিলাম।....এর পরে খাবে কি করে? লেখা শিখলে না, পড়া শিখলে না, কেমন করে চাকরী বাকরী কর্বে।' কেবল লেখাপড়া না শেখায়ই জয়গোপাল দুঃখিত হয় না, পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূর প্রণয়ের সম্পর্ক রচিত না হওয়ায়ও সে দুঃখিত হয়। এবং বাল্যবিবাহকেই সে এজন্যে দায়ী করে।[৩১]

বাল্যোদ্বাহ নাটকে গোপালের অকালমৃত্যুদৃষ্টে তার শ্বশুর বুদ্ধিহীনও অনুতপ্ত হয়। আপন কন্যার বৈধব্য তাকে বিচলিত করে এবং এজন্যে বাল্যবিবাহকেই সে দায়ী করে। শোকাভিভূত বুদ্ধিহীন বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে রীতিমতো একটি বক্তৃতা দেয়। সে বলে,

> মহাশয়! বাল্যবিবাহ যেন আর এই পৃথিবীতে কেহই না করে, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন;—এক্ষণে আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে এই বিষময়ী প্রথা নৃঘাতকীরূপে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে একে-বারে ছারেখার করিতেছে;—কত কত প্রাণীর কত প্রকারে কতবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, কত ২ অবলা কুলবালারা দারুণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য

৩১. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ নাটক, পৃ. ৯, ৬৭-৬৮।

করিতেছে, কত কত কামিনীরা কুলে জলাঞ্জলি দিতেছে, কত কত যুবা পুরুষ সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে। কত কত ভদ্র-সন্তানেরাও অতি ঘৃণাস্কর ও লজ্জাকর চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে এবং কত কত মহাপুরুষেরা জরা ও রোগগ্রস্ত হইয়া হীনবল পীতের ন্যায় সন্তানসকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছে, —এইসকল পাপ প্রবাহের বাল্যবিবাহই প্রধান প্রশ্রবণ, ইহাকে না সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করিলে দেশের মঙ্গল নাই, প্রতিবাসির মঙ্গল নাই, আপনার পরিবারের মঙ্গল নাই এবং আপনারও মঙ্গল নাই। অতএব হে বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ তোমরা আর কত কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে ?! একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পরম শত্রুকে আক্রমণ করত ইহার শিরশ্ছেদ কর তা হলেই তোমাদের মাতৃভূমির অনেক উপকার হইবে ও কালে তোমারা বীর্যবান হইয়া পরাধীন শৃংখল ভগ্ন করত মহাসুখে সঞ্চরণ করিবে এবং পরমেশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়া কত অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবে।[৩২]

হিন্দু মহিলা নাটকে প্রসন্নও এই সচেতনতার পরিচয় দেয়। তার মতে নয়-দশ বছর বয়সে বিবাহ হলে দেশের অনেক অনিষ্ট হয়।[৩৩]

আলোচ্য নাট্যরচনায় দেখা যায়, বৈদিকদের মধ্যেও বাল্যবিবাহের রীতি ক্রমশ নিরুৎসাহিত হচ্ছিলো। বিধুভূষণ এই নবজাগ্রত সচেতনতা সম্পর্কে বলে,

আমাদেদ কুল সম্বন্দ, কি অতি বাল্যবয়সে বিবাহ দেওয়া, দক্ষিণ দেশে উঠে গেছে। কলকেতার দক্ষিণ রাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় এ রীতি লোপ হয়েছে; এত শত কি ? সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাভূষণ মহাশয়[৩৪] প্রভৃতি, তাদের পুত্রাদির বিবাহ আর এ নিয়মে দিতেছেন না, তা মহাশয় কালে কালে সকলই যাবে।[৩৫]

অজ্ঞাতনামার সম্বন্ধ সমাধি নাটকে দেখানো হয়েছে, বৈদিক ব্রাহ্মণ আশুতোষ চক্রবর্তীর কন্যা জন্মের পরেই তার মামা তাকে না জানিয়েই কন্যার একটি সম্বন্ধ স্থির করে। মেয়েটি একটু বড় হলে আশুতোষ এই সম্বন্ধ অস্বীকার করে অন্যত্র তার বিবাহ দেয়। ফলে যাদের সঙ্গে পূর্বে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিলো তাঁরা আশুতোষের নামে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে মামলা দায়ের করে। কিন্তু মামলায় আশুতোষ জয়ী হয়।[৩৬]

৩২. **বাল্যোদ্বাহ নাটক**, পৃ. ৭১-৭২।
৩৩. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৫৯।
৩৪. **সোম প্রকাশ পত্রিকার** সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
৩৫. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৫৯।
৩৬. সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

আশুতোষের অন্যত্র কন্যাদান এবং মামলায় জয়লাভের মাধ্যমে নাট্যকার একই সঙ্গে বৈদিকদের মধ্যে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেন এবং তাদের মধ্যেও যে বাল্যবিবাহবিরোধী একটি সচেতনতার বিকাশ হচ্ছিলো তার প্রমাণ দেন।

বাল্যবিবাহবিরোধী ক্রমবর্ধমান সচেতনতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আলোচ্য নাট্য-রচনাসমূহে অনায়াসে লক্ষগোচর হয়। ১৮৫০-এর দশকে এমন কি ১৮৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত নাটকসমূহের স্ত্রী চরিত্রগুলি প্রায় সবগুলিই সধবা অথবা বিধবা। অনূঢ়া নায়িকা হিশেবে আমরা প্রায় কোনো চরিত্রই পাইনে।[৩৭] অপরপক্ষে, ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে কিংবা ১৮৭০-এর দশকে প্রকাশিত কোনো কোনো নাট্যরচনায় কিশোরী বা যুবতী অনূঢ়া নায়িকার সাক্ষাৎ লাভ করি। দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী (লীলাবতী, ১৮৬৭), লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর কমলিনী (কুলীনকন্যা বা কমলিনী, ১৮৭৪), দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (স্বর্ণলতা, ১৮৭৩), উপেন্দ্রনাথ দাসের সরোজিনী (শরৎ-সরোজিনী, ১৮৭৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হেমাঙ্গিনী (এমন কর্ম আর কর্ব না, ১৮৭৭) ইত্যাদি এই নতুন ধরনের নায়িকা। আসলে বাস্তব জীবনে বিবাহের বয়স যে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো নাটকে তারই প্রতিফলন আরম্ভ হয়েছিলো।

বাংলানাটকে পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক পছন্দ সম্পর্কে প্রকাশিত সচেতনতা

বিবাহের বয়স সম্পর্কে এই সচেতনতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যা স্বভাবতই দেখা দেয়। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, বিবাহে কোনো কোনো যুবতী কন্যা আপন আপন মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, এমন কি প্রস্তাবিত বরকে পছন্দ না হওয়ায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান—এমন দৃষ্টান্তও দেখেছি। প্রকৃত পক্ষে, যে ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী উভয়ই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং অবুঝ সেখানে তাদের পছন্দ-অপছন্দ অবান্তর, কিন্তু বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পেলে পছন্দ-অপছন্দ স্বভাবতই একটি জরুরি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

তা ছাড়া বাল্যবয়সে মুখ বুঁজে বিবাহ করলেও পরিণত বয়সে পাত্রের পাত্রীকে এবং পাত্রীর পাত্রকে পছন্দ না-ও হতে পারে।—এ সম্ভাবনার কথাও নাট্যকারগণ

৩৭. এ সম্পর্কে ১৮৬১ খৃস্টাব্দে অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'এতদ্দেশীয় আধুনিক কবিকুলের কোন অভিনব উপাখ্যান কল্পনা কার্যে কৃতকার্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যেহেতু এখানে (বিশেষত বালিকাদিগের) শৈশবকালেই বিবাহ হইয়া থাকে; সুতরাং বিবাহের অগ্রে নায়কনায়িকার প্রণয়োৎসক্য কিঞ্চিৎমাত্রও প্রকাশ পায় না, প্রণয়রসাশ্রিত না হইলে কাব্যগ্রন্থ হয় না, এবং তরুণাবস্থা না হইলে মনের প্রণয়ের সঞ্চার হইতে পারে না ...। অপত্যাস্বীকার প্রকরণ, পৃ. /°।

বিবেচনা করেন। তারকচন্দ্র চূড়ামণি-প্রণীত সপত্নী নাটকে এই সমস্যার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে।

রামচন্দ্ররচিত বাল্যবিবাহ নাটকের নায়িকা সরলার উক্তি থেকে জানা যায় ভূষণের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিলো এবং তাকে সে পছন্দও করেছিলো। সেই পছন্দের কথা ব্যক্ত করায় পিতা তাকে ভর্ৎসনা করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে দেয় মহেন্দ্রের সঙ্গে।

গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত পুনর্বিবাহ নাটকে সৌদামিনী এবং নফরচন্দ্র পালের কন্যাবিক্রয় নাটকে মালতী এবং হরিশচন্দ্র মিত্রের কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে সৌদামিনীর বিবাহ হয় এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে যাদের তারা অপছন্দ করে। এই অপছন্দের ফলাফল ভাল হয়নি। বাল্যবিবাহ নাটকে এর ফলে সরলার সঙ্গে ভূষণের অবৈধ প্রণয় জন্মে। এবং শেষ পর্যন্ত তার স্বামী মহেন্দ্র তার হাতে নিহত হয়। পুনর্বিবাহ নাটকে সৌদামিনী অপছন্দবশতই স্বামী সম্পর্কে বলে, 'যখন সে পাষণ্ডটা এসে কাছে বসে, তখন বোধ হয় বাবা কি জ্যাটা মশাই আমাকে দেখতে এলেন। আমি যেন তার দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা। মাইরি বোন তার কাছে শুতে আমার লজ্জা হয়।'[৩৮] নফরচন্দ্রের নায়িকা মালতী স্বামী সাহচর্যে—আমরা পূর্বেই দেখেছি—'সতত নয়ন সলিলে আর্দ্র।'[৩৯] আর কন্যাপণ কি ভয়ানক নাটকে সৌদামিনী নবীন নামক একটি যুবককে ভালোবেসে গৃহ ত্যাগ করে। অচিরে অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ায় সে শেষে বেশ্যা হিশেবে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।

সেকালে বিবাহে পাত্রপাত্রীর পছন্দের প্রশ্নটি খুব সচেতনতার সৃষ্টি করতে পারেনি। বিয়ে যেমনই হোক না কেন, তখনকার মেয়েরা স্বামীর মন জুগিয়েই চলতে চেষ্টা করতেন। স্বামীরা অবশ্য সারা জীবনেও হয়তো স্ত্রীর মন জানার চেষ্টা করতেন না। সেজন্যেই বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ কি বাল্যবিবাহের মতো পছন্দ-অপছন্দের সমস্যা সমাজকে তেমন আন্দোলিত করতে পারেনি। কেবল শিক্ষিত ও বেশি বয়সে বিবাহিত পাত্রপাত্রীকে কেন্দ্র করেই বর্তমান সমস্যা ধীরে ধীরে সমাজ-মানসকে আকৃষ্ট করে। এই সমস্যা বস্তুত দেরিতে প্রকাশ পায় এবং নাট্যরচনায়ও এ সমস্যা আসে প্রায় ব্যতিক্রমরূপে।

১৮৫৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত সপত্নী নাটকে পছন্দ করে বিবাহ করার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিবাহিত জীবনে অসুখী হওয়ায় ভূধর স্বয়ংবর প্রথাকে খুব সমর্থন করে। স্বয়ংবর প্রথার বিরোধিতা করার জন্যে সে গ্রামের বিশিষ্ট ও

৩৮. পুনর্বিবাহ নাটক, পৃ. ৮।
৩৯. কন্যাবিক্রয় নাটক, পৃ. ১৯।

মান্যবর পণ্ডিত রুদ্ররামের কথায় বিরক্তি ও অভব্যতা প্রকাশ করে।[৪০] এ নাটকের সর্বসুন্দর পণ্ডিতও স্বয়ংবর প্রথার সমর্থন করে। তার সমর্থনের কারণ এ প্রথা শাস্ত্রসম্মত। আসলে বোঝা যায়, এ নাটকের রচয়িতা নিজেই স্বয়ংবর প্রথার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এবং তারও কারণও হয়তো শাস্ত্রের সমর্থন।[৪১]

গুণগত দিক দিয়ে নাট্যকার হিশেবে দীনবন্ধুর সঙ্গে তারকচন্দ্র চূড়ামণির কোনো তুলনা হয় না। তাই তারকচন্দ্র যে কথা যথেষ্ট স্থূলতার সঙ্গে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পান, দীনবন্ধু তা-ই সুকৌশলে এবং সুনিপুণভাবে ব্যক্ত করেন। তারকচন্দ্রের নায়ক ভূধর এবং তার আদর্শ পণ্ডিত সর্বসুন্দর (সম্ভবত নাট্যকার নিজেই) স্বয়ংবরের কথা সরাসরি বলেও পাঠকের মনে যে সহানুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না, সুন্দর কাহিনী পরিকল্পনা ও চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে দীনবন্ধু সেই বাঞ্ছিত ফল অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি ললিত ও লীলাবতীকে এমন শিক্ষিত, সুন্দর, সচ্চরিত্র এবং আকর্ষণীয় করে অঙ্কন করেন যে পাঠক বা দর্শক তাদের ভালো না বেসে থাকতে পারেন না। তাদের মিলনের পথে যতো বাধা আছে, তারা দ্রুত তার অপসারণ কামনা করেন। নদেরচাঁদ চরিত্রটিকে নাট্যকার এমন কুৎসিত করে চিত্রিত করেন যে, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ের প্রস্তাবকে তারা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেন না। এমনকি কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে বংশজ পাত্র ললিতকে বাদ দিয়ে কুলীন পাত্র নদেরচাঁদকে গ্রহণ করার জন্যে হরবিলাসের যে পণ, তাকে কেবল অর্থহীনই নয়, পাঠকগণ তাকে রীতিমতো অন্যায় বলে গণ্য করেন।

এ নাটকের বিবেকী চরিত্রগুলিও ললিত-লীলাবতীর প্রণয় এবং বিবাহের ঔচিত্যকে স্বীকার না করে পারে না। সিদ্ধেশ্বর, রাজলক্ষ্মী এবং সারদাসুন্দরীর মতো শিক্ষিত ও নবমূল্যবোধে বিশ্বাসী যুবক-যুবতীই নয়, লীলাবতীর প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতও মনে করে তাদের বিয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লীলাবতী ও ললিত পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত এবং পূর্ণমিলনাকাঙ্ক্ষী। লীলাবতী সেকালের লজ্জাবতী কুমারী, কিন্তু ললিতের সঙ্গে মিলনের কথায় সে সকল লজ্জা জয় করে সারদাসুন্দরীকে বলে,

> ললিতে করিতে পতি—বলি লাজ খেয়ে,—/ ব্যাকুল হৃদয় মম হয়নি সজনি! আকুল হয়েছি ভেবে, পাছে আর কেউ / আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে। কেন বা হইল জ্ঞান, কেন বা যৌবন। / হারাই যাদের তরে ললিত মোহন।[৪২]

৪০. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৪৯-৫১।
৪১. ঐ, পৃ. ৮৩।
৪২. **লীলাবতী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন**, পৃ. ৪১০।

ললিতকে হারানোর ভয় তার এতোই আত্যন্তিক যে, সে সখীকে বলে, ললিতকে না পেলে সে নিজের 'নবীন প্রেমের মৃতদেহের সঙ্গে' সহমরণ বরণ করবে।[৪৩] একদিন নিভৃতে আলাপ করার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে ললিতকেও সে তার সংকল্পের কথা জানায়। স্পষ্টভাবেই সে ললিতকে বলে,

দানের অপেক্ষা নাথ, আছে কোথা আর, / বরণ করিচি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত, / যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত ;
ছেড়ে যাও, খাব বিষ ত্যাজিব জীবন,...[৪৪]

ললিত লীলাবতীর চেয়ে কম ব্যাকুল নয়। সেও লীলাবতীকে বলে, তাকে বিয়ে করতে না পারলে জীবন বিসর্জন দেবে অথবা বৈরাগ্য অবলম্বন করবে।[৪৫]

শেষ পর্যন্ত বহু বিঘ্নের জাল ছিন্ন হয় এবং নাট্যকার নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটান। পছন্দ করে বিবাহ করার আদর্শ এভাবে জয়লাভ করে। সমকালীন দর্শকগণও এই মিলন অনুমোদন করেন। হয়তো এজন্যেই শ্যামবাজার নাট্য সমাজের প্রযোজিত লীলাবতীর অভিনয় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে, এই অভিনয়কে কেন্দ্র করেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর **কুলীনকন্যা বা কমলিনী** নাটক রচিত হয়েছিলো **লীলাবতীর** আদলে। লীলাবতী এবং ললিতের যেমন পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে মিলন হয়, কমলিনীর সঙ্গে দিননাথের মিলনও হয় তেমনি পারস্পরিক প্রণয়ের আকর্ষণে। প্রকৃতপক্ষে, পাত্রপাত্রীর মনোনয়নের মাধ্যমে বিবাহ করার রীতিকেই নাট্যকার সমর্থন জানান।

'মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়' যে কত অনিষ্ট ঘটে সে কথা বলার জন্যে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও **স্বর্ণলতা** নামক নাটক রচনা করেছিলেন।[৪৬] রক্ষণশীল সমাজ নাট্যকারের এই উদ্দেশ্য অনুমোদন না করলেও,[৪৭] নাট্যকার যে কোর্টশিপের প্রশংসা করেছিলেন, তা দিয়ে এ বিষয়ে সমসাময়িক সমাজের একাংশের মনোভাব ও সচেতনতার সংবাদ জানতে পারি।

বিবাহের বয়স বৃদ্ধি ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে এবং হয়তো ১৮৭২ সালের ৩ আইনের পরোক্ষভাবে যুবতী অনূঢ়া নায়িকার কল্পনা নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত

৪৩. ঐ পৃ. ৪১১।

৪৪. ঐ, পৃ. ৪৬৩।

৪৫. ঐ, পৃ. ৪৫৮-৫৯।

৪৬. **বঙ্গদর্শন,** শ্রাবণ ১২৮১, পৃ. ১৮৮।

৪৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতের জন্যে দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৪৬। মনোমোহন বসু তীব্রতর ভাষায় এ নাটকের নিন্দা করেন।—**মধ্যস্থ,** কার্তিক ১২৮১, পৃ. ৩২২।

করে। ১৮৭০-এর দশকের কয়েকটি নাটকেই এজন্যে যুবতী নায়িকা এবং তাদের বিবাহপূর্ব প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ দাসের সরোজিনী ও সুকুমারী[৪৮] এবং বিনোদিনী ও বিরাজমোহিনী,[৪৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐলবালা,[৫০] সরোজিনী[৫১] এবং হেমাঙ্গিনী—সকলেই যুবতী এবং অনূঢ়া। এরা সকলেই নিজেদের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ শ্রেয় মনে করে।

পাত্রপাত্রীর পছন্দ যে সুখী বিবাহের পক্ষে আবশ্যিক এই সচেতনতা সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিলো। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের **কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে** নাটকের রায়-গিন্নি এ সম্পর্কে স্বামীকে বলে,

> প্রাণনাথ—এদেশের এই একটি অত্যন্ত মন্দ দেশাচার বলিতে হয়, যাহার সঙ্গে যাবজ্জীবনের জন্য একত্রে ঘরকন্না করিতে হইবেক, তাহাদিগের উভয়ের মনস্থ হইয়া পরিণয় কার্য সম্পাদন হওয়া উচিত, এ বিষয়টি দেশের ব্যবহার নাই বোলেই যা বলুন, কিন্তু মা বাপের এ বিষয়ে খুব বিবেচনা চাই।[৫২]

বাস্তবে দেখতে পাই এ বিষয়ে পিতামাতার বিবেচনা বড়ো বেশি ছিলো না। **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ** নাটকে কৃষ্ণদাস পিতামাতার এই অনুচিত মনোভাবের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে,

> দেখুন দেখি, একি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! দুগ্ধপোষ্য বালিকার অজ্ঞাত-স্বভাব এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হয়, তাতে সম্মতি আছে কি না আছে তার কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করে সম্প্রদান করা হয়।

এর ফলে কোনো ক্ষেত্রে সারাজীবন স্বামী-স্ত্রীর আদৌ প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, কৃষ্ণদাস সে কথারও উল্লেখ করে।[৫৩]

সপত্নী নাটকে পুত্রের অনুযোগ স্বীকার করে নিয়ে সর্বসুন্দর বলে, 'অমনোনীতা বনিতাতে সন্তানসন্ততির উৎপাদন কদাচ হয় না।' ধর্মশাস্ত্রেও যে এ জাতীয় বিবাহ নিন্দিত হয়েছে, সর্বসুন্দর তাও স্বীকার করে।[৫৪]

৪৮. **শরৎ-সরোজিনী নাটক** (কলিকাতা,১৮৭৪)।

৪৯. উপেন্দ্রনাথ দাস, **সুরেন্দ্র-বিনোদিনী** (কলিকাতা, ১৮৭৫)।

৫০. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, **পুরুবিক্রম নাটক** (কলিকাতা, ১৮৭৫।

৫১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, **সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক** (কলিকাতা, ১৮৭৫)।

৫২. জয়ন্ত গোস্বামী, পৃ. ৩৪৯-৫০।

৫৩. **অগত্যাস্বীকার প্রকরণ**, পৃ. ৫৭-৫৮।

৫৪. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ৭৬।

অসবর্ণ বিবাহ, পণপ্রথাবিষয়ক সচেতনতা ও বাংলা নাটক

হিন্দু বিবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অযৌক্তিক রীতিসমূহের মধ্যে বিবাহের উপযুক্ত বয়স এবং পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক সম্মতির কথাই সেকালের সমাজ সংস্কারকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। তবে পারস্পরিক পছন্দ ও সম্মতির কথা মেনে নিলেই, অসবর্ণ বিবাহ, এমনকি ভিন্নধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বিবাহও মেনে নিতে হয়, অথবা বিবাহকে ধর্মীয় স্যাক্রামেন্ট হিশেবে গণ্য না করে একটি সামাজিক চুক্তি হিশেবে গণ্য করতে হয়, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক খুব তিক্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের ঔচিত্য মেনে নিতে হয়, স্বামী-স্ত্রী যে একটি চুক্তির সমান দুই অংশীদার এটাকে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এসব চেতনা সমাজে তখনো খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। সে জন্যেই সমকালীন নাট্যরচনাসমূহে এসব সমস্যার প্রতিফলন বলতে গেলে আদৌ হয়নি। আসলে একটি মনোভাব সমাজ-মানসে গভীরভাবে প্রোথিত না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যে তার প্রতিফলন সাধারণত হয় না। পূর্বোক্ত চেতনাসমূহ তখনো সমাজের উপরিভাগে ভাসমান, এ জন্যেই নাটক-প্রহসনে তারা গভীর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকের বিবাহসম্পর্কিত সচেতনতার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি, অসবর্ণ বিবাহের মতো বৈপ্লবিক ভাবধারার দ্বারা কেশবচন্দ্র সেনের অনুসারিগণই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মন্ত্রপাঠের পরিবর্তে পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার রীতিও গ্রহণ করেন এই সম্প্রদায়ের স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি। নিরীশ্বর বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদিও হিন্দু সমাজ গ্রহণ করেনি। এ কারণে, আলোচ্য সময়েতো বটেই, দীর্ঘদিন পরেও, অসবর্ণ বিবাহ কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের সমর্থন করে কোনো নাটক-প্রহসন রচিত হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কিঞ্চিত জলযোগ[৫৫] নামক প্রহসনে 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্মদের আধুনিক বিবাহ পদ্ধতি এবং বিবাহবিচ্ছেদ প্রথার উল্লেখ করেন নিতান্তই বিদ্রূপের খাতিরে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ প্রহসন রচনাকালে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক শত্রুতার। সেই শত্রুতার সূত্র ধরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আধুনিক বিবাহ প্রথা, বিবাহিত

৫৫. এ নাটকটি রচনার তাৎক্ষণিক কারণ ১৮৭২ সালের ৩ আইন প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্ম সমাজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের কোন্দল। পরে এই কোন্দলের তিক্ততা হ্রাস পেলে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হলে এই প্রহসন আর পুনর্মুদ্রিত করেননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, পৃ. ১৩৮।

জীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে এতো দূরে অবস্থিত ছিলো যে, শত্রুতার খাতিরেও হিন্দু নাট্যকারগণ 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্মদের বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে বিদ্রূপ করেও কোনো নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি।

তবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমানাধিকারের মতো সার্বজনিক দু-একটি সমস্যা নিয়ে ক্বচিৎ কোনো নাট্যকার দু-একটি মন্তব্য করেছেন। যেমন *বিধবোদ্বাহ নাটকে* মায়া বলে, 'যখন পুরুষের মাগ থাকতে বিয়ে করতে পারে তখন মেয়ে মানুষও কসবি হয়ে বেরয়ে যেতে পারে। ... পুরুষের আর একটা বিয়ে করলে যদি দোষ না পড়ে তবে মেয়েতেও বেরয়ে গেলে কোন দোষ পড়ে না।'[৫৬] *সপত্নী নাটকে* স্বামী-স্ত্রীর অবন্ধুসুলভ সম্পর্ক বিষয়ে বলা হয়েছে, 'ভাতারের মুখ যেন আকাশের ফুল। ··· স্বামীর সঙ্গেতে যেন শত্রু ব্যবহার।'[৫৭] স্বামী-স্ত্রীর এ রকমের অবন্ধুসুলভ ব্যবহারের কথা *পুনর্বিবাহ নাটকেও* উল্লিখিত হয়েছে।[৫৮] কিন্তু এ রকমের মনোভাব এতো বিরল দৃষ্টিগোচর হয় যে, একে একটা সামাজিক সচেতনতা বা আন্দোলন বলে গণ্য করা যায় না।

বরং পণপ্রথা নিয়ে নাট্যকারগণ অনেক বেশি ভাবিত। তবে বরপণ সমস্যা শতাব্দীর শেষ দু' দশকের আগে তীব্র হয়ে ওঠেনি বলে, ১৮৭০-এর দশকের প্রথম ভাগে এবং তার পূর্বে রচিত নাটকসমূহে বরপণ কোনো বড়ো সমস্যা হিশেবে দেখানো হয়নি।

প্রথমে যে নাটকে বরপণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেটি হলো রামচন্দ্র দত্তের *বাল্যবিবাহ নাটক* (১৮৭৪)। এই নাটকে কায়স্থদের মধ্যে যে বরপণ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়গোপাল তার ছেলের বিয়েতে বৈবাহিকের কাছ থেকে প্রভূত উপঢৌকন লাভ করে—'কেবল চন্দ্র, সূর্য নেয়া যায়নি।'[৫৯] কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়েতে যে পণ দিতে হবে, সে কথা ভেবে সে কাতর হয়। তার উক্তি থেকে জানা যায়, সম্প্রতি কায়স্থদের মধ্যে বরপণ প্রথার প্রাদুর্ভাব হচ্ছিলো।

> আজকাল কায়েত জাত তাঁতী, সোনার বেনের মাথায় উঠেছে; আমি জানতুম যে ওরাই বিবাহের সময় ১০০, ২০০, ৫০০ ভরি সোনা নিয়ে থাকে, কিন্তু

৫৬. *বিধবোদ্বাহ নাটক*, পৃ. ১৫৫-৫৬।
৫৭. *সপত্নী নাটক* পৃ. ৮৮।
৫৮. *পুনর্বিবাহ নাটক*, পৃ. ৪-৮, ১১-১৪।
৫৯. রামচন্দ্র দত্ত, *বাল্যবিবাহ নাটক*, পৃ. ১১।

> আমাদের দেখচি ওদের চেয়েও বেশি। কোনো দিন বলে বসবে, মেয়েদের সঙ্গে সোনা ওজন করে দিতে হবে, ওঃ মনে কল্লে ভয় হয়।[৬০]

জয়গোপাল নিজের ছেলের বিয়েতে পণ গ্রহণ করেছে, দেশের লোকেরাও এ প্রথাকে ভালো বলে। কিন্তু তবু সে এ প্রথা নিন্দা না করে পারে না।[৬১]

জয়গোপাল ছাড়া অন্য দুই নাগরিককেও আমরা এ নাটকে পণপ্রথার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনি। প্রথম নাগরিক কন্যার বিবাহ স্থির করতে পারেনি, কারণ

> যেখান থেকেই সম্বন্ধ আসে তারাই দেড়গজা ফর্দ দেয়। আমি ফর্দ দেখেই চুপ করে থাকি, আর উচ্চবাচ্চ করি নিই। ...সিদিন সিমলে থেকে একটা সম্বন্ধ এসেছিলো, পাত্রটির বয়স ৪০, ৪৫ হবে। দেখতে দিব্য স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। বিদ্যাবুদ্ধি অতলস্পর্শ, বিষয়কর্মের মধ্যে আহার আর খোসগল্প। যৎকিঞ্চিৎ পৈত্রিক বিষয় ছিলো তাই বিক্রী করে একখানি কিসের দোকান হয়েছিল। শুনলেম তাও এখন নাই। একখানি বাড়ী আছে। দ্বিতীয় পক্ষের সংসার কর্বেন, কিন্তু সন্তানাদি কিছুই নাই। তা সেও ১০/১২ খানি রূপোর দানসামগ্রী না পেলে বিবাহ কর্ত্তে চায় না।[৬২]

শতাব্দীর শেষ দিকে এ প্রথার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এবং নাটকেও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুর্গাচরণ রায়ের পাশ করা ছেলে (১৮৭৯), হীরালাল ঘোষের রোকা কড়ি চোকা মাল (১৮৭৯), রাধাবিনোদ হালদারের পাশকরা জামাই (১৮৮০), অমৃতলাল বসুর বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), রাজকৃষ্ণ রায়ের লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০), যতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাদায় (১৮৯১) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

অন্তত একটি নাটক— কুলীনকায়স্থ নাটক—থেকে বরং কুলীনকায়স্থদের মধ্যে কন্যাপণ প্রথার জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। মৌলিক কায়স্থরা পুত্রের জন্যে কুলীনকায়স্থর কন্যা এনে জাতে ওঠার চেষ্টা করতো—এটা বিশেষ জোর দিয়ে এ নাটকে বলা হয়েছে। এ নাটকে বংশধর সেন কৌলীন্য লাভের জন্যে কাঙাল। পূর্বে তার একাধিক পুত্রের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অর্থের বিশেষ সচ্ছলতার অভাবে সে কুলীনকন্যা সংগ্রহ করতে পারেনি। এবারে আরেক পুত্রের জন্যে সে কুলীন-কন্যা সংগ্রহের প্রয়াস পায়। তাকে সাহায্য করে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ নামক এক

৬০. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ নাটক, পৃ. ১৩।
৬১. ঐ, পৃ. ১৪।
৬২. ঐ, পৃ. ১৩-১৪।

কুলীন কায়স্থ। আর কন্যা সংগৃহীত হয় কায়স্থদের দলপতি এক মুখ্য কুলীনের পরিবার থেকে। দলপতি অর্থলোভী এবং বহু কন্যার পিতা। সে অর্থলোভে মৌলিকের কাছে কন্যা দান করতে রাজী হয়। কিন্তু আশঙ্কা করে যে গ্রামের অন্যান্য কায়স্থগণ হয়তো এ বিয়েতে বাধা দিতে পারে। সুতরাং বিয়ের দিন কন্যাকে নিয়ে সে বরের বাড়িতে চলে যায় এবং সেখানেই সম্প্রদান হয়। দলপতির স্ত্রী অনেকগুলি কন্যার জননী হওয়ায় অন্যান্য মহিলারা তাকে খুব ঈর্ষা করে; পাড়ার অন্য এক মহিলা—শ্যামার সংলাপ থেকে এই ঈর্ষার পরিচয় পাওয়া যায়:

দুর্ভাগা রমণী আমী কুলীনের কুলে। / গর্ভে না ধরিনু মেয়ে কি সুখে বাঁচিলে।।
সন দুঃখে মরে আছি কি বলিব সই।/ পোড়া পেটে যদি হয় নয় পুত্র বোই।।

*

এ দুঃখ অপেক্ষা বন্ধ্যা হয়া ছিল ভাল।[৬৩]

দয়ারাম দত্তের কথা থেকেও 'কন্যাভাগ্যের' কথা জানা যায়:

তবে তো তিনি এক উর্বরা ক্ষেত্র (স্ত্রী) পেয়েছেন বোধ হয় জীবনযাপনের জন্য অন্য কোন উপায় অনুসন্ধান কত্তে হয় না, এক একটা কন্যা বে দে যে টাকা পান তাই প্রচুর।[৬৪]

শতাব্দীর তৃতীয় পাদের বিবাহসংক্রান্ত নাটক-প্রহসনের আলোচনা থেকে এমন মন্তব্য করা যায় যে, বিবাহকে ধর্মীয় স্যাক্রামেন্ট বলে গণ্য না করার কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম প্রবর্তন করার মতো র‍্যাডিক্যাল মনোভাব পোষণ না করলেও, এসব রচনায় বিবাহকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মানবতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস আছে। জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে নাট্যকারগণ কোনো নতুন মূল্যবোধের সমর্থন করেছেন, এমন কি কোথাও কোথাও রীতিমতো প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সে যুগের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই তাদের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করেছিলো এবং সে কারণেই তারা বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে পুরোপুরি যুক্তি ও ইহলৌকিকতার উপর স্থাপিত করতে সমর্থ হননি।

৬৩. কুলীনকায়স্থ নাটক, পৃ. ১৭।
৬৪. ঐ, পৃ. ২৬।

পঞ্চম অধ্যায়

নারীমুক্তি ঃ স্ত্রীশিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী নারীদের অবস্থা ও নারীদের প্রতি পুরুষদের মনোভাব

'স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন।' বিশেষত ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতি যেরূপ নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রদর্শন করে, তা তুলনাহীন।[১] —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই উক্তি (১৮৭১ খৃস্টাব্দ) উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় সমাজ সম্পর্কে অতিরঞ্জন বর্জিত সত্য বলে গণ্য হতে পারে। নারীদের প্রতি পুরুষদের এরূপ মনোভাবের জন্যে হিন্দু ঐতিহ্য এবং মধ্যযুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবনতি উভয়ই দায়ী বলে মনে হয়।

মনু স্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁদের অন্তঃকরণ নির্মল নয়; বেদস্মৃতিতে তাঁদের অধিকার নেই, তাঁরা ধর্মজ্ঞানবর্জিত এবং মিথ্যাপদার্থ।[২] এ জন্যেই বিয়ের আগে পিতা, বিয়ের পরে স্বামী এবং বৈধব্যকালে পুত্র তাঁদের রক্ষা করবেন। তাঁরা কখনোই স্বাধীন থাকবেন না।[৩] নারীদের স্বভাব বিশ্লেষণ করে মনু বলেন যে, তাঁরা সৌন্দর্য অন্বেষণ করেন না, যুবা বা বৃদ্ধ দেখেন না, সুরূপ কুরূপ বিচার করেন না—পুরুষ পেলেই তার সঙ্গে সম্ভোগে মিলিত হন।[৪] স্ত্রীজাতির চিত্তের স্থিরতা নেই এবং পুরুষ দেখলেই তাঁদের মনে কামভাব জাগ্রত হয়।[৫] শয্যা, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি।[৬]

নারীদের সম্পর্কে মনুর মতো সর্বজনমান্য শাস্ত্রকারের এ জাতীয় উক্তি যুগ যুগ ধরে নারীদের প্রতি পুরুষের মনোভাবকে প্রভাবিত করেছে—এরূপ মনে করা

১. বহুবিবাহ, পৃ. ৪৮ ।
২. মনুসংহিতা, ৯/১৮ : পৃ. ৫২৩-৫২৪।
৩. ঐ, ৯/৩ ; পৃ. ৫১৯।
৪. ঐ, ৯/১৪ ; পৃ. ৫২২।
৫. ঐ, ৯/১৫; পৃ. ৫২৩।
৬. ঐ, ৯/১৭ ; পৃ. ৫২৩।

অসঙ্গত নয়।[৭] প্রকৃত পক্ষে, পৌরাণিক যুগ থেকেই স্ত্রীজাতি সম্পর্কে পুরুষদের ধারণা বৈদিক যুগের তুলনায় ক্রমশ অবনত হতে থাকে।[৮] এই ধারণা সর্বনিম্নে অবনত হয় ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার কিছু পূর্বে। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাবো যে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার অর্ধশতাব্দীরও পরে এ দেশের নারীদের হীন অবস্থা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সমাজ সংস্কারকদের মনে একটি সচেতনতার উন্মেষ ঘটে এবং আরো অর্ধশতাব্দী পরে নারীদের অবস্থা আস্তে আস্তে উন্নত হতে আরম্ভ করে।

নারীদের জীবনকে বিবাহপূর্ব বাল্যজীবন ও বিবাহিতজীবন এই দুভাগে বিভক্ত করলে আমরা লক্ষ্য করবো, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজে নারীরা এই উভয় জীবনে দারুণ দুরবস্থায় পতিত হয়েছিলেন।

বাল্যকাল এমন কি জন্মের মুহূর্ত থেকেই মেয়েরা পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, অবহেলা এবং তাচ্ছিল্য লাভ করতেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে অবশ্য উল্টো কথা বলেছেন। তাঁর মতে, তাঁর পূর্বযুগে পুত্র ও কন্যার ইতরবিশেষ করা হতো কিন্তু তাঁর সময়ে পুত্র ও কন্যার তেমন কোনো তারতম্য ছিলো না।[৯] তবু বাস্তবে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনোভাব তেমন পাল্টায়নি। মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে তখনো বলা হতো, প্রসূতি 'একটা মাটির ডেলা বিউলো।'[১০] এ সময়েও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলেই দুঃখিত ও বিষণ্ণ হতেন।[১১] এই পরিবেশে জাত কন্যা চরম অযত্নের মধ্যে মানুষ হতেন।[১২] এবং বাল্যকাল থেকেই তাঁরা

৭. R. C. Majumder, **Ancient India**, p. 474.

অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও কমবেশি মনুর মতোই নারীদের সম্পর্কে নীচ ধারণা দিয়েছেন। For details see S. Chattopadhyay, **Social Life in Ancient India** (Calcutta, 1965). pp. 106-13; Alteker, pp. 319–22.

Also see P.Thomas, **Indian Women Through the Ages** (Bombay, 1964), pp. 220-22.

৮. R.C.Majumder, pp. 89-90, 204, 474.

৯. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'পুত্রকন্যা', **পারিবারিক প্রবন্ধ**, পৃ. ৭৬।

১০. 'মেয়েছেলের এত অনাদর কেন', **বামাপ**, মাঘ ১২৭০, পৃ. ৬৫।

১১. শ্রীমতী মায়াসুন্দরী, 'নারী জন্ম কি অধর্ম' **বঙ্গমহিলা**, শ্রাবণ ১২৮১, পৃ. ৯৩; 'দেশাচার : কন্যাবিক্রয়', **বামাবোধিনী পত্রিকা**, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩, পৃ. ২৭৪; পূর্ণচন্দ্র বসু, 'বঙ্গ বামার ধর্মনৈতিক অবস্থা', **আর্যদর্শন**, চৈত্র ১২৮১, পৃ. ৫৪৩।

১২. পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজচিন্তা**, পৃ. ১৩৫।

লাভ করতেন স্বাধীন ইচ্ছাকে অবদমিত করার এবং শ্বশুর বাড়ির শাসনকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা।[১৩]

বিবাহিত জীবনে বাহ্যত তাঁদের স্থানান্তর ঘটতো এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে। কিন্তু এর ফলে তাঁদের যে অবস্থান্তর ঘটতো—অন্তত সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তিগত সুখশান্তির দিক দিয়ে—তেমন মনে হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, বাল্যবিবাহ ও অসমবয়স্ক বিবাহ, সাপত্ন্য, বালবৈধব্য ইত্যাদি তাদের জীবনকে দুর্বিষহ ও ব্যর্থ করে দিতো। কিন্তু এসব ছাড়া স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনেও মেয়েরা বহু অসম্মান এবং দুঃসহ পীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হতেন। বাল্য বয়সে বিবাহ হওয়ার পর থেকেই বাপের বাড়ির নিশ্চিন্ত জীবনের পরিবর্তে বহু শাসন লাঞ্ছিত একটি নতুন জীবনের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হতো।

আলোচ্য কালের বালিকা বধূর অপমান ও লাঞ্ছনার যে চিত্র পাওয়া যায় তা মর্মস্পর্শী। এ প্রসঙ্গে সতীপ্রকাশ সেন যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে সেকালের একটি সাধারণ চিত্র বলে গণ্য করা যায়।

> কোনের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, শয়নে, বাক্য কথনে, অঙ্গ চালনে সকলেতেই কোনের বউ দোষী। কোনের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না, খাইতে পাইবে না—উদর পুরিয়া খাইতে পাইবে না ; কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না -- তিরস্কার করিলে কাঁদিতে পাইবে না—পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটি কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়াও গাত্রবস্ত্র খুলিতে পাইবে না—ত্বরিত চলিতে পাইবে না—স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে পারিবে না।[১৪]

রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে সে যুগের নতুন-বৌ-এর যে ছবি এঁকেছেন তা-ও বর্তমান বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১৫] বিনোদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে ১৮৮৭ সালে বিবাহিত তাঁর মায়ের যে চিত্র অঙ্কন করেন, তা-ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১৬]

১৩. M. M. Urquhart, **Women of Bengal**, pp. 38-40.

১৪. সতীপ্রকাশ সেন, 'কোনের বউ', **সোমপ্রকাশ**, ১৫ বৈশাখ ১২৮৭, **সাবাস ৪**, পৃ. ২৮৮-৮৯।

১৫. রাসসুন্দরী দেবী, **আমার জীবন** (দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩০৫), পৃ. ২৯।

১৬. N. C. Chaudhuri. **The Autobiography of an Unknown Indian** (6th Imp. Bombay ; 1976). p. 171.

সত্যিকারভাবে কেবল বালিকা বধূই নয়, স্বয়ং কর্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত বেশির ভাগ বধূকেই নিগ্রহ সহ্য করতে হতো। কর্ত্রী হওয়ার পরে কতোগুলি ব্যাপারে বধূর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ হতো বটে,[১৭] কিন্তু স্বামীর কাছে কোনো কালেই সাম্যের ভিত্তিতে মর্যাদালাভের উপায় ছিলো না। কারণ আলোচ্য সমাজে তৌলমূল্যে নারী-পুরুষের বিচার হতো না। এজন্যই বধূর প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অপমানজনক ব্যবহার খুব সাধারণ বিষয় বলে বিবেচিত হতো।[১৮] স্ত্রীর প্রতি হাজার নিষ্ঠুরাচরণ করলে কেউ সে সমাজে দোষ দিতো না, কিন্তু ভদ্র ব্যবহার করলে সেই স্বামী স্ত্রৈণ বলে নিন্দা ও উপহাসের পাত্র হতেন।[১৯]

কোনো কোনো স্বামী স্ত্রীদের আদৌ মানুষ বলে জ্ঞান করতেন না।[২০] এঁরা বিয়ের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ স্বীকার করে বিয়ে করলেও কার্যকালে তাঁদের সঙ্গে আচরণ করতেন গৃহপালিত পোষা জন্তুর ন্যায়।[২১] তবে বেশিরভাগ পুরুষই এতোটা নিষ্ঠুর হতেন না। তাঁরা এঁদের মনে করতেন গৃহকার্যের উপযুক্ত ক্রীত-দাসীর মতো।[২২] শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতির সেবা করাই স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো।[২৩] বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িতে এসেই সংসারের কাজ করতে পারবে—একথা মনে করে শাশুড়ী একটু বেশি বয়সী কন্যাকেই পছন্দ করতেন। যে বধূ গৃহকার্যে শ্বাশুড়ীকে সাহায্য করতে পারতেন, প্রতি-বেশীদের কাছে তিনিই যথার্থ প্রশংসা লাভ করতেন।[২৪] 'যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বই আর কোনো কর্ম নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে সে হাত-খানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের কাজ করিবে, ... তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ

১৭. Urquhart, **Women of Bengal**, p. 33.

১৮. **জ্ঞানান্বেষণ**, **সমাচার দর্পণ**-এ (১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭) উদ্ধৃত, **সসেক ২**, পৃ. ২৬২-৬৩।

১৯. পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজচিন্তা**, পৃ. ১৬৯।

২০. 'স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ', **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৭১, পৃ. ১৫১।

২১. 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা', **বামাপ**, পৌষ, ১২৭২, পৃ. ১৬২; 'পারিবারিক সংস্কার', **বামাপ**, মাঘ ১২৮২, পৃ. ২৩৫।

২২. অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্বপ**, ১ কার্তিক ১৭৬৮ (অকটোবর ১৮৪৬), পৃ. ৩৫৩; 'স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ,' **বামাপ**, পৃ. ১৫২; 'বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা,' **হিতসাধক**, শ্রাবণ ১২৭৫, পৃ. ১৫৮; 'অবলাবান্ধব', **বামাপ**, শ্রাবণ, ১২৭৬, পৃ. ৭৪।

২৩. 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা', **বামাপ**, পৃ. ১৬১; পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজচিন্তা**, পৃ. ১৩৯।

২৪. 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা', **বামাপ**, পৃ. ১৬১।

হইল।'[২৫] কাজে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য দেখাতে পারলে সেই স্ত্রী 'লক্ষ্মী বউ' বলে পরিচিত হতেন।[২৬]

এই সব লক্ষ্মী বউ-এরা আসলে দাস্য বৃত্তিই করতেন।

> অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে এবং সুপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে। ··· সকল গোসেবাবি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুস্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করেন ···।[২৭]

সেকালে হিন্দু সমাজের প্রায় সর্বত্র একান্নবর্তিতা প্রচলিত থাকায়, প্রত্যুষ থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত স্ত্রীদের অসংখ্য গৃহকার্য করতে হতো। ভারবাহী পোষা জন্তুর মতো তিরস্কার ও লাঞ্ছনা সহ্য করে এবং নিজেরা প্রায় অভুক্ত থেকে স্ত্রীরা দিনের পর দিন এই পরিশ্রম বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন।[২৮] ফলে বিশেষ করে একান্নবর্তী পরিবারের লক্ষ্মী বধূদের দাসীত্বের একশেষ হতো।[২৯]

আবার স্ত্রীর প্রতি স্বামী দৈহিকভাবে আকৃষ্ট হলে, স্ত্রী তখন কেবল দাসী বলেই নয়, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগী বস্তু বলেও গণ্য হতেন।[৩০] মাত্রাভেদে শারীরিক আকর্ষণ ভালোবাসা নামে অভিহিত হলে, স্ত্রীর গৃহকর্ম হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে লঘুভার হতো, কিন্তু মুখে স্বীকার না করলেও স্বামী এমন স্ত্রীকে 'ভোগবিলাসের উপকরণ' ভিন্ন আর কিছুই মনে করতেন না।[৩১]

অনেক পরিবারে, বিশেষত সেকালের কলকাতার নতুন ধনী 'বাবু'দের পরিবারে স্ত্রীর ভাগ্যে স্বামীর দাসীত্বটুকুও জুটতো না। এসব বাবুদের অনেকেই সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব হিশেবে বিয়ে করতেন এবং কালে কালে হয়তো স্ত্রীকে দু-একটি

২৫. রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, পৃ. ৫২।

২৬. 'পারিবারিক সংস্কার', বামাপ, পৃ. ২১৬।

২৭. রামমোহন রায়, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলি, পৃ. ২০৭।

২৮. রামমোহন রায়, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলি, পৃ. ২১০; 'বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা', হিতসাধক, পৃ. ১৫৭-৫৮।

২৯. প্যারীচরণ সরকার, বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা', হিতসাধক, পৃ. ১৫৭।

৩০. অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্বপ, ১ কার্তিক ১৭৬৮ (অক্টোবর ১৮৪৬), পৃ. ১৫৩; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উক্তি, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর অপরাজিতা (কলিকাতা, ১২৯৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৯; কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব (কলিকাতা, ১৮৬৯), পৃ. ১৪।

৩১. সীতানাথ নন্দী, 'স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার', নব্যভারত, ফাল্গুন ১২৯১, পৃ. ৫০৮।

সন্তানও উপহার দিতেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এঁরা অনেকেই কোনো সম্পর্ক কার্যত রাখতেন না। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নববাবুবিলাস** শীর্ষক ব্যঙ্গ রচনা থেকে আরম্ভ করে ১৮৪০-এর দশকের **তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা** পর্যন্ত নানা স্থানেই এজাতীয় বাবুদের স্ত্রী-বৈরাগ্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

এই বাবুরা যৌনকর্মের জন্যে মোটা অর্থ ব্যয় করতেন রক্ষিতা রেখে। কে কত অর্থ দিয়ে রক্ষিতা রাখতেন, রক্ষিতাকে বাগানবাড়ি করে দিতেন, সেটা নিয়ে সমাজে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলতো।[৩২] ১৮১০ ও ১৮২০-এর দশকের বিখ্যাত বাইজি নিকীকে একজন বাবু মাসে এক হাজার টাকা বেতন দিয়ে রক্ষিতা রেখেছিলেন।[৩৩] শতাব্দীর শেষ পাদে বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীকে গুর্মুখ সিং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অভিনয় থেকে তাঁকে বিরত করতে পারেননি, সে-ও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য।[৩৪] এ রকমের ঘটনা গত শতাব্দীতে কেবল বহুল প্রচলিত ছিলো না। লোকে এটাকে প্রশংসার চোখেও দেখতো।

বেশ্যাগমন এ সমাজে মোটেই অন্যায় বা অশোভন বলে গণ্য হতো না।[৩৫] যাঁরা বেশ্যাসক্ত নন, তাঁরাও নির্দ্বিধায় বেশ্যালয়ে যেতেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। রাত দেড়প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকতো। লোকে পূজোর রাতে যেমন প্রতিমা দেখে বেড়াতো, বিজয়ার রাতে তেমনি বেশ্যা দেখে বেড়াতো।[৩৬] ধনী, মধ্যবিত্ত এবং বিত্তহীন-অর্থনৈতিক সঙ্গতি নির্বিশেষে অনেকেই বেশ্যানুরাগী ছিলেন।[৩৭] এ ব্যাপারে বয়স বা সম্পর্কের তারতম্যও তেমন বিচার হতো না। পিতার রক্ষিতার গৃহে এ কারণে পুত্র অনায়াসে যেতে পারতো।[৩৮] প্রকৃত পক্ষে, আলোচ্য সমাজে বেশ্যার স্ট্যাটাস সাধারণ নারীদের তুলনায় অনেক উঁচুতে ছিলো। নিজের

৩২. **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, পৃ. ৫৭-৫৭।

৩৩, **সমাচার দর্পণ**, ১৬ অক্টোবর ১৮১৯, **সসেক** ১, পৃ. ১২১।

তখন বালাম চাল প্রতিমণ ১৵. থেকে ১৶. দরে বিক্রয় হতো।—**সমাচার দর্পণ**, ১২ **জানুআরী** ১৮২২, সসেক ১, পৃ. ১৪৪।

৩৪. উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, **বিনোদিনীর ও তারা সুন্দরী** (কলিকাতা, ১৩২৬), পৃ. ৫৭-৫৮; বিনোদিনী দাসী, **বিনোদিনীর কথা বা (আমার কথা)** (নব সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩২০), পৃ. ৬৮।

৩৫. **কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত** (কলিকাতা, ১৯৩৭), পৃ. ৪৮-৪৯।

৩৬. কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, **সাহিত্য**, অগ্রহায়ণ ১৩০৩, পৃ. ৪৮০।

৩৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা,' **তত্ত্বপ**, ১ শ্রাবণ, ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), পৃ. ৩১৩, ৩১৫।

৩৮. অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্বপ**, ১ আশ্বিন ১৭৬৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৪৫), পৃ. ২১৭।

নাম দিয়ে পরিচিত হতে হলে সেকালের নারীদের হয় সুন্দরী বেশ্যা নয়তো জমিদার হতে হতো। রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রমুখের চেয়ে নিকী, বকনা পিয়ারী, নান্নিজান, মুন্নিজান প্রভৃতি বেশ্যার পরিচিতি ও খ্যাতি ন্যূন ছিলো না।[৩৯]

এরূপ শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী সে যুগের বাবুরা তাই স্ত্রীদের নিকট গমন করার প্রয়োজনীয়তা মাসান্তে কি বৎসরান্তেও হয়তো বোধ করতেন না।[৪০] বাইরে এঁরা গণিকার সঙ্গে আমোদে মগ্ন থাকতেন, অন্যদিকে অবলা স্ত্রী কারাগার সদৃশ অন্তঃপুরে বন্দী থেকে মনোদুঃখে দগ্ধ হতেন। বাবুরা স্ত্রীর কাছে ব্যভিচার লুকানোর চেষ্টাও করতেন না। উল্টো অনেক সময় স্ত্রীর চোখের সামনে স্বতন্ত্র গৃহে রক্ষিতাকে রেখে স্ত্রীর কানের কাছে তার গান, বাদ্য, হাস্যকৌতুকাদির উল্লাসধ্বনি বিস্তার করে স্ত্রীর যন্ত্রণাকে শতগুণে প্রবল করে তুলতেন।[৪১] নববাবু বিলাসের নায়ক এমনি একজন বাবু। তার স্ত্রীও সেকালের অত্যাচারিত স্ত্রীদের প্রতিনিধিস্বরূপ। এই বাবুকে আমরা একবারই অন্তঃপুরে গমন করতে দেখি,—সে কেবল স্ত্রীর অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করার জন্যেই।[৪২] বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায় নাটকেও হুবহু অনুরূপ একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে।[৪৩]

কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির হলেও, শহরে চাকুরীরত ব্যক্তিদের স্ত্রীরাও পূর্বোক্ত বাবুদের নাগরিকা স্ত্রীদের চেয়ে কম অবহেলা এবং তাচ্ছিল্য লাভ করতেন না। সেকালের নিয়মানুসারে চাকুরেগণ স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যেতে পারতেন না। স্ত্রীরা থাকতেন স্বামীর গ্রামের বাড়িতে। আর দৈহিক তাগিদে চাকুরেগণ গণিকার কাছে যেতেন।[৪৪] ফলে তৃপ্ত স্বামী অনেক সময় দীর্ঘদিনের মধ্যে হয়তো একবারও স্ত্রীর কাছে যেতেন না কিন্তু ব্যভিচারী স্বামীর বিরহকাতর স্ত্রী তবু সতীত্ব বজায় রাখতেন।[৪৫]

সমাজের এরূপ নৈতিক আদর্শ ও স্ত্রীর প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাহীন মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের গৌরব সামান্যই ছিলো। ভারতচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ

৩৯. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী**, পৃ. ৯৭।

৪০. রামমোহন রায়, **সহমরণ বিষয়ে ইত্যাদি**, **রামমোহন গ্রন্থাবলি**, পৃ. ২০৭।

৪১. অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্বপ**, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫-০৬।

৪২. ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, **নববাবুবিলাস**, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৭-৩৮), পৃ. ৩৬-৩৭।

৪৩. এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশ দ্রষ্টব্য।

৪৪. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, সাহিত্য, পৃ. ৪৮০; **কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত**, পৃ. ৪৯-৫০।

৪৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্বপ**, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৬।

করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাকে আধুনিক অর্থে আদর্শায়িত প্রেম বলে আখ্যায়িত করা শক্ত। নীরদচন্দ্র চৌধুরী যে বলেছেন, রোম্যানটিক প্রেম য়োরোপীয় বস্তু, বঙ্গদেশে তার আগমন বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে,[৪৬] বর্তমান সমাজের মনোভাবের ইতিহাস আলোচনা করলে তার সত্যতা সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না।

আসলে নরনারীর আকর্ষণ যে পর্যায়ে দেহকে কেন্দ্র করেই দেহের উর্ধ্বে উপনীত হয় এবং কামের পরিবর্তে প্রেম নাম ধারণ করে, এই সমাজের প্রতিবেশ তার অনুকূল ছিলো না। মেয়েদের প্রতি সে সমাজের সীমাহীন অশ্রদ্ধা এবং তাচ্ছিল্য প্রেমের মান উন্নয়নের সহায়ক ছিলো না। অন্যদিকে প্রেমের উচ্চ আদর্শ না থাকায় মেয়েদের সামাজিক মর্যাদাও উন্নত হতে পারেনি। আলোচ্যকালে মেয়েদের শরীরটা পাওয়ার জন্যেই সচেষ্ট থাকতেন পুরুষ সমাজ। বহু বছর স্বামী-স্ত্রী হিশেবে বাস করার পরেও উভয়ের কাছে উভয়ের মন হয়তো অজানাই থাকতো। আর ঘরের অশিক্ষিতা, লজ্জাবতী আচার-ব্যবহারে ছলাকলাবিহীন, কাম-ক্রীড়ায় নৈপুণ্যবর্জিত স্ত্রীর বদলে অনেকেই নাচ-গান জানা, কামক্রীড়ায় প্রশিক্ষিত, অসঙ্কুচিত বাইজি বা বেশ্যাকেই বেশি পছন্দ করতেন। এবং অর্থ থাকলে তাদেরই উপভোগ করার চেষ্টা করতেন।[৪৭] অনেকে আবার বিয়ের পরে স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে একটি অতিরিক্ত উপপত্নীর মতো কিছুকাল ব্যবহার করে, তার পর পুরোনো হলে পরিত্যাগ করতেন। বাবু তখন পুনরায় ফিরে যেতেন বেশ্যার কাছে এবং স্ত্রী কার্যত বিধবার মতোই[৪৮] জীবন যাপন করতেন।[৪৯]

এই সমাজে ভালোবাসা এমন মামুলি জিনিশ ছিলো যে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী ভালোবাসার গভীরতা বোঝাতে গিয়ে স্ত্রীকে দেওয়া অলঙ্কারের পরিমাণ নির্দেশ করতেন।[৫০] অপর পক্ষে স্ত্রীর ভালোবাসা নির্ণীত হতো স্বামীর প্রতি তার আনুগত্য

৪৬. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী**, পৃ. ৬১-১০৬।

৪৭. সম্ভবত স্ত্রী ও বেশ্যার তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করেই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কাল পরেও লিখেছিলেন যে পুরুষদের বেশ্যাগমন বা বেশ্যাসক্তি নিবৃত্তির জন্যে স্ত্রীদের সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, পৃ. ২৩৮-৪৩।

৪৮. দীনবন্ধু মিত্রের **সধবার একাদশী** নাটকের নামকরণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৪৯. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী**, পৃ. ১৫১-৫২।

৫০ দীনবন্ধু মিত্রের **জামাই বারিক** নাটকের পদ্মলোচন এমনি একটি স্বামী। দুই স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা সমান এটা বোঝাতে গিয়ে সে বলে : 'আমার কাছে ইতরবিশেষ নাই, গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড় রাণীকে অধিক।' **জামাই বারিক**, পৃ. ২৪।

দিয়ে। সত্যিকার প্রেম থাক বা না-থাক, সর্বত্রই বিয়ের ছোট শরিক স্ত্রীর নিকট থেকে বড়ো শরিক স্বামী সার্বিক আনুগত্য দাবি করতেন। এই আনুগত্য ও পরাধীনতা যতো নিরঙ্কুশ হতো, স্ত্রীর ভালোবাসা ততোই গভীর বলে বিবেচিত হতো। মেয়েদের অধীনতাকেই সেকালের পুরুষসমাজ ভালোবাসা আখ্যা দিয়ে গিলটি করে রাখতেন।[৫১] অসমভাগী বলে স্ত্রীর আচরণে স্বামীর সব সময়ই বক্তব্য থাকলেও, স্বামীর সকল আচরণ ছিলো প্রশ্নাতীত। স্ত্রীর সতীত্ব শতকরা একশ ভাগ কাম্য হলেও, স্বামী নিজে বেপরোয়াভাবে অসৎ হতে পারতেন।[৫২] অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগ বিয়ের নিয়মানুসারে কেবল স্ত্রীর বেলাতেই প্রযোজ্য হতো, 'পুরুষ অন্যপ্রকার দাম্পত্যসুখ ভোগ করলে দোষের হয় না।'[৫৩] সহস্রবার স্খলিতপদ হলেও সমাজ পুরুষকে গ্রহণ করতো, কিন্তু সুকুমারমতি কামিনী একবার স্খলিতপদ হলেও সমাজ তাঁকে আর গ্রহণ করতো না।[৫৪]

প্রকৃত পক্ষে, সব ব্যাপারেই স্ত্রীরা স্বামীদের তুলনায় হীন এবং নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতেন। এজন্যেই ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তাঁদের অসমান মনে করা হতো। তাঁদের মন আছে এবং সে মন সাধনার দ্বারা জয় করা প্রয়োজন, এটা অনেকই স্বীকার করতেন না।

এমন কি, মেয়েরা যে মানসিক শক্তির অধিকারী—সমাজ বোধ হয় এটাও চিন্তা করতো না। রামমোহন যখন বলেন, 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? ... আপনার বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?'[৫৫] এবং সেই সঙ্গে লীলাবতী প্রমুখ প্রাচীন যুগের মহিলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন মহিলাদের মানসিক ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যে, তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তাঁর সমকালীন সাধারণ সমাজ মেয়েদের সম্পর্কে কী রকমের মনোভাব পোষণ করতো। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর নাটকে রাধামণি নামক একটি অশিক্ষিত মেয়ের অভিনয় দেখে জনৈক দর্শক যখন উত্তেজিতভাবে লেখেন—

এ উক্তি থেকে ভালোবাসা ও অলঙ্কারের যোগাযোগ উপলব্ধি করা যায়। তার উক্তি এত স্বাভাবিক এবং সহজ যে বোঝা যায় অলঙ্কারের সঙ্গে ভালোবাসার সত্যি সত্যি একটা যোগসূত্র ছিলো।

৫১. 'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র', জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ২৬৩।
৫২. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪৫), পৃ. ২০৩।
৫৩. 'বঙ্গীয় বিবাহ', জ্ঞানাঙ্কুর, আশ্বিন ১২৮১, পৃ. ৪৯৯।
৫৪. 'সতী কি কলঙ্কিনী', আর্যদর্শন, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২৪৮।
৫৫. রামমোহন রায়, রামমোহন গ্রন্থাবলি, পৃ. ২০৫।

Was not her ingenuity...sufficient to convince those who charge Nature for being partial to men that the Hindu females are as well fitted to receive education as their superior lords?[৫৬]

তখনো আমরা বুঝতে পারি সাধারণ মানুষের মনোভাব কী ধরনের ছিলো। মেয়েদের সম্পর্কে এই নীচ ধারণা দূর করার জন্যে ১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত[৫৭], ১৮৫০ সালে মদনমোহন বিদ্যালঙ্কার[৫৮] এবং ১৮৩৫ সালে কৈলাসচন্দ্র দত্ত[৫৯] ওকালতি করেন। কৈলাসবাসিনী দেবী কলম ধরেন ১৮৬০-এর দশকে।[৬০] কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভাবতে অবাক লাগে, অনেককাল পর্যন্ত এই মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিলো। তাই ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে অন্য একজন সমাজ সেবক মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা যে পুরুষের মতোই এই কথাটা বহু যত্নে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[৬১]

মেয়েদের মানসিক শক্তি বিষয়ে সমাজের এই মনোভাব এতো গভীরে প্রোথিত ছিলো যে, মেয়েরা নিজেরাও মনে করতেন, তাঁদের সত্যি লেখাপড়া শেখার মতো মানসিক শক্তি নেই।[৬২]

স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা

এই পরিবেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন না থাকারই কথা। এবং বাস্তবে দেখতে পাই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন বলতে গেলে মোটেই ছিলো না। উইলিআম অ্যাডাম তাঁর ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালের

৫৬. **Hindu Pioneer**, 22 Oct. 1835, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, **রহস্য সন্দর্ভ** (কলিকাতা, ১৮৯৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৮-৯।

৫৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা', **বিদ্যাদর্শন**, আষাঢ় ১৭৬৪ (জুন-জুলাই ১৮৪২), **সাবাস** ৩, পৃ. ৫৭৬-৭৮।

৫৮. মদনমোহন বিদ্যালঙ্কার, 'স্ত্রী শিক্ষা', **সর্বশুভকরী পত্রিকা**, আশ্বিন ১৭৭২ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৫০), **সাবাস** ৩, পৃ. ৫৪৩-৪৪।

৫৯. K. Bose, 'On the Education of Hindoo Females', in **Selections from the Bethune Society Papers, edited by the President and the Committee of Papers, No. 3** (Calcutta, 1857), pp. 142-49.

৬০. কৈলাসবাসিনী দেবী ১৮৬০-এর দশকে তিনখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

৬১. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব**, প্রথম পরিচ্ছেদ, মন্ত্রতন্ত্র; স্ত্রীশিক্ষা, **ভারত সুহৃদ**, অগ্রহায়ণ ১২৮৩, পৃ. ২৭৪।

৬২. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি** (কলিকাতা, ১৮৬৫), পৃ. ৩১।

বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলেন যে, কজন বিধবা জমিদার বা জমিদার-কন্যা ছাড়া তখনকার সকল মেয়েই অশিক্ষিত ছিলেন।[৬৩] এছাড়া কিছু বিধবা, বিশেষত সন্তানহীন অভিজাত ঘরের বিধবা, ধর্ম গ্রন্থাদি পড়ার জন্যে লেখাপড়া শিখতেন বলে জানা যায়।[৬৪] কিন্তু এ ধরনের কয়েকটি বিরল দৃষ্টান্ত ব্যতীত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন কার্যত একেবারেই ছিলো না।[৬৫] ১৮১৯ খৃস্টাব্দে শিক্ষিত রমণীদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রামমোহন যেভাবে লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, কালিদাসের পত্নী ও মৈত্রেয়ীর নামোল্লেখ করেন[৬৬] এবং ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সমকালীন দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কেবলমাত্র রাণী ভবানী ও হটি বিদ্যালঙ্কারের উল্লেখ করেই থেমে যান,[৬৭] তা থেকে বোঝা যায়, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী কেন, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার ধারা কোনো কালেই তেমন স্ফূর্তি লাভ করেনি। বরং স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী বহু মনোভাব ও বিশ্বাস এই সমাজের গভীরে মূল প্রোথিত করে।

লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়, এ বিশ্বাস সেকালে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।[৬৮] তা ছাড়া, মেয়েরা কালীর আঁচড় দিলেই গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে এ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিলো।[৬৯] শিক্ষা পেলে মেয়েরা অসতী হবেন,[৭০] অহঙ্কারবশত

৬৩. W. Adam, **Reports on the State of Education in Bengal 1835 & 1838**, ed. by A. Basu (Reprint; Calcutta, 1941), p. 187.

৬৪. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি, পৃ. ১৩-১৪; ঈশানচন্দ্র বসু, 'স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ (১)', **নব্যভারত**, ফাল্গুন ১২৯৯, পৃ. ৫৫৯-৬০।

৬৫. প্যারীচাঁদ মিত্র অবশ্য মনে করেন, কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা বিদ্যাভ্যাস করতেন। নিজের পরিবারের কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, 'While a pupil of the Pathshala at home (১৮২০-এর দশক), I found my grandmother, mother and aunts reading Bengali books. They could write in Bengali and keep accounts; **আধ্যাত্মিকা** (কলিকাতা, ১৮৮০), Preface, p. 1.

৬৬. রামমোহন রায়, **সহমরণ বিষয়ে** ইত্যাদি, পৃ. ২০৫-০৬।

৬৭. গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, **স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক**, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৪৪), পৃ. ২৯-৩০।

৬৮. দ্রষ্টব্য: গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, **স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক**, পৃ. ৪; W. Adam, p. 187; মদনমোহন তর্কালঙ্কার পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৫-৪৬; প্যারীচাঁদ মিত্র, **রামারঞ্জিকা** (কলিকাতা, ১৮৬০), পৃ. ২; কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের**, ইত্যাদি, পৃ. ৭; ঈশানচন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১; কৈলাশবাসিনী দেবী, **হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা**, (কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ, ১৮৬৩), পৃ. ৬৫।

৬৯. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি, পৃ. ৭।

৭০. 'স্ত্রীবিদ্যার ইতিহাস প্রাচীন কাল অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত,' **'সংবাদ প্রভাকর**

স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের অবাধ্য হবেন,[৭১] পাঠশালায় যাওয়ার সময়ে অথবা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে তাঁদের কৌমার্য অপহৃত হবে,[৭২] ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করলে তাঁরা ইয়ং বেঙ্গলদের মতো উচ্ছৃংখল আচরণ করবেন[৭৩]—এসব আশঙ্কাও সাধারণ লোকের মনোভাবকে প্রভাবিত করতো। কেউ কেউ মনে করতেন, স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।[৭৪] এই সব আন্তরিক বিশ্বাস এদেশে স্ত্রীশিক্ষা অপ্রচলিত রাখে। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বস্তুত সাধারণের মনোভাব এতোই প্রতিকূল ছিলো যে, মেয়েরা নিজেরাও শিক্ষিত মেয়েদের ডাইনীর মতো অমঙ্গলের প্রতীক বলে গণ্য করতেন এবং আপন-আপন সন্তানদের এঁদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে রাখতেন।[৭৫]

অশিক্ষিত জনসাধারণের তো কথাই নেই, সেকালের সমাজের প্রধান প্রধান শিক্ষিত নেতাও স্ত্রীশিক্ষাকে স্বাগত জানাতে পারেননি। বিশেষত বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর মনোভাবের সঙ্গে তাঁরা কখনোই আপোস করতে পারেননি। রাধাকান্ত দেবকে কেবল কলকাতার হিন্দু সমাজের প্রধান ভাগের নেতা বলেই চিহ্নিত করা ঠিক নয়, সেই সঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যকেও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনে তিনি যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন তাকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করলে দূষণীয় হয় না।[৭৬] স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি যে সচেতন ছিলেন না, তা-ও নয়। তিনিই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে **স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক** গ্রন্থটি লিখতে অনুপ্রেরণা দান করেন এবং রচিত হওয়ার পরে প্রকাশের জন্যে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনিই স্কুল বুক সোসাইটিকে দান করেন।[৭৭] দীর্ঘকাল পর্যন্ত লোকেদের ধারণা ছিলো তিনিই এ গ্রন্থের

১৩ জুলাই ১৮৪৯, **সাবাস** ১, পৃ. ৩১৬-১৭ : মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২ ; কৈলাসবাসিনী দেবী **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি, পৃ. ১২।

৭১. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২।

৭২. 'স্ত্রীশিক্ষা ও চন্দ্রিকায়', **সংবাদ প্রভাকর**, ১২ মে ১৮৪৯, **সাবাস** ১, পৃ. ৩১১।

৭৩. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বর্তমান ব্যবহার', **তত্ত্ব**, কার্তিক ১৭৭১ (অকটোবর-নভেম্বর ১৮৪৯), পৃ. ৮৪।

৭৪. কেষাঞ্চিৎ মতস্থ হিন্দুনাং, 'চিঠিপত্র', **সম্বাদ ভাস্কর**, ২৯ মে ১৮৪৯ : **সাবাস** ৩, পৃ. ৪০৬ ; মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২।

৭৫. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি, পৃ. ১৫ ;

৭৬. A.F.S. Ahmad, **Social Ideas and Social Change in Bengla,** pp. 20-23 ; D. Kopf, **British Orientalism etc.** pp. 194-96. যোগেশচন্দ্র বাগল, **রাধাকান্ত দেব** (পঞ্চম সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৯৫৭), পৃ ৭-১৭ ; ২২-৩৩।

৭৭. P.C. Mitter, **A Boigraphical Sketch of David Hare** (Calcutta, 1877), p. 65.

রচয়িতা।[৭৮] প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অনুকূল মনোভাব অভ্রান্তভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনি কিংবা তাঁর অনুগামীগণ মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা মোটেই সমর্থন করেননি।[৭৯] রাধাকান্ত দেব তাঁর নিজের পরিবারে অন্তঃপুরেই মেয়েদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

রাধাকান্ত দেবের মতো কাশীপ্রসাদ ঘোষের নামও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কলেজে উত্তম ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীকালে *Hindu intelligencer* পত্রিকার সম্পাদক, কাশীপ্রসাদ নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করেন।[৮০] সমাচার চন্দ্রিকা, *Literary chronicles* ইত্যাদি পত্রিকাও স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করে।[৮১] মোট কথা, নারীদের মানসিক ক্ষমতা আছে এবং বিদ্যা-শিক্ষার মাধ্যমে সেই ক্ষমতার উপলব্ধি করতে পারলেও মেয়েদের এই অধিকার দিতে চাইতেন না বা দিতে কুণ্ঠিত হতেন।

স্ত্রীশিক্ষা তথা নারীমুক্তি সম্পর্কে সচেতনতার উন্মেষ

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এদেশের শিক্ষিত ও য়োরোপীয় ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত সমাজকর্মীগণ ধীরে ধীরে নারীদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দেশীয় মহিলাদের সঙ্গে য়োরোপীয় মহিলাদের চাক্ষুষ পার্থক্য দৃষ্টে এবং সমকালীন ইংলণ্ডীয় নারীমুক্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কর্মীগণ এ সংস্কারের অনুপ্রেরণা লাভ করেন এমন মনে করার কারণ আছে। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে একজন সমাজ-সমালোচক মন্তব্য করেন যে, ইংরেজ সভ্যতার প্রভাবে এদেশে নারীজাতির অবস্থাই উন্নত হয়নি, এমন কি কন্যার প্রতি স্নেহও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কর্ম উপলক্ষে বিদেশ গমন কালে কেউ শিশুকন্যার জন্য কাঁদেন, কন্যাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর সময় কাঁদেন, অথবা বিধবা কন্যাকে উপবাস করতে দেখে জননী উপবাস করেন। কিন্তু আগে কন্যা

৭৮. D. Kopf প্রকৃত পক্ষে এ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁরই নাম করেন। **British Orientalism**, p. 195 ; A. F.S. Ahmed বলেন, তিনি একজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। **Social Ideas** etc. p. 29.

৭৯. দ্রষ্টব্য: বেথুনকে লেখা রাধাকান্ত দেবের পত্র, ১৮৪৯ J.C. Bagal-এর **In Eastarn India** (Calcutta, 1952) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৮০. P. Sinha, **Nineteenth Century Bengal**, p. 110. **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, পৃ. ২২০।

৮১. 'স্ত্রীবিদ্যা ও চন্দ্রিকা', সংবাদ প্রভাকর, সাবাস ৯ পৃ. ৩১১, 'সম্পাদকীয়', সংবাদ প্রভাকর, ৭ অগস্ট ১৮৫০, সাবাস ১, পৃ. ৩১৭।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ এতোটা ছিলো না।[৮২] প্রকৃত পক্ষে, ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই হয়তো এ দেশের সংস্কারকগণ তাঁদের সমাজের অর্ধাংশ নারীদের প্রতি সচেতন হন এবং তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্যে ইংলণ্ডীয় আদর্শের অনুকরণ করতে থাকেন।

প্রসঙ্গত আমরা ইংলণ্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে স্মরণ করতে পারি। প্রাচ্যের নিদারুণ হীনাবস্থার তুলনায় কিঞ্চিৎ উন্নত হলেও, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও মেয়েদের অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না। এদেশের মতোই সেখানেও স্বামীই ছিলেন গৃহের সর্বময় কর্তা, স্ত্রী এবং তার সম্পত্তির উপর স্বামীর অধিকার ছিলো নিরঙ্কুশ।[৮৩] স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা এদেশের তুলনায় বহুগুণ ভালো হলেও, পুরুষদের সঙ্গে এ বিষয়ে সমান অধিকারের দাবি মহিলারা করতে পারতেন না।[৮৪] বিশেষত তাঁদের জন্যে উচ্চশিক্ষা ছিলো নিষিদ্ধ। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের আগে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২০-এর আগে অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২৩-এর আগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের ডিগ্রি পাওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেয়নি।[৮৫] ১৮৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডের মেয়েদের ভোটাধিকারের আন্দোলন পর্যন্ত শুরু হয়নি, ভোটাধিকার লাভ করা তো দূরের কথা। বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারবিষয়ক আইনের প্রথম বিল পার্লামেন্টে ১৮৭০ সালের আগে পেশ করা হয়নি। সুতরাং বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ মহিলাদের বহু বিষয়েই মৌল অধিকার ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে ইংলণ্ডীয় সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ সচেতন হতে থাকে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে মহিলা এবং পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের কর্মীগণই আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেন। (বঙ্গদেশের সঙ্গে এখানটায় একটা বড়ো পার্থক্য লক্ষণীয়)। একদিকে Mary Wollstonecraft, Mary Anne Radcliffe, Hannah More, Mary Berry, Mary Somerville, Caroline Norton, Mary Hay প্রমুখ মহিলা, অন্যদিকে Dr. Gregory, Thomas Gisborne, William Thompson,

৮২. 'বঙ্গমহিলাদের বর্তমান অবস্থা', তমোলুক পত্রিকা, ১২৮১, পৃ. ২২০।

৮৩. J. Evans, **The Victorians** (Cambridge, 1966), p. 3.

৮৪. রুশোর মতো মনীষীও পুরুষের তুলনায় মহিলাদের নিকৃষ্ট করে চিত্রিত করেছেন। See M. Wollstonecraft, **The Right of Women** (Reprint, London, 1955), pp. 29-30.

৮৫. 'Legal Position of Women', in **Encyclopaedia Britannica**, Vol. 21 (1966), p. 707.

J. S. Mill প্রমুখ পুরুষ কর্মী নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে নানা রচনা প্রকাশ করেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করেন।[৮৬]

ইংলণ্ডের সমাজকর্মীগণের নারীমুক্তি আন্দোলনের সংবাদ জেরিমি বেন্থামের বন্ধু রামমোহন কিংবা হেনরি লুই ভিভিআন ডিরোজিও-র ছাত্রদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই পেঁৗছে গিয়েছিলো। রামমোহন কিংবা ইয়ং বেঙ্গলগণ সমকালে অনুকরণীয় আদর্শের খোঁজে ইংলণ্ডের দিকেই তাকাতেন, যেমন ইংলণ্ডের প্রগতিশীল কর্মীগণ আলোচ্য সময়ে তাকাতেন ফ্রান্সের দিকে।[৮৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ডে ১৮১০ ও ১৮২০-এর দশকেই চার্চবিরোধী প্রগতিশীল সেক্যুলার আন্দোলন দানা বেঁধেছিলো। একদিকে জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুআর্ট মিল, রবার্ট আওয়েন, রিচার্ড কার্লাইল প্রমুখ চিন্তাবিদ অন্যদিকে শেলী, বায়রন, কিটস প্রমুখ রোমান্টিক কবি মিলে এ সময়ে চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তার ঢেউ বহুদূরে হলেও বঙ্গদেশীয় চিন্তার তটভূমিকে আঘাত করেছিলো। যেকালে ইংলণ্ডে রিচার্ড কার্লাইলের প্রচেষ্টায় টম পেইনের রচনাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সেই সময়েই কলকাতায় কালো বাজারে চড়া দরে টম পেইন বিক্রি হচ্ছিলো।[৮৮]

সরাসরি ইহলৌকিকতার আন্দোলন ছাড়াও, ১৮১০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে (১৮১৫) ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে ইউনিটারিআন আন্দোলন বিকাশ লাভ করে, আপাত দৃষ্টিতে ধর্মীয় আন্দোলন হলেও তাও আসলে ইহলৌকিকতারই আন্দোলন। ইউনিটারিআনগণ দেবতাবর্জিত যে নতুন ধর্ম প্রচার করেন, তা সর্বতোভাবে নৈতিকতা ও মানুষের সামাজিক কল্যাণেরই আন্দোলন। ইংলন্ডে এঁরা নারীমুক্তি এবং শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের যে বিরাট প্রয়াস পরিচালনা করেন, বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কারকগণ তার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। একথা বোধ হয় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বঙ্গদেশের ১৮১০ ও ১৮২০-এর দশকের সবচেয়ে বড়ো সংস্কারক রামমোহন রায়ের সঙ্গে ল্যান্ট কার্পেন্টার ও অন্যান্য

৮৬. For details see D.M. Stenton, Ch. XI.

৮৭. ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এ সম্বন্ধে বেন্থাম লেখেন, "Whatsoever has been done and is doing in France will soon be done in Britain. Reader would you wish to know the lot designed for you? Look to France, there you may behold it" Quoted in E. Halevy, **A History of the English People in the Nineteenth Century,** Vol. II. p. 26.

৮৮. A. F. S. Ahmed, p. 42.

ইউনিটারিআন নেতাদের যে যোগাযোগ ঘটে, বর্তমান প্রসঙ্গে সেই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইউনিটারিআন সামাজিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।[৮৯]

১৭৯৯ খৃস্টাব্দে উইলিআম কেরীর নেতৃত্বাধীনের শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে খৃস্টান ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যেও মিশনারিগণ কম প্রযত্ন করেননি।[৯০] তাঁদের ধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করলেও এদেশবাসীরা বিশেষত শিক্ষিত ব্যক্তিরা গঙ্গাসাগরে শিশু হত্যা, সতীদাহ ইত্যাদির মতো বিবিধ সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা না করে পারেননি। অন্তত তাঁদের সংস্কার প্রয়াস দেখে এ দেশবাসীরা নিজেদের সমাজের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন — এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু প্রভাব—য়োরোপীয় উদারনৈতিক ভাবধারা অথবা খৃস্টানি মানবতা—যারই প্রবল হোক না কেন, এক কথায় পাশ্চাত্যের প্রভাবেই কলকাতার ভদ্রলোক নেতাগণ মেয়েদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। এই পরিবেশে রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীদাহের অমানবিকতা, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীলোকের দাম্পত্য জীবনের দুর্গতি, রাধাকান্ত দেব ও গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্ত্রীলোকের অশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের সচেতনতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। প্রকৃত পক্ষে, ১৮২০-এর দশকেই বাঙালি সমাজে এই চেতনার উন্মেষ হলো—'মেয়েরা কি মানুষ নয়?'

পরের দশকে প্রথমে প্রবাসবশত এবং পরে মৃত্যুর দরুন রামমোহন সংস্কার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন, স্কুল বুক সোসাইটির কার্যক্রম স্তিমিত হয় এবং গৌড়ীয় সমাজের মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অবলুপ্ত হয়। অপর পক্ষে সমাজের একটা বড়ো অংশই ঝুঁকে পড়ে ঐতিহ্যের দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের একাংশ নারীদের অধিকার সম্পর্কে পূর্ব দশকের তুলনায় অধিকতর সচেতন হন। ডিরোজিও-র[৯১] মতো যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক শিক্ষকের কাছ থেকে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারার

৮৯. D. Kopf, **The Brahmo Samaj and The Shaping of Modern India Mind** (Princeton, 1979), Chapters I, 2 & 3.

৯০. E. D. Potts, pp. 139-68

৯১. দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ, **বিদ্রোহী ডিরোজিও** (কলিকাতা, ১৯৬১); T. Edwards, 'Henry Louis Vivian Derozio,' **Calcutta Review,** Vol. LXXII (1881), pp. 280-310; LXXIII (1881), pp. 35-77.

পরিচয় পেয়ে নব্যবঙ্গের ইংরেজি-জানা যুবকগণ কেবল এই প্রশ্ন উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না যে 'মেয়েরা কি মানুষ নয়?' বরং তাঁরা ঘোষণা করলেন, মেয়েরা মানুষ এবং পুরুষের সমান মর্যাদা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। নারীজাতির মানসিক ক্ষমতা আছে এবং তাঁরা পুরুষের সেবায় প্রাণপাত করেন, আমরা লক্ষ্য করেছি পূর্বেই রামমোহন এদিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলগণ বললেন, সমাজ মেয়েদের উপর যেভাবে অত্যাচার করে তা অমানুষিক এবং প্রকৃতি নিয়মবিরুদ্ধ, বিধাতার অনভিপ্রেত।[৯২] মহিলাদের প্রতি পুরুষ শাস্ত্রকারদের পক্ষপাতদুষ্ট বিধান জারির উল্লেখ করে ডিরোজিও শিষ্যদের পত্রিকা জ্ঞানান্বেষণে লেখা হয়—

> এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ম যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি তদর্থে বেদ পাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞান যোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধূমে চক্ষুজ্বালা হস্তদাহ প্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরম সুখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান লিখিলেন...।[৯৩]

কিন্তু শাস্ত্রকারদের বিধান যেমনই হোক না কেন, যুক্তির আলোকে বিচার করে নব্যশিক্ষিতগণ তা মেনে নিতে পারলেন না, তাঁরা ঘোষণা করলেন—

> জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্যজনের দাস হইবে কিম্বা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক!... স্ত্রীলোকেরদিগের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকদিগেরে অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্বতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান...।[৯৪]

'স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান'—এ চেতনার উন্মেষ এবং এরূপ ঘোষণা বঙ্গদেশে ১৮৩০-এর দশকেই প্রথম শোনা যায়। এর বহু শতাব্দী আগে মহানির্বাণতন্ত্র অথবা বৃহৎসংহিতায় বিচ্ছিন্নভাবে নারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তার প্রকৃতি ছিলো ভিন্ন ধরনের এবং আধুনিক বঙ্গ সমাজের মনোভাব আলোচনা প্রসঙ্গে তা অবান্তর।

তবে ইয়ং বেঙ্গলদের কণ্ঠস্বর সমগ্র সমাজের তুলনায় ছিলো নিতান্ত ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট। তা ছাড়া ঐতিহ্যবিরোধী আচার-ব্যবহারের দ্বারা তাঁরা বৃহৎ সমাজের থেকে

৯২. জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭,-এ উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ ২৬২-৬৩।

৯৩. জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, ৫ জানুআরি ১৮৩৩,-এ উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ. ৯৬।

৯৪. জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭,-এ উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ. ২৬২-৬৩।

বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে একটি সীমিত পরিধির মধ্যে ঝড় তুললেও, তাঁদের আন্দোলন সাধারণদের মধ্যে কোনো অনুকূল সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি। তার জন্যে প্রয়োজন ছিলো ভারতীয় ঐতিহ্যের আরো কাছাকাছি অবস্থান করে রক্ষণশীল সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই আহ্বান জানানোর। ১৮৪০-এর দশকের বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকাকে অবলম্বন করে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ এই আহ্বান জানান।

১৮৩০-এর দশকের ইয়ং বেঙ্গলদের তুলনায় অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনোভাব ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির এবং কোনো কোনো বিষয়ে আদর্শায়িত। ইয়ং বেঙ্গলগণ বলেছিলেন, মেয়েরা পুরুষের সমান, অন্যদিকে অক্ষয়কুমার বললেন, বহু বিষয়ে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় উন্নত ও উৎকৃষ্ট। সমকালীন সমাজের নারীদের নৈতিক মান সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় প্রশংসা করা হয়নি, বরং দুঃখের সঙ্গে এবং কৈফিয়তের সুরে বলা হয় যে, 'স্ত্রীলোকেরা কিছুমাত্র উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত ও যথার্থ অযথার্থ বোধ শিক্ষা না পাইলে তাহারদিগের মন সৎপথে থাকিবে' এমন ভরসা করা যায় না।[৯৫] অপর পক্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ পুরুষসমাজের চরম নৈতিক অবনতির সঙ্গে তুলনা করে মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। পুরুষেরা সম্বৎসর পাপাচারে মগ্ন থাকেন, মাসান্তে, কেউ কেউ বৎসরান্তেও একবার স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকান না, সন্তানদের প্রতিও কর্তব্য পালন করেন না, 'তথাপি অনেক স্ত্রী অধর্মকে ঘৃণা করিয়া এবং ধৈর্যকে অবলম্বন করিয়া···সতীত্বকে প্রতিপালন করে,···তাঁহারদিগের ভার্যারা কোন জ্ঞান অভ্যাস না করিয়াও··পাপ হইতে পবিত্র রহিয়াছে···'।[৯৬]

যে মহিলারা ব্যভিচারিণী, অক্ষয়কুমার তাঁদেরও কোনো অপরাধ দেখতে পাননি। বরং এর জন্যে তিনি পুরুষদেরই দোষারোপ করেন। তাঁর মতে, কোনো কোনো মহিলা পুরুষের দোষেই সতীত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হন।[৯৭]

৯৫. জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩১,-এ উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ. ২৬৩। প্রায় একই সময়ে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে সংবাদ সুধাকর পত্রিকায় একটি বাবুর বাড়ির পুরুষ মহিলা সকলের ব্যভিচারের চিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, এই মহিলাদের ব্যভিচারের কারণ তাঁদের শিক্ষার অভাব এবং সেজন্য পুরুষ সমাজই দায়ী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাড়ির পুরুষ সদস্যদের ব্যভিচারের নিন্দা না করে পত্রিকায় মহিলাদের ব্যভিচারেরই নিন্দা করা হয়। দ্রষ্টব্য : নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, পৃ. ৭০-৭১।

৯৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৬।

৯৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ পৌষ ১৭৬৬ (ডিসেম্বর ১৮৪৪), পৃ. ১৩৪। অক্ষয়কুমারের বহু শতাব্দী পূর্বে বৃহৎসংহিতা, নারীপুরুষের ব্যভিচারের তুলনামূলক আলোচনা

১৮৫০-এর দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্যারীচরণ সরকার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ রায় প্রমুখ মেয়েদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাঁদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রায় অক্ষয়-কুমারের অনুকরণে এক প্রবন্ধে বঙ্গদেশের নারীদের সঙ্গে বঙ্গদেশের পুরুষ এবং য়োরোপীয় নারীদের তুলনা করে, দেশীয় মহিলাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশংসা করেন।[৯৮]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪২ সালে বিদ্যাদর্শনে এবং ১৮৫৪ সালে বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার প্রতি সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।[৯৯] ১৮৫০ সালে প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধেও নারীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়।[১০০] কিন্তু স্ত্রীজাতির মুক্তির জন্যে তিনি সবচেয়ে বলিষ্ঠ আহ্বান জানান ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত বিধবাবিবাহ পুস্তিকার মাধ্যমে। অতঃপর ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত তাঁর লেখা বিভিন্ন রচনাতেই এই নারীমুক্তির আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে। বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ ইত্যাদি সংস্কার কর্মের পেছনে নারীসমাজের মুক্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিলো। ১৮৫০-এর দশকের শেষার্ধ স্কুলসমূহের পরিদর্শক হিশেবে তিনি সরকারী সাহায্যে এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় হুগলি, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে যে বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেন, তার উদ্দেশ্যও ছিলো নারীদের দুর্গতি মোচন।[১০১] তাঁর সাহিত্য-কর্মের মধ্যেও নারী-দের প্রতি এক আশ্চর্য দরদ প্রকাশিত হয়েছে।[১০২]

করে বলা হয় 'Conjugal fidality is enjoined on both husband and wife, and its violation by either is censured equally by Sastras, but men disregarded this, while women do not, hence women are superior to men'. Quoted in P. Thomas, **India Women Through the Ages**, p. 280.

৯৮. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'সতীত্ব', **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, ভাদ্র ১৭৭৪ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫২), পৃ. ১৭৩-৭৯।

৯৯. দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট **ক**'।

১০০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ', **সর্বশুভকরী পত্রিকা**, ভাদ্র ১৭৭২ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫০), **সাবাস ৩**, পৃ. ৫৩৫-৪১।

১০১. বিনয় ঘোষ, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, পৃ. ২২২-২৫; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**, পৃ. ৬৪-৭২।

১০২. সীতা, শকুন্তলা ইত্যাদি পৌরাণিক চরিত্রগুলির তিনি যে নতুন ব্যাখ্যাদান করেন, প্রসঙ্গত তা উল্লেখযোগ্য।—মুখলেসুর রহমান, 'শকুন্তলা ও সীতার বনবাস', গোলাম মুরশিদ (সম্পাদক), বিদ্যাসাগর (রাজশাহী, ১৯৭০), পৃ. ১৩৫-৩৯।

১৮৫০-এর দশকের নারীমুক্তি আন্দোলনের আর একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।[১০৩] ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে তিনি রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মাসিক পত্রিকা নামক একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। নারীদের উন্নতিই ছিলো এই পত্রিকার লক্ষ্য।[১০৪] ১৮৫৫ সালে *Calcutta Review* পত্রিকায় বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধ এবং ১৮৬০ সালে প্রকাশিত রামারঞ্জিকা গ্রন্থ রচনার পেছনেও প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো অনুরূপ। আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) এবং মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার উপায় (১৮৫৯) গ্রন্থদ্বয়েও স্ত্রীজাতির দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়। ১৮৮৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আরো কয়েকখানি পুস্তক তিনি নারীকল্যাণের কথা মনে রেখেই রচনা করেন।[১০৫]

সম্বাদ ভাস্করের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং এক পর্যায়ে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তারাশঙ্কর তর্করত্ন[১০৬] এবং দ্বারকানাথ রায়ও[১০৭] এই দশকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দান করেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং প্যারীচরণ সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দান করার জন্যে। ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে প্যারীচরণ[১০৮] এবং ১৮৫৪ সালে কলকাতায় সমাজোন্নতি বিধায়ক বান্ধব সভা স্থাপন করে কিশোরীচাঁদ মিত্র[১০৯] তাঁদের

১০৩. See 'Perry Chand Mittra', **Calcutta Review**, Vol. CXX 1905, pp. 237-60 : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র**, পৃ. ১৭৫-২১২।

১০৪. এ পত্রিকার ভূমিকায় বলা হয়, 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে,...বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। **বাংলা সাময়িকপত্র**, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১০৫. **এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা** (কলিকাতা, ১৮৭৯); **বামাতোষিণী** (কলিকাতা, ১৮৮১), এবং **আধ্যাত্মিকা** (কলিকাতা, ১৮৮০)।

১০৬. এঁর রচিত গ্রন্থ **স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা** (কলিকাতা, ১৮৫১)।

১০৭. ইনি **স্ত্রীশিক্ষা বিধান** গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, কার্তিক ১৭৭৯ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৫৭) সংখ্যায় সমালোচিত।

১০৮. দ্রষ্টব্য নবকৃষ্ণ ঘোষ, **প্যারীচরণ সরকার** (কলিকাতা, ১৯০২), পৃ. ৬৩-৬৯।

১০৯. মন্মথনাথ ঘোষ, **কর্মবীর কিশোরীচাঁদ**, পৃ. ১০০-০৬।

ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় যে সহায়তা দান করেন, তা-ও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে প্রায় ধর্মপ্রচারের উৎসাহ নিয়ে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সঙ্গীগণ স্ত্রীজাতির সংস্কার আরম্ভ করেন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে এই আন্দোলন সমাজের একাংশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে, কলকাতায় তো বটেই, কলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলেও নারীমুক্তি আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়। মেয়েদের শিক্ষাদান, অবরোধমোচন ও স্বাধীনতার পোষকতা করাকে কেশবচন্দ্রের অনুসারীগণ পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা মোচনের জন্যে আলোচ্যকালে রীতিমতো আন্দোলন আরম্ভ করেন।

উমেশচন্দ্র দত্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে (১৮৬৩ থেকে ১৯০৭) বামাবোধিনী পত্রিকা এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি অবলাবান্ধব (১৮৬৯-১৮৭৪, ১৮৭৯) পত্রিকার মাধ্যমে নারী জাতীর অতুলনীয় সেবা করেন। ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকের অবোধ বন্ধু, ভারত সুহৃদ, বঙ্গমহিলা, আর্যদর্শন প্রভৃতি পত্রিকাও স্ত্রীজাতির জাগরণের জন্যে কম চেষ্টা করেননি। আর্যদর্শন পত্রিকাকে আশ্রয় করে পূর্ণচন্দ্র বসু এবং নব্যভারতকে কেন্দ্র করে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও সিদ্ধেশ্বর রায়ের মতো লেখক নারী-প্রগতিমূলক যে সব রচনা প্রকাশ করেন, তার অনেকগুলি এক শতাব্দীর ব্যবধানে আজো উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেনি।

আলোচ্য দুদশকে কৈলাসবাসিনী দেবী, বামাসুন্দরী প্রমুখ লেখিকা, কুমুদিনী[১১০] প্রমুখ বিদূষী এবং রাধারাণী,[১১১] সৌদামিনী[১১২] প্রমুখ কর্মী নারীপ্রগতির জন্যে পুরুষের পাশাপাশি উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৬০-এর দশকে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী ১৮৭০-এর দশকে নারীপ্রগতির সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১১৩]

১১০. কুমুদিনীর জীবন বৃত্তান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য কুমুদিনীচরিত (কলিকাতা, ১৭৮৯, শকাব্দ, ১৮৬৭-৬৮)।

১১১. দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী এবং চিত্তরঞ্জন দাসের জেঠীমা। এঁর জীবন বৃত্তান্তের জন্যে দ্রষ্টব্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনালেখ্য (দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৮৭৯)।

১১২. এঁর জীবনীর জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ রাখালচন্দ্র রায়, জীবনবিন্দু (কলিকাতা, ১৮৮০)।

১১৩. পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এঁদের এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন; নয়তো সমাজের অর্ধাংশকে এমন পঙ্গু করে রেখে সমগ্র সমাজের উন্নতি বা কল্যাণ প্রত্যাশা অসম্ভব---এই সচেতনতার উদ্‌বোধন স্বাভাবতই নারীমুক্তির পথ সম্পর্কে সমাজকর্মীদের ভাবিত করে। কী খৃস্টান মিশনারীগণ, কী রামমোহন-রাধাকান্ত, কী ইয়ং বেঙ্গলগণ, কী অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর সকলেই অবশ্য মনে করেন মেয়েদের মুক্তির নিমিত্তে সর্বপ্রথমে তাঁদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে ভারতীয় বালিকা ভর্তির ঘটনা প্রথম উল্লিখিত হয় ১৮১৬-১৭ খৃস্টাব্দে[১১৪] অবশ্য এই বালিকারা ছিলো ইঙ্গবঙ্গসমাজের[১১৫] কিন্তু ১৮১৮ খৃস্টাব্দে রবার্ট মে চুঁচুড়ায় যে বালিকা বিদ্যালয় খোলেন তাতে চোদ্দজন দেশীয় খৃস্টান এবং অখৃস্টান উভয় শ্রেণীর বালিকা ভর্তি হয়।[১১৬] তা ছাড়া, রেভারেণ্ড পীয়ার্সের উদ্যোগে ১৮১৯ খৃস্টাব্দে কলকাতায় **Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools** নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।[১১৭] এই প্রতিষ্ঠান দু বছরের মধ্যে কলকাতায় তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এতে ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭।[১১৮]

এ সময়ে স্কুল-বুক সোসাইটিও দেশী বালিকাদের শিক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করে।[১১৯] ১৮২০ খৃস্টাব্দে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জে. এইচ. হেরিংটন এবং বিখ্যাত মিশনারী উইলিআম ওয়ার্ড ইংলণ্ডে এ দেশের নারীদের অশিক্ষা ও দুরবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি জাগানোর চেষ্টা করে। এঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে মিস মেরী অ্যান কুক কলকাতায় আগমন করেন। মিস কুক স্কুল-বুক সোসাইটির অনুকূল্য লাভ করেননি। কিন্তু চার্চ মিশনারী সোসাইটি তাঁর পোষকতা করে। ১৮২৩ সালের মার্চ মাসের আগেই এঁর তত্ত্বাবধানে

১১৪. For details See **First Report of Native Schools, 1817** (Serampore, 1817).

১১৫. E D. Potts, p. 123.

১১৬. M. A. Liard, **Missionaries and Education in Bengal** (Oxford, 1972), p. 134.

১১৭. **Ibid.**; ঈশানচন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১।

১১৮. M. A. Liard, p. 134.

১১৯. See J. C. Marshman's evidence before Parliamentary Committee, 1853, quoted in J. A. Richey, (ed.), **Selections from Educational Records,** Pt. II (calcutta, 1922), p. 35.

১৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সব বিদ্যালয়ে তখন ৩০০ বালিকা বর্ণ পরিচয়, ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ, বাংলার ইতিহাস, সেলাই, মোজা তৈরি ইত্যাদি শিল্পকর্ম শিখছিলো।[১২০] ১৮২৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কৃতিকার্য হয়ে এই ছাত্রদের মধ্য থেকে ১৫০জন হিন্দু ও মুসলমান বালিকা চার আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত পারিতোষিক লাভ করে।[১২১] আরো দুবছর পরে যখন বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গুণগত মানও উন্নত হয়। গভর্নর জেনারেল আমহার্স্ট এবং তাঁর পত্নী এই পরীক্ষায় উৎসাহ দিতে উপস্থিত হন। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য বিশ সহস্র মুদ্রাও দান করেন।[১২২] বৈদ্যনাথের এই আর্থিক সহায়তা পেয়ে মিস কুক তাঁর পরিকল্পনা আরো ব্যপকতর ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। ১৮২৮ সালে তাঁর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০-এ।[১২৩] তাঁর উদ্যোগে কলকাতার বাইরে বর্ধমানেও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১২৪]

কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়ের এই সংখ্যাবৃদ্ধি দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সেকালের হিন্দু মনোভাবের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। ভদ্রলোক সম্প্রদায় এই প্রচেষ্টার সঙ্গে আদৌ যুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। বৈদ্যনাথ রায় ব্যতীত অন্য কোন হিন্দু ভদ্রলোক স্ত্রীশিক্ষার পোষাকতা করেছিলেন বলেও জানা যায় না। এমন কি রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার তুলনায় ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে গভর্নর জেনারেলের কাছে উচ্ছ্বসিত একটি পত্র লিখিলেও[১২৫], নারীশিক্ষায় কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তিকাটি রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে সহায়তা করা ছাড়া, রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু করেননি।

আসলে সেকালে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ধারণাটি ভদ্রলোকগণ আদৌ গ্রহণ করতে পারেননি। ১৮৩০-এর দশকের শেষ দিকে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত পত্রাদি থেকে মনে হয়, তখনো ভদ্রলোকেরা ভাবতেন না যে, তাঁদের কন্যারা

১২০. **সমাচার দর্পণ**, ৮ মার্চ ১৮২৩, সসেক ১, পৃ. ১৪।

১২১. **সমাচার দর্পণ**, ২৭ ডিসেম্বর ১৮২৩, সসেক ১, পৃ. ১৪।

১২২. **সমাচার দর্পণ**, ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫, সসেক ১, পৃ. ১৫।

১২৩. **সমাচার দর্পণ**, ২৮ জুন ১৮২৮, সসেক ১, পৃ. ১৬।

১২৪. **সমাচার দর্পণ**, ১৮ জুলাই ১৮২৭, সসেক ১, ১৬।

১২৫. For the text of the letter see **The English Works of Raja Rammohun Roy**, vol. IV, ed. by K. Nag and D. Burman (Calcutta, 1947), pp. 105-08.

বিদ্যালয়ে পড়তে যাবে।[১২৬] বেথুন স্কুল স্থাপিত হওয়ার পরেও কন্যাদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার ব্যাপারে ভদ্রলোকদের কেবল দ্বিধা নয়, রীতিমতো আপত্তি ছিলো।

তা ছাড়া, মিশনারিদের খৃস্টান ধর্ম প্রচারও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি হিন্দুদের মনোভাব প্রতিকূল করে। বিশেষত ১৮২০-এর দশকে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্য থেকে দু-একজন করে খৃস্টান হতে আরম্ভ করায় সাধারণ হিন্দুসমাজ সঙ্কুচিত ও শঙ্কিত হয় এবং কন্যাদেরকে সযত্নে মিশনারি বিদ্যালয়সমূহ থেকে দূরে রাখে।[১২৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে যে কজন হিন্দু খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেন, পরবর্তী দশ বছরে (১৮২৩-১৮৩২) তার চেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দু ধর্মান্তরিত হন।[১২৮] এই ব্যাপক ধর্মান্তর দৃষ্টে রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে আতঙ্কিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ১৮৪২ খৃস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত বালিকা-দিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে যখন লেখেন, ইতিপূর্বে যাঁরা শিক্ষা লাভ করেছেন সে সব মহিলা খৃস্টান হননি,[১২৯] তখন রক্ষণশীল সমাজের স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মনোভাবের অন্যতম কারণ যে খৃস্টান হওয়ার আশঙ্কা, তার সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রকৃত পক্ষে, এসব কারণেই ১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকের বিদ্যালয়গুলিতে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে মোটেই যায়নি।[১৩০] যারা গিয়েছিলো তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস নিম্নশ্রেণীর ছিলো। ১৮৩১ সালে বঙ্গদূত পত্রিকায় এই বালিকাদের সামাজিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় যে, এরা 'বাগদী ব্যাধ বোদে বেশ্যা বৈরাগি'।[১৩১] এই নিম্নশ্রেণীর বালিকারা প্রায়শ, বিদ্যার অনুরাগে

১২৬. দ্রষ্টব্য: চুঁচুড়ার কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য, মুর্শিদাবাদের কৈলাসচন্দ্র সেন এবং হুগলিনিবাসীর পত্র, **সমাচার দর্পণ**, ৩ মার্চ, ২৬ মে এবং ১৬ জুন ১৮৩৮, **সসেক** ২, পৃ. ৯৯-১০৩।

তদুপরি দ্রষ্টব্য: **সংবাদ প্রভাকর**, **সমাচার দর্পণে** উদ্ধৃত, ২৩ জুলাই ১৮৩১, **সসেক** ২, পৃ. ৯২। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে লেখা পূর্বে উল্লিখিত রাধাকান্ত দেবের পত্রের কথাও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১২৭. ঈশানচন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৩।

১২৮. 'Results of the Missionary Labours in India, **Calcutta Review**, vol. XVI (1851), p. 255.

১২৯. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ', **বিদ্যাদর্শন**, আশ্বিন ১৭৬৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৪২), **সাবাস** ৩, পৃ. ৫৭৯।

১৩০ ঈশানচন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২।

১৩১. **সমাচার দর্পণ**, ২৫ জুন, ১৮৩১,-এ উদ্ধৃত, **সসেক** ২, পৃ. ৯১-৯২।

নয়, বরং পারিতোষিকের লোভেই বিদ্যালয়ে যেতো, তারও সমসাময়িক প্রমাণ আছে।[১৩২] বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব বালিকাদের লেখাপড়ার যথেষ্ট অগ্রগতি হতো না।[১৩৩] অপর পক্ষে বিদ্যালয়ে গমনরীতি না-থাকায় সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু মেয়েদের লেখাপড়া প্রায় হয়নি। যাঁদের হয়েছিলো, তাঁরা বিদ্যালয়ে নয়,—শিক্ষা-লাভ করেছিলেন অন্তঃপুরেই। সেকালের কোনো কোনো ধনী পরিবার অর্থব্যয় করে শিক্ষিতা বৈষ্ণবী নিয়োগ করে বা ইংরেজ মহিলাদের নিমন্ত্রণ করে অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দানের চেষ্টা করেছিলেন। সেকালে এই শিক্ষাপদ্ধতি জেনানা-শিক্ষাপদ্ধতি নামে পরিচিত ছিলো।[১৩৪] প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ত্রী এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সারদাসুন্দরী সেকালের জেনানাশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন।[১৩৫] শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা হরসুন্দরী, আশুতোষ দেবের কন্যা,[১৩৬] চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রবময়ী দেবী[১৩৭] প্রমুখ বঙ্গললনাও অন্তঃপুরেই শিক্ষা লাভ করেন। এর মধ্যে সারদাসুন্দরী ইংরেজি বলতে শিখেছিলেন। দ্রবময়ী দেবী সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে এবং আশুতোষ দেবের কন্যা কয়েকটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দ্রবময়ী দেবী শিক্ষা পান পিতার কাছে, সারদাসুন্দরী ছাড়া অন্যান্যরা বৈষ্ণবীদের কাছে। কৈলাসবাসিনী দেবী বিয়ের পর ১৮৪৯ সালে আপন স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের কাছে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন।[১৩৮] পরবর্তী কালে তিনি ভারতবর্ষের মহিলাদের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ পুস্তকের লেখিকা হিসাবে পরিচিত হন।[১৩৯]

১৩২. W. Adam, pp. 452-53.

১৩৩. ১৮২০-এর দশকে মেয়েদের তিন রকমের পড়ার ব্যবস্থা ছিলো। তার মধ্যে অন্যতম খৃস্টান অনাথ বালিকাদের বোর্ডিং স্কুল। এসব বালিকারা পুরাপুরি মিশনারিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতো বলে, তাদের লেখাপড়া খানিকটা হতো।

W. Adam, pp. 41-49.

১৩৪. ১৮৬০-এর দশকেও এই পদ্ধতি জনপ্রিয় ছিলো। ব্রাহ্মবন্ধু সভা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ১৮৬১ সালে 'অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী' নামে এর প্রচলন করেন।

১৩৫. See The Rev. E. Storrow, **The Eastern Lily gathered ; a Memoir of Bala Shoondore Tagore** (London, 1852).

১৩৬. **সম্বাদ ভাস্কর** ৩১ মে ১৮৪৯, সসেক ১, পৃ. ৩৬৭।

১৩৭. **সম্বাদ ভাস্কর**, ১৯ এপ্রিল ১৮৫১, সসেক ১, পৃ ৩৬৭-৬৮

১৩৮. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা**, গ্রন্থরচয়িত্রীর নিবেদন, পৃ. ./.-৵/.

১৩৯. কৈলাসবাসিনীর প্রথম পুস্তক **হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা** (১৮৬৩) এবং দ্বিতীয় পুস্তক **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি** (১৮৬৫) প্রবন্ধ গ্রন্থ। এছাড়া, তিনি সাময়িক পত্রে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এঁর তৃতীয় পুস্তক **বিশ্বশোভা** (১৮৬৯)

নিস্তারিণী দেবী[১৪০] এবং কুমুদিনী দেবীও কৈলাসবাসিনী দেবীর মতো আপনাপন স্বামীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।[১৪১]

সমাজমানস প্রতিকূল থাকায় ১৮২০, ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকের মহিলারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। নিতান্ত আদুরে কন্যা[১৪২] বা নতুন আদর্শে বিশ্বাসী স্বামীর স্ত্রীই[১৪৩] ব্যতিক্রম হিশেবে অন্তঃপুরে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই ব্যতিক্রমগুলি সেকালের স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী সাধারণ মনোভাবকেই বরং প্রকটিত করে।

বিদ্যালয়ের ব্যাপক সুযোগ না পেলে শিক্ষার যথেষ্ট সম্প্রসারণ প্রায় অসম্ভব, সমাজ-সংস্কারকগণ এ সম্পর্কে ১৮৪০-এর দশকের গোড়াতেই সচেতন হয়েছিলেন। তখন অবশ্য ১৮২০-এর দশকে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি সবই লুপ্ত হয়েছিলো।[১৪৪] এজন্যে ১৮৪২ সালে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের খবর সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, অক্ষয়কুমার দত্ত তাকে স্বাগত জানান।[১৪৫] কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৪২ সালে এ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। পাঁচ বছর পরে প্যারীচরণ সরকার বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমাজের দারুণ প্রতিকূলতায় এ বিদ্যালয়ও সফল হতে পারেনি।[১৪৬]

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে আধুনিক বঙ্গে সত্যিকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন জে. ই. ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (১৮০১-১৮৫১)।[১৪৭] প্রধানত রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন বিদ্যালঙ্কারের আনুকূল্যে

গদ্যে পদ্যে রচিত নিবন্ধের সমষ্টি। তাঁর আগে ১৮৬০ সালে বামাসুন্দরী দেবী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।

১৪০. দ্রষ্টব্য : আনন্দচন্দ্র শর্মা, **নারীচরিত** (ময়মনসিংহ, ১৮৬৬), পৃ. ৪৭-৫৪।

১৪১. দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৭০-১১৫ : **কুমুদিনীচরিত**।

১৪২. দ্রবময়ী দেবী ও নিস্তারিণী দেবী ছিলেন তাঁদের স্ব স্ব পিতামাতার একমাত্র সন্তান। কুমুদিনী ও বামাসুন্দরী ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান।

১৪৩. কৈলাসবাসিনী দেবী, কুমুদিনী, বামাসুন্দরী, নিস্তারিণী দেবী—সকলেই সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্মভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত স্বামী লাভ করেছিলেন।

১৪৪. উইলিয়াম অ্যাডাম-এর রিপোর্ট থেকে ১৮৩০-এর দশকের শেষভাগে একটি মাত্র বালিকা বিদ্যালয় ছিলো বলে জানা যায়। W. Adam, pp. 48-49.

১৪৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ', পৃ. ৫৭৯।

১৪৬. নবকৃষ্ণ ঘোষ, **প্যারীচরণ সরকার**, পৃ. ৬৩-৬৯।

১৪৭. বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব বৎসর থেকে 'বেথুন' শিক্ষা কাউনসিলের সভাপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে দশ হাজার পাউণ্ড ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করেন। See **Selections from Educational Records**, II, 33.

'বেথুন' ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের মে মাসের শুরুতে এই বিদ্যালয়টি উদ্‌বোধন করেন।[১৪৮] বেথুন রামগোপাল ঘোষকে তাঁর পরামর্শদাতা ও ছাত্রী-সংগ্রহকারী বলে আখ্যায়িত করেন। দক্ষিণারঞ্জন দান করেন বিদ্যালয় গৃহ এবং দশ হাজার টাকা মূল্যের ৫ বিঘা জমি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করা ছাড়াও তাঁর দুটি কন্যাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে বিদ্যালয়কে সাহায্য করেন।[১৪৯] বিদ্যালয় স্থাপনের দু বছর তিন মাস পরে বেথুন অকালে মারা যান কিন্তু তাঁর ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়[১৫০] টিকে থাকে এবং পরবর্তী নারীজাগরণের ভিত্তি-রূপে কাজ করে।

বেথুন স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৮২০ দশকীয় বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে একটি মৌল পার্থক্য ছিলো। পূর্ববর্তী বিদ্যালয়গুলি খৃস্টানদের দ্বারা পরিচালিত ছিলো এবং সেগুলির উদ্দেশ্যও হয়তো ছিলো খৃস্টান ধর্মের প্রচার। অপর পক্ষে, বেথুন বিদ্যালয় ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা পরিচালিত ছিলো না। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারই ছিলো বেথুনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে তিনি হিন্দু ভদ্রলোকদের সহায়তা গ্রহণ করেন। এবং একথা বললে ভুল হবে না যে, এ বিদ্যালয়ের আদর্শ ছিলো হিন্দু-ভাবাপন্ন। ১৮২০-এর দশকের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের সামাজিক পটভূমি আমরা লক্ষ্য করেছি—তাঁরা বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর। বেথুন বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী ঘোষণা করে যে, এ বিদ্যালয়ে কেবল সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বালিকারাই লেখাপড়া শিখতে পারবে।[১৫১]

সমাজ-মানসিকতা এবং বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পাল্টে যাওয়ায়, বেথুন বিদ্যালয় যথেষ্ট ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা লাভ করে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেথুন এমন আস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে, সেকালের রক্ষণশীল, উদার এবং প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই এ বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হন। এই কমিটিতে একাধারে হরচন্দ্র ঘোষের মতো

১৪৮. 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার অনুষ্ঠান', **সম্বাদ ভাস্কর**, ১০ মে ১৮৪৯, **সাবাস** ৩ পৃ. ৩৯৭।

১৪৯. J. E. D. Bethune to Lord Dalhousie, 29 March 1850, **Selctions from Educational Records**, II, 52-53.

১৫০. বেথুন তাঁর বিদ্যালয়ের নাম 'ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়' রাখার প্রস্তাব দেন লর্ড ডালহৌসির কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে। See **Ibid**, p. 56.

১৫১. দ্রষ্টব্য: বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রচারিত বিজ্ঞাপন, **সম্বাদ ভাস্কর**, ১৩ জানুআরি ১৮৫৭, **সাবাস** ৩, পৃ. ৪৫০।

ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগরের মতো উদার পণ্ডিত, কালীপ্রসাদ ঘোষের মতো ইংরেজি শিক্ষিত রক্ষণশীল এবং কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মতো প্রাচীনপন্থী সমবেত হয়েছিলেন। অন্য ব্যাপারে প্রবল মতভেদ থাকলেও বিদ্যালয়ের প্রশ্নে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এবং সম্বাদ ভাস্করের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (ভট্টাচার্য) উভয়ই একমত হয়ে একে স্বাগত জানান।[১৫২] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সর্বশুভকরী পত্রিকা প্রভৃতিও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে সন্তোষ প্রকাশ করে।

এ জাতীয় ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পেয়ে বেথুন বিদ্যালয় স্থায়িত্ব লাভ করে এবং হিন্দুসমাজে শিকড় প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়।[১৫৩] যাঁরা প্রথম দিকে বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন, তাঁদের সৎসাহস ও সংকল্পও বিদ্যালয়ের সফলতার একটি বড়ো কারণ। বিদ্যালয়ের উদ্‌বোধনের দিন সংবাদ প্রভাকরে বলা হয়, ২০টি বালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দেবে।[১৫৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১১টি ছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সমাজের প্রবল বিরোধিতার মুখে অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৭-এ। এদের মধ্যে আবার ৩-৪ জনের বেশি উপস্থিত হতো না। বিদ্যালয়ের বয়স প্রায় এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর বেথুন লেখেন, একজন প্রভাবশালী প্রাচীনপন্থী নেতার মৃত্যুর পরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১-এ দাঁড়ায়।[১৫৫] কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই নামে মাত্র বিদ্যালয়ের যুক্ত ছিলো, নিয়মিত উপস্থিত হতো না। এক পর্যায়ে বেথুনে মাত্র ৩টি ছাত্রী ছিলো। এদের দু জন মদনমোহনের কন্যা, অন্যজন হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের।[১৫৬]

দেবেন্দ্রনাথের মতো নির্ভীক ব্যক্তিও প্রথম দিকে বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করতে ইতস্তত করছিলেন। তবে ১৮৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তাঁর কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।[১৫৭] কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত

১৫২. পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে খানিকটা রক্ষণশীল হয়েছিলেন।

১৫৩. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি** পৃ. ৩১-৩২।

১৫৪. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'স্ত্রীবিদ্যা' **সংবাদ প্রভাকর**. ৭. ৫. ১৮৪৯, **সাবাস** ১, পৃ. ৩০৪-০৬।

১৫৫. J. E. D. Bethune to Lord Dalhousie, 29 March 1850, **Selections from Educational Records**, II, 52-53.

১৫৬. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, পৃ. ১২৮।

১৫৭. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ২৫ আষাঢ় ১৭৭৩ (জুলাই ১৮৫১), **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ ৪০; 'সম্পাদকীয়', **সংবাদ প্রভাকর**, ৭ জুলাই ১৮৫১, **সাবাস** ১, পৃ. ৩৩১-৩২; সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', **প্রবাসী**, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৪৭৪।

প্রমুখ মনীষী এই স্ত্রী-বিদ্যালয়ের বিকাশে উৎসাহ ও সহায়তা দান করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুশিক্ষা রচনা করেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে।[১৫৮] এমন কি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নাকি বোধোদয় রচনা করেন মেয়েদের কথা মনে রেখে।[১৫৯] গ্রন্থ রচনা ছাড়া, বিদ্যাসাগর বহু বছর ধরে সম্পাদক হিশেবে এই বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দের অগস্ট মাসে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১৬০] কিশোরীচাঁদ মিত্রও আলোচ্য কালে রাজশাহীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বলে শোনা যায়।[১৬১] আসলে বেথুন বিদ্যালয়ের সফলতা দৃষ্টে অনেকেই মফস্বলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করছিলেন। বারাসতের পূর্বোক্ত বালিকা বিদ্যালয়টিও এ সময়ে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করে।

তবে পূর্বোক্ত সহযোগিতা বা সাফল্য দৃষ্টে এমন মনে করার আদৌ কারণ নেই যে, এ সময়ে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মনোভাবের অবসান ঘটে। ১৮৫০-এর দশকে তো নয়ই, ১৮৬০, ১৮৭০ এমন কি ১৮৮০-র দশকেও স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মনোভাব সমাজের কোনো কোনো অংশে রীতিমতো প্রবল ছিলো।[১৬২] ১৮৫০-এর দশকের শেষে অথবা ১৮৬০-এর দশকের প্রারম্ভে[১৬৩] কলকাতার অদূরে মাজিলপুরে যুবকগণ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করায় স্থানীয় জমিদার মিথ্যা মামলায় জড়ানো থেকে আরম্ভ করে উদ্যোগী যুবকদের উপর নানা রকমের

১৫৮. গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে মদনমোহনের স্পষ্ট উক্তি ছিলো। ঈশানচন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৬।

১৫৯. প্রথম দিকে এ গ্রন্থের নাম ছিলো **শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ** অর্থাৎ মদনমোহনের গ্রন্থের পরিপূরক। ঐ, পৃ. ৫৬৬।

১৬০. এ ব্যাপারে জয়কৃষ্ণ এডুকেশন কাউনসিলের কাছে ১৮৪৯ সালের অগস্ট মাসে একটি পত্র দেন। এই পত্রের মূল পাঠের জন্যে দ্রষ্টব্য : **Selctions from Educational Records**, II, 48-43.

স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা জয়কৃষ্ণের আগে বেথুন করেন, না বেথুনের আগে জয়কৃষ্ণ করেন এ বিষয়ে বিতর্কের জন্যে দ্রষ্টব্য : N. Mukherjee, **A Bengal Zamindar**, p. 154.

১৬১. মন্মথনাথ ঘোষ, **কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র**, পৃ. ৭৩-৭৪।

১৬২. ১৮৮৯ সালে একজন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক লেখেন যে, স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের মীমাংসা হয়নি এবং স্ত্রীশিক্ষা ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্তদের গৃহ ছাড়া অন্যত্র আদৌ সমাদৃত হয়নি। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, **ললনা সুহৃদ** (কলিকাতা, ১৮৮৯), পৃ. ১।

১৬৩. তারিখের বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় শিবনাথশাস্ত্রী (**আত্মচরিত**) ও **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** পরস্পর বিরোধী উক্তি থেকে।

অত্যাচার করেন।[১৬৪] এ থেকেই বোঝা যায় সমাজের বাধা কত প্রবল ছিলো। বস্তুত, বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করলে ১৮৬০, ১৮৭০-এর দশকে সমাজ কন্যার অভিভাবকের উপর রীতিমতো অত্যাচার করতো।[১৬৫]

১৮৫০-এর বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের ফলেও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহলের প্রতিকূলতা সম্ভবত বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেথুন স্কুল স্থাপনের ফলে তিনি তাকে সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন।

নিশি বিদ্যা যাহা শেখে, সেইমাত্র ভালো।
অন্ধকারে অন্ধ থাকো, কায নাই আলো।।[১৬৬]

—এ উক্তি তাঁর পরিবর্তিত মানসিকতার কেবলমাত্র সূচনা। পরবর্তীকালে তিনি স্পষ্টত মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার নিন্দা করেন।[১৬৭]

আলোচ্য কালের স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার নিন্দার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ নিন্দার প্রধান কারণ রক্ষণশীলতা। প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে যে জাড্য সাধারণ মানুষের মনকে সকল সমাজেই অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখে তা এবং প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন অমঙ্গল ঘটাতে পারে--এই আশঙ্কা স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয় হতে দেয়নি।

স্ত্রীশিক্ষার কোন উপযোগিতা নেই, কেননা মেয়েরা চাকুরি করবেন না,[১৬৮] শিক্ষা তাঁদের সুকোমল স্বভাবকে বিনষ্ট করবে,[১৬৯] শিক্ষিত হলে পরপুরুষকে পত্র

১৬৪. **তত্ত্ব**, মাঘ ১৭৮৫ (জানুআরি-ফেব্রুআরি ১৮৬৪), পৃ. ১৭৩; শিবনাথ **শাস্ত্রী আত্মচরিত**, পৃ. ৫৮-৬০।

১৬৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম', **নব্যভারত** ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ২২৯।

১৬৬. **সংবাদ প্রভাকর**, ২২ এপ্রিল ১৮৫১, **বাংলা সাময়িক পত্র** ১, পৃ. ৩৭।

১৬৭. প্রসঙ্গত স্মরণীয়: 'হিঁদুয়ানী কিসে রবে ?/যত দুধের শিশু,/ভোজে ঈশু/ডুবে মোলো ডবের টবে।/আগে মেয়েগুলো,/ছিলো ভালো,/ব্রতকর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।/একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,/আর কি তাদের তেমন পাবে ?/যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ি মেরে,/কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।/তখন "এ, বি," শিখে, বিবি সেজে,/বিলাতি বোল কবেই কবে।/এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে,/সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।/ ··এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,/গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে। ···বুঝি "হট" বোলে, "বুট" পায়ে দিয়ে, "চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।' 'দুর্ভিক্ষ', **কবিতা সংগ্রহ**, প্রথম ভাগ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৮৮৫), পৃ. ১২১-২২।

১৬৮. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪২-৪৩; প্যারীচাঁদ মিত্র, **রামারঞ্জিকা**, পৃ.২।

১৬৯. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'দুর্ভিক্ষ' (কবিতা), **কবিতা সংগ্রহ**, প্রথম ভাগ, পৃ. ১২১-২২;

লিখে তার সঙ্গে মিলিত হবেন,[১৭০] গৃহকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করবেন,[১৭১] স্বামীর প্রতি অবাধ্য হবেন,[১৭২] বিজাতীয় ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবেন ইত্যাদি নানা প্রতিকূল মনোভাবই এ সময়কার সমাজ-মানসে ক্রিয়াশীল ছিলো। এমন কি 'Contributed by a graduate of the Calcutta University' স্বাক্ষরিত একটি রচনায় জনৈক লেখক এমন উক্তি আলোচ্য কালে করেন যে, 'বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের সংসর্গ অপেক্ষা নরক বাস বরং ভাল'।[১৭৩] তবে এ রকমের তীব্র বিরোধিতা করার মতো লোক স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের মতোই সংখ্যায় কম ছিলেন। বেশির ভাগ লোকই স্ত্রীশিক্ষা এবং তার উপযোগিতা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ অথবা উদাসীন।

সমাজের সচেতনতার অভাব এবং একাংশের বিরোধিতা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতিবন্ধকও কম ছিলো না। অবরোধব্যবস্থার প্রতি ভদ্রসমাজের মনোভাব ছিলো অবিচল। এর ফলে বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১৭৪]

রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ সেকালে পত্রপত্রিকায় এমন কথাও লিখেছিলেন যে, মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়তে গেলে তাঁদের অল্প বয়সের কথা বিবেচনা না করেই শিক্ষকগণ ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের কৌমার্য হরণ করবেন।[১৭৫] সত্যি সত্যি শিক্ষয়িত্রীর অভাব স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রাচীন সমাজের মনোভাব প্রতিকূল করে রাখে। এ জন্যেই শিক্ষয়িত্রীর অভাবকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে একটি বড়ো

'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র', **জ্ঞানাঙ্কুর**, বৈশাখ ১২৮১ পৃ. ২৬১; 'অধুনাতন ও পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৌষ ১২৮১, পৃ. ৮২; 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাস', **তত্ত্বপ** ফাল্গুন ১৮০২ (ফেব্রুআরি-মার্চ ১৮৮১), **পৃ.** ২১৯।

১৭০. 'স্ত্রীবিদ্যার ইতিহাস প্রাচীন কাল অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত', **সংবাদ প্রভাকর**, ১৩ জুলাই ১৮৪৯, **সাবাস** ১, পৃ. ৩১৬; 'স্ত্রীবিদ্যা ও চন্দ্রিকা', **সংবাদপ্রভাকর**, ১২ মে ১৮৪৯, **সাবাস** ১, পৃ. ৩১০-১২; কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি**, পৃ. ১২।

১৭১. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি, পৃ. ২৬-২৮: 'নারীচরিত', **বামাপ**, অগ্রহায়ণ ১২৭৬, পৃ. ১৪১; কুন্দমালা দেবী, 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই?', **বামাপ**, আশ্বিন ১২৭৭, পৃ. ১৭৬-৭৮।

১৭২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, **পূর্বোক্ত**, পৃ. ৫৪২; কৈলাসবাসিনী দেবী. **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি, পৃ. ১১-১২।

১৭৩. (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়). 'বিদ্যাবিড়ম্বনা', **জ্ঞানাঙ্কুর**, বৈশাখ ১২৮০, পৃ. ১৯০।

১৭৪. 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', **অবোধবন্ধু**, ভাদ্র ১২৭৬, **পৃ.** ১১৫; 'গৌরব স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৃ. ২৬১। পাঠকের পত্র.(কৈলাসচন্দ্র সেন), **সমাচার দর্পণ**, ২৬ মে ১৮৩৮, **সসেক** ২, পৃ. ১৩১।

১৭৫. **সমাচার চন্দ্রিকার** মন্তব্য, **সংবাদ প্রভাকরে** সমালোচিত। 'স্ত্রীবিদ্যা ও চন্দ্রিকা', **সংবাদ প্রভাকর**, ১২ মে ১৮৪৯, **সাবাস** ১, ৩১১-১২।

অন্তরায় বলে গণ্য করা যায়।[১৭৬] মেরী কার্পেন্টার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে এই বাধা দেখে খুব হতাশ হন।[১৭৭] এবং দেশী কতিপয় ভদ্রলোকের সমর্থনসহ সরকারের কাছে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্যে আবেদন করেন।[১৭৮] সমাজের বহুবিরোধিতার মুখে ১৮৭১ খৃস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু অচিরেই ছাত্রীর অভাবে কলকাতার বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।[১৭৯] এ বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার ফলে শিক্ষয়িত্রীর অভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ সংকীর্ণই থেকে যায়।

সেকালে স্ত্রীশিক্ষার একটি বড়ো বাধা ছিল লোকভয়। একান্নবর্তী পরিবারের তরুণ সদস্যের অনেকেই নিকট আত্মীয় এবং বয়স্ক গুরুজনদের ভয়ে স্ত্রী বা কন্যাকে শিক্ষা দিতে পারতেন না। সকলের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাপড়া শেখার দুটি চমৎকার দৃষ্টান্ত রাসসুন্দরী এবং কৈলাসবাসিনী দেবী।[১৮০] হরসুন্দরী দেবী যখন পিতার কাছে ধরা পড়ে গেলেন যে, তিনি কেবল সামান্য লেখাপড়া জানেন না, রীতিমতো কয়েকটি ভাষায় সুশিক্ষিত, তখন তিনি খুবই সঙ্কুচিত ও ভীত হন।[১৮১] এ থেকেই যে সমাজের মনোভাব বোঝা যায়।

মেয়েদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব,[১৮২] অল্পবেতনের অর্ধশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করে শিক্ষাদানের প্রয়াস,[১৮৩] বিদ্যালয়ের নিম্নমান ইত্যাদিও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো।

সেকালে স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারণের সবচেয়ে বড়ো বাধাগুলির অন্যতম ছিলো বাল্যবিবাহ। নিতান্ত বাল্যবয়সে বিয়ে হতো বলে সেযুগের মেয়েরা লেখাপড়া শেখার

১৭৬. 'স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন', **বামাপ**, কার্তিক ১২৭১, পৃ. ১৯৯; 'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা', **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৪, পৃ. ৫৭৪।

১৭৭. 'স্ত্রীনর্মাল বিদ্যালয়', **সোমপ্রকাশ**, ৩ পৌষ ১২৭৩, **সাবাস** ৪, পৃ. ৫১০-১১।

১৭৮. দেশীয় ভদ্রলোকেরা অনেকই, এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও, এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। ছাত্রীনিবাসে রেখে মেয়েদের পড়ানোর প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করেন। তাঁর মতে নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত শিক্ষিকাগণ সমাজের চোখে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্রী হবেন। দ্রষ্টব্য : বঙ্গদেশের গভর্নরকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি, ১ অকটোবর ১৮৬৭। চণ্ডীচরণে চিঠিটি উদ্ধৃত হয়েছে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় pp. Appendix, B, IX-X.

১৭৯. ঈশানচন্দ্র বসু, 'স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ ২', **নব্যভারত**, পৌষ ১৩০০, পৃ. ৪৭০-৭১।

১৮০. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা** গ্রন্থরচয়িত্রীর নিবেদন, পৃ./. ⁄.; রাসসুন্দরী দেবী, **আমার জীবন**, পৃ. ৬০-৬৩।

১৮১. **সম্বাদ ভাস্কর**, ৩১ মে ১৮৪৯, **সাসেক** ১, পৃ. ৩৬৫-৬৬।

১৮২. P.C. Mitter, pp. 364-65.

১৮৩. 'স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা', **সোমপ্রকাশ**, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২, **সাবাস** ৪, পৃ. ৫০৮-০৯।

যথেষ্ট সময় পেতেন না।[১৮৪] বস্তুত দেশবাসী তখন এমন মনোভাবাপন্ন ছিলেন যে, যখন কন্যার জন্যে শিক্ষক অন্বেষণ করা প্রয়োজন, তখন তাঁর জন্যে পাত্র অন্বেষণ করতেন।[১৮৫] বিয়ে হয়ে গেলে সেখানেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার সমাপ্তি হতো। কেবল স্বামীর উৎসাহ থাকলে তবেই কেউ কেউ বিয়ের পরেও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সেখানে আবার গৃহকর্ম[১৮৬] এবং সন্তানের লালন-পালনের কাজ বাধা হয়ে দাঁড়াতো। বিদ্যালয়সমূহের সরকারী পরিদর্শক তাঁর ১৮৭১-৭২ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলেন যে, তিনি এক বিদ্যালয়ে চোদ্দ বছরের একটি ছাত্রী দেখেন যিনি চারু পাঠ তৃতীয় ভাগ, চমৎকার পড়তে পারেন। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁর বড়ো প্রতিবন্ধক তিন মাসের একটি সন্তান।[১৮৭] সন্তানের লালন-পালন বিদ্যাশিক্ষায় কতো বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে রাসসুন্দরী দেবীও তার একটি সরল ও আন্তরিক বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮৮]

বিবাহিত মহিলাদের বেলায় অনেক সময় দেখা যেতো, হয়তো স্বামীর শেখানোর আগ্রহ আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর। অথবা প্রথম দিকে খানিকটা উৎসাহ দিলেও প্রতিদিন পড়ানোর উৎসাহ স্বামী নিজেই হারিয়ে ফেলতেন।[১৮৯] শিক্ষক নিযুক্ত করে লেখাপড়া শেখায় নানা অসুবিধা ছিলো। বৈষ্ণবী ইত্যাদি দেশীয় মহিলা নিয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। আর খৃস্টান মহিলারা শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচারের দিকে মনোযোগ দিতেন।[১৯০]

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরিবর্তিত মনোভাব

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব এবং নানা প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশক থেকে সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এর

১৮৪. P.C. Mitter, pp. 364-65 ; **General Report on Public Instruction in Lower Provinces of the Bengal Presidency, 1863-64** (Calcutta, 1865), p. 59 ; 'স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা', **সোমপ্রকাশ**, পৃ. ৫০৮ ; 'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা', **বামাপ** ভাদ্র ১২৭৪, পৃ. ৫৭৪ ; 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', **অবোধবন্ধু** পৃ. ১১৬-১৭ ; রাসসুন্দরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

১৮৫. 'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা', **বামাপ**, ফাল্গুন ১২৭৪, পৃ. ৭০০।

১৮৬. 'স্ত্রীশিক্ষা', **সোমপ্রকাশ**, ২ বৈশাখ ১২৭৫, সাবাস ৪, পৃ. ৫১৯-২০।

১৮৭. **General Report on Public Instruction in Bengal for 1871-72** (Calcutta, 1873), p. 81.

১৮৮. রাসসুন্দরী দেবী, **আমার জীবন**, পৃ. ৬১।

১৮৯. কুলুটোলাস্থ ব্রাহ্মিকা, 'বামাবোধিনী ও বামাগণ', **বামাপ**, কার্তিক ১২৭৬, পৃ. ১৩৯।

১৯০. 'স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন', **বামাপ**, কার্তিক ১২৭১, পৃ. ২০৩।

উপযোগিতা ও আবশ্যকতা বিষয়ে সচেতন হতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় উপলব্ধি করেন শিক্ষিত স্বামী এবং অশিক্ষিত স্ত্রীর সহাবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সুখকর হতে পারে না।[১৯১] ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে এ সম্পর্কে লেখা হয় :

> যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন; কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকেও অবশ্য লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না; . . . কিছুদিন পরে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অশিক্ষিত স্ত্রীলোক—দিগের (sic) বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কন্যাদাতৃগণ কলেজের পড়ো চাহেন, কালেজের পড়োরা স্কুলের ছাত্রী চাহেন। . . . শিক্ষিত পুরুষের সহিত অশিক্ষিত স্ত্রীর বিবাহ হইলে, সর্বদিকে সুখজনক হয় না, · · · অমিলের কারণ হইয়া উঠে।[১৯২]

অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে ঘর করার রীতিই সেকালে প্রচলিত ছিলো। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র—সকলের ভাগ্যেই এই বিড়ম্বনা জুটেছিলো। বাইরে এঁরা সমাজ সেবা করতেন, সমাজ ও নারীজাতির উন্নয়নে প্রযত্ন নিতেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের গৃহেই এক দারুণ অসঙ্গতি ছিলো।[১৯৩] তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে এই অসঙ্গতির পীড়ন হয়তো অনুভব করে থাকবেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা তেমন কিছু করেননি। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মে তরুণরা এই অসঙ্গতি এবং অভাব বিষয়ে সচেতন হন। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় এই নতুন অভাববোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়।

> কৃতবিদ্য যুবকেরা এক বিষয়ে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীর নিকটে শান্তি পান না, তাঁহার সংসার কষ্ট যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ।

১৯১ 'কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও মনের অসুখ', **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, বৈশাখ ১৭৮২ (এপ্রিল-মে ১৮৬০), পৃ. ২২১।

১৯২ 'স্ত্রীশিক্ষা', **জ্ঞানাঙ্কুর**, আশ্বিন ১২৮২, পৃ. ৫২৪।

১৯৩ ভারতবর্ষের নারীজাতির দুরবস্থা বিষয়ে ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন তা শুনে Annette Akroyd খুবই বিচলিত হন। তিনি এদেশের নারীদের জাগরণের জন্যে কাজ করার মহান ব্রত নিয়ে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এসে পৌঁছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, অন্তত কেশবচন্দ্রের স্ত্রীকে ব্যতিক্রম হিশেবে দেখতে পাবেন। কিন্তু যখন দেখলেন কেশব আপন অন্তঃপুরেই আলোক এবং স্বাধীনতা পৌঁছে দিতে পারেননি, তখন স্বভাবতই কেশব সম্পর্কে খুব হতাশ হন এবং তখন থেকেই তাঁর মোহ ভঙ্গ হতে আরম্ভ করে। — H.W. Beveridge. **India Called Them** (London, 1947), pp. 88-89.

প্রকৃত পক্ষে, নব্য সম্প্রদায়ের সবই ছিলো, কেবল 'স্ত্রীই জীবনের কণ্টক হইলেন'।[১৯৪]

এই নতুন চেতনার বিকাশের ফলে এ সময় থেকে বিবাহ বিষয়ে স্ত্রীশিক্ষা পাত্রপাত্রীর অভিভাবকদের কাছে প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে।[১৯৫] প্রাগ্রসর সমাজে, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজে, আলোচ্য ১৮৬০-৭০-এর দশকে স্ত্রীকে সংস্কার করে তাঁকে ভদ্র পোশাকে সজ্জিত করানো, অবরোধ মোচন করে তাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করানো, তাঁকে আধুনিক করে তোলার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করি।[১৯৬] অবশ্য এ নিয়ে রক্ষণশীল সমাজ বিদ্রূপও কম করেনি।[১৯৭]

স্ত্রী শিক্ষিত হলে সন্তানদের সুশিক্ষা হবে,[১৯৮] একান্নবর্তী পরিবারে মেয়েদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে,[১৯৯] জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হবে[২০০] এসব ছাড়াও মেয়েরা প্রাত্যহিক জীবনে তাঁদের প্রকৃত ও উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন---এই সচেতনতা প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকদেরকে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ করছিলো। বেথুন সোসাইটি, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, বামাবোধিনী সভা, ভারত সংস্কারক সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্যক্তি ১৮৫০, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে নারীজাগরণের জন্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তা সামগ্রিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ সময়ে প্রাচীন সমাজেও বোধ হয় বিরোধিতা হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে ১৮৬৫ সালে কৈলাসবাসিনী দেবী বলেছেন, 'যাঁহারা পূর্বে উক্ত বিষয়

১৯৪. 'এদেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার', **বামাপ**, বৈশাখ ১২৮০, পৃ. ১৬।

১৯৫. ছাত্রী বৃত্তির প্রশংসাপত্র দেখিয়ে পাত্রীর বিবাহ স্থির হয় — এরকমের একটি ঘটনার উল্লেখ **বামাবোধিনী পত্রিকায়** লক্ষ্য করি। 'বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব', **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৯, পৃ. ১৩২।

১৯৬. 'বিবি আর বউ', **বান্ধব**, অগ্রহায়ণ ১২৮১, পৃ. ১৪৩-৪৫; **মধ্যস্থ**, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২৩৩; 'অধুনাতন ও পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৌষ ১২৮১ পৃ. ৮২। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: 'বিবি আর বউ', **বান্ধব**; 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্ন', **বসন্তক**, ১৮৭৪।

১৯৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাল্যবিবাহের দোষ', পৃ. ৫৩৯।

১৯৯. 'ভগ্নীভাব', **বামাপ**, আশ্বিন ১২৭২, পৃ. ১১০।

২০০. 'আমাদের যথার্থ অভাব কি?', **রহস্য সন্দর্ভ**, প্রথম পর্ব, নবম সংখ্যা, ১২৮০, পৃ. ১৪১-৪২।

(অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা) শ্রবণ করিলে কর্ণবিবরে হস্তার্পণ করিতেন তাঁহারাও এক্ষণে তাহার উন্নতি কল্পে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আপনাপন বালিকাগণকে প্রকাশ্যরূপেই হউক অথবা গুপ্তভাবেই হউক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছেন।'[২০১]

সরকারী প্রতিবেদনে বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির যে সংবাদ পাওয়া যায় তা থেকেও স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারণের প্রমাণ মেলে। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার প্রায় পনেরো বছর পরে প্রদত্ত উডরোর (বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক) প্রতিবেদনে বলা হয়, ফলাফল আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বেথুনে পাঠরত এ সময়কার ৪৬টি ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২১ জন বই পড়ে অর্থ বুঝতে পারতেন এবং এক চতুর্থাংশ সহজ গল্প পড়তে ও বুঝতে পারেন। [২০২] বঙ্গদেশে এ সময়ে মোট ৯৫টি বিদ্যালয়ে ২,৪৮৬ জন ছাত্রী লেখাপড়া শিখছিলেন।[২০৩] কিন্তু দেখা যায় আরো আট বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ৩৬২ ভাগ (মোট ৩৪৪) এবং ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ২৫০ ভাগ (মোট ৬,৭১৭) বৃদ্ধি পায়।[২০৪] আরো দশ বছরের মধ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা শতকরা ৩০৩ ভাগ (মোট ১০৪২) এবং ছাত্রী সংখ্যা শতকরা প্রায় অবিশ্বাস্য ৬৫৬ ভাগ (মোট ৪৪,০৯৬) বৃদ্ধি পায়।[২০৫]

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বিষয়ে সমসাময়িক পরোক্ষ প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ৫০০ বাঁধা গ্রাহক ছিলেন। এর তিনটি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করার আবশ্যক হয়। প্রথম সংখ্যা এক হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিলো, তারও সবগুলি নিঃশেষিত হয়।[২০৬] সেকালের মান দিয়ে বিচার করলে একটি স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার

২০১. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের** ইত্যাদি পৃ. ৩১। অনুরূপ উক্তি ৩৪ পৃষ্ঠাতেও আছে। উপরন্তু দ্রষ্টব্য : 'স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা', **সোমপ্রকাশ**, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২, **সাবাস** ৪, পৃ. ৫০৮; 'বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব', **বামাপ**, পৃ. ১৩২; 'স্ত্রীশিক্ষা', **জ্ঞানাঙ্কুর**, আশ্বিন ১২৮২, পৃ.৫২১

২০২. **General Report on public Instruction in Lower provinces of the Bengal presidency 1862-64,** p.59.

২০৩. **Ibid.** p. 64

২০৪. **General Report on public Instruction in Bengal for 1871-72** p,56.

২০৫. **General Report on public Instruction in Bengal for 1881-82** (Calcutta. 1883), p,92

২০৬. 'বামাবোধিনী পত্রিকার নবম বর্ষ', **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৮ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৭১), পৃ. ২৪৭; **বামাপ** ভাদ্র ১২৭১ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৬৪), পৃ. ১৬৭-৬৮।

এই চাহিদা স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে সমাজের সচেতন মনোভাবেরই প্রমাণ দেয়। তা ছাড়া, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে বামাবোধিনী পত্রিকা, অবলাবান্ধব, বঙ্গমহিলা প্রভৃতি কয়েকটি স্ত্রীলোকপাঠ্য ও স্ত্রীলোকের উন্নতি-বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ এবং ভারতসুহৃদ, অবোধবন্ধু প্রভৃতি পত্রিকায় 'বামারচনা' বিভাগ প্রকাশ করার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকার না করে পারা যায় না। ১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকে আর্যদর্শন এবং নব্যভারত নারীজাগরণের ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করে, তাও গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সমাজ-মানসে নারীজাগরণ সম্পর্কে এমন পরিবর্তন সূচিত হয় যে, রসময় দত্তের রক্ষণশীল পরিবারের একজন হিন্দু-খৃস্টান সদস্য গোবিন্দচন্দ্র দত্ত[২০৭] এ সময়ে মনে করেন যে, এদেশে থাকলে তাঁর দুই কন্যার শিক্ষা ভালো হবে না। এজন্যে তিনি এই কন্যাদ্বয়—তরু দত্ত ও অরু দত্তকে নিয়ে য়োরোপ যাত্রা করেন। এঁরা পরে ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় মহিলা বলে পরিচিত হন[২০৮] এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে পূর্বোক্ত চন্দ্রশেখর দেবের মতো কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তখনো স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তীব্র প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করলেও সমাজের একটা বড়ো অংশই এর উপযোগিতা ও আবশ্যকতা বিষয়ে দ্বিধামুক্ত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার মান

তবে এ সময়কার স্ত্রীশিক্ষার মান মোটেই উন্নত ছিলো না। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে এ সম্বন্ধে প্যারীচরণ সরকার বলেন যে, এ শিক্ষা ছিলো শিশুদের ঘরকন্নার মতো

২০৭. গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রসময় দত্তের তৃতীয় পুত্র। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত। খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। গোড়া থেকে Society for the Aquisition of General knowledge -এর সদস্য। ইংরেজিতে সুশিক্ষিত **Calcutta Review** পত্রিকায় প্রথম থেকেই যে স্বল্প সংখ্যক বাঙালী লিখতেন গোবিন্দচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। **Calcutta Review**-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা 'Ramkristo Chatterjee' মুদ্রিত হয় ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে (Vol. XIX).

For details see R.C. Dutt, 'Notes on Govin Chunder Dutt,' **Calcutta Review**, Vol. CXV (1902), p.p. 400-02.

২০৮. এঁরা য়োরোপ যান ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে। প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে ক্যাম্ব্রিজ ও St. Leonards-এ লেখাপড়া শেখেন। তরু দত্ত ইংরেজি, ফরাসি ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ফরাসি ভাষায় বহু কবিতা ও একটি উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৭৭ সালে মৃত্যুর এক বৎসর আগে তিনি তাঁর ফরাসি কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদসংকলন (**A Sheaf Gleaned in French Fiedls**) প্রকাশ করেন।

অর্থহীন ও তাৎপর্যবর্জিত এবং জনগণ আসলে মেয়েদের নামমাত্র শিক্ষা দিতেই আগ্রহী।[২০৯] এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার না করে পারা যায় না। আলোচ্যকালে কেশবচন্দ্র সেনের মতো প্রগতিশীল নেতাও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭০-এর দশকের শুরুতে ভারত সংস্কারক সভার অধীনে যে বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, কেশবচন্দ্র তার পাঠ্যক্রমে জ্যামিতি, দর্শন এবং বিজ্ঞানের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন।[২১০] আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ধারণাটি অনুমোদন করেনি।[২১১]

উচ্চশিক্ষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সামনে সর্বশেষ বাধা এসে উপস্থিত হয়। ১৮৫০-এর দশকে সমাজ স্ত্রীশিক্ষার নামেই প্রবল আপত্তি করতো। তবে ১৮৬০-এর দশকে এর প্রয়োজনীয়তা কথঞ্চিৎ স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃতি ও মান নিয়ে জনচিত্তে একটি দ্বিধা থেকে যায়। ভারতসংস্কারক সভার আলোচ্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের প্রসঙ্গে ১৮৭২-৭৩ সালে এ দ্বিধা রীতিমতো প্রবল বিরোধিতার আকার ধারণ করে। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ ব্রাহ্মনেতা বিষয়টিকে নারীমুক্তি সমস্যার সঙ্গে একীভূত করে দেখেন। তাঁদের বিবেচনায়, নারীদের উচ্চশিক্ষা পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার কারণ নেই এবং এ শিক্ষার অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করাও অসমীচীন।[২১২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ বিষয় নিয়ে সমকালীন ইংলণ্ডেও যথেষ্ট বিতর্ক চলেছিলো। এবং ১৮৭৮ সালের আগে ইংলণ্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই কোনো ডিগ্রি পরীক্ষায় মেয়েদের অংশ গ্রহণের অধিকার স্বীকার করে নেয়নি।

২০৯. প্যারীচরণ সরকার, 'বিবিধবিষয়িণী চিন্তা', **হিতসাধক**, শ্রাবণ ১২৭৫, পৃ. ১৫৪-৫৫।

২১০. S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, pp.163-64.

২১১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাস', **তত্ত্বপ**, ফাল্গুন ১৮০২ (ফেব্রুআরি-মার্চ ১৮৮১) ; এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, **তত্ত্বপ**, অগ্রহায়ণ ১৮০০ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৮), পৃ. ১৫৪-৫৫।

দীর্ঘকাল পরেও আদি সমাজের সদস্যগণ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আদর্শ সমর্থন করেননি। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, পৃ. ৬৯, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬৮।

২১২. **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, পৃ. ২৬৬, ২৮৯ ; S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, pp. 163-64 ; শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ১১৪-১৫।

১৮৭১ সালে Annette Akroyd[২১৩] কলকাতায় আগমন করলে দ্বারকানাথ ও তাঁর বন্ধুগণ একটা মস্ত বড়ো সুযোগ লাভ করেন। এঁরা মিস অ্যাক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় হিন্দু মহিলা নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২১৪] দ্বারকানাথ নিজে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেবক ও সংগঠক রূপে এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন।[২১৫] এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দানের সংকল্প নিয়েই সংগঠকগণ অগ্রসর হন। এ সময়ে বেথুন বিদ্যালয়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিলো না। সুতরাং হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ই ছিলো মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।[২১৬] প্রকৃতপক্ষে, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ সালের প্রারম্ভে মেয়েদের এন্‌ট্রেন্স ও এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেয়। এই ঘটনা সেকালের সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নারীশিক্ষার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই স্বীকৃতি আসলে শিক্ষায় নারীদের সমানাধিকারেরই স্বীকৃতি। এর ফলে 'সমাজের ভাবী কল্যাণের দ্বার উদঘাটন' হয়।[২১৭] এ কারণে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত সময়কে নারীশিক্ষার ইতিহাসের প্রথম পর্ব বলে অভিহিত করা যায়। ১৮৭৭ সাল থেকে দ্বিতীয় পর্ব সূচিত হয়।

১৮৭৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত মহিলাদের যে চিত্র পাওয়া যায়, সমকালীন নারী-সমাজের তুলনায় তা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হলেও, তাকে খুব উজ্জ্বল বলে আখ্যায়িত করা

২১৩. মিস অ্যাক্রয়েড নিজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা ছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি তাঁর পিতার স্থাপিত বেডফোর্ড কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। তাঁর ডিগ্রি অবশ্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ছিলো না। ১৮৭৫ সনের এপ্রিল মাসে বরিশালের জেলা প্রশাসক ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরি বিভারিজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এদের পুত্র লর্ড উইলিয়াম হেনরি বিভারিজ (১৮৭৯-১৯৬৩)।

২১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৬২), পৃ. ১২। Also see W. H. Beveridge, pp. 92-93.

২১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১২-১৪।

২১৬. এ বিদ্যালয়ের ইতিহাসে একাধিক উত্থান-পতনের ঘটনা যুক্ত আছে। ১৮৭৫ সালে মিস অ্যাক্রয়েডের বিয়ের পর এ বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৬ সালের জুন মাসে দ্বারকানাথের উদ্যোগে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামে এ বিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সালে এ বিদ্যালয় বেথুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত হয়। For details see **Bethune College Centenary Volume 1849-1949**, ed. by K. Nag & L. Ghose (Calcutta, 1951).

২১৭. 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা', **বঙ্গমহিলা**, চৈত্র ১২৮৩, পৃ. ২৭১-৭২।

যায় না। এ সময়কার শিক্ষিত মহিলারা, প্রকৃতপক্ষে, সামান্যই লেখাপড়া শিখেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম দেশীয় সিভিল সার্ভেন্ট সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত দু-চারখানা ইংরেজি বই পড়ছিলেন এবং ইংরেজিতে অতি সাধারণ আলাপ করতে শিখেছিলেন। পশ্চিম ভারতে থাকতে হতো বলেই বাধ্য হয়ে তিনি ইংরেজীতে আলাপ করতে শিখেছিলেন। উপরন্তু অত্যন্ত অভিজাত ও ধনী পরিবারের স্ত্রী হিশেবে ইংরেজ মহিলার কাছে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।[২১৮] তাঁরই শিক্ষার মান যদি এ রকমের হয়, তা হলে সেকালের সাধারণ শিক্ষিত মহিলাদের শিক্ষার মান অনুমেয়।

আসলে যতটা শিক্ষা তাঁরা পেতেন, সেকালের শিক্ষিত মহিলারা অনেকে তার থেকে বেশি ভান করতেন। কোনো কোনো মহিলা এ সময়ে একখানা গ্রন্থ হাতে ক্ষণে ক্ষণে গবাক্ষের কাছে দণ্ডায়মান হয়ে বা উপবেশন করে আপনাদের ধন্য মনে করতেন, বলে জানা যায়।[২১৯] কেউ-বা দু-একখানা পাঠ করতে পারলে বা পশম বুনতে শিখলেই গৃহকর্মে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য দেখাতে আরম্ভ করতেন।[২২০] 'বিকৃত স্বাদ উদ্দীপক কতিপয় কাব্য এবং নাটক আর কার্পেট বুনিবার পশম অনেকের জীবনসর্বস্ব' হয়ে উঠতো।[২২১] কেউ-বা আবার 'বোধোদয় এবং সীতার বনবাস পড়িয়াই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ' করতেন।[২২২] আর একেবারে সাধারণ শিক্ষা-প্রাপ্ত মহিলারা অনেকে একদিকে বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি আদি রসাত্মক অন্যদিকে রামায়ণ, মহাভরত ইত্যাদি পৌরাণিক রচনা পাঠ করেই ক্ষান্ত হতেন। তবে ব্যতিক্রম হিশেবে যাঁদের নামোল্লেখ করা যায়, যেমন কৈলাসবাসিনী দেবী, বামা-সুন্দরী, 'দ্বিজ তনয়া'[২২৩] প্রমুখ তাঁদেরও শিক্ষাগত মান সম্পর্কে ধারণা করা যায়—তাঁদের প্রকাশিত রচনা থেকে। এ মান আজকের বিচারে নগণ্য হলেও সেকালের শিক্ষাবিরল সমাজের নিদর্শন হিশেবে প্রশংসনীয়। এসব রচনার মান বিচার করে বলতে হয়, স্ত্রীশিক্ষা সীমিত গণ্ডির মধ্যে পরিকীর্ণ হলেও সে সময়ের বাঙালী সমাজে মূল প্রোথিত করেছিলো।

২১৮. **পুরাতনী**, পৃ. ৩০, ৬৩, ৬৫, ১৮।

২১৯. কুন্দমালা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮।

২২০. 'নারীচরিত', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭৬ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৬৯) পৃ. ১৪১।

২২১. 'স্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি', **বামাপ**, অগ্রহায়ণ ১২৮০, পৃ. ২৫৪।

২২২. 'অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্য', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৮৯।

২২৩. 'দ্বিজ তনয়ার আসল নাম কামিনী সুন্দরী দেবী। এঁর প্রকাশনা—**উর্বশী নাটক**, (শিবপুর ১৮৬৬); **বালবোধিকা** (১৮৬৮) **ঊষা নাটক**, (১৮৭১) **রামের বনবাস নাটক** (দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৮৭৭), ইত্যাদি।

বাংলা নাট্যরচনায় স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা

সাহিত্যকে যদি সমাজ-মানসের দর্পণরূপে কল্পনা করি, তা হলে আলোচ্য কালের বাংলা নাট্যরচনার বিশ্লেষণ থেকে মনে হয়, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ ইত্যাদির সমস্যার তুলনায় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্ন সমাজমানসে গুরুত্ব লাভ করেনি। না এ সমস্যা নিয়ে বেশি নাটক রচিত হয়, না এ সমস্যা পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির মতো নাট্যকারদের খুব ভাবিত করে। অথচ আমরা জানি, ১৮৪৯ সালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সময় থেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নটি প্রাচীন সমাজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া এবং নব্য সমাজে যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু বাস্তব জীবনে এতো বড়ো আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, ১৮৫০-এর দশকে সপত্নী নাটক এবং একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন ছাড়া অন্য কোনো নাট্যরচনায় স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলতে গেলে উত্থাপিত হয়নি। কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), বিধবা-বিবাহ নাটক প্রভৃতি প্রথম দিকের বিখ্যাত রচনাগুলিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আদৌ কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

১৮৬০-এর দশকে অবশ্য একাধিক নাটক রচিত হয়েছে, স্ত্রীশিক্ষাই যেগুলির উপজীব্য। যেমন, কেদারনাথ দত্তের ইন্দুমতী[২২৪] এবং মহেন্দ্রনাথ বসুর স্ত্রীলোক-সাধ্য[২২৫] নাটকদ্বয়। এ ছাড়া এই দশকে রচিত কয়েকটি প্রধান নাটকেও অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতার কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উত্থাপিত হয়। কিন্তু সমস্যার ব্যাপ্তি এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে এই সংখ্যাকে নিতান্ত অপ্রতুল বলতে হয়।

স্ত্রীশিক্ষা তথা নারীমুক্তিবিষয়ক নাটক রচনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক নাট্যকারদের এই অনীহার কারণ কী?

বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম ভাগের আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে যে, এ দেশের নারীদের দুর্দশা ছিলো সর্বব্যাপী—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। অশিক্ষা এবং অন্তঃপুরের বন্ধন প্রায় সকল মহিলার বেলাতেই প্রযোজ্য ছিলো। মেয়েদের অশিক্ষা এবং অবরোধই এ সমাজে স্বাভাবিক ও সার্বজনিক ছিলো, সুতরাং সে বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলা মোটেই সহজ কাজ ছিলো না, অপর পক্ষে, সমাজের সব মেয়ে বিধবা হতেন না, বহুবিবাহের শিকার হতেন আরো কম সংখ্যক

২২৪. কেদারনাথ দত্ত, ইন্দুমতী নাটক (কলিকাতা, ১৮৬১)। চুপীনিবাসী কেদারনাথ দত্ত এই নাটক প্রকাশের আগে ও পরে একাধিক গদ্যপদ্য রচনা প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, বঙ্কুকচরিত, সাবিত্রী উপখ্যান, মনোহর আখ্যায়িকা, শ্রীবৎস উপখ্যান ইত্যাদি।

২২৫. মহেন্দ্রনাথ বসু, স্ত্রীলোকসাধ্য নাটক (কলিকাতা, ১৮৬৩)।

মহিলা, মদ্যপায়ী বা লম্পটের সংখ্যাও বেশি ছিলো না, এঁদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করা বা কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলা তুলনামূলকভাবে সহজ ব্যাপার ছিলো। আবার শিক্ষালাভ করায় কোনো নারী বিপথগামী হয়েছেন কিংবা স্ত্রীদের স্বাধীনতা দেওয়ায় কুফল ফলেছে,—এ চিত্রও ব্যতিক্রমধর্মী বলেই তার পক্ষে পাঠক দর্শকের মনে কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করা স্বাভাবিক ছিলো। ১৮৭০-এর দশকে বেশ কয়েকটি নারী-স্বাধীনতামূলক নাটক-প্রহসন রচিত হয়,—এগুলির প্রায় সবটাতেই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার মন্দ দিক প্রকটিত হয়। এবং পাঠ্যগ্রন্থ, অভিনয় উভয় ক্ষেত্রেই এগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মসম্পৃক্ত ছিলো। এদের উচ্চারণ মাত্র ধর্ম ও দেশাচারের প্রতি অন্ধআনুগত্যসম্পন্ন মানুষেরা প্রবল বিরোধিতা সৃষ্টি করতো। ধর্মব্যবসায়ীরাও একে গণ্য করতেন তাঁদের জীবিকার প্রতি একটা বড়ো চ্যালেঞ্জস্বরূপ। অন্যদিকে মদ্যপান ও লাম্পট্য, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি সমাজের সামনে আসে সেক্যুলার সমস্যা হিশেবে। এসব সমস্যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে বিচলিত করে, কিন্তু ধর্মকে আঘাত করেনি। শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ হয়নি, পুরাণের প্রসিদ্ধ নারীরা লেখাপড়া জানতেন—এসব কারণে হয়তো স্ত্রীশিক্ষা বিধবাবিবাহের মতো দারুণ দূষণীয় বলে গণ্য হতো না। তা ছাড়া, রানী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ত্রী সারদাসুন্দরী, হরসুন্দরী দেবী প্রভৃতি অদূর অতীত বা সমকালীন দৃষ্টান্তও সমাজের প্রতিকূল মনোভাবকে অংশত নমনীয় করে থাকবে। এসব কারণেই ধর্মীয় সমস্যাগুলি যেমন সমাজের উপরিভাগে প্রবল আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিলো, পূর্বোক্ত সেক্যুলার সমস্যাসমূহ তেমন তোলেনি। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাবিষয়ক নাটকের সংখ্যা হয়তো এ জন্যেই নগণ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মদ্যপান ও লাম্পট্যের মতো সেক্যুলার সমস্যা তা হলে নাট্যকারদের কল্পনাকে অতো উত্তেজিত করলো কেন? উত্তরে বলা যায়, পানাসক্তি ও লাম্পট্য সম্পর্কে, বিশেষত লাম্পট্য সম্পর্কে সকল সমাজের সকল মানুষেরই একটা সনাতন কৌতূহল আছে, নারীমুক্তি সম্পর্কে তেমন নেই। তাছাড়া, মদ্যপান ও লাম্পট্যের চিত্র গাঢ় রঙে চমকপ্রদ করে অঙ্কন করা যায়, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার উপকারিতা প্রদর্শন করে উজ্জ্বল বর্ণের চিত্র অঙ্কন করা শক্ত ব্যাপার। আলোচ্য কালে এসব কারণেই বর্তমান বিষয়ে বেশি নাটক রচিত হয়নি অথবা রচিত হয়ে থাকলেও সেগুলি জনচিত্তে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্ন এ রকমের অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করলেও, অনেকগুলি নাটকে মূল সমস্যার পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং যথোচিত গুরুত্বও লাভ করে। তারকচন্দ্র চূড়ামণি সপত্নী নাটকে সেকালের বঙ্গদেশের অনেকগুলি সামাজিক সমস্যার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনের লক্ষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের পানাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। কিন্তু জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার মদ্যপ সদস্যগণ সমকালীন সমাজের একটি জীবন্ত প্রশ্ন—স্ত্রীশিক্ষার কথা—মাতলামির মুহূর্তেও বিস্মৃত হতে পারেনি। নববাবু সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে সভ্যতার আবশ্যিক শর্ত হিশেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'মেয়েদের এজুকেট' করার কথাও বলে।[২২৬]

১৮৬০-এর দশকে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী ও লীলাবতী, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বুঝলে কিনা,[২২৭] বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটক, হরিশ্চন্দ্র মিত্রের ম্যাও ধরবে কে? ইত্যাদি নাটক-প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এসব রচনায় একটি সামান্য লক্ষণ এই যে, বর্তমান নাট্যকারগণ স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করেন।

১৮৭০-এর দশকে প্রকাশিত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাচার,[২২৮] জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের কিঞ্চিৎ জলযোগ, অজ্ঞাতনামার মেয়ে মনষ্টার মিটিং[২২৯] এবং ইহারই নাম চক্ষুদান[২৩০] ইত্যাদি নাটক-প্রহসনের মূল বিষয়বস্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা। এছাড়া, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর কুলীনকন্যা বা কমলিনী, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা, সুকুমারী দত্তের অপূর্ব সতী,[২৩১] মনোমোহন বসুর

২২৬. একেই কি বলে সভ্যতা, পৃ. ২৪।

২২৭. (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), বুঝলে কিনা !!! প্রহসন (কলিকাতা, ১৮৬৬)। নাটকটি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। সুকুমার সেনের অনুমান,— এ প্রহসন রামনারায়ণ তর্করত্ন-রচিত, ভ্রান্ত বলে মনে হয়। --বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৫৩ ও ৯৯। এ প্রহসনের দ্বিতীয় সংস্করণে বুঝলে কিনা-র 'স্বত্বাধিকারী' রূপে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃ. ২০৩ পাটী।

২২৮. অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশাচার (কলিকাতা, ১৮৭২)।

২২৯. মেয়ে মনষ্টার মিটিং (কলিকাতা, ১৮৭৪)।

২৩০. ইহারই নাম চক্ষুদান (কলিকাতা, ১৮৭৫)।

২৩১. সুকুমারী দত্ত, অপূর্ব সতী (কলিকাতা, ১৮৭৫)। সুকুমারী অভিনেত্রী গোলাপির জনপ্রিয় নাম। শরৎ-সরোজিনী নাটকের সুকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করে গোলাপি এই নাম অর্জন করেন। এই নাটক রচনায় আশুতোষ দাস তাঁকে সহায়তা করেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী

নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটক-প্রহসনেও স্ত্রীশিক্ষার কথা প্রসঙ্গত উত্থাপিত হয়।

প্রধান সমস্যা হিশেবে গৃহীত না হলেও, ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকের নাট্যকারগণ স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মোটামুটি উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এ সময়কার নাটকে কেবল যে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত ও স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মনোভাব অগ্রাহ্য হয়েছে, তা-ই নয়, নাটকের চরিত্র কল্পনায়ও ধীরে ধীরে স্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮৫০-এর দশকের নাটকে, চপলাচিত্ত চাপল্য, কুলীনকুলসর্বস্ব, সপত্নী নাটক, বিধবা সুখের দশা, বিধবা বিষম বিপদ ইত্যাদিতে যেসব নারীচরিত্র দেখা যায় তারা কেউ লেখাপড়া জানে না। কেবল ব্যতিক্রম হিশেবে দেখতে পাই বিধবা-বিবাহ নাটকের প্রসন্ন, বিধবামনোরঞ্জন নাটকের কুমুদিনী, বিধবোদ্বাহ নাটকের অজ্ঞাতনামা একটি বিধবা[২৩২] এবং নীলদর্পণের সরলতাকে, এরা সামান্য লেখাপড়া জানে। একেই কি বলে সভ্যতার নাগরিকগণ তাস খেলে বটে, কিন্তু লেখাপড়া জানে এমন কোনো প্রমাণ নেই। অগত্যা স্বীকার প্রকরণ, বউ হওয়া এ কি দায় গঞ্জনাতে প্রাণ যায়, বুঝলে কিনা, সধবার একাদশী প্রভৃতি নাটক-প্রহসনে অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলিও শহুরে, কিন্তু তারাও লেখাপড়া জানে না। ১৮৫০-এর দশকের শেষ ও ১৮৬০-এর দশকের শুরুতে রচিত একটি নাটকে ব্যতিক্রম হিশেবে আমরা একটি শিক্ষিত মেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করি। এই চরিত্রটি ম্যাও ধরবে কে নাটকের কুমুদিনী।

কিন্তু ১৮৬০-এর দশকের শেষে কিংবা ১৮৭০-এর দশকে রচিত নাটক-প্রহসনের নারীচরিত্রগুলি দেখা যায়— নাট্যকার স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করুন অথবা না-ই করুন— তার অনেকগুলিই শিক্ষিত। লীলাবতী নাটকের লীলাবতী, সারদাসুন্দরী এবং রাজলক্ষ্মী; নবীন তপস্বিনী নাটকের কামিনী এবং মালতী; বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকের প্রমদা এবং গোলাপী; বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দুমহিলা নাটকের[২৩৩] সরমা ও মনোরমা; প্রণয় পরীক্ষা নাটকের সরলা এবং মহামায়া; নয়শো

ক্যাটালগে এই নাটকের রচয়িতা হিশেবে সুকুমারী দত্ত ও আশুতোষ দাস উভয়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে। Catalogue of the Library of the India Office, vol. II, pt. Iv, p.56.

২৩২. এই বিধবা নিতান্ত অশুদ্ধ ভাষায় বিধবাবিবাহ সমর্থক যুবকবৃন্দের নিকট একটি চিঠি লেখে। বিধবোদ্বাহ নাটক, পৃ. ২১২।

২৩৩. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দুমহিলা নাটক (কলিকাতা, ১৮৬৯)। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের উত্তরে বিপিনমোহন সেনগুপ্ত এবং বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—এ দুজন হিন্দু মহিলা নাটক রচনা করেন। বিচারে বিপিনমোহন শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচিত হন এবং পুরস্কার লাভ করেন।

রূপেয়ার সরলা ; জামাই বারিকের কামিনী এবং পাঁচি ; স্বর্ণলতার স্বর্ণলতা ; কুলীন-কন্যা বা কমলিনীর কমলিনী ; অনূঢ়া যুবতীর নিতম্বিনী ; কিঞ্চিৎ জলযোগের বিধুমুখী ; শরৎ-সরোজিনীর সরোজিনী ; অপূর্ব সতীর নলিনী; বাল্যবিবাহ নাটকের সরলা প্রভৃতি নারী শিক্ষিত। আসলে সমাজ ক্রমশ শিক্ষিত অথচ নম্র, বিনীত এবং লজ্জানত মেয়েদের পছন্দ করতে আরম্ভ করেছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য-কালের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহের নায়িকারাও শিক্ষিত। সমাজের এক পরিবর্তিত সচেতনতাই এইরূপ চরিত্র-পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সমাজমানসের এই পরিবর্তনে বাংলা নাট্যরচনা এবং বাংলা নাটকের অভিনয় একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো বলে মনে হয়। সুন্দরী বিদগ্ধ নারীর যে আদর্শ সে কালের সমাজে ধীরে ধীরে গৃহীত হচ্ছিলো রোমান্টিক প্রেমের মতোই তা এসেছিলো পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্য থেকে। এই নারীরা অনেকেই নভেল-নাটকের নায়িকাদের অনুকরণ করতেন এবং এ কারণে সাধারণের চোখে তাঁরা নিন্দিতও হতেন, এমন সমসাময়িক প্রমাণ আছে। এরূপ একটি চরিত্র জ্যোতিরিন্দ্র নাথের এমন কর্ম আর করবো না প্রহসনের হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনী অতিরঞ্জিত চরিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সময়ের নারীরা বাস্তব সমাজে দৃষ্টান্তের অভাবে স্বভাবতই আদর্শের জন্যে তাকাতেন বাংলা নাটক ও উপন্যাসের দিকে। স্বামীরাও সম্ভবত সেখানেই প্রেমিকের আদর্শ অন্বেষণ করতেন।

কলকাতায় বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয় ১৮৫৭ সাল থেকে। প্রথম দিকে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত শকুন্তলা, রত্নাবলী, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি যে নাটকসমূহ বারংবার শৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাতে প্রাচীন কালের নারীদের যে আদর্শ ফুটে ওঠে, অবরোধ এবং অশিক্ষা সেখানে ছিলো অনুপস্থিত। চোখের সামনে বিদগ্ধ, শিক্ষিত, কলানিপুণ নারীদের আদর্শ দেখে এসব নাটকের দর্শকরা কি নিজেদের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তার তুলনা করেননি ? খুবই প্রত্যাশিত যে, করেছেন এবং এভাবেই সমকালীন অবরোধ ও অশিক্ষার পরিবেশকে গণ্য করেছেন কৃত্রিম এবং আরোপিত বলে। প্রকৃতপক্ষে, এই সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতেই, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এমন যুগান্তরের সৃষ্টি হয় যে, অতঃপর নায়িকাদের পক্ষে অশিক্ষিত, ঘোমটা-পরা, অন্তঃপুরচারিণী, মিতবাক রমণী হওয়া আর সম্ভব ছিলো না।[২৩৪] লীলাবতী (লীলাবতী), কমলিনী (কুলিনকন্যা বা কমলিনী) সরলা (নয়শো রুপেয়া), স্বর্ণলতা (স্বর্ণলতা)—সকলেই লেখাপড়া জানা অনূঢ়া

২৩৪. বঙ্কিমচন্দ্রও এই পরিবেশে যে-নায়িকাদের কল্পনা করে তাঁরা অনেকেই শিক্ষিত। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত এবং উনিশ বছর বয়সেও অবিবাহিত।

যুবতী। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই নাটকগুলির অভিনয়-সাফল্য দৃষ্টে মনে হয়—এই নারীরা সেকালের দর্শকদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করতে পেরেছিলো। এ থেকেও দর্শকদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব নাটকের আদর্শ যে সমাজবিবেককে প্রভাবিত করে এগিয়ে নিয়ে যায় নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির দিকে—এরূপ অনুমান খুবই সঙ্গত।

আলোচ্য নাটক-প্রহসনগুলিতে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি সাধারণ নরনারীর যে মনোভাব বিধৃত হয়েছে, তা সে সময়কার সমাজমানসেরই দলিল বলে গণ্য হতে পারে। এই মনোভাবের এক দিকে আছে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি বহুযুগপোষিত বিরূপতা, অন্যদিকে আছে নতুন কালের পরিবর্তিত মূল্যবোধের স্বাক্ষর। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমাজের বাস্তব প্রতিকূলতা এবং আনুকূল্যের চিত্রও প্রাসঙ্গিকভাবে এসব রচনায় মুদ্রিত হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজের প্রতিকূল মনোভাব

আগেই লক্ষ্য করেছি সে সময়ে অনেকেই মনে করতেন, লেখাপড়া শেখার মতো বুদ্ধি মেয়েদের নেই। এ মনোভাব নাটকেও প্রকাশ পেয়েছে। নবনাটকের বিধর্মবাগীশ স্ত্রীশিক্ষার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'বলি ভায়া অক্ষর যে ব্রহ্ম-স্বরূপ—এই আকারাদি ক্ষাকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ এ স্ত্রীলোক শিক্ষা করবে?' কেবল তাই নয়, সে মনে করে, স্ত্রীশিক্ষা 'যা বেদে কোরানে নাই' তা কখনোই প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।[২৩৫] স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকগণ যখন শাস্ত্রবিচার করে প্রমাণ করে, স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রবিরোধী নয়, তখনো দেশাচারের দোহাই দিয়ে প্রাচীন সমাজ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। বিপিনমোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের কৃপারাম যে খুব গোঁড়া বা রক্ষণশীল তা মনে হয় না; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নে সে প্রায় আপোষ-হীন মনোভাব পোষণ করে। কলেজের ছাত্র গোপাল এবং তার বন্ধু যখন শাস্ত্র বিচার করে প্রমাণ করে স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসিদ্ধ, তখনো কৃপারাম তা মেনে নেয় না। কারণ শাস্ত্র যা-ই বলুক, দেশাচার এটা অনুমোদন করে না।[২৩৬] অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দেশাচার নাটকে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সেকালের দেশাচার কী প্রবল ছিলো, তারই বিস্তারিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

প্রাচীনপন্থীদের প্রধান আশঙ্কা ছিলো, শিক্ষালাভ করলে মেয়েরা হয়তো চিঠি লিখে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বোক্ত কৃপারামের কথাই

২৩৫. নবনাটক, পৃ. ১০।
২৩৬. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৩৫।

উল্লেখ করা যায়। এই আশঙ্কা তার মনে বদ্ধমূল।[২৩৭] বাল্যবিবাহ নাটকে সত্যি সত্যি এরূপ একটি গৃহবধূর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যে চিঠি লিখে পরপুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করে।[২৩৮] তবে এ নাটকে এই প্রেমের চিত্রটি রচিত হয়েছে সহানুভূতির সঙ্গে।

দীনবন্ধু মিত্র স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সধবার একাদশী নাটকে গোকুলের কথার উত্তরে তিনি যেভাবে জীবনচন্দ্রের মুখে নিম্নের সংলাপটি বসিয়েছেন, তা থেকে সমকালীন জনপ্রিয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সমাজ হয়তো, মনে করতো, শিক্ষিত হলে মেয়েরা ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে।

গোকুল। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন দেকি, ছেলেটির (অটলের) জন্মের তো কোনো দোষ নাই।

জীবন। তোমার সেকেলে ব্যান, তার ছেলেতে সন্দ হয় না—একেলে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেচেন, গাউন পরচেন, বাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে সন্দ হবে।[২৩৯] মন্তব্যটি এতো ক্যাজুয়াল (casual) যে, একে সেকেলে মনোভাবের অকৃত্রিম দলিল হিশেবে অবশ্যই মনে করতে পারি।

বুঝলে কিনায় ইন্দ্রনারায়ণের ছ বছর বয়স্ক কন্যাকে স্কুলে প্রেরণ করায় প্রাচীন দলপতি অটলকৃষ্ণ মন্তব্য করে, 'স্ত্রীলোকের ইস্কুলে যাওয়াও যা, আর মেছোবাজারের বারিকে যাওয়াও তা। এতে যদি ওঁকে (ইন্দ্রনারায়ণকে) দলে রাখা যায় তবে মেছোবাজারের বেশ্যারাই বা অপরাধ করেচে কি?[২৪০]

রক্ষণশীল সমাজের আর একটি বড়ো আশঙ্কা ছিলো যে, শিক্ষা পেলে মেয়েরা চিরদিন যে দাসত্বকে বিনা প্রতিবাদে মেনে এসেছে, তাকে আর মান্য করবে না। কৃপারাম মনে করে শিক্ষিত মহিলারা

পুরীতে রবে না, হাঁড়ি ধরিবে না,
মনের বেদনা ঘুচাবে এবে।
*
পতিসেবা ধন, ভুলিয়ে তখন,
মনের মতন পুথী দেখিবে।
*

২৩৭. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৩০।
২৩৮. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ নাটক, পৃ. ২৩।
২৩৯. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ২৯০।
২৪০. বুঝলে কিনা, পৃ. ৪৩।

বিবাহের তরে, জনকের ঘরে,
নতশির করে নাহি রহিবে।[২৪১]

লেখাপড়া শিখে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েরা আপন স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে শিখবে নবনাটকের বিধর্মবাগীশও এমন ধারণা পোষণ করে।—'ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে চক্ষু ফুটিয়ে দিলে ওরা যে সাহেব বিয়ে করতে চাবে।'[২৪২]

এক কথায় প্রাচীনপন্থীরা মনে করে যে, শিক্ষা পেলে মেয়েরা কি 'আমাদের আর মানবে, না আমাদের কথা শুনবে'।[২৪৩] তাদের আরো মনে হয়, মেয়েরা এক 'আনো' কথাটি শিখে যে রকম দিনরাত একের পর এক ফরমায়েশ ও আবদার করতে থাকে, তাতে লেখাপড়া শিখলে তখন সারাক্ষণই 'চাই, চাই' করবে। কিছুতেই তাদের সন্তুষ্ট করা যাবে না।[২৪৪]

এতোসব কুফলের আকর স্বরূপ স্ত্রীশিক্ষাকে রক্ষণশীল সমাজ তাই এক কথায় 'গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও অধর্ম' বলে গণ্য করে।[২৪৫]

স্ত্রীশিক্ষার যে কোনো ভালো দিক থাকতে পারে, প্রাচীনপন্থীরা এটা স্বীকার করে না। বরং পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে তুলনা করে তারা বলে মেয়েরাতো বিদ্যা শিক্ষা করে চাকুরী করবে না, সুতরাং তাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অর্থহীন।[২৪৬] লীলাবতী নাটকের হেমচাঁদ নিজে মোটামুটি শিক্ষিত, কোনো কোনো বিষয়ে সে বেশ উদার মত পোষণ করে। তার স্ত্রী শারদাসুন্দরীও শিক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হেমচাঁদ মনে করে, 'মেয়েমানুষের পড়াশুনোয় কাজ কি, ধর্মেতেই বা কাজ কি?—রাঁধ, বাড়, খাও,—ব্যস'।[২৪৭] অর্থাৎ সে রক্ষণশীল বৃদ্ধদের মতো স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মারমুখী নয়, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাকে সে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার প্রাচীন সমাজ স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের মোটেই ভালো চোখে দেখতো না। ইন্দুমতী নাটকের নায়েবের উক্তি থেকে এই প্রতিকূল মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

> দু পাত ইংরেজি উল্টে বাবুদের আর বিদ্যা রাখবার ঠেঁই নেই, সার জেনেছেন যে মেয়েলোককে লেখাপড়া শেখালে দেশের ভাল হবে. . . আঃ বাবুদের

২৪১. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৩১।
২৪২. **নবনাটক**, পৃ. ১১।
২৪৩. **ইন্দুমতী নাটক**, প. ১১।
২৪৪. **নবনাটক**, পৃ. ১০।
২৪৫. ঐ।
২৪৬. **ইন্দুমতী নাটক**, পৃ. ১০; **নবনাটক**, পৃ. ১১।
২৪৭. লীলাবতী, **দীনবন্ধু রচনা সংকলন**, পৃ. ৩৮১।

কি সুক্ষ্ম বুদ্ধি গো দেখে গাটা জ্বালা করে দূর হোগ খ্রীষ্টানের ধরনই স্বতন্ত্র।[২৪৮] নব্য শিক্ষিত এবং স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক যুবকদের সম্পর্কে ভট্টাচার্যও একই ধরনের মন্তব্য করে:

ইংরাজী দুপাত পড়ে বাবুরা যখন।
একেবারে বিমোহিত হয় তার মন।।
জেনেছে হিন্দুর শাস্ত্র সব গোলমেলে।
একেবারে নিমগ্ন হয়েছে বাইবেলে।।[২৪৯]

নবনাটকের বিধর্মবাগীশ এদের কেবল খৃস্টান বলেই তৃপ্তি পায়নি, একই সঙ্গে তাদের নাস্তিক বলেও আখ্যায়িত করে।[২৫০]

সপত্নী নাটকের ভূধর সাধারণ ইংরেজি শিক্ষিত এবং কলকাতায় চাকুরিরত যুবক। অনেক ব্যাপারেই সে বেশ আধুনিক মত পোষণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষাকে সে প্রসন্ন মনে অনুমোদন করতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উৎসাহদাতাদের সে 'সাহেবের চেলা' বলে অভিহিত করে। তার ধারণা, এরা চায় দেশের তাবৎ লোক সাহেব হয়ে যাক।[২৫১] ভূধর আশঙ্কা প্রকাশ করে, শিক্ষা লাভ করলে মেয়েদের 'ঢাকাঢুকী ভাব' অবলুপ্ত হবে।[২৫২] শিক্ষার আলোক পেলে ইংরেজদের অনুকরণে মেয়েদের পোশাক ও আচার-ব্যবহারে অশোভন হয়ে উঠবে পূর্বোক্ত কৃপারাম এবং সপত্নী নাটকের সূর্যকান্ত এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করে।[২৫৩]

কৃপারাম এবং সূর্যকান্ত মনে করে যে, নব্যযুবকগণ তাদের শিক্ষিত স্ত্রীদের নিয়ে সাহেবের মতো গাড়িতে চড়ে ভ্রমণ করবে,[২৫৪] কেউবা স্ত্রীকে ঘোড়ায় চড়াবে।[২৫৫]

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার রোধ করার জন্যে প্রাচীনসমাজ যে প্রবল বাধা দান করে বর্তমান নাটকসমূহে তারও স্বাক্ষর দেখতে পাই। ইন্দুমতী নাটকের জমিদার গ্রামের সদ্য স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়টি তুলে দেওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে।

২৪৮. ইন্দুমতী নাটক, পৃ. ৭।
২৪৯. ঐ, পৃ ৯।
২৫০. নবনাটক, পৃ. ১০।
২৫১. সপত্নী নাটক, পৃ. ৪৮।
২৫২. ঐ।
২৫৩. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৩১; সপত্নী নাটক, পৃ. ৮১।
২৫৪. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দুমহিলা নাটক, পৃ. ৩০। বাস্তবে স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি চড়ার ঘটনা ঘটে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে। এ নাটকটিও রচিত হয় ১৮৬৬ সালে।
২৫৫. সপত্নী নাটক, পৃ. ৮১। তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করেনি। তবে এ নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার দু দশকের মধ্যে করেছিলো।

কিন্তু কোনোক্রমেই বিদ্যালয়টি ভেঙ্গে দিতে না পারায়, বিদ্যালয় অঙ্গনের খাজনা বাড়িয়ে দেয়।[২৫৬] বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকেও বালিকা বিদ্যা-লয় স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র গ্রাম্য বাধার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[২৫৭]

আমরা লক্ষ্য করেছি, বালিকা কন্যাকেও বিদ্যালয়ে প্রেরণ করলে সমাজ কন্যার অভিভাবককে দণ্ড দিতে উদ্যত হতো। নাটকেও এই সামাজিক বাধার উল্লেখ আছে। বুঝলে কিনা প্রহসনে ছ বছরের কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্যে প্রাচীন দলপতি কন্যার পিতার প্রতি রুষ্ট হয়,—আমরা আগেই তা লক্ষ্য করেছি। শেষ পর্যন্ত সমাজ তাকে একঘরে করে। ফলে কন্যার বিবাহ দেওয়া এবং সামাজিক জীবন যাপন করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।[২৫৮]

মেয়েরা নিজেরাও যে স্ত্রীশিক্ষাকে ভালো চোখে দেখতো না, নাটকেও এ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ম্যাও ধরবে কে নাটকে কমলিনীর উক্তি থেকে এই মনোভাবের কথা জানতে পারি।—'কজন পুরোণ গিন্নিঠাকুরুন মিলে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার অনেক নিন্দাবান্দা কল্লেন। আমরা লেখাপড়া শিখেছি দেখে ওঁরা আমাদের উপর ভারি বিরক্ত।[২৫৯] বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের মনোরমা লেখাপড়া জানে বলে পাড়ার মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করে।[২৬০] এই নাটকের একটি দৃশ্যে মাতাল স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে তার সঙ্গে সুরমাকে কথা বলতে শুনি। সে সময়ে তার মাথায় ঘোমটা ছিলো না। দূর থেকে তা দেখে নিস্তারিণী এবং সুখময়ী যে মন্তব্য করে, তা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই টিপিক্যাল।

নিস্তারিণী। তাইত ভাই ভাতারকে দেখে কি একটুও মাতায় কাপড় দিতে নাই। এমন দেখিনি, ছি—পড়লেই বা দু-পাত;...

সুখময়ী। কি বলব ভাই তবেত বিবিদের মত গাউন পরলেও হয়, কে কি বলবে বল।[২৬১]

লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়, এ বিশ্বাস মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলো,—নাটকেও তা দেখতে পাই।[২৬২] স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হলে মেয়েরা অশ্লীল

২৫৬. **ইন্দুমতী নাটক**, পৃ. ৬-১১।
২৫৭. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৪-৫।
২৫৮. **বুঝলে কিনা**, পৃ. ১৬, ৪৩-৪৫।
২৫৯. **ম্যাও ধরবে কে**, পৃ. ৪।
২৬০. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৩৪।
১৬১. ঐ, পৃ. ১১৪।
২৬২. **ইন্দুমতী নাটক**, পৃ. ১৩, সারদার উক্তি ; বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৩৯, কমলার উক্তি ; বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৩৪, মনোরমার উক্তি।

সাহিত্য পাঠ করে বিকৃত আনন্দ লাভ করবে, এ আশঙ্কাও নাটকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৬৩]

কিন্তু নতুন যুগের পক্ষে মেয়েদের শিক্ষাদান করাই ছিলো স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত বস্তু। এজন্যে, শত বিরূপ মনোভাব ও বাস্তব বিরোধিতা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষা ধীর পদক্ষেপে, কিন্তু অনিবার্যরূপে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। সমাজের প্রগতিশীল যে অংশ স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করেছে, তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাবও ন্যূন ছিলো না। বর্তমান নাট্যরচনাসমূহে এই অংশের আনুকূল্য ও মনোভাবের যে চিত্র পাওয়া যায়, এবারে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

নববাবুর বক্তৃতায়, আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, স্ত্রীশিক্ষা সভ্যতার অন্যতম শর্ত বলে স্বীকার করা হয়। বিপিনমোহন সেনগুপ্ত রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের বেণীমাধবও অনুরূপ মতাবলম্বী।[২৬৪] ইন্দুমতী নাটকের সারদা গোড়াতে স্ত্রীশিক্ষার দারুণ বিরোধী ছিলো। পরিশেষে সে-ও বুঝতে পারে, স্ত্রীশিক্ষা নতুন যুগের অন্যতম আবশ্যিক ধর্ম এবং কন্যাদের উৎকর্ষের জন্যে এর প্রয়োজন আত্যন্তিক।[২৬৫]

স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ নয়, এই আশ্বাসও অনেক প্রাচীনপন্থীকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে। বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দুমহিলা নাটকের রামদাস মহানির্বাণতন্ত্রের বিখ্যাত শ্লোক 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতি যত্নতঃ' ইত্যাদি উদ্ধার প্রমাণ করে যে, স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত। কালিদাসের স্ত্রী, বাহ্বটের কন্যা, খনা, লীলাবতী, বল্লাল সেনের স্ত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়েও সে স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য প্রমাণ করে।[২৬৬] সপত্নী নাটকের সর্বসুন্দর সূর্যকান্ত পণ্ডিতের অপণ্ডিতসুলভ গোঁড়ামি দৃষ্টে তাকে তিরস্কার করে বলে, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কথা কোনো শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ হয়নি।[২৬৭]

শাস্ত্রের নিষেধ নেই অথচ বাস্তবজীবনে স্ত্রীশিক্ষার অনেক উপযোগিতা আছে—এই চিন্তা ধীরে ধীরে সমাজমানসকে প্রভাবিত করে, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। ম্যাও ধরবে কে প্রহসনে হরিশ্চন্দ্র মিত্র দেখান, মা শিক্ষিত হলে সন্তানরা বাল্যকালেই শিক্ষিত হতে পারে। কমলিনীর পুত্র শরদের মুখে কবিতা আবৃত্তি শুনে

২৬৩. **ইন্দুমতী নাটক,** পৃ. ১০; বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক,** পৃ. ৬, ৩৯।

২৬৪. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক,** পৃ. ৫।

২৬৫. **ইন্দুমতী নাটক** পৃ. ১৬-১৭।

২৬৬. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক,** পৃ. ৩২-৩৫।

২৬৭. **সপত্নী নাটক,** পৃ. ৮৩।

কামিনী বিস্মিত ও আনন্দিত হয়'। প্রশ্ন করে সে জানতে পারে শরদ কবিতা শেখে তার মা আর মাসীর কাছে। এতে সে মন্তব্য করে 'মাতা বিদ্যাবতী না হলে কি এত অল্প বয়সে বালক এমন শিক্ষিত হয়।' তারপর নাট্যকারের কথাই যেন উচ্চৈস্বরে প্রকাশ করে 'হে স্ত্রীশিক্ষাবিদ্বেষিসকল? চক্ষু মেলিয়া দেখ, স্ত্রীশিক্ষা লতার এই অমৃতময় ফল'।[২৬৮]

স্ত্রীশিক্ষার সুফল দেখাতে গিয়ে বিপিনমোহন সেনগুপ্ত তাঁর নাটকে উল্টো পথ অবলম্বন করেছেন। প্রসন্নর প্রথম স্ত্রী মোহিনী লেখাপড়া জানে না। দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেও যখন তার সন্তান হলো না তখন প্রসন্ন আর একটি বিয়ে করে। কিন্তু এ স্ত্রীরও কোনো সন্তান দীর্ঘদিন হলো না। এই অবস্থায় মোহিনীর একটি পুত্র জন্মে। পরিবারের একমাত্র সন্তান হিশেবে পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী ইত্যাদি সকলেরই সে খুব স্নেহের পাত্রে পরিণত হয়। কিন্তু মোহিনী লেখাপড়া না জানায়, স্নেহ দেখাতে গিয়ে পুত্র হিরণকুমারকে অত্যধিক খাওয়ায়। এতে হিরণকুমার একদিন দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। মর্মান্তিক শোকে কাতর প্রসন্ন ক্ষুব্ধ হয়ে স্বগতোক্তি করে—

> হা ভারতভূমি, তোমার কি দুরবস্থা,—কি আশ্চর্য। কতকালে এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকেরা বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে ও জ্ঞানলাভে পারক হইবে। হা জগদীশ্বর কত দিনে তুমি অজ্ঞানা হিন্দু মহিলাগণের প্রতি সানুকূল হইবে। হায় যদি হিরণকুমারকে তার গর্ভধারিণী এতাধিক খাদ্য ভক্ষণ না করাইত, যদি সর্বদাই তাহাকে সাবধানে রাখিয়া আহারাদি রীতিমত ও নিয়মিত দিত, তবে বোধ হয় কখনই সে এরূপ অকালে কাল-কবলিত হইয়া পিতামাতার চির মনঃপীড়ার কারণ হইত না।[২৬৯]

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত অঙ্কিত এই চিত্র খুব সাহিত্য গুণান্বিত না হলেও, সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে খুব বাস্তবোচিত হয়েছে, সন্দেহ নেই।

লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নম্র ও সুশীল হয়, বিপিনমোহনের নাটকে এ কথা বলা হয়েছে। বসন্তের স্ত্রী প্রমদা স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, ননদ, জা সকলেরই স্নেহের পাত্রী। তার ব্যবহারে সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট। তার অন্যতম ননদ গোলাপী তার সম্পর্কে বলে, 'বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা স্বভাবকে যে কিরূপ নত করে, বলা যায় না। ছোট বৌ আমাদের লেখাপড়া শিখিয়া দিন দিন সুশীলা ও নম্রমুখী হইতেছে...।[২৭০]

২৬৮. ম্যাও ধরবে কে, পৃ. ১৫।
২৬৯. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৯৬।
২৭০. ঐ, পৃ. ৮৮।

প্রমদার শাশুড়ী সেকেলে মানুষ। চিরদিন জানে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়। কিন্তু সে-ও ছোট বউ প্রমদার প্রতি সন্তুষ্ট।

> বসন্ত আমার ছোটবৌকে ভেতরে ভেতরে শিকিয়েচেন, তা কি করি, বলি হোক, ছোট বৌ আমার ঘরের লক্ষ্মী, বাছা এবটু শিকেচে, তা সে এমন পাঁচালীর ছড়াও কাটে না, সে মন্দ পুথীও পড়ে না।[২৭১]

বিদ্যাশিক্ষা করলে স্বভাবের উন্নতি হয় সে কথা **ইন্দুমতি** নাটকের কাদম্বিনীও বলে। তার কথা থেকে জানা যায়, এক সময়ে ইন্দুমতী সকলের সঙ্গে ঝগড়া করতো এবং কারো কথা শুনতো না। কিন্তু শিক্ষা তার চরিত্রকে সংশোধন করে। তার মায়ের মুখে শুনতে পাই, ...ইন্দুমতী কেমন লেখাপড়া শিখে এখন স্কুল কায কচেচ.. এখন তারে দেখলে চক্ষু জুড়ায়...সকলকে মিষ্টি কথা কয় কারু মন্দ চেষ্টা করে না কাহাকেও ঘৃণা করে না কোন দোষ নেই বল্লিই হয়.সংসারের কাজও বেশ স্যংখলা (Sic) পূর্বক করে মাকে জেয়াদা কাযকর্ম কর্ত্তে দেয় না।[২৭২]

মেয়ে ইন্দুমতী কেন, মা কাদম্বিনী নিজেও এক সময়ে পাগলির মতো ছিলো,— তার বড় বোন সারদার কথা থেকে আমরা জানতে পাই। কিন্তু কাদম্বিনীর স্বভাবও লেখাপড়া শিখে উন্নত হয়।[২৭৩] ইন্দুমতী ও কাদম্বিনীর দৃষ্টান্ত সারদাকে প্রভাবিত করে এবং সে তার কন্যা বিমলাকে স্কুলে পাঠায়।

বাহ্যিক স্বভাবের চেয়েও গভীরতর পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে সুকুমারী দত্ত প্রণীত **অপূর্ব সতী** নাটকে। এই নাটকে দেখানো হয়, হরমণি বেশ্যার কন্যা নলিনী শিক্ষা লাভ করে মাতৃব্যবসা ঘৃণা করতে শেখে।[২৭৪] বাস্তবে সমসাময়িক-কালে এরকমের ঘটনা ঘটেছিলো বলেও জানা যায়।[২৭৫]

২৭১. ঐ, পৃ ৩৯।

২৭২. **ইন্দুমতী নাটক**, পৃ. ১১-১২।

২৭৩. ঐ, পৃ. ১৬।

২৭৪. **আর্যদর্শন**, আশ্বিন ১২৮২, পৃ. ২৮৪। এ নাটকটি দুর্লভ। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এক কপি আছে। সুকুমার সেন **আর্যদর্শন** অবলম্বনে এই নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।—**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, পৃ. ২, ৩২৩-২৪।

২৭৫. ঢাকায় ১৮৭২ সালের শেষ দিকে রূপজীবী নারীর লক্ষ্মীমণি নামক ১৪/১৫ বছর বয়স্ক কন্যা মায়ের প্ররোচনা সত্ত্বেও দেহ বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানায়। কন্যাটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শিখেছিলো এবং ব্রাহ্ম শিক্ষকের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। সারাদিন তাকে একটি ঘরে এক পুরুষের সঙ্গে আটকে রাখা হয় কিন্তু সে কিছুতেই সতীত্ব বিনষ্ট হতে দেয়নি। সন্ধ্যায় সে সুযোগ পেয়ে পলায়ন করে এবং ব্রাহ্মদের আশ্রয় ভিক্ষা করে। ব্রাহ্মগণ

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, বিয়ের পাত্রী লেখাপড়া জানে কিনা এ সচেতনতা ক্রমশ নব্যশিক্ষিত পাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিলো।[২৭৬] নাটকেও এই মনোভাবের স্বাক্ষর দেখতে পাই। নয়শো রূপেয়া নাটকের সরলা কন্যা-বিক্রেতা বংশজ পরিবারের কন্যা। এ সব পরিবারে পাত্রীর মূল্য নির্ধারিত হতো বয়স এবং রূপ দিয়ে। সরলা যুবতী অথবা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিতে উপনীত। সে যে রূপবতী তা-ও জানতে পারি। এর উপর বিদ্যা বাহুল্য মাত্র। তার পিতা রামধন প্রাচীনপন্থী এবং স্ত্রীশিক্ষার সম্ভবত সমর্থক নয়। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও সরলাকে যখন রঞ্জন লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করে, তখন রামধন বা তার কনিষ্ঠ সাতুলাল তাতে আপত্তি করে না। কেননা তারা জানতো পরিবর্তিত যুগে পাত্রীর পক্ষে শিক্ষিত হওয়া একটা বাড়তি যোগ্যতা। কন্যার দাম এতে আরো বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে সরলা ও রঞ্জনের সংলাপ উদ্ধার করা যায়।

সরলা। ছোট কাকার ইচ্ছা আমি খুব লেখাপড়া শিখি। আর তিনি বাবাকে বুঝান যে আমি লেখাপড়া শিখিলে তাঁর ভাল হবে।

রঞ্জন। অর্থাৎ তোমাকে খুব অধিক দরে বিক্রি করিতে পারিবেন?[২৭৭]

বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রীশিক্ষা আসলে ধীরে ধীরে একটা ফ্যাশানে পরিণত হচ্ছিলো। এজন্যেই দেখি, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো 'ভিলেন' চরিত্রগুলির অন্যতম নদেরচাঁদও কনে দেখার সময়, শেখানো গৎ ভুলে গিয়ে, লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করে, 'আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়?' তারপর প্রশ্নটা সংশোধন করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, 'ওগো লীলাবতী, তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ?' বারবার অপমানের ফলে নদেরচাঁদ উত্যক্ত হয় কিন্তু তবু লেখাপড়ার কথাটা সে ভুলে যায় না। কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে সে ললিতকে বলে, 'এখন আপনি মেয়েমানুষটাকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন'।[২৭৮]

বাস্তব উপযোগিতার কথা চিন্তা করে রক্ষণশীল সমাজ ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলো এবং এর ফলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করছিলো—এমন চিত্র

তাকে উদ্ধার করেন। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীমণির এক শিক্ষিত ব্রাহ্মের সঙ্গে বিবাহ হয়। দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১২২-২৩।

লক্ষ্মীমণির মা আইনের সহায়তা গ্রহণ করে, কিন্তু বিচারে পরাস্ত হয়। -- বামাপ, চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৩৮৪।

২৭৬. পূর্বে. পৃ ৩০৫-০৬।

২৭৭. নয়শো রূপেয়া, পৃ. ২।

২৭৮. লীলাবতী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ৪১৯, ৪২২, ৪২৪।

আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে আছে। **ইন্দুমতী নাটক** ও বিপিনমোহন সেনগুপ্ত রচিত হিন্দু মহিলা নাটকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এই সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে দেখানো হয়েছে নব্যশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে এবং প্রতিপক্ষরূপে চিত্রিত হয়েছে রক্ষণশীল সমাজ। তবে গোঁড়া সমাজের প্রতিরোধ যে ভেঙ্গে পড়ছিলো, তার স্বাক্ষরও এসব রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। বিপিনমোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং তার বিরোধিতার কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এই নাটকেই নিস্তারিণীর সংলাপ থেকে জানতে পারি, গ্রামের তাবৎ-বালিকাই একে একে এই বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করে।[২৭৯] ইন্দুমতী নাটকেও সারদা প্রথমে স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলো। সাধ করে সে তার কন্যাকে বিধবা করবে না, এমন কথাও বলেছিলো।[২৮০] কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সুফল দৃষ্টে পরিণতিতে তার মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং সে বিমলাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। সুশিক্ষিত মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরাও যে স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করেছে, তারও প্রমাণ এসব নাটক-প্রহসনে ছড়িয়ে আছে। সপত্নী নাটকের সর্বসুন্দর শিরোমণি, বিপিনমোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের রামদাস প্রভৃতি চরিত্র এ শ্রেণীর।

২৭৯. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দুমহিলা নাটক**, পৃ. ৩৯।
২৮০. **ইন্দুমতী নাটক**, পৃ. ১২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীমুক্তি : অবরোধ ও বন্দীত্ব মোচন এবং সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় মহিলার অবস্থা অত্যন্ত অসম্মানজনক ও শোচনীয় ছিলো। তাঁদের মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিশেবেই সমাজ-সংস্কারকগণ স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। অপর পক্ষে, রক্ষণশীল পুরুষ সমাজ মেয়েদের মতো উপযোগী প্রাণীকে (একাধারে রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বাসী ক্রীতদাসী) শিক্ষা এবং স্বাধীনতা দান করে তাদের ওপর নিজেদের অসীম কর্তৃত্ব লোপ অথবা হ্রাস করতে প্রস্তুত ছিলো না। এ জন্যেই বিদ্যাশিক্ষা এবং অবরোধের ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি সমাজের এমন শক্ত বিধিনিষেধ ছিলো।

নিতান্ত বাল্যবয়সে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই মেয়েদের কার্যত অন্তঃপুরে বন্দী থাকতে হতো। বয়স যতোই কম হোক, এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি ছিলো না।[১] বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার সময় ছাড়া[২] তাঁদের অন্তঃপুর ত্যাগের কোনো অধিকার ছিলো না। অথচ এই অন্তঃপুর, বিশেষত শহরে, নিতান্ত আলোবায়ুহীন, অস্বাস্থ্যকর ও অপরিসর ছিলো। একজন য়োরোপীয় মহিলা অন্তঃপুরের এই পরিবেশকে তাঁর দেশের কুকুর ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর পক্ষেও অনুপযোগী বলে বর্ণনা করেন।[৩] অথচ এই অন্তঃপুরেই মহিলাদের বাল্যকাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত জীবন কাটাতে হতো।

শুধু অন্তঃপুরে বাসই নয়, সেই সঙ্গে অন্য যে সব বাধ্যবাধকতা ও নিয়ম স্ত্রীদের মেনে চলতে হতো, একালের বিচারে তা হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য। বধূদের, বিশেষত তাঁরা 'খোকার মা' না হওয়া পর্যন্ত, অনেক ক্ষেত্রে কর্ত্রী না

১. 'অবগুণ্ঠন', **বামাপ**, মাঘ ১২৭৩, পৃ. ৪৩১।

২. কলকাতার সম্ভ্রান্ত বিত্তবান পরিবারের বধূদের অনেকের বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অধিকারও ছিলো না।— 'সম্পাদকীয়'. **সম্বাদ ভাস্কর**, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, **সাবাস ৩**, পৃ. ৩২৮। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কথাও প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য।'— **পুরাতনী**, পৃ. ২০-২২।

৩. Urquhart, **Women of Bengal**, p, 18.

হওয়া পর্যন্ত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনই নয়, মাতৃতুল্য শাশুড়ী এবং পিতৃতুল্য শ্বশুর ও ভাসুরের সামনেও আহাত ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো।[৪] কারো সঙ্গে এমন কি দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গেও, কথা বলার অধিকার ছিলো না।[৫] জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকানো,[৬] কোনো রকমের শকটে আরোহণ করা, জুতো পরা,[৭] সেলাই-করা পোশাক পরা মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো।[৮] গ্রামের, এমন কি শহরেরও, সাধারণ বিত্তহীন পরিবারে পর্দাপ্রথার এতো কড়াকড়ি ছিলো না। কিন্তু এসব পরিবারও হঠাৎ ধন-সম্পদের অধিকারী হলে অবরোধ প্রথাকে দৃঢ়তর করতো।[৯] এ থেকে বোঝা যায়, অবরোধ এবং অবগুণ্ঠন সেকালে ভদ্র ও শোভন রীতি এবং আভিজাত্যের চিহ্ন বলে গণ্য হতো।[১০]

মেয়েদের এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী এবং অধীন করে রাখার কারণ সম্পর্কে সে যুগের একজন সমাজ-সংস্কারক বলেন, পাছে স্বামীর প্রতি প্রণয় ও ভক্তি বিচলিত হয়, এ জন্যেই বধূকে অন্তঃপুরে অন্তরীণ করে রাখা হতো।[১১] এই উক্তি খুব যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। নারীদের অধীনতা ও বন্দীত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্যেই জ্ঞানের আলোক এবং মুক্ত পৃথিবী থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখা হতো। অন্তঃপুরের বন্দীত্ব, পর্দা ইত্যাদি ছাড়াও নানা ধরনের অধীনতা তাঁরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতেন।

৪. রাসসুন্দরী দেবী এবং নিরোদচন্দ্র চৌধুরীর মাতার দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তদুপরি দ্রষ্টব্যঃ 'অবগুন্ঠন', বামাপ, পৃ. ৪৩১ ; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 'উন্নতি ও স্বাধীনতা', বামাপ, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ৬৯।

৫. 'পারিবারিক সংস্কার', বঙ্গ মহিলা, মাঘ ১২৮২, পৃ. ২৩৪।

৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (আগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫।

৭. 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৫১-৫২। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে এক পত্রে লেখেন, 'পায়ে মোজা ও পাদুকা পরিতে কি কোন কষ্ট বোধ কর?' পত্র সংখ্যা ৫, ১৮ ফেব্রুআরী ১৮৬৪, পুরাতনী, পৃ. ৫৪।

৮. B.C. Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 62.

৯. H.A.D. Phillips, **Our Administration of India** (London, 1886), pp. 128-29.

১০. আশ্চর্যের বিষয় এই অন্তঃপুরে একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে পর্দার এতো বাড়াবাড়ি থাকলেও, চাকর-বাকরের সামনে মহিলারা অশোভন পোশাকে অনাবৃত মুখে নিঃসংকোচে বের হতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯ ; 'অবগুন্ঠন', বামাপ, পৃ. ৪৩৩। এমন কি সহস্র পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে গঙ্গাস্নান করতেও এরা কুণ্ঠিত হতেন না বা অভিভাবকগণও বাধা দিতেন না। ঐ ; রাজকুমার চন্দ্র, **দেখেশুনে আক্কেল গুড়ুম**, (কলিকাতা, ১৮৬৩), পৃ. ৬-৭।

১১. 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', **অবোধ বন্ধু** পৃ. ১১৭।

প্রাত্যহিক জীবনে এই মহিলারা কোনো স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। ভরণপোষণ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তাঁদের নির্ভর করতে হতো পুরুষ সমাজের ওপর।[১২] এমন কি, স্বামীকে নির্বাচন করার অধিকারও তাঁদের ছিল না। একজন লেখকের মতে, সম্ভবত নিজেদের শরীর ও মনের উপরও তাঁদের কোনো অধিকার ছিলো না।[১৩] সন্তানের উপর মায়ের অধিকারই বেশি থাকার কথা, কিন্তু সেকালের আইনানুসারে এক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছাই বহাল থাকতো।[১৪] স্বাভাবিক সুবিচারের নিয়মানুসারে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার খুবই প্রত্যাশিত; কিন্তু যে সমাজ কার্যত স্ত্রীদের কোনো অধিকারই মেনে নেয়নি, সে সমাজ এই অধিকার স্বীকার করে নেবে এটা আশা করা যায় না। বস্তুত, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ জীবিত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার সাধারণত স্বীকার করেন নি।[১৫]

অবরোধ মোচন সম্পর্কে সচেতনতা

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তির জন্যে যা অত্যাবশ্যক ছিলো, তা হলো তাঁদের অবরোধ মোচন। শিক্ষাদানের জন্যে যেমন অবরোধ ভেঙ্গে মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা দরকার ছিলো, তেমনি শিক্ষাদানের পর সেই মহিলাদের অন্তঃপুরের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে নিরন্তর অবরুদ্ধ রাখার ধারণা ছিলো প্রায় অবাস্তব। বস্তুত, শিক্ষাদান এবং অবরোধ মোচন উভয় মিলে মেয়েদের আত্মিক ও কায়িক মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারতো। তবে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা পদ্ধতি যেমন অবরোধকে মেনে নিয়ে শিক্ষাদান করার একটা আপোষ ব্যবস্থা বলে গণ্য হতে পারে, অবরোধকে খোলো আনা স্বীকার করে নিয়ে মেয়েদের দৈহিক বন্দীত্ব মোচনের তেমন কোনো মধ্যবর্তী উপায় ছিলো না। নারীমুক্তির জন্যে যেসব সংস্কারক গত শতাব্দীতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তাঁরা এ কারণেই অবরোধবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন।

১৮৩০-এর দশকে ইয়ং বেঙ্গলদের অন্যতম মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় অবরোধ সম্পর্কে বলা হয় যে, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ

১২. 'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র', **জ্ঞানাঙ্কুর**, পৃ. ২৬১।

১৩. সীতানাথ নন্দী, 'স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার', **নব্যভারত**, ফাল্গুন ১২৯১, পৃ. ৫০৮।

১৪. ঐ, পৃ ৫০৮-০৯।

১৫. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য : **মনুসংহিতা**, ৯/১৯৪-২০০, পৃ. ৫৭৫-৭৭। For the opinion of **Smriti**-writers, see R.L. Choudhary, **Hindu Women's Right to Property** (Calcutta, 1961), pp. 6-33.

করে রাখলেই মেয়েরা সৎপথে থাকবে এ প্রত্যাশা অমূলক।[১৬] ১৮৪০-এর দশকের শেষে এবং ১৮৫০-এর দশকের প্রারম্ভে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নির্ভীক ব্যক্তি যাঁরাই আপনাপন কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তাঁরাও কার্যত আংশিকভাবে অবরোধ ভঙ্গ করার আন্দোলনেই অংশগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মেয়েদের অবরোধ মোচনে আন্তিক সমর্থন ও বাস্তবিক সহায়তা দান করেন। তবে লক্ষ্যণীয় এই যে, ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া[১৭] সকলেই অবরোধ মোচনের সমর্থন করেন কেবলমাত্র মেয়েদের বিদ্যালয় গমনের প্রশ্নে, অন্যান্য উপলক্ষে নয়।

১৮৬০-এর দশকের প্রারম্ভেও সরাসরি অবরোধ মোচন করাতো দূরের কথা মেয়েদের পক্ষে স্বামীর সঙ্গেও পরগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও অনুচিত কাজ বলে বিবেচিত হতো। ১৮৬২ সালের জানুআরি মাসে আচার্যপদে অভিষিক্ত হওয়ার শুভ ও সম্মানজনক ঘটনা উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন যখন আপন পনেরো বছর বয়স্ক স্ত্রীকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গমন করতে উদ্যত হন তখন তাঁর আত্মীয়গণ তাঁকে ভোজপুরী দারোয়ান দিয়ে দ্বাররুদ্ধ করে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। এছাড়া তাঁকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলে।[১৮]

মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে কর্মস্থানে বাস করবেন,[১৯] নিকটাত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবেন,[২০] স্বামী ও অন্যান্যের সঙ্গে একত্রে আহার করবেন, সভায় যাবেন কিংবা প্রয়োজনবোধে শকট-আরোহণ করবেন[২১] এসব আদৌ সমাজের

১৬. জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার দর্পণ, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭, সসেক ২ পৃ. ২৬২-৬৩।

১৭. 'রজনীযোগে আপন আপন পতির সহিত কোন কোন সভাতেও গমন', এবং সেখানে বিবি ও সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ সালেই উল্লেখ করেন। 'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ', বিদ্যাদর্শন, আশ্বিন ১৭৬৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৪২), সাবাস ৩, পৃ. ৫৭৯-৮০।

১৮. P.C. Mazoomdar, pp 138-42 ; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮০-৮১।

১৯. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনচরিত, সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০৩, পৃ. ৪৮০; কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, পৃ. ৪৯।

২০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা' পুরাতনী, পৃ. ২৪-২৫।

২১. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার', প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ৩১৮, ৩১৯; সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, পৃ. ৪৭৫।

অনুমোদিত ছিলো না। মনে করা যেতে পারে, এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের পত্নী—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মাতা, গঙ্গাস্নান করতে চাইলে, তিনি পাল্কিতে চড়ে বসতেন আর বাহকরা পালকিশুদ্ধ তাঁকে গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে আসতো।[২২]

কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে অবরোধ ভাঙগার ব্যাপারেও সমাজে এক নতুন সচেতনতার উন্মেষ লক্ষ্য করি। এই দশকে কেবল কেশবচন্দ্রই নয়, আরো কয়েকজন নির্ভীক পুরুষ অবরোধ ভাঙগাতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, তাতে সমাজ প্রচণ্ড ঘা খায়। এরকমের পৌনঃপুনিক আঘাতের ফলে সমাজ অবরোধ-মোচন সম্পর্কে সহনশীল হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি হ্রাস পায়।

স্ত্রীকে নিয়ে কেশবচন্দ্রের পরগৃহে যাওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনার দু বছর পরে ১৮৬৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে আপন কর্মস্থান পশ্চিমভারতে নিয়ে যান।[২৩] এও সে যুগের পক্ষে রীতিমতো দুঃসাহসিক এবং অচিন্তনীয় ঘটনা। তবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে এটা মোটেই বিস্ময়ের বিষয় ছিলো না। তিনি নারী স্বাধীনতার আন্তরিক সমর্থক ছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখেন,

> আমি বাবামহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।··· আমি লিখিয়াছি যে আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীনপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়াছিলেন।···যে পর্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ...তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইংলণ্ডে আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে।[২৪]

অন্যত্র লেখেন,

> তুমি এখন পিঞ্জরের পাখীর মত বদ্ধ রহিয়াছ ও তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্তি ও উন্নতির একটুকু স্থান নাই।[২৫]

২২. স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃ. ৩১৮।

২৩. ইতিপূর্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মহিলা স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থানে বাস করেন, এমন দৃষ্টান্ত জানা নেই।

২৪. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি (লণ্ডন থেকে লেখা), ১১ জানুআরি ১৮৬৪, পুরাতনী, পৃ. ৪৮-৪৯।

২৫. ঐ, ১৮ ফেব্রুআরি ১৮৬৪, পৃ. ৫৩।

জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংলণ্ডে পাঠাতে দেবেন্দ্রনাথ সম্মত হননি। এতে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ হয়ে লেখেন,

> তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন বাবামহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চির জীবনের মতো চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি।··· তোমাকে আমি কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে তোমার শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তিলাভ করিতে পারিবে না।[২৬]

অবরোধ ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাব ছিলো খুবই উদার।[২৭] সুতরাং দেশে ফিরে আসার পর তাঁর পক্ষে স্ত্রীকে কর্মস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রের অনুরোধ অনুযায়ী পুত্রবধূকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেননি, এবারে পশ্চিম ভারতে প্রেরণ করার ব্যাপারে সম্মতি না দিয়ে পারলেন না। কিন্তু বাড়ি থেকে জাহাজে যেতে বলেন পালকিতে করে। ঘরের বধূ হেঁটে গিয়ে বাড়ির বাইরে গাড়িতে চড়বেন, দেবেন্দ্রনাথ এটা অনুমোদন করতে পারেন নি।[২৮]

দু বছর পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন কলকাতায় ফেরেন, তখন জাহাজ থেকে তিনি সরাসরি গাড়িতে চড়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন। এতে বাড়িতে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[২৯] দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল এ চপলতার জন্যে পুত্রবধূকে ক্ষমা করতে পারেননি।[৩০] প্রকৃত পক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর

২৬. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি (লণ্ডন থেকে লেখা), ২ জুলাই, ১৮৬৪, পৃ. ৫৮।

২৭. সত্যেন্দ্রনাথ J. S. Mill-রচিত **The Subjection of Women** গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁর *আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস* (কলিকাতা, ১৯১৫) গ্রন্থে দাবি করেন। (পৃ. ৪) এই ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এই পুস্তিকার প্রকাশকাল কারো জানা নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিখ উল্লেখ করেননি, কিন্তু ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী বলে ধারণা দিয়েছেন। এটা ঠিক নয়। মিলের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৬৭), পৃ. ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবীর মতে সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত যাওয়ার আগে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক একটি পুস্তিকা রচনা করেন।—স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮। এটাও বোধ হয় ঠিক নয়।

২৮. স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা* পৃ. ১৭৮।

২৯ স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮।

৩০. দেবেন্দ্রনাথের অপ্রসন্নতার কথা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সত্যেন্দ্রনাথকে জানালে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে একাধিক পত্র লেখেন। দ্রষ্টব্য পত্রসংখ্যা ৩১ ('বাবা মহাশয়

স্ত্রী নিজেদের বাড়িতেই কার্যত একঘরে হয়ে থাকেন। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে সঙ্কোচবশত মিশতে পারতেন না।[৩১] সত্যি সত্যি অবরোধ মোচন করে মহিলাদের পক্ষে গাড়িতে চড়া সে যুগে খুব অন্যায় কাজ বলে গণ্য হতো। এজন্যেই রাখালচন্দ্র রায় এবং তাঁর ভ্রাতা বিহারীলাল রায় যখন ১৮৬৬ সালে আপনাপন স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে বরিশাল শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন, তখন তা উত্তেজনা এবং সংবাদ সৃষ্টি করে।[৩২]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাখালচন্দ্র ও বিহারীলাল রায় ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে আরো দুটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা এদেশের অবরোধ ব্যবস্থাকে বিচলিত করে। অগস্ট মাসে রাখালচন্দ্র ও বিহারীলাল বরিশালে নিজেদের গৃহে ইংরেজ সাহেব ও বিবিদের একটি ভোজ দেন। এতে এঁরা স্ব স্ব স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত থাকেন ও একত্রে আহার করেন। এই মহিলাদ্বয় অন্য একটি ভোজসভায় আত্মীয়দের সঙ্গে একত্রে আহার করেন।[৩৩] অন্যদিকে ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে গভর্ণর জেনারেলের বাড়িতে এক পার্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতাবশত নিজে যেতে না পারলেও স্ত্রীকে প্রেরণ করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সর্বপ্রথম বাঙালি রমণী যিনি এ জাতীয় একটি পার্টিতে যোগদান করেন।[৩৪] এ ঘটনা উপস্থিত সকলকেই একান্ত বিস্মিত করে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর কেবল বিস্মিত নন, তাঁর আত্মীয়ার এই ব্যবহারে দারুণ ব্যথিত এবং ক্রোধান্বিত হন। তিনি তখনই সভা ত্যাগ করে চলে যান।[৩৫]

প্রায় একই সময়ে—নভেম্বর—মাসে অনুষ্ঠিত মেরী কার্পেন্টারের সংবর্ধনা সভায় অবরোধ মোচনের যে মহড়া চলে, তা-ও ঐতিহাসিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তোমার জন্য কলিকাতার বাড়িতে আসিবেন না কে বলিল? তোমার প্রতি তজ্জন্য লোকের বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই।') পুরাতনী, পৃ. ৯০; পত্রসংখ্যা ৫০, পৃ. ১০৯; পত্রসংখ্যা ৫২, পৃ ১১২; পত্রসংখ্যা ৭২, পৃ. ১৩১।

৩১. স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮-১৯।

৩২. বামাপ., কার্তিক ১২৭৩, পৃ. ৩৭৮।

৩৩. ঐ, পৃ. ৩৭৭-৭৮।

Also see Sir C. Beadon's (Lt.-Governor) Letter to Mr. Sutherland (Collector of Barisal), quoted in L. Ghose, **The Modern History of the Indian Chiefs Rajas, Zamindars, & c.**, Pt. II (Calcutta, 1881), p. 13.

৩৪. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, পৃ. ১৭৯; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সত্যেন্দ্রনাথ ইত্যাদি**, পৃ. ১৮।

৩৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা' **পুরাতনী**, পৃ. ৩৩; B. B. Majumdar, **Heroines of Tagore** (Calcutta, 1968), p. 46.

এই সভায় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ পরস্পর পরিচিত হন এবং আলাপ করেন।[৩৬] এই সভায় উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশে একজন ব্রাহ্ম বক্তৃতায় বলেন—

> আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে তোমরা দূর কর। তোমরা জড় বস্তু নও, পশুও নও যে, স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে। আমরা তোমাদিগকে সেইরূপ নীচভাবে শিক্ষা দিতে চাহি না।[৩৭]

মেরী কার্পেন্টারের আগমন উপলক্ষে বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদকও অনুরূপ মন্তব্য করেন। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,

> হে সুশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! এই উপলক্ষে আপনারা আপনাদের স্ত্রীদিগকে বিশুদ্ধ স্বাধীনতার আস্বাদ প্রদান করুন। ভগনীগণ! আপনাদের স্বামীরা যদি আপনাদিগের মঙ্গলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনারা সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাঁদের নীচতাকে অতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার হার তাহা কণ্ঠদেশে পুনর্বার পরিধান করুন।[৩৮]

২৫ ডিসেম্বর তারিখে মিস কার্পেন্টার পরিচিত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের একটি পার্টিতে আহ্বান করেন। এখানেও পার্টির শেষে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের মধ্যে পুনরায় আলাপ-পরিচয় হয়। এসব ঘটনায় রক্ষণশীল সমাজ স্বভাবতই অভিভূত হয়, এমন কি কেশবচন্দ্র সেনের মতো প্রগতিশীল নেতাও এই ব্যবহার দৃষ্টে অপ্রসন্ন হন।[৩৯]

প্রকৃত পক্ষে, ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে এ দেশের নারীদের অবরোধ মোচনের ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি বছর। উপর্যুপরি কয়েকটি অবরোধ ভাঙার ঘটনা এ বছর বাঙালি সমাজকে সচকিত করে এবং হয়তো সমাজের প্রতিরোধকেও দুর্বল করে দেয়। এর তিন বছরের মধ্যেই এ দেশীয় দুটি বালিকা উচ্চ শিক্ষার্থে য়োরোপ যাত্রা করেন। এবং আরো দু বছরের মধ্যে ১৮৭১ সালে একজন গৃহবধূ (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী) স্বামীর সঙ্গে বিলেত যাত্রা করেন।[৪০] আর

৩৬. যে সব মহিলা এখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী, রাখালচন্দ্র রায়ের স্ত্রী সৌদামিনী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রী যোগমায়া, পার্বতীচরণ গুপ্তের স্ত্রী কামিনী, অঘোরনাথ গুপ্তের স্ত্রী কাদম্বিনী, কানাখ্যানাথ ঘোষের স্ত্রী নিত্যকালী, অন্নদাচরণ খাস্তগীরের কন্যা সৌদামিনী এবং প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী প্রধান।

৩৭. 'ব্রাহ্মিকাদের অভিনন্দন', **বামাপ,** অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৩৯২।

৩৮. 'মিস মেরী কার্পেন্টার', **বামাপ,** কার্তিক ১২৭৩, পৃ. ৩৭৬।

৩৯. গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র,** প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৪৭।

৪০. Sir A. R Banerji, **An Indian Pathfinder : Memoirs of Sevabrata Sasipda Banerji,** pp. 17-18.

একজন গৃহবধূ (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী) স্বামী ছাড়া একাকীই বিলেত যাত্রা করেন ১৮৭৭ সালে।[৪১]

১৮৬০-এর দশকের অসম্পূর্ণ কাজ ১৮৭০-এর দশকে অধিকতর পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। এ দশকে মেয়েরা প্রকাশ্য সভায় গমন করেন,[৪২] অন্তঃপুরে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে সংবর্ধনা জানান,[৪৩] থিয়েটারে অভিনয় করেন,[৪৪] এবং স্বামীর পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে ভ্রমণ করেন।[৪৫] অবরোধ প্রথার ভিত্তি এভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই দশকে কলকাতা এবং মফস্বলের কোনো কোনো মহিলার মধ্যেও অবরোধ বিরোধী সচেতনতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ১৮৭১ সালে রাজশাহীর এক অন্তঃপুর-বন্দিনী সাময়িক পত্রিকায় লেখেন যে, স্বাধীনতার অভাবে মেয়েরা জড়পদার্থের ন্যায়। তাঁরা বাইরে গিয়ে উপাসনায় যোগ দিতে কিংবা লেখাপড়া শিখতে পারেন না। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন, বাইরে গেলেই কি চরিত্র নষ্ট হয়?

৪১. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', **পুরাতনী**, পৃ. ৩৮।

৪২. ১৮৭১ সালের গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত টাউন হলের সভায় বোধহয় সর্বপ্রথম মহিলারা যোগদান করেন। **বামাপ,** চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৩৬৫।

১৮৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শোনার জন্যে মিস অ্যাক্রয়েড একটি সভায় গমন করেন। সেখানে তিনি ছাড়া আরো একটি কি দুটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। দ্রষ্টব্য : মিস অ্যাক্রয়েডের ডায়েরি, W. H. Beveridge, p. 90.

৪৩. প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ কলকাতায় আগমন করেন ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। এ উপলক্ষে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তার অন্তঃপুরে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। মেয়েরা রাজ-অতিথিকে অবরোধ ভেঙে সংবর্ধনা জানানোয় প্রাচীন সমাজ রক্ষণশীলতার খাতিরে এবং নব্যসমাজ নবোদিত জাতীয়তাবোধের তাড়নায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

৪৪. মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করার উদ্যোগ সর্বপ্রথমে গ্রহণ করেন ওরিয়েন্ট থিয়েটার। এটা ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। **—মধ্যস্থ,** ১২ ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৭৭০। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম মেয়েদের দিয়ে স্ত্রী ভূমিকার অভিনয় করান। **—মধ্যস্থ** ১৪ ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ৪০৫-০৬।

এই অভিনয় হয় ১৮৭৩ সালের ১৬ অগস্ট তারিখে। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,** পৃ. ১৩২। কলিকাতার আগে হাওড়ায় ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকে অভিনেত্রী সহযোগে নাট্যাভিনয় হয়েছিলো বলে কেউ কেউ মত পোষণ করেন। H. N. Das Gupta, **The Indian Stage,** Vol. II, p. 22.

৪৫. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, **জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি** (কলিকাতা, ১৯২০), পৃ. ১৩৮।

ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লেখেন, 'স্ত্রীলোকদিগের উপর পুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাতে কিছুই আপত্তি করিতে পারিবেন না। কি আশ্চর্য!'[৪৬]

প্রায় একই সময়ে কলকাতার একজন ভদ্রমহিলা—মায়াসুন্দরী—বিস্ময় ও তিক্ততার সঙ্গে বলেন,

> স্ত্রীলোকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিলাম না।[৪৭]

প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য কালে শিক্ষিত রমণীগণের অনেকের পক্ষেই অন্তঃপুরের চিরস্থায়ী বন্দীত্ব 'ক্লেশকর' বলে মনে হয়।[৪৮]

কিন্তু একথা মনে করার কারণ নেই যে, সমাজের বেশির ভাগ লোক অবরোধ-বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। বরং অবরোধ মোচনের ঘটনা এবং অবরোধবিরোধী মনোভাবই একালে ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতো। ১৮৭২ সালে রামতনু লাহিড়ী তাঁর কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের নিয়ে টাউন হলে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনতে যান। এর জন্যে কেবল প্রাচীন সমাজই নয়, প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো ডিরোজিও-শিষ্য এবং নারীদরদীও তাঁকে পরিহাস করেন।[৪৯]

পরবর্তী সময়ে স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে ভ্রমণ করলেও, ১৮৭২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীস্বাধীনতা, এমন কি উপাসনা সভায় তাঁদের যোগদান করার বিষয়টি অনুমোদন করতে পারেননি।[৫০] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ সময়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের রীতিমতো বিরোধিতা করা হয়েছে।[৫১] মেয়েদের প্রকাশ্য সভায় যোগদান করার ধারণাটি বামাবোধিনী পত্রিকাও সমর্থন করতে পারেনি।[৫২]

৪৬. খোরালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা, 'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের স্বাধীনতার বিষয়,' **বামাপ,** জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮, পৃ. ৬২-৬৪।

৪৭. শ্রীমতী মায়াসুন্দরী, 'নারীজন্ম কি অধম,' বঙ্গমহিলা, শ্রাবণ ১২৮২, পৃ. ৯৪।

৪৮. জানকীনাথ সরকার, 'এ দেশীয় বামাগনের বহির্গমন,' **বামাপ,** আশ্বিন ১২৭৮, পৃ. ১৮৫।

৪৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ২৮৯।

৫০. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরে দ্রষ্টব্য।

৫১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: 'সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন,' **তত্ত্বপ,** আষাঢ় ১৭৯৪ (জুন-জুলাই ১৮৭২); 'স্ত্রীজাতির অধিকার, স্ত্রীস্বাধীনতা,' শ্রাবণ ১৭৯৪ (জুলাই-অগস্ট ১৮৭২); 'স্ত্রীশিক্ষা,' জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ (মে-জুন ১৮৭৬)।

৫২. 'নূতন সংবাদ', **বামাপ,** চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৩৬৩।

আসলে অবরোধ মোচন করার ধারণাটি সমাজকর্মীদের কাছে তখনো অপ্রত্যাশিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য ছিলো।

এই পরিবেশে সাধারণ মানুষ যে মহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে দেখলেই নিন্দা বা বিদ্রূপ করবেন, তা অস্বাভাবিক নয়।[৫৩] মেয়েদের দেখলে অনেকেই অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতেন যে, তার ফলে অবরোধমুক্ত নারীরা খুব অস্বস্তি বোধ করতেন।[৫৪] এ থেকে বোঝা যায়, সমকালে অবরোধ মোচনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশই সচেতন হয়ে ওঠে। বৃহত্তর সমাজে এই সচেতনতার বিকাশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো।

১৮৬৬ সালের জানুআরি মাসে মাঘোৎসবের মতো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যখন মহিলারা যোগদান করতে চান, তখন অনেকের কাছেই তা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিলো। শেষে তাঁদের পর্দার আড়ালে বসে এই উৎসবে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৫] পাঁচ বছরের মধ্যে ব্রাহ্মিকাদের এ অধিকার স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ১৮৭২ খৃস্টাব্দে এই অধিকার সম্প্রসারণের প্রয়াস চালালে নতুন করে তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। এই বিরোধিতার মুখে সাময়িকভাবে কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়।[৫৬] অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও দুর্গামোহন দাসের পরিবারস্থ মহিলাগণ পর্দার বাইরে বসে উপাসনা করার চেষ্টা করলে এই

৫৩. মধ্যস্থ পত্রিকায় একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এই বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেয়। —মধ্যস্থ, ১৬ আষাঢ় ১২৭৯, পৃ. অতিরিক্ত ১-২।

৫৪. মিস অ্যাক্রয়েড কেশব সেনের পূর্বোক্ত সভায় (পূর্বে, পৃ.৩১৫) উপস্থিত হলে পুরুষদের দু ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। একদল তাঁর দিকে লুব্ধ নয়নে তাকিয়েছিলেন। তাতে তিনি বিস্মিত হননি। কেননা সব সভ্যতাতেই এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরাই তাঁর দিকে অদ্ভুত জন্তু দেখার মতো বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। এতে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করেন। মিস অ্যাক্রয়েডের ডায়েরি, W. H. Beveridge, p. 90.

৫৫. বামাপ, ফাল্গুন ১২৭২, পৃ. ২১৬-১৭।

৫৬. ১৮৭১ সালের মাঝামাঝি 'পূর্ববঙ্গীয় কোন ভদ্রমহিলা' (দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী ?) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে মহিলাদের জন্য আসন নির্মাণের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ টাকা দান করেন। —বামাপ, কার্তিক ১২৭৮, পৃ. ২১৩। এই চাঁদা গ্রহণের মধ্য দিয়ে মন্দিরে মহিলাদের বসার অধিকার স্বীকৃত হয়। অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও দুর্গামোহন দাসের পরিবারস্থ মহিলারা ১৮৭২ সালের মাঘোৎসবের সময় পর্দার বাইরে বসার চেষ্টা করলে কেশব আপত্তি জানান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অন্নদাচরণ, দুর্গামোহন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ একত্রিত হয়ে বৌবাজারে অন্নদাচরণের গৃহে স্বতন্ত্র একটি উপাসনা সভা স্থাপন করেন। মার্চ মাসে এই সভা আরম্ভ হয়। ৩০ ফাল্গুন তারিখের সভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ধর্মীয় বক্তৃতা দান করেন। —তত্ত্বপ, জৈষ্ঠ ১৭৯৪ (মে-জুন ১৮৭২), পৃ. ২৭-৩০। শিবনাথ শাস্ত্রী নারীমুক্তি দলের একজন নেতা

বিরোধের সূচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই অধিকার স্বীকৃত হওয়ার পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দু অংশের বিরোধের অবসান হয়।[৫৭]

কিন্তু আগেই লক্ষ্য করেছি ১৮৭২-৭৩ সালে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার এবং পাঠ্যক্রমের প্রশ্নে কেশবচন্দ্র সেন ও নারীস্বাধীনতা সমর্থক তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পুনরায় বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। এই বিরোধিতার কোনো মীমাংসা হয়নি। তবে স্ত্রীস্বাধীনতা দল[৫৮] হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নেন। এমন কি, কেশব সেনও পরের দশকে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে একটি কলেজ স্থাপন করেন। তার চেয়ে বড়ো কথা উচ্চশিক্ষা ও পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে তাঁর ধারণা স্বতন্ত্র ধরনের হলেও, তিনি মেয়েদের নানা অধিকার, বিশেষত বিয়ের ব্যাপারে তাঁদের মৌল অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রকৃত পক্ষে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজই 'মেয়েদের নানা বিষয়ে সম্মান প্রাপ্য' এই সচেতনতার সৃষ্টি করতে সহায়তা করে এবং বহু বিষয়ে সম্মান দানও করে। সেকালে

হলেও বিরোধিতা এড়ানোর জন্যে এই সভার আচার্যের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে এই দায়িত্ব নেন রাজনারায়ণ বসু। এই সমাজে উপাসনার সময়ে মহিলারা সবার সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে বসতেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। —রাজনারায়ণ বসুর **আত্মচরিত**, পৃ. ১৯৭।

৫৭. শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে জুন মাসের দিকে কেশব মেয়েদের বসার অধিকার স্বীকার করে নিলে বিরোধের অবসান হয়। –S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, p.163. কিন্তু আসলে স্বতন্ত্র সমাজ সেপ্টেম্বর মাসেও কাজ করছিলো বলে জানা যায়।–বৌবাজার উপাসনা সমাজ, **তত্ত্বপ**, আশ্বিন ১৭৯৪ সেপ্টেম্বর–অকটোবর ১৮৭২), পৃ. ১০৭। রাজনারায়ণ বসুর মতে এ সমাজ ছ-সাত মাস সজীব ছিলো। রাজনারায়ণ বসুর **আত্মচরিত** পৃ. ১৯৭।

৫৮. স্ত্রীস্বাধীনতা দলের বিশিষ্ট সদস্যগণ ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগীর, রাখালচন্দ্র রায়, রজনীনাথ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। এই দল তাঁদের আধুনিক মনোভাবের জন্যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ, এমন কি কেশবচন্দ্র সেনের 'উন্নতিশীল' ভারতবর্ষীয় সমাজকেও উত্তেজিত করেন। হিন্দু সমাজের অন্যতম মুখপত্র **মধ্যস্থ** পত্রিকা এ সময়ে নীতি ও আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—'সমাজরক্ষক' (আদি সমাজ), 'উন্নতিশীল' (ভারতবর্ষীয় সমাজ) এবং 'বেড়ে উন্নতিশীল' (স্ত্রী-স্বাধীনতা দল)। **হালিসহর পত্রিকা** এঁদের নাম দেয় যথাক্রমে 'বেদ প্রধান', 'বক্তৃতামূলক' ও 'স্ত্রীসর্বস্ব'। —**মধ্যস্থ**, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, পৃ. ১২৭।

মহিলাগণ নিজেদের নামে পরিচিত হতেন না ; তাঁদের পরিচয় ছিলো বিশেষ ব্যক্তির স্ত্রী কি কন্যা কি মাতা হিশেবে। লোকেরা অনেক সময় তাঁদের নাম পর্যন্ত ভুলে যেতেন। কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজ তাঁদের স্বকীয় পরিচয় ও নামের স্বীকৃতি দান করেন। মেয়েদের নামের আগে শ্রীমতী, কুমারী এবং শেষে পদবী লেখার রীতিও এঁরাই চালু করেন।[৫৯]

এ ছাড়া ছোটখাটো এমন সব সংস্কারে তাঁরা উৎসাহ দেখান যা থেকে বোঝা যায় এ সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি একটি নতুন মর্যাদাবোধ ও সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিলো। এ দেশের মেয়েরা চিরকাল পুরুষদের পরে আহার করতেন এবং তাঁদের নিজেদের জন্যে উত্তম খাদ্যের সামান্যই অবশিষ্ট থাকতো।[৬০] কেশবচন্দ্র সেন এ জন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে মেয়েদের আগে আহারের নিয়ম প্রবর্তন করেন।[৬১]

আলোচ্যকালে মেয়েদের পোশাক ছিলো অতি নগণ্য। তাঁরা কেবল একটি শাড়ি পরিধান করতেন এবং শীতকালে তার উপর একটি চাদর।[৬২] শাড়ির নীচে পেটিকোট, উর্ধ্বাঙ্গে ব্লাউজ এবং পায়ে জুতো পরার নিয়ম তখনো চালু হয়নি।[৬৩] তদুপরি এই শাড়ি ভদ্র পরিবারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হতো। এই পোশাকে বাইরের সমাজের পক্ষে দূরের কথা,পিতা বা ভ্রাতার সম্মুখে যাওয়ার জন্যেও উপযুক্ত ছিলো না।[৬৪] সমকালীন একজন সমালোচক এই জন্যে 'দশ হাত কাপড়ে স্ত্রীলোক লেঙটো' বলেছেন। তিনি একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> এখন যে সকল বস্ত্র তাহারা পরিধান করে তাহা বস্ত্র না বলিলেও হয়। আর যখন স্নানান্তে জল হইতে তাহারা উঠে তখন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে কিনা তাহা হঠাৎ নয়নগোচর হয় না, আর বাবু ভেয়েরা যত সরু কাপড় পান, ততই আনন্দ পূর্বক যত দাম হউক না কেন, তাহা ক্রয় করিয়া আপন প্রণয়িনীদিগকে দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ ও কৃত কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন, পূর্বে ২ লোকেরা পট্টবস্ত্র বড়ই ভাল বাসিতেন, এখন তাহার পরিবর্তে, যে সকল শান্তিপুরে কাপড়

৫৯. 'বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মানসূচক উপাধি', বামাপ, আশ্বিন ১২৮০, পৃ. ২০১–০৩।

৬০. রামমোহন গ্রন্থাবলি, পৃ. ২০৭।

৬১. সকালে মেয়েরা খেতেন দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে, পুরুষরা সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। আবার রাতের খেলা মেয়েরা খেতেন নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে এবং পুরুষরা সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে। —বামাপ, আষাঢ় ১২৭৯, পৃ. ৬৮-৬৯।

৬২. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, পৃ. ২৯।

৬৩. B. C. Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 62.

৬৪. 'সংবাদ', তত্ত্বপ, আষাঢ় ১৭৮৬ (জুন-জুলাই ১৮৬৪), পৃ. ৪৭।

উঠিয়াছে, তাহা দেখিলে শুনিলে আক্কেল গুড়ুম হয়।...কাপড়ের মধ্যে সূতা অতি অল্প আছে, প্রায় সিকিরি বোনা আর ধোপার বাটী হইতে আইলে যে কত পরিমাণে সরু হয়, তাহা প্রকাশ করিতে জিহ্বা ও কলম নিতান্ত অসক্ত, সাধুরা বলেন, ও কাপড় নহে উহাকে চোপড় কহে...।[৬৫]

Fanny Parks-ও এরকমের সূক্ষ্ম শাড়ির বর্ণনা দিয়ে বলেন, এরকমের পোশাক পরেন বলেই হয়তো স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে মহিলাদের যেতে দেওয়া হয় না।[৬৬] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন, 'আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে, তাহা না পরিলেও হয়।[৬৭] এই পোশাকের সংস্কার যথার্থই অত্যাবশ্যক ছিলো। ১৮৬০-এর দশকেই এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করি।[৬৮] এ সময়কার সংস্কারকগণ অনেকেই বলেন, স্ত্রীলোকদের অবরোধ মোচনের পূর্বে তাঁদের পোশাকের সংস্কার প্রয়োজনীয়।[৬৯]

আর বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কেউ কেউ পোশাকের সংস্কার করতে আরম্ভও করেন। ১৮৬৪ সালে স্বামীর কর্মস্থান বোম্বাই গমনকালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এক মহাসমস্যার সম্মুখীন হন। একমাত্র শাড়ি পরে বাইরে যাওয়া যায় না, অথচ বাঙালি মেয়ে হিশেবে তিনি কী পোশাক পরতে পারেন, এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভাবিত হন। শেষে সত্যেন্দ্রনাথ এক ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা পোশাক করান— যাকে এই দোকানিরা 'ওরিএন্টাল' বিবেচনা করলেন।[৭০] স্বর্ণকুমারী দেবীর মতে এ পোশাক ছিলো বিলিতি, পার্শি ও বাঙালি স্টাইলের অদ্ভুত এক সমন্বয়।[৭১] পোশাকটি এমন অভিনব ও জটিল ছিলো যে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজে সেটি পরতে পারতেন না, সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যেকবার পরতে সাহায্য করতেন।[৭২] কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য

৬৫. রাজকুমার চন্দ্র, **দেখেশুনে আক্কেল গুড়ুম** (কলিকাতা, সংবৎ ১৯২০, ১৮৬৩-৬৪), পৃ. ৬-৭।

৬৬. F. Parks, **Wandering of a Pilgrim in Search of the Picturesque** etc. Vol. I (London, 1850), p. 60

৬৭. জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, পত্র সংখ্যা ৪, ১৮ জানুআরী ১৮৬৪, **পুরাতনী**, পৃ. ৫১।

৬৮. 'সূক্ষ্ম বস্ত্র' (কবিতা), **বামাপ**, কার্তিক ১২৭৫ পৃ. ১২৩-২৭; 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ,' **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৮।

৬৯. 'উন্নতি,' **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৭১, পৃ. ১৬৩; **বামাপ**, পৌষ ১২৭১, পৃ. ২৪৩।

৭০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা,' **পুরাতনী**, পৃ. ২৯।

৭১. স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮।

৭২. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা, পৃ. ২৯।

দিয়েই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই বাঙালী মহিলাদের মধ্যে পেটিকোট, ব্লাউজ এবং শাড়ি পরার বর্তমান ভঙ্গির প্রবর্তন করেন।[৭৩]

সেকালের সমাজ অবশ্য এ ধরনের জামা, জুতো, শেমিজ পরা মহিলাদের দেখে বিস্মিত হতো এবং অনেক সময়েই ধিক্কার দিতো।[৭৪] আর মহিলারা নিজেরাও বোধ-হয় জুতো-মোজা পরাকে বেশ কষ্টকর মনে করতেন।[৭৫]

স্ত্রীজাতিকে বিদগ্ধ ও সভ্য করে তোলার জন্যে কেবল পোশাকেরই সংস্কার নয়, উন্মুক্ত নদীরঘাটে কিংবা পুকুরে তাঁদের স্নান করার অশোভন রীতি সম্পর্কেও অনেকেই সচেতনতা প্রকাশ করেন। এভাবে স্নান করা যে সকল সভ্যতা ও শোভন রুচির পরি-পন্থী তার উল্লেখ করে এই রীতির সংস্কার করার চেষ্টা করেন সমাজকর্মিগণ।[৭৬]

প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার সময় সেকালের মেয়েরা পুনর্বিবাহ নামক যে অশ্লীল অনুষ্ঠান পালন করতেন, তারও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারকগণ উপলব্ধি করেছিলেন।[৭৭]

অলঙ্কারের প্রতি মহিলাদের অতিরিক্ত দুর্বলতা এবং সিন্দুর দেওয়ার রীতি সম্পর্কেও এই সংস্কারকগণ তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। অলঙ্কার প্রলোভন যে দূষণীয় এবং সিন্দূর ব্যবহার যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক—সংস্কারক যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করার প্রয়াস পান।[৭৮]

যা কিছু অবাঞ্ছিত, অনুচিত, অশোভন তার সব কিছু সংস্কার করে বঙ্গদেশীয় নারীগণকে সভ্য করে তোলার প্রয়াসে আলোচ্য সময়ের সমাজ-সংস্কারকগণ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে তাঁদের দৃষ্টি গভীরভাবে নিবদ্ধ ছিলো নারীদের অধিকার আদায় করার প্রতি। বিশেষত বিবাহ এবং সম্পত্তি জীবনের এই দুই প্রধান বিষয়ে তাঁদের

৭৩. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, পৃ. ২৫২-৫৪।

৭৪. সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি' **প্রবাসী**, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৪৭৫ ; 'বিবি আর বউ' **বান্ধব**, অগ্রহায়ণ ১২৮১, পৃ. ১৪৩-৪৬ ; 'বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি', **বামাপ**, অগ্রহায়ণ ১২৮০, পৃ. ২৬৫-৬৬ ; 'স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল', **বামাপ**, পৌষ-মাঘ ১২৮২, পৃ. ১৮৪ ; 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্ন', **বসন্তক**, ১৮৭৪, পৃ. ৬৯-৭০।

৭৫. দ্রষ্টব্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, পত্র সংখ্যা ৪, ১৮ জানুআরি ১৮৬৪, **পুরাতনী**, পৃ. ৫১।

৭৬. 'স্ত্রীলোকের স্নান প্রণালী', **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৭৬, পৃ. ৭১-৭২ ; অবগুণ্ঠন', **বামাপ**, মাঘ ১২৭৩, পৃ. ৪৩৩।

৭৭. 'পুনর্বিবাহ বিষয়ক কথোপকথন', **বামাপ**, কার্তিক ১২৭২, পৃ. ১৩৪-৩৬।

৭৮. 'অলঙ্কার পরিধান', **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭২, পৃ. ৫২-৫৫; 'সিন্দূর', **বামাপ**, কার্তিক ১২৭৫, পৃ. ১২১-২৩।

অধিকার যাতে স্বীকৃত হয় এ সম্পর্কে সমাজ-বিবেককে জাগ্রত করা এই কর্মীদের ব্রত ছিলো। বিবাহ ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হলে পুরুষের কৃপা ও অনুকম্পার স্থলে তাঁরা তাঁদের জন্মগত ও মৌল অধিকার পেতে পারেন—এই সচেতনতা নারীমুক্তি আন্দোলনকে কাঙ্ক্ষিত পথ প্রদর্শন করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সমকালীন ইংলণ্ডেও স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চলে। এ ব্যাপারে Mary Wollstonecraft, Hannah More, Mary Anne Radcliffe, Caroline Norton প্রমুখ মহিলা-কর্মী এবং উইলিয়াম টম্প্সন, জন স্টুআর্ট মিল প্রমুখ মনীষী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এঁদের সমবেত আন্দোলনের ফলে ১৮৭০ সালে বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ক বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। ১৮৮২ সালে এ অধিকার স্বীকৃত হয়।[৭৯]

অনেকটা এরই অনুকরণে সম্পত্তিতে এ দেশীয় মহিলাদের অধিকার নিয়ে কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক আন্দোলন করেন। তবে এ আন্দোলন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি সেকালে মোটেই লাভ করেনি।

স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে ভাবিত স্বল্প সংখ্যক সমাজ-সংস্কারক এ-ও অনুভব করেছিলেন যে, যথার্থ নারীমুক্তির জন্যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অত্যাবশ্যক। অন্নবস্ত্রের জন্যে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হলে প্রকৃত স্বাধীনতা যে কখনোই আসতে পারে না এটা সেকালের পক্ষে প্রাগ্রসর চিন্তা হলেও, দু-একজন এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেয়েরা নিজেরা উপার্জন করবেন না, চিরকাল নির্ভর করে থাকবেন পুরুষদের উপর—পুরুষদের এই মনোভাবই মেয়েদের 'অশেষ দুঃখ, অসৌভাগ্য ও হীনাবস্থার কারণ'।[৮০] যখন ভরণপোষণের জন্যে স্ত্রীগণ স্বামীর উপর নির্ভরশীল থাকবেন না, প্রবন্ধ লেখকের মতে, 'তখন স্বামির স্ত্রীর প্রতি এরূপ অত্যাচার (প্রহার ইত্যাদি) ও উৎপীড়ন ঘুচিয়া যাইবে।'[৮১] এজন্যেই নারীজাতির সামগ্রিক মুক্তির জন্যে তাঁদের উপার্জন করা অত্যাবশ্যক বলে কেউ কেউ দৃঢ় মত পোষণ করেন।[৮২]

৭৯. See D. M. Stenton, **The English Women in History**, Ch. XI.

৮০. 'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র', **জ্ঞানাঙ্কুর**, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ২৬০।

৮১. ঐ, পৃ. ২৬৫।

৮২. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'স্ত্রীস্বাধীনতা', **সোপান**, প্রথম স্তর (কলিকাতা, ১২৮৬), পৃ. ১১৫; 'স্ত্রীশিক্ষা', **সোমপ্রকাশ**, ৩০ শ্রাবণ ১২৮৯, সাবাস ৪ পৃ. ৫৭৬-৭৭; সিদ্ধেশ্বর রায়, 'লোকসংখ্যা', **নব্যভারত**, ফাল্গুন ১২৯০, পৃ. ৪৭০।

বাংলা নাট্যরচনায় অবরোধমোচন ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখেছি যে, ১৮৬৬ সালের আগে অবরোধ মোচনের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বঙ্গসমাজে স্থাপিত হয়নি। ১৮৬৬ সাল থেকে প্রধানত ব্রাহ্মপরিবারে স্ত্রীশিক্ষা ও পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অবরোধমোচন এবং স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যান্য লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। সুতরাং ১৮৬৬ সালের পূর্ববর্তী নাটকসমূহে অবরোধমোচন অথবা/এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গ স্বভাবতই উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু ১৮৭০-এর দশক থেকে এ প্রসঙ্গ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যেহেতু স্ত্রীশিক্ষার তুলনায় অবরোধমোচন তথা স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কেই সমাজ অধিকতর প্রতিকূল ছিলো, সেজন্যে এই দশকে রচিত নাটক-প্রহসনে স্ত্রীস্বাধীনতা এবং তার মূল কারণ স্ত্রীশিক্ষা উভয়ই রক্ষণশীল নাট্যকারদের প্রত্যক্ষ আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। কেবল যে মনোমোহন বসুর মতো হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখক এ সময়ে নাগাশ্রমের অভিনয় লিখে ব্রাহ্মদের প্রগতিশীল নারীমুক্তি আন্দোলনকে বিদ্রূপ করেছিলেন তা-ই নয়, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং সেকালের তুলনায় খুব আধুনিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিঞ্চিৎ জলযোগ রচনা করে নারীমুক্তির প্রশ্নটিকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছিলেন।

আসলে পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতার দাবি দারুণ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিলো এবং নাট্যকারগণ কল্পিত নারীস্বাধীনতার অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কন করে এই প্রতিকূল মনোভাবই প্রকাশ করেন। পাঠক-দর্শকগণও এই অতিরঞ্জিত চিত্র দর্শনে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের একাংশের মোটামুটি প্রশ্রয় থাকলেও এবং এই সমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ ঘটলেও, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি এদের আদৌ কোনো সহানুভূতি ছিলো না। স্ত্রী শিক্ষা লাভ করলে তার সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে কি সন্তানাদির লালনপালনে সুবিধে হবে—এসব বিবেচনা করে স্ত্রীশিক্ষার কিছুটা পোষকতা করলেও, স্ত্রীরা অবরোধ মোচন করে অন্তঃপুরের বাইরে গমন করুন, চিরবন্দিনী দশা থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করুন—এ মনোভাব সে সমাজ মোটেই সমর্থন করতে পারেনি। বরং ১৮৭০-এর দশকের স্ত্রীস্বাধীনতামূলক নাট্যরচনাসমূহে স্ত্রীদের অবরোধ মোচন ও সমানাধিকার বিষয়ে যে বিরোধিতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সুতীব্র। বাস্তব আদর্শ সামনে না থাকায়, এ সময়কার নাট্যকারগণ স্ত্রীস্বাধীনতার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা একান্ত কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পাঠক ও অভিনয়ের দর্শকগণ এই কাল্পনিক ও চড়া রঙের ছবি দেখে তা রীতিমতো উপভোগ করেন। আসলে তাঁরা সম্ভবত শঙ্কা

এবং নিঃসন্দেহে কৌতুকের মনোভাব নিয়ে অদৃষ্টপূর্ব স্ত্রীস্বাধীনতার যে চিত্র কল্পনা করেন, নাট্যকারদের রচনায় তারই প্রতিফলন দেখতে পান। এবং পাঠক ও দর্শকদের মধ্যে এসব নাটকের জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে যে বিরুদ্ধতা তা কয়েকজন নাটক রচয়িতার ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, পরিকীর্ণ হয়ে ছিলো বৃহত্তর সমাজে।

দীনবন্ধু মিত্র এক কথায় যিনি শিক্ষিত এবং আধুনিক নারীদের চরিত্র অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সর্বপ্রথম অঙ্কিত করেন,—তাঁর মধ্যেও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা রক্ষণশীলতা লক্ষ্য করি। তাঁর সৌরিন্ধ্রী, সরলতা (নীলদর্পণ), কামিনী, মালতী (নবীন তপস্বিনী), লীলাবতী, শারদাসুন্দরী, রাজলক্ষ্মী (লীলাবতী), কামিনী (জামাই বারিক) ইত্যাদি চরিত্র শিক্ষিত এবং সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট আধুনিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা সকলেই অন্তঃপুরচারিণী। গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনমোহন সেনগুপ্ত উভয়ই মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু এঁরা তবু অবরোধের সমর্থনই করেন।

মেয়েদের যথার্থ স্থান অন্তঃপুর, পরপুরুষের সামনে যাওয়া তাদের পক্ষে অনুচিত—এই উপদেশ এ সময়ের নাট্যকারগণ পরিবেশন করেন দু ভাবে। এক, সুন্দরী ও লেখাপড়া জানা আকর্ষণীয় নারীদের অন্তঃপুরে বন্দী রেখে এবং দুই, অশিক্ষিত, গ্রাম্য, কদর্যরুচির অধিকারিণী সাধারণ মহিলাদের পরপুরুষের সামনে হাজির করে।

প্রথম পথটি দীনবন্ধু মিত্র বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। লীলাবতী নাটকের শারদাসুন্দরী এবং তার স্বামী হেমচাঁদ উভয়ে শিক্ষিত। রাজলক্ষ্মী শারদা-সুন্দরীর বন্ধু এবং রাজলক্ষ্মীর স্বামী সিদ্ধেশ্বর হেমচাঁদের বন্ধুস্থানীয় ও সুপরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও শারদাসুন্দরী কখনো সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেনি। স্বামীর ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নের উত্তরে সে পরিষ্কার জবাব দেয় 'আমি সিদু নিদু চাইনে, আমি যে বিদু পেইচি, সেই ভাল।'[৮৩] রাজলক্ষ্মী যখন তাকে তার স্বামী সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে অনুরোধ করে তখন সে যে উত্তর দেয়, তা থেকেই সেকালের হিন্দু পরিবারের অবরোধের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> রাজলক্ষ্মী। কেন, আমার স্বামীর সুমুখে বার হতে তোমার কি ভয় হয়, না লজ্জা হয়?
>
> শারদা। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব, সুমুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

৮৩. লীলাবতী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ৩২৮।

রাজলক্ষ্মী। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না। তোমার পড়া শুনতে তার ভারি ইচ্ছে।

শারদা। যুবতী-জীবন পতি, তাঁর হাত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি ; বন্ধু দরশন
নিতান্ত সহজ কথা ; কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে ?

*

পতিকে সুমতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে তবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব তুষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্ম সঙ্গীত সুন্দর।[৮৪]

এ আদর্শ দীনবন্ধু নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, জামাই বারিক ইত্যাদি রচনায়ও রক্ষা করেন। নীলদর্পণের সৌরিন্ধ্রী ও সরলতা, সধবার একাদশীর কুমুদিনী ও সৌদামিনী এবং জামাই বারিকের কামিনী—সকলেই রীতি-মতো পর্দানশীন রমণী। সধবার একাদশীর শেষ দৃশ্যটি বর্তমান প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এখানে দেখতে পাই, অটল ষড়যন্ত্র করে খুড় শাশুড়ী মনে করে নিজের স্ত্রী কুমুদিনীকে বাইরের বাড়িতে (বৈঠকখানায়) নিমচাঁদের সামনে নিয়ে আসে। এর ফলে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সকলের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রীদের বাড়ির বাইরে যাওয়া, অথবা বাহির বাড়িতে পর-পুরুষের সামনে যাওয়া—এমন কি স্বামীর উপস্থিতিতে—তা সে ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হতো।

প্রকৃত পক্ষে, পরপুরুষতো দূরের কথা, দিনের বেলা স্বামীর কাছে যাওয়াও নিন্দনীয় ছিলো। মাতাল স্বামীকে হঠাৎ বাড়িতে ফিরে আসতে দেখে সুরমা তাকে প্রকৃতিস্থ করতে গেলে পাড়ার মেয়েরা তাকে নির্লজ্জ বলে নিন্দা করে, পূর্বেই আমরা তা দেখেছি।[৮৫] স্বামীর সামনে তার মাথা থেকে ঘোমটা খসে যাওয়ায়, পাড়ার মেয়েরা তা-ও মন্দ চোখে দেখে।[৮৬]

৮৪. লীলাবতী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ৩৯১।
৮৫. ঘটনাটি বটুবিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের।
৮৬. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ১১৪।

জামাই বারিকের জামাইরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে দিনের বেলা দেখা করতে পারতো না, সে চিত্র দীনবন্ধু মিত্র বিস্তারিতভাবে অঙ্কন করেন।[৮৭] নীলদর্পণে বিন্দুমাধব স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কিন্তু তাকে সরাসরি ডাকা শোভন নয় বলে সে আদুরীকে ডাকে। সে ডাকের অর্থ, বোকা হলেও, আদুরীর বুঝতে অসুবিধে হয় না। সৌরিন্ধ্রীকে তাই সে বলে, 'ডাকচেন মোরে কিন্তু চাচেচন তোমারে।'[৮৮]

সপত্নী নাটকে কলকাতায় চাকরিরত ভূধর অনেকদিন পরে বাড়ি এসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে, তাতে পাশের বাড়ির তিন কুলীনকন্যা যে-মন্তব্য করে, তা প্রসঙ্গত উদ্ধার করা যেতে পারে।

চঞ্চলা। কোথা লো বড় বৌ? আজ বড় যে তোকে আর দেখতে পাই না? হোক না ভাই, আর কার কি কেউ কখন চাকরী কর্ব্যে বাড়ী আসে না? তা হল্যেই কি এত ঘুমুতে হয় লা? মিটে পেল্যেই কি আঁটিশুদ্ধ গিলতে হয়?···

কাদম্বিনী। সে কি লো ওমা কোথা যাব মা। দেখ্যে দেখ্যে যে আর বাঁচিনে। বৌ মানুষ, দিনের বেলায় এত ঘুম কিলো। তায় আবার দাদা কাল বাড়ী এস্যেছেন। কেমন মেয়্যে লা। ওমা লোকে শুনলে বলবে কি লা। কি বলে নেঙ্গঠকে চেয়্যে নেঙ্গঠকে যে দেখে তার বেশী নজ্জা, এ যে তোর তাই হল্যো লো।[৮৯]

বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটকের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে আদর্শ হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে ছোট বৌ প্রমদার চরিত্র। অন্যান্যের সঙ্গে তুলনা করলে দুটি বিষয়ে তার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে,—তার ব্যবহারে সবাই সন্তুষ্ট এবং সে কখনোই অন্তঃপুরের বাইরে যায় না।

মেয়েদের পর্দা এবং অবরোধের প্রতি নাট্যকারদের সমর্থন ছিলো অপরিসীম, সে জন্যেই তাঁরা পূর্বোক্ত চিত্র অঙ্কন করতে উৎসাহ পান। দ্বিতীয় পথ— অশিক্ষিত, গ্রাম্য, কদর্যরুচির অধিকারিণী মেয়েদের পরপুরুষের সামনে উপস্থিত করে অথবা এ ব্যাপারে স্বামীদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েও নাট্যকারগণ অবরোধের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

এ সব নাটকে দেখতে পাই অশিক্ষিত, গ্রাম্য ও নীচ চরিত্রের স্ত্রীলোকেরা স্নান, বিবাহ, পূজাপার্বণ ইত্যাদির সময়ে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতো এবং যে সমাজে পর্দা প্রথার অতো কড়াকড়ি ছিলো সেই সমাজই এইসব অম্লান বদনে সহ্য করতো। আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে মেয়েদের এই উচ্ছৃঙ্খল ও অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল আচরণের

৮৭. জামাই বারিক, পৃ. ৩৯-৪১, ৫২-৫৪।
৮৮. নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ২৩।
৮৯. সপত্নী নাটক, পৃ. ৮-৯।

দৃশ্য নাট্যকারগণ সম্ভবত ইচ্ছে করেই বিস্তারিতভাবে এবং গাঢ় রঙে অঙ্কন করেন।

স্নান করতে গিয়ে সেকালের মেয়েরা যে অশোভন দৃশ্যের অবতারণা করতো, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবোদ্বাহ নাটক, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের চপলাচিত্ত চাপল্য, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্বিবাহ নাটক প্রভৃতি বহু রচনায়ই দেখানো হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের উপস্থিতি দেখানো হয়নি।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত বুঝলে কিনায় পুরুষদের উপস্থিতিতে মেয়েদের গঙ্গাস্নানের কথা আছে। দর্পনারায়ণের স্ত্রী ভদ্রঘরের বধূ সুতরাং তার পরপুরুষের সামনে যাওয়ার কথাই ওঠে না। কিন্তু স্নানের সময়ে সহস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে যেতেও তার আপত্তি নেই, সমাজও তাকে বাধা দেয় না। বরং গঙ্গাস্নান বলে কাজটিকে তারা প্রশংসার চোখেই দেখে।

কিন্তু মেয়েদের স্নানের দৃশ্য দেখে চরিত্রহীন পুরুষরা যে মেয়েদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য করতো এবং কোনো কোনো সময়ে সুযোগ পেলে স্নানার্থী মহিলার প্রতি শারীরিক আক্রমণ চালাতো 'কস্মিন হিন্দু মহিলা' রচিত বল্লালী খাত নাটকে তার প্রমাণ মেলে। মহিনীকে স্নান করতে আসতে দেখে বন্ধুদের মধ্যে মুখরোচক গল্প আরম্ভ হয়। রমেশ বলে—

বাহায়া ২ বেড়ে গাল তোফা বিউটিফুল বা তাইতো এমন চমৎকার রূপবতিত কখন দেখ নাই।

*

চলনে নড়িছে পাছা দেখে বাঁচা ভার।
সক্ সক্ করে মন রসিক জনার।।

*

হৃদয়ের বাউ হয়ে বিশ্বেশ্বর সমান।
উদানের স্থানতে হলেন অধিষ্ঠান।।[১০]

কেবল এ মন্তব্য করেই রমেশ ও তার বন্ধুরা থেমে যায় না। তারা ঠিক করে এ মেয়েটির সতীত্ব তারা হরণ করবে। একজন গিয়ে সিক্ত বসন পরা মহিনীর হাত ধরে এবং তাকে টানাটানি করে। কেউবা অর্থের প্রলোভন দেখায়। একজন গিয়ে তার রূপের প্রশংসা করে এবং সহানুভূতি জানায়।—

যে কুচের মাঝে শোভে হেমময় হার।
মনে ব্যথা পাই তাহা হেরে শূন্যাকার।।

*

১০. বল্লালী খাত নাটক, পৃ. ৩৪-৩৫।

যে নিতম্ব মাঝে শোভে শশীময় হার।
তাহে নাহি আহা মরি মুনসি সুতার ॥...[২১]

এ চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে মেয়েদের সেকেলে স্নানরীতির অশ্লীলতা ও বিপদের কথাই নাট্যকারগণ স্মরণ করিয়ে দিতে চান।

কীর্তন, কথকতা কিংবা গানের আসরেও মেয়েরা পুরুষের সামনে যেতে পারতো—চপলাচিত্ত চাপল্যে তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের মধ্যে গিয়ে সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করার সুযোগ পেতো আত্মীয় কিংবা পাড়া প্রতিবেশী-দের বিয়ের সময়ে। আগেই লক্ষ্য করেছি, দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ও তাঁর আত্মজীবনীতে এ কথা বলেন। তাঁর মতে এই দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ হতো নিতান্ত নির্দোষ, কোনো বিকার বা মোহ নারী বা পুরুষ কারো চিত্তকে মলিন করতে পারতো না।[২২] কিন্তু আলোচ্য নাটক-প্রহসনে বাসরঘরে মেয়েদের যে নির্লজ্জ ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাকে শোভন বলে গণ্য করা যায় না।

শ্যামাচরণ দে-প্রণীত বাসরকৌতুক নাটক,[২৩] তারকচন্দ্র চূড়ামণি-প্রণীত সপত্নী নাটক, বিপিনমোহন-প্রণীত হিন্দু মহিলা নাটক, উমেশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত বিধবাবিবাহ নাটক ইত্যাদিতে বাসরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

শ্যামাচরণদের নাটকটির আদ্যন্ত কেবল একটি বাসরের বর্ণনাই আমরা পাই। বর বাসরে প্রবেশ উদ্যত—নাটকের সূচনা এখান থেকে এবং রাতশেষে বাসর ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে এ নাটকের সমাপ্তি। এই সময়ের মধ্যে বরের সঙ্গে চৌদ্দটি যুবতী যে বিচিত্র—অধিকাংশ স্থানেই স্থূল ও আদিরসাত্মক—কৌতুক ও রসিকতা করে, তা-ই এ নাটকের বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, আলোচ্য কালে যে পাত্রীর বিয়ে হতো, নিতান্ত অল্পবয়স্ক বলে সে সাধারণত বাসরের কিছু বুঝতো না। কিন্তু বর প্রায়শ যুবকই হতো। এই অবস্থায় বিবাহিত যুবতী ও তরুণীরাই সমস্ত রাত সাহচর্য দিতো। বর্তমান নাটকের চৌদ্দটি যুবতীকে আমরা সারা রাত বরের সঙ্গে 'ইয়ারকি' দিতে দেখি। বরও এই যুবতীদের সঙ্গে সমান তালে রসিকতা করে। অঞ্জনার ভাষায় এই বর খুব বাচাল—'অন্য বরের বোল ফোটাবার তরে ওর মাস্তে হয়, পোঁদে চিমটি কাটিতে হয়, তবুও ভালরূপে কইতে প্রায় সকলে পারে না বোন। এযে একবারেই চক্কোর ধোরে বসলো লো।'[২৪] অঞ্জনার এ প্রশংসা খুব আন্তরিক,—

২১. বল্লালী খাত নাটক, পৃ. ৪১।
২২. কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবন চরিত', পৃ. ৪৩০-৩২।
২৩. শ্যামাচরণ দে, বাসরকৌতুক নাটক (দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৮৬২)।
২৪. ঐ পৃ. ১২।

সুলোচনার ভাষায় অঞ্জনা বরের 'প্রেমে গোলে' গেছে।[২৫] কেবল অঞ্জনা নয়, অন্যান্য মেয়েদেরও বরকে খুব ভালো লাগে। তারা সবাই বরের গা ঘেঁষে বসে নিষিদ্ধ সুখ পেতে চায়। বিশেষ করে কামিনী আর প্রমদা কথা দিয়ে যতোটা সম্ভব শারীরিক সম্ভোগের ইঙ্গিত দিতে থাকে। যেমন প্রমদা প্রতিশ্রুতি দেয়—

এস প্রাণ ধন, রসিক রতন, বলিয়া তখন, ধরিব করে।
পড়ি তব পায়, সঁপি মন কায়, লইবো তোমায়, হৃদয়োপরে ।।
রাখিব যতনে, নয়নে নয়নে, তুষিব যৌবনে, প্রফুল্ল হোয়ে।
এ অধিনী সঙ্গে, সদা রসরঙ্গে, মজিবে অনঙ্গে, সুখেতে রোয়ে ।।
অধরে চাপিয়ে, প্রেম-সুধা দিয়ে, ক্ষুধা নিবারিয়ে, নাশিব দুখ।
কোন জ্বালা আর, রবে না তোমার, তা হলে সুসার, পাইবে সুখ ।।[২৬]

মোটকথা অশ্লীল রসিকতা, গা ঘেঁষাঘেঁষি ইত্যাদির মাধ্যমে যতোটা বিকৃত আনন্দ পাওয়া সম্ভব, এ নাটকের বর এবং চৌদ্দটি যুবতী তা পাওয়ার চেষ্টা করে। বর এবং যুবতীরা যে গানগুলি পরিবেশন করে সেগুলিও ইঙ্গিতবহ। এমন কি এক বুড়ি ঠানদিও কিছুক্ষণের জন্যে বরের সঙ্গে স্থূল রসিকতায় অংশগ্রহণ করতে ছাড়ে না।

বাসরঘর প্রসঙ্গে সপত্নী নাটকে বলা হয়েছে, নারীরা অসতী হতে চাইলে সমাজ শাসনের ভিতরে থেকেও এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অসতী হতে পারে।[২৭] বাসরকে এ নাটকে আখ্যায়িত করা হয়েছে: 'পড়সি জামাই লয়ে খেলা' বলে।[২৮] এই খেলা সম্পর্কে যুবতী নারীদের মনোভাব নিম্নরূপ:

পড়িব বরের গায়ে করি নানা ছল ।।
যদি দেখি এ বরের মুখখানি ভাল।
করিব যা মনে আছে রয় রবে আলো ।।
যদি হয় সে মুখ শারদ সুধাকর।
বিম্বফল জিনি যদি হয় সে অধর ।।
অধীরা হইয়া তবে বধিরার মত।
শুনিব না হাসুক বলুক যেবা যত ।।
চক্ষু মুদি করিব সে মুখ সুধা পান।
অভাগা পতির রাগে যায় যাবে প্রাণ ।।

২৫. বাসরকৌতুক নাটক, পৃ. ৮।
২৬. ঐ, পৃ. ১২-১৩।
২৭. সপত্নী নাটক, পৃ. ১০৫।
২৮. ঐ, পৃ ১০৬।

না হয় না রব ঘরে যাব বেশ্যা হয়ে।
ইংরাজ রাজত্বে বাস কিবা যাবে বয়ে ।।[৯৯]

'রয় রবে আলো' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আলো না থাকলে কী হতে পারে, এখানে নাট্যকার তার ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন। অন্যত্র আর একটু স্পষ্ট করে বলেন,

ভাগ্যবলে আলো যদি নেবে একবার।
ভাগাড়ের মধ্যে শত শকনী (শকুনী!) সঞ্চার ।।[১০০]

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত রচিত **হিন্দু মহিলা** নাটকে বাসরের যে চিত্র দেখতে পাই, সেখানে বর ষাট বছরের বৃদ্ধ, কুৎসিত এবং নির্বোধ। সুতরাং যুবতী নারীদের উচ্ছ্বসিত বা আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলাপী, নিস্তারিণী, শশিমুখী, জগৎমোহিনী প্রভৃতি কম চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে না। শেষ পর্যন্ত গোলাপী আর নিস্তারিণীর খেমটা নাচ দিয়ে আসর সমাপ্ত হয়।[১০১]

উমেশচন্দ্র মিত্রের **বিধবাবিবাহ** নাটকে মূল বাসরের দৃশ্যটি দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে; কিন্তু যখন সবাই বরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেই সুযোগে বিধবা যুবতী সুলোচনা তার প্রেমিক মন্মথের সঙ্গে মিলিত হয়।

বিবাহের আর একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেয়েরা যথেষ্ট চপলতা প্রকাশ করতো। অনুষ্ঠানটির নাম জলসই। **সপত্নী** নাটকে দেখানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানের নাম করে মেয়েরা কি রকম অশোভন ও নির্লজ্জ আচরণ প্রকাশ করতো। ভূধরের বিবাহ উপলক্ষে তার শ্বশুর বাড়ির এবং তার নিকটবর্তী অন্যান্য বাড়ির যুবতী কন্যারা জলসই-এর নামে যে সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করে, তা থেকেই এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যভিচারের কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কি আনন্দ নিশিযোগে সুযোগ সময়।
সয়িতে যাইব জল কোলাহল ময় ।।
কে কার লইবে তত্ত্ব কোথা রবে কেবা।
আনন্দে করিব আজ বাসনার সেবা ।।

*

সাজিব সুসাজে আজি যাব বেশ্যা বেশে।
বলাবলী গলাগলী ঢলাঢলী শেষে ।।

বাসরের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে

৯৯. **সপত্নী নাটক**, পৃ. ১০৬-১০৭।
১০০. ঐ, পৃ. ৯৮।
১০১. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ১৬-২১।

এ নয় সেরূপ শুধু রমণী বাজার।
পুরুষ পরেশ আছে হাজার হাজার ।।
বিশেষ যাহার সঙ্গে আছে যার মন।
সে কি কভু ছেড়্যে দেয় সুযোগ এমন?
লইয়া ফুলের তোড়া ছোঁড়াগুলো যত।
হোই হোই করিতেছে সাজিতেছে কত ।।
হেরিয়া সে সব সাজ ব্যাজ নাহি সয়।
মনে করি কোলে করি যা হয় তা হয় ।।
অপরূপ কাম কূপ কি গোঁপের রেখা।
রতির সহিত যেন মদনের দেখা ।।

*

এ বাড়ী ও বাড়ী যাব পরিয়া ঢাকাই।
ঢাকাই কেবলমাত্র কিছু না ঢাকাই ।।

*

চমকি উঠি থমকে থাকি নাড়িব কাপড়।
পরস্পর পরস্পরে মারিব চাপড় ।।
কি আনন্দ সে সময় রসময় যদি।
কাছে থাকি আঁখি ঠারে বাড়ে প্রেমনদী ।।[১০২]

পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানেও মেয়েরা পর্দা ভেঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার সুযোগ পেতো। গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পুনর্বিবাহ নাটকটিতে এই 'উৎসবনিবন্ধন বঙ্গীয়া অঙ্গনাগণের বিলক্ষণ অসভ্যতাচরণ নির্লজ্জতার বিষয়' বিস্তারিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[১০৩] এ নাটকে দেখতে পাই, যে-নারীরা সাধারণত কখনই ঘরের বাইরে পরপুরুষের সামনে বের হয় না, তারাও এ উৎসব উপলক্ষে খুদ ভিক্ষা করার জন্য দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গমন করে। সন্ন্যাসীর উক্তি থেকে এই শোভাযাত্রার চেহারা অনুমান করতে পারি।—'রাম রাম। কতকগুলো মেয়েমানুষ প্রায় বিবসনা হইয়া এইদিকে টপ্পা গাইতে গাইতে আশ্চে---।'[১০৪] স্নান, ছেলে-বিউনো, কাদামাটি খেলা ইত্যাদির সময় মেয়েরা প্রকাশ্যে যে অশ্লীল আচরণ করতো, তারও অতিরঞ্জিত চিত্র আমরা এই নাটকে

১০২. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, **হিন্দু মহিলা নাটক**, পৃ. ৯৮-৯৯।
১০৩. **পুনর্বিবাহ নাটক**, 'আভাষ'।
১০৪. ঐ,, পৃ. ৪২-৪৩।

দেখতে পাই।[১০৫] পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের অশ্লীলতার কথা সপত্নী নাটকেও উল্লিখিত হয়েছে।[১০৬]

আলোচ্য নাটক-প্রহসনে দেখতে পাই, আরো একটা সময়ে মহিলারা লজ্জা ও সংকোচ ত্যাগ করে পুরুষদের সামনে বেরিয়ে আসতো। সেকালে ভণ্ড-সন্ন্যাসী ও গণকঠাকুরগণ বিনা বাধায় অন্তঃপুর পর্যন্ত গমন করতে পারতো। যে সমস্ত গোপনতম কথা মেয়েরা সাধারণত নিকট-আত্মীয়ের কাছেও প্রকাশ করতে ইতস্তত করে, এসব নাটকে দেখতে পাই, সে সব কথা তারা অবলীলাক্রমে গণকঠাকুর আর সন্ন্যাসী-ঠাকুরের কাছে ব্যক্ত করে।

বিধবাবিবাহ নাটকের সুলোচনা ভদ্রঘরের মেয়ে, সুতরাং নির্ধারিত পর্দা বজায় রাখতে সে সামাজিকভাবে বাধ্য। কিন্তু পিতা-মাতার সামনেই সে অসঙ্কোচে গণকের কাছে হাত বাড়িয়ে দেয়। তাতে গণক যে স্বগতোক্তি করে তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

আচার্য। (স্বগত) মন্দ নয়, এঁর হাত দেখতেও প্রবৃত্তি হয়—চোরের রাত্রিবাস লাভ—প্রকারান্তরে হাতে ধরাটাও ঘটবে।[১০৭]

বিপিনমোহন রচিত হিন্দু মহিলা নাটকেও গণক এবং সন্ন্যাসীর কাছে মেয়েদের চপলতা প্রকাশের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।[১০৮] শেষে রামদাস পুরোহিত যেন নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভণ্ড সন্ন্যাসীকে বলে, 'আবি নেকাল যাও, দোষরা দরওয়াজামে দেখো ; হিয়া মৎ রহ।'[১০৯]

শিক্ষালাভ করে মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটুক, বিয়ের ব্যাপারে তারা আপন মতামত ব্যক্ত করুক—সমকালীন অধিকাংশ সমাজসংস্কারকগণের মতোই নাট্যকারগণও তা চাননি। বরং দেখতে পাই, ১৮৬০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত নাট্যকারগণ মেয়েদের নিতান্ত দম দেওয়া পুতুলের মতো তৈরী করতে চান এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে এঁরা সমাজের প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকেই সমর্থন করেন।

কিন্তু ১৮৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে অবরোধ মোচন ও বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু স্বাধীনভাবের বিকাশ লক্ষ্য করি। নাট্যকারগণ এর পোষকতা না করে বরং সামাজিক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় এই স্বাধীনতার স্পৃহাকে

১০৫. পুনর্বিবাহ নাটক, পৃ. ৪৭-৬১।
১০৬. সপত্নী নাটক, পৃ. ১০৬।
১০৭. বিধবাবিবাহ নাটক, পৃ. ২২।
১০৮. বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৪২-৪৯।
১০৯. ঐ, পৃ. ৪৯।

ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করে, নারীসমাজকে পুরাতন প্রচলিত পথে পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে ১৮৭০-এর দশকের সর্বপ্রথম ও প্রধানতম নাট্যরচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রহসন (১৮৭২)। এই প্রহসনের নায়িকা বিধুমুখী নাট্যকারের দৃষ্টিতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মহিলা। এর চরিত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শন করে নাট্যকার স্ত্রীস্বাধীনতাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করতে চেয়েছেন।[১১০] আজকের বিচারে অবশ্য বিধুমুখী না আধুনিক, না তার আচরণ অসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। আমরা দেখতে পাই, বিধুমুখী সেকালের মহিলাদের মতো বৈশিষ্ট্য-বর্জিত স্বামীর ক্রীড়নক মাত্র নয়। তার স্বকীয় একটি ব্যক্তিত্ব আছে এবং কতোগুলো ব্যাপারে স্বামীর কাছ থেকে সে অধিকার আদায় করে নিয়েছে। সে উপাসনা করার জন্যে মন্দিরে যেতে চাইলে, তার স্বামী পূর্ণচন্দ্র তাকে যেতে দেয়। রবগনের হোটেলে খেতে চাইলে পূর্ণচন্দ্র তাকে বাধা দেয় না। এমন কি, যেখানে-সেখানে 'উড়তে চাইলে' অর্থাৎ ঘোরাফেরা করতে চাইলে, পূর্ণচন্দ্র তাতেও অনুমতি দান করে।[১১১] একদিন রাতের বেলায় উপাসনা মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বিধুমুখী দেখে তার পাল্কিটি উধাও হয়ে গেছে। কী করে বাড়ি ফিরবে সে যখন এ রকম দুশ্চিন্তা করছে এমন সময় তাদের উপাসনা-সমাজের একজন প্রচারক তাকে 'সস্নেহে' হাত ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[১১২] স্বামী তাকে গুরুতর মিথ্যা দোষারোপ করলে সে ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের ভয় দেখায়।[১১৩]

এইটুকু স্বাতন্ত্র্য বাদ দিলে বিধুমুখী তার সমকালীন মহিলাদের তুলনায় খুব একটা পৃথক নয়। তার স্বামী মাতলামী করে সে সেটা মেনে নেয়। এমন কি,

১১০. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীস্বাধীনতাকে উপহাস করতে চান না বলে, বরং বলা ভালো স্ত্রীস্বাধীনতার পোষকতা করার জন্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে উপহাস করতে চেয়েছিলেন স্ত্রীস্বাধীনতার কুফল দেখিয়ে। এই প্রহসনে কেশবচন্দ্র সেন 'পতিতপাবন সেনে' অথবা 'স্যানজায়' পরিণত হয়েছেন। ভারতাশ্রমের নাম 'ভারতাশ্রম হোটেলে' রূপান্তরিত হয়েছে। 'উপাসনা-মন্দির', 'প্রচারক', 'পারিবারিক-বন্ধন', 'সার্ভিস', 'লেকচার', 'ডিভোর্স' ইত্যাদির পৌনঃপুনিক উল্লেখ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে বিদ্রূপ করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে প্রহসনের যাঁরা লক্ষ্য—সেই ভারতবর্ষীয় সমাজের সদস্যরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, আদিসমাজ এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ সবকিছুকেই তাঁদের পত্রপত্রিকায় তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

১১১. কিঞ্চিৎ জলযোগ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ (কলিকাতা, ১৯৬৯) পৃ. ৬।

১১২. ঐ, পৃ. ৯।

১১৩. ঐ, পৃ. ২৫।

শ্যামবাজারের একটি বেশ্যার কাছে তার স্বামী নিয়মিত গমন করে—এতো বড়ো অপমানও সে সহ্য করে। অথচ সে নিজে উৎসাহের সঙ্গে প্রার্থনা সভায় যোগদান করে এবং তার সতীত্ব প্রশ্নাতীত। কিন্তু সমাজ তবু তাঁকেই দোষারোপ করে। পুরানো চাকর ভোলা যে বিধুমুখীকে 'রায় বাঘিনী' বলে গাল দেয় বা বিধুমুখীর বাধ্যগত বলে পূর্ণচন্দ্রকে দোষারোপ করে,[১১৪] সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিধুমুখীর আচরণ চিরাচরিত সমাজরীতি থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বলে ভোলা কিছুতেই সেটাকে স্বীকার করে নিতে পারে না। ক্ষোভের সঙ্গে সে বলে, 'আমাদের স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধূলো পালে, মায়েগুলো বর্তায়ে যাত।' আর বিধুমুখী কিনা 'সোনার চাঁদ' পূর্ণচন্দ্রকে 'গোলাম' করে রেখেছে। 'স্বাধীনতার' মন্ত্র পড়ে নিজে সে যত্রতত্র নেচে বেড়াচ্ছে, পূর্ণচন্দ্রকেও নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।[১১৫] স্বামী-স্ত্রীর এই অদৃষ্টপূর্ব সম্পর্কের অর্থ সে বোঝে না, পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রৈণ ব্যবহারের কারণও সে খুঁজে পায় না। সে ভাবে, হয়তো স্ত্রী পূর্ণচন্দ্রকে 'গুণ' করেছে।[১১৬]

আসলে ভোলা প্রাচীন সমাজের প্রতীক। তার চোখে বিধুমুখীর 'স্বাধীনতা' অসঙ্গত এবং অর্থহীন। তার মন্তব্যের মাধ্যমে এবং বিধুমুখীর 'উচ্ছৃঙ্খল' আচরণ চিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার স্ত্রীস্বাধীনতা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন।

কিন্তু স্বাধীনতার নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেয়েদের অবরোধমোচন, মন্দিরে গমন, পরপুরুষের সঙ্গে সামান্য মেলামেশাকরণ এবং চরম অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের কথাই বলেন। নয়তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ এবং সাংসারিক প্রাত্যহিক জীবনে যথার্থ স্বাধীনতা অর্জনের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেননি। বিধুমুখী বলে, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সে বাপের বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু প্রাচীনপন্থী বাবা-মা তাকে গ্রহণ না করলে সে ভারতাশ্রমে আশ্রয় নেবে।[১১৭] অর্থনৈতিক কোনো স্বাবলম্বন তার নেই; এবং সে কারণে সে আদৌ স্বাধীন নয়। এ জন্যেই আশ্রয়, অন্নবস্ত্র ইত্যাদির জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয়, হয় স্বামীর উপর, নয় বাবা-মার উপর। আর এর কোথাও আশ্রয় না পেলে উপাসনা-সমাজের উপর। এখানেই দেখা যায়, বিধুমুখী কী কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিধুমুখীর প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি অধিকারের প্রশ্ন তুলে তাকে স্বাধীন বা

১১৪. কিঞ্চিৎ জলযোগ, পৃ. ৩।
১১৫. ঐ, পৃ. ৭, ৮।
১১৬. ঐ, পৃ. ৭, ২০।
১১৭. ঐ, পৃ. ২৫।

স্বেচ্ছাচারী বলে চিত্রিত করেন। তার চরম অধীনতা দেখতে পাননি।[১১৮] প্রকৃত পক্ষে, নাটক রচনা কালে তাঁর কাছে সত্যিকার স্ত্রীস্বাধীনতার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিলো।

স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ নাট্যকার মনোমোহন বসুরও জানা ছিলো না। তাঁর নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৪-৭৫) নাটকে[১১৯] বাসুকীর মুখ দিয়ে স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, তা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর অস্পষ্ট ধারণার কথা জানা যায়।

> স্বাধীনতা গুণটির বিচার কালে "বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ; পূর্বরাগজনিত অর্থাৎ কোর্টশিপমূলক বিবাহ; অসবর্ণ বিবাহ; বিধবাবিবাহ, খুড়তুতো, জ্যেঠতুত, মামাতো, মাসতুত, পিসতুতো ভাই ভগ্নীর বিবাহ," এ সকলও উচ্চ ধরনের গুণ বলে গণ্য হবে।[১২০]

অন্যত্র বাসুকী আরো সংক্ষেপে স্ত্রীস্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়ে বলে, এটা হলো ইংরেজদের অনুকরণ—

> স্ত্রীস্বাধীনতার মানে, ঘৃণিত হিন্দুর ঘরে পিঞ্জররুদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় দাসীর কর্মে নিযুক্ত না হয়ে ঠিক আমাদের শিববংশের কৈলাস-কামিনীদের ন্যায় যথেচ্ছাগামিনী ও যথেচ্ছাচারিণী হবে।[১২১]

একটি অর্ধ-আধুনিক মহিলা বাসুকীর সামনে আগমন করে তার আচরণে খুব জড়তা, লজ্জা, সংকোচ ইত্যাদি দেখালে বাসুকী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই মহিলাকে যেভাবে

১১৮. এ নাটক রচনার কিছুকাল পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েন। তাই নাটকটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এর আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেননি।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮। এই পরিবেশেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে যথেষ্ট আধুনিকা করে তোলার চেষ্টা করেন। ঘোড়ায় চড়িয়ে স্ত্রীকে নিয়ে গড়ের মাঠে ভ্রমণ করা এ সময়েরই ঘটনা। কিন্তু তিনি এ জাতীয় 'স্বাধীনতা' দান করলেও কাদম্বরী দেবী যথেষ্ট স্বাধীন হতে পারেননি। অভিনেত্রী অথবা নিকট-আত্মীয়া কোনো মহিলার সঙ্গে তাঁর নায়ক পূর্ণচন্দ্রের মতোই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রণয়ের সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। বিধুমুখী ছাড়াছাড়ির হুমকি দিয়েছিলো; কাদম্বরী আত্মহত্যা করে পাকাপাকি রকমের ছাড়াছাড়ি করেন। আসলে তখনকার মেয়েরা প্রত্যেকটা ব্যাপারে পুরুষের এতো মুখাপেক্ষী ছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। দান হিশেবে যা তাঁরা পেতেন, তা স্বাধীনতা নয়, তা কেবল এ ধরনের আধুনিক ফ্যাশানের শিক্ষা।

১১৯. নাটকটি প্রথম ১৮৭৪ সালে মধ্যস্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে কিছু সংস্কৃত আকারে গ্রন্থ হিশেবে প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম ছিলো কেঁড়েলচন্দ্র টাকেন্দ্র।

১২০. 'নাগাশ্রমের অভিনয়', মধ্যস্থ, শ্রাবণ ১২৮১, পৃ. ১৮৭-৮৮।

১২১. ঐ, পৃ. ১৮৮।

ভর্ৎসনা করে তা থেকে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি মনোমোহন বসুর ধারণা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—

> আজো তুমি যথার্থ স্বাধীনা হতে পারনি—আজো ঘৃণিত হিন্দুর ঘরের জঘন্য লজ্জা তোমায় ছাড়েনি। আমি জিজ্ঞাসা কর্বা মাত্রেই কোথায় তুমি ওর গলা জড়িয়ে পবিত্র প্রেমের চিহ্নস্বরূপ চুম্ব খেয়ে প্রকারান্তরে দেখিয়ে দেবে যে, উনি তোমার স্বামী, তা না হয়ে লজ্জায় ঘাড় হেঁট। আজো তোমার ঘোমটা ঘোচেনি—যেই আমি তোমার মুখের পানে চাচ্ছি, অমনি তুমি ত্রস্ত হয়ে মাথার কাপড় টেনে মুখের অর্ধভাগ ঢেকে ফেলছো—আজো তুমি পুরুষের সঙ্গে ভাল করে চকোচক্ষি কর্তে পার না।[১২২]

নাগাশ্রমের সম্পাদক তক্ষক মনে করে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের খাতিরে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা থাক অথবা না-ই থাক, জগতে উন্নত বলে প্রশংসা লাভ করার জন্যে দরকার হলে জন্মভূমি ও স্বদেশবাসী সকলের মঙ্গলকে বলিদান করে শ্বেতাঙ্গ দেবতাদের স্বাধীনতার রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে।[১২৩]

নাগাশ্রমের অভিনয় প্রহসনের সমালোচনা প্রসঙ্গে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় লেখা হয়, 'এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের অপদার্থতা ও অতি জঘন্য রুচির পরিচয় দিতেছে। রহস্য হয় নাই—কটূক্তি হইয়াছে, ইতর লোকের কলহ ও গালাগালির ন্যায় সুরুচি বিরুদ্ধ হইয়াছে। এরূপ শত্রু হইতে ব্রাহ্মসমাজের কোন ক্ষতি সম্ভব নাই, এরূপ মিত্র হইতে হিন্দু সমাজের কোন লাভ নাই বরং ক্ষতি আছে।[১২৪] এ সমালোচনা হয়তো একটু বেশি কড়া, কিন্তু এরমধ্যে সত্যতার অভাব নেই। মনোমোহন বসু যতোগুলো নাটক রচনা করেন, নাগাশ্রমের অভিনয় সম্ভবত তার মধ্যে নিকৃষ্ট। আসলে স্ত্রীস্বাধীনতা কী, এর কতোটা সমাজের পক্ষে আবশ্যিক, কতোটা মঙ্গলজনক, এসব ধারণা তাঁর স্পষ্ট ছিলো না। সুতরাং কাল্পনিক স্ত্রীস্বাধীনতার অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে বাসুকীবেশী কেশবচন্দ্র সেন, নাগাশ্রম নামের অন্তরালে ভারতাশ্রম তথা সমগ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে বিদ্রূপ করার তার প্রয়াস খুব সফল হয়নি। যে বাস্তব ভিত্তিভূমির উপর অসঙ্গত অবাস্তবের রঙ চড়িয়ে স্যাটায়ার করা যায় সে বাস্তব স্ত্রীস্বাধীনতার সম্যক জ্ঞান মনোমোহনের ছিলো না। তার নাটকে এ জন্যেই স্ত্রীস্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ বিরোধিতা এবং তীব্র বিদ্বিষ্ট মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

১২২. নাগাশ্রমের অভিনয়।
১২৩. ঐ, প. ১৮৫।
১২৪. গ্রন্থসমালোচনা—নাগাশ্রমের অভিনয়, জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮২, পৃ. ২৮৭।

অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত মেয়ে মনষ্টার মিটিং (১৮৭৫) প্রহসনেও স্ত্রী-স্বাধীনতা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অন্ধ বিরোধিতার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এ নাটকে দেখানো হয়েছে উন্নত বাবুবেশী কেশবচন্দ্র সেন, সোম (সোমপ্রকাশ), অমৃত (অমৃতবাজার পত্রিকা), মীরার (Indian Mirror), পেট্রিয়ট (Hindu Patriot) প্রভৃতি স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে বোঝেন মেয়েদের অবরোধমোচন এবং স্বেচ্ছায় বিবাহকরণ। নাট্যকার এ জিনিশ দুটি আদৌ সমর্থন করতে পারেন নি। এ জন্যেই তিনি মেয়েদের স্বয়ম্বর সভায় গোরা সৈন্যদের আমদানি করে তাদের হাতে উন্নত বাবু, পত্রিকা সম্পাদকগণ এবং উন্নত বাবুর স্ত্রী সৌদামিনীর চরম অপমানের চিত্র অঙ্কন করেন এবং স্ত্রীস্বাধীনতা যে মন্দ জিনিস তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[১২৫]

১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাস্তব জীবনে স্ত্রীস্বাধীনতার যথেষ্ট নমুনা না থাকায় অথবা প্রাচীন সমাজ যথেষ্ট শঙ্কিত না হওয়ায়, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রভৃতি নাটকে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও তথাকথিত স্ত্রীস্বাধীনতার (অর্থাৎ অবরোধ মোচন, পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, দু-একটি ক্ষেত্রে বিবাহপূর্ব প্রণয় ইত্যাদি) ধীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর শেষ দু দশকে বেশ কয়েকটি নাটক রচিত হয়, স্ত্রীস্বাধীনতা যাতে খুব প্রধান্য পায়।[১২৬] বাস্তবের বিশ্বস্ত অনুকরণ না হোক, এর মধ্যে কোনো কোনো নাটক রঙ্গব্যঙ্গের জন্যে উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে। তবে নাট্যকার-গণ রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে এই উপদেশই দিতে চেয়েছেন যে, স্ত্রীস্বাধীনতা ভাল নয়।

কিন্তু আলোচ্য কালেও মেয়েদের যথার্থ স্বাবলম্বন, অর্থনৈতিক মুক্তি, মানসিক উন্নতি—এসব গভীরতর সমস্যা বর্তমান নাট্যকারদের ভাবিত করেনি বা তাঁরা কেউই বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেননি। আসলে যে সমাজে মেয়েদের অবস্থা ছিলো অমন শোচনীয় এবং তাঁদের অধীনতা ছিলো সর্বজনস্বীকৃত—সে সমাজে যথার্থ নারীমুক্তি, এমন কি নারীমুক্তি বিষয়ক যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা ছিলো যুগান্তরের অপেক্ষায়।

১২৫. নাটকটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই নাটকের একটি কপি রক্ষিত আছে। এ নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর জন্যে দ্রষ্টব্য: জয়ন্ত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৭-৩০।

১২৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, খণ্ডপ্রলয় (কলিকাতা, ১৮৭৮); বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, আচাভুয়ার বোম্বাচাক (কলিকাতা, ১৮৮০); রাখালদাস ভট্টাচার্য, স্বাধীন জেনানা (কলিকাতা, ১৮৮৬); রাখালদাস ভট্টাচার্য, রুক্মিণীরঙ্গ (কলিকাতা, ১৮৮৭); রাধাবিনোদ হালদার, পাস করা মাগ (কলিকাতা, ১৮৮৮); সিদ্ধেশ্বর রায়, বৌবাবু (কলিকাতা, ১৮৮৯); অমৃতলাল বসু, তাজ্জব ব্যাপার (কলিকাতা, ১৮৯০); দুর্গাদাস দে, ছবি বা বড়দিনের পঞ্চরঙ্গ (কলিকাতা, ১৮৯৬); অমৃতলাল বসু, বৌমা (কলিকাতা, ১৮৯৭); এবং দুর্গাদাস দে, মিস বিনো বিবি বি. এ. (কলিকাতা, ১৮৯৮)।

সপ্তম অধ্যায়

স্থিতিশীল ও শোভন সমাজের জন্যে আন্দোলনঃ পানাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পচনের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় পদার্থ দিয়ে মদ তৈরী করার কৌশল শেখার পর থেকেই মানব সমাজে মত্ততা একটি সমস্যায় পরিণত হয়।[১] প্রাচীন বঙ্গদেশও এই সমস্যা থেকে মুক্ত ছিলো না। সেকালের বঙ্গদেশে ভাত, গম, গুড়, মধু, আখ, তালরস ইত্যাদি পচিয়ে বা গেঁজিয়ে নানা রকমের মদ তৈরি হতো। এর মধ্যে গুড়ের তৈরী মদ সারা ভারতবর্ষেই খ্যাতি লাভ করে।[২] চর্যাপদে মদ তৈরী, বিক্রি ও পান করার এবং মত্ততার কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৩] ধর্মশাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও,[৪] প্রাচীন বঙ্গদেশের লোকেরা এই নিষেধ কতোটা মেনে চলতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।[৫] অন্তত পাল আমলে, দেখা যাচ্ছে, উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যেও মদ্যপান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।[৬]

মুসলিম রাজত্বকালে মদ্যপান নিবারিত হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। কেননা ইসলাম খানের মতো দু-একজন সুলতান ছাড়া,[৭] অন্যান্য মুসলমান শাসকগণ মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন না। ধনীরা নিয়মিত মদ্যপান করতেন, বিশেষত উৎসবাদিতে মদ্যপান বহুলভাবে উৎসাহিত হতো।[৮] মুসলমান শিক্ষক, মহিলা এবং ধর্মব্যবসায়ীগণও গোপনে মদ্যপান করতেন। আর সৈন্যদের কাছে মদ ছিলো অতীব লোভনীয় বস্তু।[৯] সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, শাসক শ্রেণীর বিরোধিতা না থাকায় হিন্দু সমাজে মদ্যপান হ্রাস পাওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। বরং আলোচ্য মুসলিম আমলেই তান্ত্রিকগণ ধর্ম সাধনার নামে দারুণ

১. 'Temperance', **Encyclopaedia Britannica**, Vol.21 (1966), p.918B.

২. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, পৃ. ৫৪১। **History of Bengal**, I, 612.

৩. দ্রষ্টব্যঃ মণীন্দ্র মোহন বসু, **চর্যাপদ** (কলিকাতা, ১৯৪৩), পদ সংখ্যা ৩ (বিরুবপাদ রচিত), পৃ. ১০।

৪. ভুবনেশ্বর মিত্র, **মদিরা** (কলিকাতা, ১৮৮১), পৃ. ১১০-১২১।

৫. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, পৃ. ৫৪১; **History of Bengal**, I,612; T. Chakravarty, **Food and Drink in Ancient Bengal**, (Calcutta, 1959), p. 38.

৬. S. Hussain, **Everyday Life in the Pala Empire** (Dacca, 1868), p.191.

৭. M.A. Rahim, **Social and Cultural History of Bengal**, II, 270.

৮. T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, P. 202; M.A. Rahim, II, 270.

৯. K. M. Ashraf, 'Life and Condition of the People of Hindustan', **Journal of the Asiatic Society of Bengal**, Vol. I, (1934), p. 317.

পানাসক্ত হয়ে পড়েন। সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে তান্ত্রিকদের পঞ্চ-মকার তথা মদ্যপ্রীতির কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম শাসনকালীন বঙ্গদেশ মদ্য-পানাসক্তিতে পূর্ণ একটি অঞ্চল বলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিচিত হয়েছিলো।[১০] অনেক বিদেশী পর্যটকও এই পানাসক্তির উল্লেখ করেন।[১১] তা ছাড়া বঙ্গদেশের অন্যতম রপ্তানি-পণ্য ছিলো তাড়ি[১২] তা-ও এ অঞ্চলে ব্যাপক মদ তৈরির প্রমাণ দেয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে মদ্যপান মোটেই জনপ্রিয় ছিলো না। একজন সংসারী মানুষ হয়তো সারাজীবনেও কখনো মদ্য স্পর্শ করতেন না। বরং পূজোপার্বণ উপলক্ষে সিদ্ধি ও ভাঙ খাওয়া বেশ প্রচলিত ছিলো। এই রীতি খুব দূষণীয় বলেও গণ্য হতো না।[১৩] তা ছাড়া অনেকে আফিম, গুলি, গাঁজা ইত্যাদিতে আসক্ত হতেন বলে জানা যায়।[১৪]

ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পরে, বিশেষত কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে, অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে এবং নগরায়ণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্যে এক শ্রেণীর উদ্যোগী পুরুষ কলকাতায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এঁরা অল্পকালের মধ্যেই কেউবা বাবু,[১৫] কেউবা ভদ্রলোক[১৬] বলে পরিচিত হন। উভয়

১০. Ibid., pp. 317-18.

১১. See M.A. Rahim, I, 270-71.

১২., T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, p. 178.

১৩. কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, **ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিত**, পৃ. ৪৬-৪৭।

১৪. M.A. Rahim, II, 271-72.

১৫. ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে কিছু বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, পাইকার, দালাল, গোমস্তা প্রচুর ধন উপার্জন করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জমিদারি ক্রয় করে বাড়তি আভিজাত্য অর্জন করেন। এই নতুন ধনিক শ্রেণী সাধারণভাবে 'বাবু' বলে পরিচিত হন। এঁদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : N.K. Sinha, **The Economic History of Bengal**, Vol. I (3d ed. ; Calcutta, 1965), Passim ; B.B. Misra, **The Indian Middle Class** (London, 1961) pp.75-78, 80-84, 111-14.

বাবুদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সমাচার দর্পণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **নববাবুবিলাস** ও প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত **আলালের ঘরের দুলালে** কৌতুকমণ্ডিত বিশ্বস্ত চিত্র আছে। এসবের ভিত্তিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুদের একটি বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। দ্রষ্টব্য : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **নববাবু বিলাস**, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), ভূমিকা, পৃ. ৵.-১।.

১৬. For the term **bhadralok** See J.H. Broomfield, **Elite Conflict**

অভিধাবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই যথেষ্ট ধনোপার্জন করেন। এঁরা সাধারণত পরিবারকে গ্রামের বাড়িতে রেখে কলকাতায় এসে বাস করতেন। এ কারণে এঁদের মধ্যে বেশ্যাগমনও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১৭] বেশ্যাসক্তির সহচর হিশেবেই মদ্যপান প্রশ্রয় পায়। তা ছাড়া, নতুন শাসক ইংরেজদের মদ্যপান রীতির অনুকরণ করতে গিয়েও হয়তো এঁরা মদ্যপান আরম্ভ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই বাবু ও ভদ্রলোকদের মধ্যে মদ্যপান বহুলভাবে প্রচলিত হয়। আলোচ্যকালের নব্যবাবুগণ মদের সঙ্গে গাঁজা, চরস, গুলি, আফিম ইত্যাদিও সেবন করতেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নববাবুবিলাস গ্রন্থে এবং ১৮৫৯ খ্রস্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়[১৮] গ্রন্থে এ সময়কার বাবুদের মদ্যপান ও অন্যান্য মাদক সেবনের হাস্যরঞ্জিত কিন্তু বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়।

শিক্ষিত নব্যযুবকগণ মদ্যপানের প্রতি আসক্ত হতে আরম্ভ করেন ১৮২০-এর দশকে।[১৯] ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে এই আসক্তি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে পূর্বোক্ত নববাবুদের সঙ্গে নব্যশিক্ষিতদের পানাসক্তিতে একটি পার্থিক্য লক্ষ্য করা যায়। বাবুদের মদ্যপানের সঙ্গে গুলি, গাঁজা, চরস, চণ্ডু প্রভৃতি নেশা করার এবং লাম্পট্য ও বেশ্যাগমন প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলো। অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত যুবকগণ প্রধানত ইংরেজী আচার ব্যবহারের অনুকরণেই মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁরা মনে করতেন, মদ্যপান ও খানা খাওয়া (অর্থাৎ

in a Plural Society: Twentieth Century Bengal (Berkeley, 1968), pp. 5-7; A. Seal, **The Emergence of Indian Nationalism** (Cambridge, 1971), pp. 39-43.

১৭. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **নববাবু বিলাস**, পৃ. ৩৫।

১৮. প্যারীচাঁদ মিত্র, **মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়** (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১২৬৯), আগড়ভম সেনের আখ্যান দ্রষ্টব্য: পৃ. ১৮-৩১। গ্রন্থের প্রধান অংশ পূর্বেই মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আলালের ঘরের দুলাল এর সমালোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন যে, এ গ্রন্থে অঙ্কিত সমাজ শতাব্দীর প্রথম পাদের। —'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা', **বিবিধার্থ সংগ্রহ**, চৈত্র ১৭৮০ শকাব্দ (মার্চ-এপ্রিল ১৮৫৮), পৃ. ২৮০-৮১। এ মন্তব্য **মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়** সম্পর্কেও সত্য।

১৯. T. Raychaudhuri, 'Norms of Family Life and Personal Morality among the Bengali Hindu Elite', p. 22.

মুসলমানী কিংবা বিলাতী রীতিতে খাওয়া) সুসংস্কৃত মনের পরিচায়ক। তাঁদের মতে 'এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয় লাভ করা।'[২০] ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, মদ্যপান করলেও এঁরা মাতলামি করাকে ঘৃণা করতেন।[২১] তা ছাড়া এঁরা আদৌ বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। পূর্ব প্রজন্মের যুবকদের সঙ্গে এখানে তাঁদের একটা বড়ো পার্থক্য রচিত হয়।[২২]

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য নন, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের বন্ধু এবং তাঁর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী দু-একজন মদ্যপায়ীর বক্তব্য থেকে মদ্যপান সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কী রকমের ছিলো, তা সহজেই বোঝা যায়। রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে বলেন,

> তখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।...তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমত মনে না করিতেন।....আমি ও আমার সহচরেরা....মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।[২৩]

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বলেন,

> এক্ষণে য়ুরোপ দেশীয়েরা সভ্যচূড়ামণি হইয়াছেন, এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। সুতরাং সংসারযাত্রা নির্বাহের যে প্রণালী তাঁহারা নির্বাচন করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীতি জন্মিল; এবং তাহারই অনুকরণ করিবার বিশেষ যত্ন হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান, বিশেষ দোষাকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস, এ দেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির (বিশ্বাস) হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদর পূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে, আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে?...আমরা চারি

২০. রাজনারায়ণ বসু, **সেকাল আর একাল** (কলিকাতা, ১৭৯৬ শকাব্দ, ১৮৭৪) পৃ. ২৭। অনুরূপ উক্তির জন্য দ্রষ্টব্য: 'পানদোষ', **তত্ত্ব**, শ্রাবণ ১৭৭২ (জুলাই-অগস্ট ১৮৫০), পৃ. ৫৭।

২১. **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ৪১।

২২. ঐ, পৃ. ৪১-৪২।

২৩. ঐ, পৃ. ৪১-৪২।

পাঁচজন আত্মীয় কখনও কখনও তাঁহার (মাধবচন্দ্র মল্লিক, ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য, কৃষ্ণনগরের ডেপুটি কলেকটর) বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম। প্রথমে কেবল সুরার গুণের দিকেই মনোযোগ হইল। অল্প পানে শরীর ভাল থাকে, অধিক শ্রম করিতে পারা যায়, ক্ষণবিলম্বে শারীরিক শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হয়, মানসিক শক্তিও বর্ধিত হয়, বিষণ্ণ হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে, অল্পকাল মধ্যে পরস্পর সুহৃদভাব জন্মে এবং জাতিভেদ সংস্কারের অদ্বিতীয় উপায় হয়। এই সকল বিবেচনায় ইহা আমাদের অতি আদরের ধন হইল। আমরা কেহই প্রত্যহ বা অধিক পরিমাণে পান করিতাম না। যখন দুই চারি বন্ধু একত্রিত হইতাম, তখন কখনও কখনও মৃদু মদিরা পান করিয়া সুখসাধন করিতাম।[২৪]

মদ্যপানের প্রতি এরূপ অনুকূল মনোভাববশত, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পানাসক্ত হয়ে পড়তেন।[২৫] ফলে 'বঙ্গীয় যুবকগণ যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, যাঁহাদের মুখ হইতে সর্বদা সেক্স্‌পিয়ার, বায়রণ লিখিত বাক্য নির্গত হয়, তাঁহারা এক হস্তে মদের বোতল ও আর এক হস্তে বেকন লইয়া সমাজের সামনে আবির্ভূত হন'।[২৬] রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তির আদর্শ দ্বারাও শিক্ষিত সমাজ প্রভাবিত হয়।

মদ্যপানকে নির্দোষ বলে গণ্য করায় রাজনারায়ণ বসুর পিতা স্বয়ং পুত্রকে নিয়ে মদ্যপান করতেন এবং পরিমিত পান করার উপদেশ দিতেন।[২৭] ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়ার সময় ১৮৪০-এর দশকে মদ ও বিস্কিট খাওয়ার রেওয়াজ ছিলো। ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ মানেন না, এটা দেখানোর জন্যেই মদ ও বিস্কিট খেয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়।[২৮] ১৮৫০-এর দশকেও ব্রাহ্মগণ মদ্যপানকে দূষণীয় বলে মনে করতেন না। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও আহারের সময় নিয়মিত সামান্য মদ পান করতেন।[২৯]

২৪. কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, 'আত্ম-জীবন চরিত', সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৩, পৃ. ৭০৪।

২৫. 'বঙ্গদেশের বর্তমান সময়ের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অনেক বিষয়ে প্রশংসনীয়', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭২, পৃ. ১৪১-৪২।

২৬. 'বঙ্গদেশের অবনতির প্রধান দুটা কারণ', মধ্যস্থ, ১৩ মাঘ ১২৭৯, পৃ. ৬৮০-৮১।

২৭. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৪৩-৪৪।

২৮. ঐ, পৃ. ৪৬।

২৯. অজিত কুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৬৭। রাজনারায়ণ বসুকে

১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে মদ্যপান এতো নির্দোষ বলে বিবেচিত হয় যে, লোক আতিথেয়তা করার জন্যে মদ পরিবেশন করতেন।[৩০] ১৮৫০-এর দশকের শেষ দিকে যখন দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বারের মতো কেশবচন্দ্র সেনকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন, তখন ভোজনের সময় কেশবকে মদ পরিবেশন করা হয়।[৩১] ভোজসভায় মদ পরিবেশন করার একটি ঘটনা বিবৃত করে এ সময়কার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার বলেন, সভায় বারোজন বাদে সবাই পাশের ঘরে গিয়ে মদ্যপান করেন।[৩২] অন্য আর একটি ডিনারের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, সেখানে বিপুল পরিমাণ মদ ব্যয়িত হয়।[৩৩]

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৬০-এর দশকে ছাত্রজীবনে এক শিক্ষিত ভদ্রলোকের প্ররোচনায় দু-এক দিন মদ পান করতে বাধ্য হন।[৩৪] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এ সময়ে কলকাতায় এক ব্রাহ্মের বাসায় থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করতেন। এই গৃহস্বামী সুরাপানে খুব উৎসাহী ছিলেন এবং বন্ধুদের মদ্যপানে উৎসাহ দিতেন। বিজয়কেও তিনি দলভুক্ত করার প্রয়াস পান।[৩৫]

এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, পানাসক্তি কলকাতার বহু পরিবারেই খুব প্রসার লাভ করে।[৩৬] অতি সম্ভ্রান্ত 'ভাগ্যবান' থেকে আরম্ভ করে অতি সাধারণ লোকের মধ্যে এই আসক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩৭] ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে পানাসক্তি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কলেজের সীমানা ডিঙিয়ে উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি পেশা-

১৮৫০-এর দশকে লেখা এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ বলেন 'মদ্যপান পরিত্যাগ হইল ···।' পত্রসংখ্যা ৩২, **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ. ৪২।

৩০. ভুবনেশ্বর মিত্র, **মদিরা**, পৃ. ১২৫।

৩১. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র**, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৩২. নবকৃষ্ণ ঘোষ, **প্যারীচরণ সরকার**, পৃ. ৯৮।

৩৩. প্যারীচরণ সরকার, 'মাদক সেবন', **হিতসাধক**, বৈশাখ ১২৭৫, পৃ. ১১০।

৩৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৬৬।

৩৫. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, **ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের পরীক্ষিত বিষয়** (কলিকাতা, ১৮৮২), পৃ. ৫।

৩৬. **বেঙ্গল স্পেক্টেটর**, সাবাস ৩, পৃ. ৯৮।

৩৭. **তত্ত্বপ**, ১ ভাদ্র ১৭৬৬ (অগষ্ট ১৮৪৪), পৃ. ৯৭; **'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা', তত্ত্বপ**, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), পৃ. ১০১; **'পানদোষ', তত্ত্বপ**, শ্রাবণ ১৭৭২ (জুলাই-অগষ্ট ১৮৫০), পৃ. ৫৬-৫৮; ভুবনেশ্বর মিত্র, **মদিরা**, পৃ. ১২৫।

দারদের ভিতরও ছড়িয়ে পড়ে।[৩৮] বিশেষভাবে ডাক্তারদের কুখ্যাতি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি।[৩৯] অভিনেতাদের পানাসক্তিও সমাজ সংস্কারকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।[৪০]

মদ্যপানাসক্তির প্রাদুর্ভাবের ফলে মদের বিক্রয়ও বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে ভদ্র-পাড়ায় মদের দোকান প্রায় ছিলো না; কিন্তু ১৮৫০ সাল নাগাদ কলকাতায় ভদ্র এলাকায় শতাধিক মদের দোকান স্থাপিত হয়।[৪১] আরো কিছুকাল পরে কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায়, মধ্যস্থের ভাষায়—নটি-দশটি করে মদের দোকান চালু হয়। একমাত্র জোড়াবাগানেই ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকে ২৪টি মদের দোকান ছিলো।[৪২] এ বছর বরাহনগরে মদের দোকান সংখ্যা ৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬-তে পৌঁছে।[৪৩] রাজকুমার চন্দ্র ১৮৬৩-৬৪ সালে লেখেন, তখন বাঙালি পাড়ায় মদের বোতল বিক্রির যে ব্যবসা জমে ওঠে, তা থেকে বোঝা যায়, পানাসক্তি বাঙালিদের মধ্যে পূর্বের তুলনায় কত বৃদ্ধি পেয়েছিলো।[৪৪]

পানাসক্তি কলকাতার বাইরে মফস্বলেও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।[৪৫] ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত একটি রচনায় অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, তখন নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, কোননগর, টাকী, যশোহর প্রভৃতি 'কি ক্ষুদ্র কি গণ্ডগ্রামস্থ অনেক ব্যক্তিই মদ্যরসে এক প্রকার মগ্ন হইয়াছে' ...।[৪৬] শিক্ষিত

৩৮. 'সুরাপান', তত্ত্বপ, অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৬), পৃ. ১৩৫।

৩৯. এ সম্পর্কে **সোমপ্রকাশে** বলা হয়, 'সর্বসাধারণের এই একটা সংস্কার জন্মিয়াছে, ডাক্তার মাত্রেই মাতাল হইয়া থাকেন, ' ' 'আমরা বিলক্ষণ জানি ২/৪ জন ব্যতিরেকে প্রায় সকলেই এই দোষে দূষিত। '' ' ' 'কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও তাহার উত্তীর্ণ ছাত্রগণ', **সোমপ্রকাশ**, ২১ ভাদ্র ১২৭১, সাবাস ৪, পৃ. ৫০৬। কেবলমাত্র ডাক্তারদের পানাসক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ১৮৭০ ও ১৮৮০ দশকে কমপক্ষে তিনখানা বাংলা নাটক রচিত হয়। ভুবনমোহন সরকার, **ডাক্তার বাবু নাটক** (কলিকাতা, ১৮৭৫); রাজকৃষ্ণ রায়, **ডাক্তারবাবু** (কলিকাতা, ১৮৯০); এবং কুঞ্জবিহারী দেব, **ঠেসাপাথিক ভুঁইফোড় ডাক্তার** (কলিকাতা, ১৮৮৭)।

৪০. **মধ্যস্থ**, ৩০ বৈশাখ ১২৭৯, পৃ. ৮০।

৪১. 'পানদোষ' **তত্ত্বপ**, শ্রাবণ ১৭৭২ (জুলাই-অগস্ট ১৮৫০) পৃ. ৫৬-৫৭।

৪২. 'বঙ্গদেশের অবনতির প্রধান দুটি কারণ', **মধ্যস্থ**, ১৩ মাঘ ১২৭৯, পৃ. ৬৮১।

৪৩. **মধ্যস্থ**, ১৭ চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৮৭১।

৪৪. রাজকুমার চন্দ্র, **দেখেশুনে আক্কেল গুড়ুম**, পৃ. ৮।

৪৫. 'সুরাপান', **তত্ত্বপ**, অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৬), পৃ. ১৩৪-৩৫।

৪৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্বপ**, ১ শ্রাবণ ১৭৬৭ (জুলাই ১৮৪৫), পৃ. ১৯৮।

ব্যক্তিদের মধ্যে পানাসক্তির প্রাবল্য মেদিনীপুর,[৪৭] কৃষ্ণনগর,[৪৮] ঢাকা,[৪৯] ময়মনসিংহ[৫০] প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এমন ঘটনাও জানা যায় যে, ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের নেশাগ্রস্ত উপাচার্য উপাসনাসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।[৫১]

শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া রক্ষণশীল সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকে তন্ত্রের নামে যথেচ্ছা মদ্যপান করতেন। এঁদের সুরাসক্তিও ১৮৪০ এর দশক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, নবদ্বীপ অঞ্চলের যে সমস্ত গ্রামে বিশ বছর আগে মদ্যপানের সামান্যতম প্রচলন ছিলো না, সে সব জায়গাতে তখন শত শত ব্যক্তি মদ্যপানে দীক্ষিত হন। এঁরা ধর্মের নামে অপ্রকৃতিস্থ ও উন্মত্ত আচরণ করতেন। মাসিপোতা গ্রামে কালীর উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে মত্ততার অবস্থায় সঙ্গীগণ মেষ বা ছাগ জ্ঞানে বলি দেয় বলে জানা যায়।[৫২]

১৮৬০ এর দশকে ময়মনসিংহের একটি গ্রামের তাবৎ নারীপুরুষ মিলে তন্ত্রের নামে রাত্রিতে পানাসক্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভন আচরণ করতেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।[৫৩] সিলেট অঞ্চলেও তান্ত্রিকদের মধ্যে সুরাপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, তাঁর অনেক আত্মীয়ও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[৫৪] যশোর অঞ্চলের কথা জানা যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে।[৫৫] কৃষ্ণনগরের রাজারাও তান্ত্রিক মতে মদ্যপান করতেন।[৫৬] মদ্যপানকে তান্ত্রিকগণ 'অন্তরঙ্গ সাধন' বলে জ্ঞান

৪৭. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৮৩-৮৫।

৪৮. কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনচরিত' সাহিত্য, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৩ পৃ. ৭০৪-০৫; ৭৫৩, এবং যত্রতত্র।

৪৯. দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫০ এর দশকে ঢাকা ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট মদ্যপানাসক্তি লক্ষ্য করেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৬, দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পৃ. ৭। আরো দ্রষ্টব্য: 'একজন পাড়াগেঁয়ের পত্র' মধ্যস্থ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, পৃ. ১৩৭।

৫০. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, পৃ. ৮৩-৮৫।

৫১. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

৫২. তত্ত্ব, ১ শ্রাবণ ১৭৬৭ (জুলাই ১৮৪৫), পৃ. ১৯৮।

৫৩. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, পৃ. ৮৩-৮৫।

৫৪. B C. Pal, Memories of My Lif and Times, I, 53, 76, 170.

৫৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, পৃ. ২৩১।

৫৬. কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, 'আত্ম-জীবন চরিত', সাহিত্য, পৃ. ৭০৪-০৫।

করতেন।[৫৭] সে কারণে, সাধারণ ধর্মীয় কিংবা নৈতিকতার কোনো শাসনও তাঁদের পানাসক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতো না।

মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে স্বভাবতই দেশে মদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত দামী মদের ব্যবহারও এ সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।[৫৮] বঙ্গদেশে আমদানি করা বিদেশী মদের জন্যে ১৮৭৬-৭৭ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় করেন। তাড়ি এবং অন্যান্য দেশীয় মদের জন্যে শুল্ক আদায় হয় যথাক্রমে সোয়া ছ লক্ষ ও সোয়া ছাব্বিশ লক্ষ টাকা।[৫৯] এ বছর বিক্রীত দেশী মদের পরিমাণ ছিলো প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ গ্যালন।[৬০] এ থেকেই বোঝা যায়, এ সময়ে কী বিপুল পরিমাণ মদ এ দেশে ব্যয়িত হতো। মদের বিক্রয় বৃদ্ধির আর একটি কারণ, দেশী মদের দাম ১৮৭০-এর দশকে খুব হ্রাস পায়। এ সময়ে টাকায় চার-পাঁচ বোতল দেশী মদ পাওয়া যেতো, অথচ কিছুকাল আগে পর্যন্ত টাকায় দু বোতলের বেশী মদ পাওয়া যেতো না।[৬১]

পানাসক্তি বিরোধী সচেতনতার উন্মেষ

গত শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে, বিশেষভাবে শিক্ষিত সমাজে, মদ্যপানের প্রসার ঘটায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে সচেতন হতে আরম্ভ করেন; কারণ এই প্রাদুর্ভাব কতোগুলো সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছিলো। বাড়তি ব্যবসা-বাণিজ্য, নবলব্ধ ইংরেজি বিদ্যা, চাকুরি প্রভৃতির সাহায্যে বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার কতোগুলো পরিবার এবং সমষ্টিগতভাবে কলকাতার সমাজ একটি ধনতান্ত্রিক সভ্যতা

৫৭. **তত্ত্বপ**, ১ কার্তিক ১৭৬৭ (অক্টোবর ১৮৪৫), পৃ. ২২৯; 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা', **তত্ত্বপ**, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), পৃ. ৩১১।

৫৮. ১৮৬৭ সালের হিশাবে দেখা যায় সে বছর ফ্র্যান্স থেকে ইংলণ্ড, জর্মানি, রাশিয়া ও বেলজিয়ামে যথাক্রমে ৪০, ২৫, ২০ ও ৫ লক্ষ বোতল শ্যাম্পেন রপ্তানি হয়। অপর পক্ষে একমাত্র ভারতবর্ষেই রপ্তানি হয় ৫০ লক্ষ বোতল। ' ' 'প্যারীচরণ সরকার, 'আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সমস্যা,' **'হিতসাধক'**, চৈত্র ১২৭৪, পৃ. ৫৮-৫৯। এই মদ দেশীয়রাই বেশি ব্যবহার করতেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায় না।

৫৯. **Report on the Administration of Bengal**, 1877-78 (Calcutta, 1878), pp.366-67.

৬০. **Ibid.**, p. 366.

৬১. ভুবনেশ্বর মিত্র, **মদিরা**, পৃ. ১৩২।

ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনীতি, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি এ সমাজে নতুন মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাচ্ছিলো। কিন্তু পানাসক্তির ফলে উন্নতিশীল পরিবারসমূহের ভবিষ্যৎ সম্ভবনার স্থল — যুবকগণ পরিবারের নিকট একটি সমস্যায় পরিণত হন। এই সব যুবকের মধ্যে পরিবার তথা সমাজ যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছিলো, অপরিমিত পানাসক্তির ফলে তা নিশ্চিত বিনষ্টির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। প্রকৃত পক্ষে, মদ্যপানের প্রাদুর্ভাববশত পরিবারসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচলিত হয় এবং পরিবারের সমষ্টি সমাজও একই কারণে শঙ্কিত হয়। মদ্যপায়ীরা অশোভন ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দ্বারা একটি স্থিতিশীল সমাজে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন, তা-ও এই আশঙ্কার অন্যতম কারণ।

মদ্যপানের ফলে সমাজে যে দুরবস্থা ও সংকটের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য উদ্ধার করলে সমস্যার বিচিত্র দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্তের বর্ণনায় দেখা যায়, ১৮৪০-এর দশকের রাতের কলকাতা মদ্যপদের অত্যাচারে রীতিমতো বিব্রত ও উচ্চকিত।

> কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে কলিকাতার অবস্থা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। তিনি তৎকালে এমন পথ দেখিতে পাইবেন না যাহাতে ভূরি ভূরি মনুষ্য সুরাপানে মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার না করিতেছে এবং কোন কোন পল্লীর মধ্যে তিনি এরূপ গৃহ দেখিতে পাইবেন না যেখানে বহুব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া মদ্যরসে প্রমত্ত না হইতেছে।[৬২]

পরের বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় অক্ষয়কুমার দত্ত পুনরায় মদ্যপদের অত্যাচারের যে বর্ণনা দেন তা আরো চমকপ্রদ।

> সন্ধ্যার পর কলিকাতার অবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিলে কি দৃষ্ট হয়? কোন স্থানে বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া মদ্যরসে প্রমত্ত হইতেছে, কেহবা অভিভূত হইয়া পথের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে, কোন স্থানে ভূরি ভূরি মনুষ্য ক্ষিপ্ত হইয়া পথিকদিগের প্রতি উপদ্রব করিতেছে, এবং অধিকাংশ গণিকালয় কেবল মদিরামত্তের কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে।[৬৩]

অন্য এক চিত্রে দেখি, কলকাতার বহু ভদ্রলোক মদ্যপান ও তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য পাপাচরণ করে প্রায় সমস্ত রাত্রি বা তার অধিকভাগ জাগরণ করেন, দিবসের প্রথম ভাগ নিদ্রায় ক্ষেপণ করেন, তারপর স্নান ভোজনাদি করে সামান্য বিষয়কর্ম করেন

৬২. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ ভাদ্র ১৭৬৬ (অগস্ট ১৮৪৪), পৃ. ৯৭।
৬৩. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ শ্রাবণ ১৭৬৭ (জুলাই ১৮৪৫), পৃ. ১৯৮।

বা আদৌ করেন না এবং পুনর্বার রাত্রির প্রতীক্ষায় থাকেন।[৬৪] রাজপথে মত্ত আচরণ করিয়া দণ্ডিত হওয়ার সংবাদও জানা যায়।[৬৫]

মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিরা জননী, স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন, এমন কথা অনেকেই বলেন।[৬৬] প্যারীচরণ সরকার মদ্যপান নিবারণে অত্যুৎসাহ প্রকাশ করেন, তার অন্যতম কারণ তাঁর অগ্রজের পূর্বোক্তরূপ ব্যবহার।[৬৭] শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ও মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন আলোচনা করলে দেখতে পাই, এ পরিবারে অনেকেই অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতেন। শশিপদ নিজেও পানাসক্তি হেতু স্বাস্থ্যহানি সহ বহু কুফলের শিকারে পরিণত হন।[৬৮] প্রমত্ত অবস্থায় মাতাল তার মাকে খুন করে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।[৬৯]

অপরিমিত মদ্যপানের ফলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ঘটনা সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করলে অনেকগুলিই চোখে পড়ে। Hindu Patriot পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৬১) মারা যান নিতান্ত অল্প বয়সে। হরিশ্চন্দ্রের অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে লেখেন, 'কি দুঃখের বিষয় মদ্যপান করিয়া করিয়া কত সৎ ও বিদ্বান ও দেশহিতৈষী কাল-গ্রাসে অকালে পতিত হইতেছে।··· তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমার দৃষ্টান্তদ্বারা সকলে সাবধান হউন, যেন মদ্যপানে না আপনাকে হনন করিয়া ফেলেন'।[৭০] কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দ্বারকানাথ মিত্র

৬৪. দ্রষ্টব্য: 'বড় মানুষের রোজনামচা', **বিদ্যাদর্শন**, অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৪৫), **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ১২১-২২; 'সুরাপান', **তত্ত্বপ**, কার্তিক ১৭৭৪ (অকটোবর-নভেম্বর ১৮৫২), **সাবাস** ২, পৃ. ১৪০; প্যারীচাঁদ মিত্র, **মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়**, আগড়ভম সেনের আখ্যান।

৬৫. **মধ্যস্থ**, ২৮ ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ৪৬০।

৬৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, **মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ** (কলিকাতা, ১৮৬৫), পৃ. ২৫-৩৩; পূর্ণচন্দ্র বসু, **সমাজচিন্তা**, পৃ. ২০৬।

৬৭. নবকৃষ্ণ ঘোষ, **প্যারীচরণ সরকার**, পৃ. ৯৮-৯৯।

৬৮. See D. Chakravarty, **op. cit.**

৬৯. গোপালচন্দ্র বসু, **মাদক সেবনের অবৈধতা ইত্যাদি** পৃ. ২৫-৩৩; **মধ্যস্থ**, ২১ ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ৪৩৯।

৭০. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ৭ আষাঢ় ১৭৮৩ (জুন ১৮৬১), **পত্র সংখ্যা ২৫, দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পৃ. ৩১।

(১৮৩৩-১৮৭৪)[৭১] ইত্যাদি দৃষ্টান্তও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অখ্যাত-দের মধ্যেও এরকম অকাল মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চয় অনেক ছিলো।[৭২]

মদ্যপানের ফলে লাম্পট্যও যথেষ্ট উৎসাহিত হয়। পানাসক্তিবশত ধনী দরিদ্রে পরিণত হয়েছেন, এমন উদাহরণও সে সমাজে মোটেই দুর্লভ ছিলো না।[৭৩] কলকাতার দরিদ্র পল্লীতে বিশেষত শ্রমিকদের মধ্যে কোথাও কোথাও পানাসক্তি একটা সমস্যা হিশেবে দেখা দেয়।[৭৪] এর ফলে এই দরিদ্রদের দারিদ্র্য আরো প্রকট হয়ে ওঠে।[৭৫] মোটকথা মদ্যপানের অতিরেক হেতু সমাজের প্রশান্তি, শোভনতা এবং স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয় এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ হুমকির সম্মুখীন হয়।

মদ্যপানজনিত বহুমুখী সমস্যা স্বভাবতই সমাজমানসকে পানাসক্তির প্রতি সচেতন করে তোলে। ১৮৪০-এর দশক থেকে আরম্ভ করে **তত্ত্বোধিনী পত্রিকা**, **বেঙ্গল স্পেক্টেটর** প্রভৃতি পত্রিকায় এই সমস্যার উত্থাপন ও আলোচনা এই সচেতন-তারই স্বাক্ষর বহন করে। তবে এই দশকে সমাজকর্মীদের অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক—নিজেরাই পানাসক্ত ছিলেন। **তত্ত্বোধিনী পত্রিকায়** মদ্যপানের নিন্দা করা হলেও ধর্মীয় নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পানাসক্তিতে অন্যায় কিছু দেখতে পাননি।[৭৬] রক্ষণশীল নেতারাও মদ্যপানের অতিরেক দেখে না দেখার ভান করতেন।[৭৭] এর ফলে মদ্যপানবিরোধী মনোভাব সমাজদেহে যথেষ্ট ব্যাপ্তিলাভ করতে পারেনি। দু-একজনই এ দশকে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে

৭১. দ্বারকানাথ মিত্রও মৃত্যুর পূর্বে উপদেশ দিয়ে যান যে, মদ্যপান হেতু তাঁর অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত যেন অন্যের মনে জ্ঞানোদয় করে।

৭২. **সোমপ্রকাশ**, ২১ ভাদ্র ১২৭১, **সাবাস** ৪, পৃ. ৫০৬; প্যারীচরণ সরকার, 'মাদক সেবন', **হিতসাধক**, বৈশাখ ১২৭৫, পৃ. ১১০; 'বঙ্গদেশের অবনতির প্রধান দুটো কারণ', **মধ্যস্থ** ১৩ মাঘ ১২৭৯, পৃ. ৬৮০-৮১; 'সুরাপান', **তত্ত্ব**, অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৬), পৃ. ১৩৫; S.N. Banerjea, **A Nation in Making**, p. 7.

৭৩. কৈলাসবাসিনী দেবী, 'সভ্যতা ও সমাজ সংস্কার', **অবোধবন্ধু**, বৈশাখ ১২৭৫, পৃ. ১০-১১।

৭৪. Sir A.R. Banerji, **An Indian Pathfinder**, p. 70.

৭৫. **কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত**, পৃ. ১৮১।

৭৬. পূর্বে পৃ. ৩৪২।

৭৭. 'ধর্মসভার গত বৈঠক', **বেঙ্গল স্পেক্টেটর**, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২, **সাবাস** ৩, পৃ. ৯৮।

সচেতনতা প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান।[৭৮] কয়েক বছর পরে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর কোনো বন্ধুও পানাসক্তি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেন।[৭৯]

পানাসক্তি সমাজদেহকে জীর্ণ ও কলুষিত করছে—সুতরাং তার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক—১৮৪০ ও ১৮৫০ এর দশকে এই যে মনোভাব কোনো কোনো সংস্কারকের মনে জেগে ওঠে, তার পেছনে পাশ্চাত্য প্রভাব একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলো বলে মনে হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত বারংবার বলেন, পানাসক্তি ইংরেজ অনুকরণের কুফল।[৮০] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ডে মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন হচ্ছে—এই যুক্তি দেখিয়েই তিনি আবার পানাসক্তি দূরীকরণের জন্যে আন্দোলনের আহ্বান জানান।[৮১] প্যারীচরণ সরকারও ১৮৬০-এর দশকে বিলেতের মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে স্বদেশের দোষ সংশোধন করার প্রয়াস পান।[৮২]

ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যাপক পানাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে এডিনবরার টমাস ট্রটার মদ্যপানের কুফল বিষয়ে একটি গ্রন্থ এবং ফিলাডেলফিয়ার বেনজামিন রাস একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর পরেই সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৮০৮ খৃস্টাব্দে নিয়ুইয়র্কে প্রথম মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রে এই আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৮৩]

৭৮. অক্ষয়কুমার ১৮৪৪ সাল থেকেই বেশ কয়েকবার পানাসক্তি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ১ ভাদ্র ১৭৬৬ (অগস্ট ১৮৪৪), ১ শ্রাবণ ১৭৬৭ (জুলাই ১৮৪৫), ১ কার্তিক ১৭৬৭ (অক্টোবর ১৮৪৫), ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), শ্রাবণ ১৭৭২ (জুলাই-অগস্ট ১৮৫০), কার্তিক ১৭৭৪ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৫২) সংখ্যা **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** দ্রষ্টব্য। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত **বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার**, দ্বিতীয় ভাগেও অক্ষয়কুমার সুরাপানের দোষ বিষয়ে পুরো একটি অধ্যায় সংযোজন করেন।

৭৯. **সর্বশুভকরী পত্রিকার** চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল ১৮৫১) প্রায় পুরোটাই মদ্যপানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিবন্ধে পূর্ণ ছিলো।

৮০. অক্ষয়কুমার দত্ত, **তত্ত্বপ**, ১ ভাদ্র ১৭৬৬ (অগস্ট ১৮৪৪), পৃ. ৯৭; ঐ, ১ শ্রাবণ ১৭৬৭ (জুলাই ১৮৪৫), পৃ. ১৯৮, ঐ; ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), পৃ.৩১২; ঐ, শ্রাবণ ১৭৭২ (জুলাই-অগস্ট ১৮৫০), পৃ. ৫৭।

৮১. অক্ষয়কুমার দত্ত, **বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দ্বিতীয় ভাগ** (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৮৫৬), পৃ. ২১৪-৩০।

৮২. প্যারীচরণ সরকার. 'মাদক সেবন', পৃ. ৮৬-৮৭।

৮৩. 'Temperance', **Encyclopeadia Britannica**, Vol. 21. pp. 918B-919.

১৮১৮ খৃস্টাব্দে য়োরোপের প্রথম মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয় আয়ারল্যাণ্ডে। ১৮২৯ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ডে এ সভার মোট ২৫টি শাখা স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডে এই আন্দোলন সূচিত হয় ১৮৩০ খৃস্টাব্দে ইয়র্কশায়ার ও লাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে। **Temperance Society Record** নামক একটি সাময়িকপত্র অবলম্বন করে প্রধানত ইভেনজেলিক্যাল ধর্মযাজকদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন ক্রমশ সমস্ত ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তখনো আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো প্রধানত শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণীর পানাসক্তি নিবারণ। ১৮৩১ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত British and Foreign Temperance Society স্থাপিত হয়।[৮৪] এই সভা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং রাজা স্বয়ং এর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। রানী ভিক্টোরিয়া এই সভার সদস্য হন ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে।[৮৫] মদ্যপানের আতিশয্যবশত যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে House of Commons ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন।[৮৬] শেষ পর্যন্ত মদ্যপান নিরোধক আইন প্রণীত না হলেও, তদন্তের ফলে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে বহু সত্য কথাই প্রকাশিত হয়। ৫৮৯ জন ডাক্তার পার্লামেণ্টের কাছে সুরাপানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।[৮৭] এরপর এই আন্দোলন আরো জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়ে ইউনিটারিআনগণও মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

ইংলণ্ডের ১৮৩০-এর দশকের এই আন্দোলন সহজেই ভারতবর্ষেও অনুপ্রবেশ করে। ১৮৪০-এর দশকের প্রারম্ভে বোম্বাইতে প্রধানত সৈন্যদের উদ্যোগে একটি মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। এঁরা **Bombay Temperance Advocate** নামক একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।[৮৮] ১৮৪৩ সালে বঙ্গদেশেও দমদম

৮৪. E. Halevy, **A History of the English People**, II, 162-63.

৮৫. 'Temperance', **Encyclopeadia Britannica**, vol. 21, p. 919.

৮৬. E. Halevy, **A History of the English People**, II, 162-63. For Details see **Abstract of Evidence before the Select Committee appointed to Inquire into the Extent, Causes, and Consequences of the Prevailing Vice of Intoxication, and to ascertain whether any legislative measure can be desired to prevent further spread of so great a National Evil** (London, 1835), (The reference is cited in E. Halevy, II, 163).

৮৭. প্যারীচরণ সরকার, 'মাদক সেবন', পৃ. ৮৭।

৮৮. **Calcutta Christian Observer**, vol. XIII (December, 1844), pp. 813-14.

ও ফোর্ট উইলিআমে দুটি মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। ফোর্ট উইলিআমের সভাটি ছিলো পুরোপুরি সৈন্যদের; দমদমের সভার সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিলো। বিখ্যাত ধর্মযাজক আলেকজাণ্ডার ডাফ দমদমের সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সভাদ্বয়ের উদ্যোগে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো এবং মদ্যপান-বিরোধী সঙ্গীত (Temperance Hymn) ও মদের বদলে কফি পরিবেশিত হতো।[৮৯]

১৮৫০-এর দশকেও কলকাতার খৃস্টান ধর্মযাজকগণ মদ্যপান নিবারণী প্রয়াস বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৫২ সালে এঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার পরিবর্তনের প্রাক্কালে পার্লামেণ্টের কাছে একটি আবেদন প্রেরণ করে বলেন, ভবিষ্যতে কোম্পানি যেন মদের ব্যবসার পোষকতা না করে।[৯০] পরের বছর এপ্রিল মাসে এঁরা মদ্যপান নিবারণী প্রচার করার জন্যে কলকাতায় সভার অনুষ্ঠান করেন বলে জানা যায়।[৯১] প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজরাই বঙ্গদেশে প্রথম মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন এবং এ সম্পর্কে সমাজমানস জাগ্রত করার পেছনে তাঁদের তৎপরতা বোধহয় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলো।

এদেশীয়দের মধ্যে ১৮৪০-এর দশকে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যে সচেতনতা অঙ্কুরিত হয়, ১৮৫০ এর দশকে তাই পল্লবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ইত্যাদি সমাজমানসে যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে, মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন তার সামনে নিতান্ত নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী পূর্বোক্ত আন্দোলনসমূহে সার্বিক প্রয়াস নিবদ্ধ করার আলোচ্যকালে মদ্যপান বিরোধী কোনো রচনা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু সমস্যাটি যে সমাজমানস থেকে পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ এ সময়কার সৃজনশীল সাহিত্য, বিশেষত নাটক ও নকশা জাতীয় রচনা। আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় প্রভৃতি রচনা এই সময়েই প্রকাশিত হয়। একালে নাটকেও সমস্যাটি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়।

কিন্তু মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন ১৮৫০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক-ভাবে সংগঠিত হয় নি বা ব্রাহ্মসমাজের মতো কোনো ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের

৮৯. **Ibid**. (January, 1844), pp. 71-72 ; (March, 1844), p. 180.

৯০. 'সুরাপান', **তত্ত্ব**, কার্তিক ১৭৭৪ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৫২), **সাবাস** ২, পৃ. ১৩৯।

৯১. **সংবাদ প্রভাকর**, ২৩.১২.১২৫৯, **সাবাস** ১, পৃ. ১৯৪।

সমর্থন লাভ করেনি। ১৮৬০-এর দশকে এ আন্দোলন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজেরও সমর্থন লাভ করে।

মদ্যপান-বিরোধী মনোভাবকে প্রথম সংগঠিত আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন রাজনারায়ণ বসু। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরে একটি মদ্যপান-নিবারণী সভা স্থাপন করেন।[৯২] মফস্বলে স্থাপিত হওয়ায় এ সভা স্থানীয় একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও, বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর সাফল্য ছিলো নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

এ দিক দিয়ে বিচার করলে বঙ্গদেশের প্রথম মদ্যপান নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সুরাপান বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো নেতা প্যারীচরণ সরকার। অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, প্যারীচরণ সরকার সমকালীন যুবচিত্তকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।[৯৩] তাঁরই উদ্যোগে ১৮৬৩ সালে ১৫ নভেম্বর কলকাতায় বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি স্থাপিত হয়।[৯৪] কয়েক মাস পরে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ২৪ মে তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় টেম্পারেন্স সোসাইটি একটি বৃহত্তর সমিতি গঠন করে। এই সমিতির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অ্যামিরিকান মিশনারি সি. এইচ. ডল যুক্ত হন।[৯৫]

মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা ও পানাসক্তি নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুকূল সমাজমানসের সৃষ্টি হয়েছিলো বলে মনে হয়। এ জন্যেই দেখি, সভা স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গদেশে তার বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ সালের ফেব্রুআরি মাসের মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৫টি এবং নভেম্বর মাস নাগাদ অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে এ সভার মোট ৭২টি শাখা স্থাপিত হয় এবং এসব শাখায় তিন হাজার সদস্য

৯২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৮৩ ; রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র ২৫ মাঘ ১৭৮২ (ফেব্রুআরি ১৮৬১) দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী পৃ. ৩৩।

৯৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৬৬ ; S.N. Banerjea, **A Nation in Making**, pp.6-7 ; B.C. Pal, **Memories of My Life and Times**, p 212.

৯৪. নবকৃষ্ণ ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, ৯৯। প্যারীচরণ এ সভার সম্পাদক এবং নীলমণি চক্রবর্তী ও হরলাল রায় সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। দীননাথ ধর, রাজেন্দ্রনাথ বসু, প্রসন্নকুমার গুপ্ত, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ জয়েন উদ্দীন হোসেন, বীরেশ্বর মিত্র ও মদনমোহন মুখোপাধ্যায় সদস্য নির্বাচিত হন।

৯৫. ঐ, পৃ. ১০১।

যোগদান করেন।[৯৬] মফস্বল শাখাগুলিতে রাজনারায়ণ বসু, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তি যোগদান করেন।[৯৭] টেম্পারেন্স সোসাইটি কয়েক বছর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৯৮] ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর এই সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।[৯৯]

মদ্যপান নিবারণী সভা ছাড়াও, ব্রাহ্মসমাজ আলোচ্য কালে এই আন্দোলনের বিশেষ পোষকতা করে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, ১৮৫০-এর দশকেও ব্রাহ্মগণ মদ্যপানকে দূষণীয় বলে বিবেচনা করতেন না।[১০০] কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা মদ্যপান নিবারণ করার কাজটিকে প্রায় ধর্ম প্রচারের উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে, কেশবচন্দ্র কলকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের অন্য কয়েকটি শহরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরে পানাসক্তির আতিশয্য নিবারণে বিশেষভাবে তৎপর হন।[১০১]

১৮৭০-এর দশকে কেশবচন্দ্র যে ভারত সংস্কারক সভা গঠন করেন তার পাঁচটি শাখা ছিলো। তার মধ্যে একটি শাখা পুরোপুরি নিয়োজিত ছিলো মদ্যপান

৯৬. বামাপ, কার্তিক ১২৭১, প. ২১৩। অন্য এক হিসাব অনুসারে প্রথম বছর মোট ৬৪টি শাখা স্থাপিত হয়। - নবকৃষ্ণ ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, পৃ. ১০২। Also See, **Hindu Patriot**, 29 February 1864.

৯৭. নবকৃষ্ণ ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, পৃ. ১০২।

৯৮. ১৮৬৮ সালে প্যারীচরণের জীবনে সন্তানের মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে নানা দুর্যোগ নেমে আসে। তিনি এডুকেশন গেজেটসহ সবগুলি পত্রিকার কাজই ছেড়ে দেন। টেম্পারেন্স সোসাইটির প্রতিও তাঁর মনোযোগ কমে যায়। ১৮৭৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর ভুবনমোহন সরকার সোসাইটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু আস্তে আস্তে এর কর্মসূচী সঙ্কুচিত হয়।

৯৯. ঐ, পৃ. ১১০।

১০০. পূর্বে, পৃ. ৩৪৩। ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিলো এঁরা উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছা মদ ও মাংস সেবন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্কে সম্যক ধারণা হওয়ার পূর্বে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। দ্রষ্টব্য: বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, **ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি**।

১০১. **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত** পৃ. ৮৩-৮৫; গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র প্রথম খণ্ড**, পৃ. ২৮৭-৯০; বঙ্কবিহারী কর, **মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী**, পৃ. ৮০-৮১, ১৫৬; P.C. Mazoomdar, **Life and Teachings of Keshub Chunder Sen**, pp. 241-42; Sir A.R. Banerji, **An Indian Pathfinder**, pp. 70-71; D. Chakravarty, **op. cit.**

নিবারণের কাজে।[১০২] এই কাজে শিবনাথ শাস্ত্রী, কানাইলাল গাইন, যাদবচন্দ্র রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কেশবচন্দ্রকে সহায়তা ও সহযোগিতা দান করেন।

মদ্যপান নিবারণী সভাসমূহ এবং ব্রাহ্মসমাজ পানাসক্তি দূরীকরণের জন্যে সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। টেম্পারেন্স সোসাইটির Wellwisher (১৮৬৫-১৮৬৮) ও হিতসাধক (১৮৬৮) এবং ভারত সংস্কারক সভার মাসিক মদ না গরল?(১৮৭১-১৮৭) পত্রিকা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১০৩] ভারত সংস্কারক সভার সুলভ সমাচারও মদ্যপানের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রচারণা চালাতো। এ ছাড়া পুস্তক-পুস্তিকাও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হতো এবং প্রায়শ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিতরিত হতো।[১০৪]

এসব সোসাইটির উদ্যোগে আলোচনা ও বক্তৃতাসভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো। তার মধ্যে কিছু বক্তৃতা বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার গুণে উৎকর্ষ লাভ করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১০৫] সুরাপানের ফলে কী ধরনের অনিষ্ট ঘটে উদাহরণ সহযোগে সেই কথাটি প্রকাশ করা এবং সেই সঙ্গে সুরাপান করা, এমন কি পরিমিত পরিমাণে পান করা, অনুচিত —এই উপদেশ দান করাই ছিলো এ সমস্ত বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য।[১০৬] তবে কেশবচন্দ্র সেন অথবা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

১০২. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৮-৪৩, ৮৪২; P.C. Mazoomdar, **Life and Teachings of Keshub Chunder Sen**, pp. 241-42.

১০৩. **Wellwisher** এবং হিতসাধকের সম্পাদক ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। **মদ না গরল?**-এর সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলমণি ধর, কানাইলাল গাইন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১০৪. **বামাপ**, কার্তিক ১২৭১, পৃ. ২১৩।

১০৫. যেমন ১৮৬৪ সালে হালিশহরের সুরাপান নিবারণী সভায় প্রদত্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা পরের বছর মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ নামে, মেদিনীপুর সুরাপান নিবারণী সভায় পঠিত ভুবনেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধসমূহ মদিরা নামে, কলকাতায় প্রদত্ত কানাইলাল গাইনের বক্তৃতা **A Lecture on Alcohol** নামে প্রকাশিত হয়।

১০৬. যেমন ১৮৬৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে চুয়াডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় সুরাপান নিবারণী সমিতির অধিবেশনে বিধুভূষণ রায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, প্রারম্ভিক কবিতায়ই তার সারাংশ লভ্য। কবিতায় বলা হয়:

কে না জানে সুরাপানে বুদ্ধিভ্রংশ হয়/কে না জানে সুরাপানে ধর্ম হয় ক্ষয়।
কে না জানে সুরাপানে আয়ু ক্ষয় পায় / কে না জানে সুরাপানে বিপদ ঘটায়।
কে না জানে সুরাপানে অর্থ নাশ হয়/ কে না জানে সুরাপানে অপমান রয়।
কে না জানে সুরাপানে মত্ত নাম রটে/ কে না জানে সুরাপানে অপমৃত্যু ঘটে।

মতো সুবক্তা যখন এ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতেন, তখন স্বভাবতই বিপুল জনতা আকৃষ্ট হতেন এবং সম্ভবত অনেকে এসব বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিতও হতেন।[১০৭]

সে যুগে নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করায়, কোনো কোনো সুরাপান নিবারণী সভা মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করে নাটক রচনার প্রতিযোগিতাও আহ্বান করে।[১০৮] এসব নাটক পাঠক ও দর্শকদের মনোভাব কথঞ্চিত প্রভাবিত করতে পেরেছিলো, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

এভাবে নানা উপায়ে মদ্যপান-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে পানাসক্তি দূরীকরণের চেষ্টা চলে। যাঁরা মদ্যপানে অভ্যস্ত নন, তাঁরা যাতে নতুন করে মদ্যপান আরম্ভ না করেন, সভাগুলি সেদিকেও নজর দিতো।[১০৯]

মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনের প্রতি সমাজের একটি অংশ জোরালো সমর্থন জানায়। ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই মদ্যপায়ী বলে কুখ্যাত হলেও, আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরাই এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন এবং তাঁরাই প্রধানত এ আন্দোলনের শরিক হন। প্যারীচরণ, রাজনারায়ণ, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শশিপদ, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, কানাইলাল, হরচন্দ্র প্রমুখ সকলেই ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ১৮৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে ৩৫টি শাখা স্থাপিত হয়, তার ১২টির সম্পাদক ছিলেন স্কুল শিক্ষকগণ। অন্যান্যরাও ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত।

কে না জানে সুরাপানে ভ্রাতা বন্ধু পর/ কে না জানে সুরাপানে নিন্দনীয় নর।
তথাপি অবোধ লোক মদ পানে ধায়/ হায় হায় বাঙ্গালীর একি হল দায়।
—**হিতসাধক**, মাঘ ১২৭৪, পৃ. ২৩।

১০৭. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ১৮৭৫ সালের জুন মাসে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, সে-ই তাঁর জনসভায় প্রথম অভিভাষণ। সভায় প্রচুর শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতার দ্বারা এঁরা যথেষ্ট প্রভাবিত হন বলে সুরেন্দ্রনাথ মনে করেন।

See S.N. Banerjea, **A Nation in Making**, p. 32.

১০৮. এরূপ প্রতিযোগিতা আহ্বান করে **এডুকেশন গেজেট** পত্রিকায়, ১৮৬৭ সালে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, মদ্যপান বিরোধী সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের জন্যে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।—**বামাপ**, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪, পৃ. ৫১৯। নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত **বারুণীবিলাস নাটক** (কলিকাতা, স্কুল বুক প্রেস, ১৮৬৭) এমন একটি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়া নাটক। পাটনার সুরাপান নিবারণী সভার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকটি রচিত হয়।

১০৯. নিবারণী সভার সদস্যদের একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে অঙ্গীকার করতে হতো যে, তাঁরা মদ্যপান করবেন না। রাজনারায়ণ বসু স্থাপিত মেদিনীপুর সুরাপান নিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা থাকতো—পরিমিত পান করার অর্থ বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা।—রাজনারায়ণ

ভুবনেশ্বর মিত্রের মতো কেউ কেউ মদ্যপান নিবারণের পক্ষে শাস্ত্রীয় দোহাই দিলেও,[১১০] এটা লক্ষণীয় যে, মদ্যপান বিরোধী মনোভাব গঠনে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিচারই গুরুত্ব লাভ করে। ডাক্তারদের মতামত, বিদেশে মদ্যপান-বিরোধী ক্রমবর্ধমান মনোভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই পানাসক্তদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা চলে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু একটি বিশিষ্ট ধর্মের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা মদ্যপান করাকে ধর্মীয় দিক দিয়ে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেননি; অথবা কোনো অপবিত্রতাবোধও তাঁদের মনোভাবকে অধিকার করেনি। বরং তাঁরা প্রধানত শারীরিক কারণেই মদ্যপানকে নিরুৎসাহিত করেন।[১১১]

প্যারীচরণ সরকার তাঁর **The Tree of Intemperance** গ্রন্থে যে চিত্র অঙ্কন করেন তা-ও শরীর ও চরিত্রের উপর পানাসক্তির কুফল সম্পর্কে। তাঁর মতে, পানাসক্তি বৃক্ষের মূলে আছে অসৎ সঙ্গ, অসৎ দৃষ্টান্ত, ঈশ্বরে ভীতির অভাব, লাম্পট্য, দুর্বলচিত্ততা ইত্যাদি। শয়তান বা কুপ্রবৃত্তি এই বৃক্ষের মূলে সর্বদা জল সেচন করে। মৃত্যু এই বৃক্ষকে নিপাতিত করতে উদ্যত এবং বিধাতার অভিশাপ অগ্নিরূপে এই বৃক্ষকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে।[১১২]

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দ্বিতীয় ভাগে,[১১৩] এবং গোপালচন্দ্র বসু তাঁর **মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্ট-কারিতা বিষয়ক** প্রবন্ধে-ও[১১৪] একই কারণে মদ্যপানের নিন্দা করেন।[১১৫]

বসুর আত্মচরিত, পৃ ৮৩-৮৪। Also see, P. C. Sircar, 'The Bengal Temperance Society', **Hindu Patriot**, 29 February 1864.

১১০. দ্রষ্টব্য: ভুবনেশ্বর মিত্র, **মদিরা**, পৃ. ৯৬-১২১; গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, **মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ**, পৃ. ৩৪-৩৮।

১১১. **দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী**, পত্র সংখ্যা ৬ ও ২৫, পৃ. ৭, ৩১; **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ৪১-৪৬, ৮৩-৮৫।

১১২. See P. C. Sircar, **The Tree of Intemperance** (Calcutta, 1874).

১১৩. **অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দ্বিতীয় ভাগ**, পৃ. ১৮১-২১৫।

১১৪. **গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদক সেবনের অবৈধতা** ইত্যাদি, পৃ. ১৩-১৮।

১১৫. পানাসক্তির অনিষ্টকারিতা দেখাতে গিয়ে এঁরা কখনো কখনো দু-একটি বিষয়কে অতিরঞ্জিত করেছেন। যেমন অক্ষয়কুমার লিখেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি এতো বেশি পানাসক্ত ছিলেন যে বাইরের আগুন ছাড়াই একদিন তাঁর শরীর ভস্মীভূত হয়।— **বাহ্য বস্তুর** ইত্যাদি, পৃ. ১৮৮। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষয়টি যাচাই না-করেই এবং অক্ষয়কুমারের উল্লেখ না-করেই উপাখ্যানটি তাঁর গ্রন্থে উত্থাপন করেন।—**মাদক সেবনের অবৈধতা** ইত্যাদি, পৃ. ৩৩-৩৪।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে মদ্যপান করাকে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অন্যায় কর্ম বলে গণ্য করতেন না।[১১৬] কিন্তু ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে এসে অন্তত এটুকু পরিবর্তন লক্ষ্য করি যে, মদ্যপান দূরীভূত না হলেও, এ সময়ে মদ্যপানবিরোধী একটা সচেতনতা সমাজে অভ্রান্তভাবে জাগ্রত হয়েছিলো। এই সচেতনতার মুখে মদ্যপায়ীরা সঙ্কুচিত হন এবং হয়তো একটা পাপবোধ তাঁদের অধিকার করে। অন্তত পানাসক্তি নিয়ে গর্ব করার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। ক্রমশ লুকিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে মদ্যপান করার রীতিই এ সময়ে প্রবর্তিত হয়। এমনকি, অনেকে গোপনে মদ্যপান করলেও প্রকাশ্যে মদ্যপান-বিরোধী কথাবার্তা বলতেন বলে জানা যায়।[১১৭] নিবারণী আন্দোলনের এটুকু সাফল্য অন্তত স্বীকার করে নিতে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন-চন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ১৮৬০-এর দশকের সমাজ-সচেতন যুবকবৃন্দ অকুণ্ঠচিত্তে নিবারণী আন্দোলনের এই অবদান স্বীকার করেন।[১১৮]

নিবারণী আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের সমর্থন অবশ্য লাভ করেনি। অনেক পানাসক্ত ব্যক্তিই এ আন্দোলনকে নিতান্ত অর্থহীন ও ভণ্ডামি বলে মনে করতেন।[১১৯] সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের মধ্যাহ্নকাল ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার দুঃখ করে লেখেন,

> মাদক সেবন আমাদিগের মধ্যে এত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে যে, উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে, লোকে পাগল মনে করে। এবং যে পুস্তকে মাদক সেবনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা থাকে, অত্যল্প লোকে তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক হয়। ... আমরা জ্ঞাত আছি বটে যে, আমাদের ইংরাজী "ওয়েল উইশার' পত্রিকায় সর্বদা সুরাপানের বিরুদ্ধে লেখা হয় বলিয়া, অনেকে ঐ পত্রিকা পাঠ করেন না। মাদকপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা এত অধিক বটে, যে মাদক দ্রব্যের নিন্দা থাকিলে হিতসাধকের উপরও অনেকে বিরক্ত হইবেন, কিন্তু তাহা জানিয়াও আমরা উচিত বাক্য না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।[১২০]

১১৬. পূর্বে, পৃ. ৩৪০-৪৫।

১১৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, **বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দ্বিতীয় ভাগ**, পৃ. ১৮২ ; বঙ্কুবিহারী কর, **মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী**, পৃ. ১৫৬।

১১৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৬৫-৬৬ ; S. N. Benerjea, **A Nation in Making**. pp. 7, 32 ; B. C. Pal, **Memories of My Life and Times**, p.212.

১১৯. পরে, দ্রষ্টব্য।

১২০. প্যারীচরণ সরকার, **'মাদক সেবক'**, পৃ. ৭৫।

এ উক্তির মধ্যে কতোটা ক্ষোভ এবং কতোটা সত্যতা ছিলো বলা শক্ত। মনে হয়, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। তবে আন্দোলনে বাধা নিশ্চয় এসেছিলো।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরে মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করলে সেখানকার এক মদ্য-ব্যবসায়ী তাঁর নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় শশিপদ অপরাধী বলে গণ্য হন এবং জরিমানা দিতে বাধ্য হন।[১২১]

মাতালরা রাজনারায়ণ বসুকেও কম উপদ্রব করেননি। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; মদ্যপরা তাঁর নামে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের কাছে লিখিত নালিশ করে এবং তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করার প্রয়াস পায়।[১২২]

পানাসক্তির সমালোচনা করায় সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকাকে কোনো কোনো তরুণ সম্পাদক তীব্র নিন্দা করেন বলেও জানা যায়।[১২৩] Bengal Social Science Association-এর এক সভায় এ সময়কার একজন বিখ্যাত রাসায়নিক মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে বলেন যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্যে হিতকরী।[১২৪] উর্ধ্বের দোকানে মদ বিক্রির ব্যাপারে প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতা ভুবনমোহন সরকার সুরাপান নিবারণী সভার পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দান করেন। এতে সংস্কারক মহল থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা উচ্চারিত হয়।[১২৫]

প্রকৃত পক্ষে, মদ্যপানের বিরুদ্ধে সার্বজনিক সচেতনতা তখনো উদ্রিক্ত হয়নি। এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধের তুলনায় পানাসক্তি তখনো লঘু অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। সে সময়ে চোদ্দ বছরের কন্যাকে অবিবাহিত রাখলে সমাজ সে অভিভাবককে হয়তো একঘরে করতো, কিন্তু 'মদের পিপাকে পিপা পার' করে দিয়ে 'সহরের মদ মহার্ঘ' করে ফেললেও তেমন শাসন করতো না।[১২৬] এ থেকেই নিবারণী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১২১. See D. Chakravarty, **Op. cit.**
Sir A. R. Benerji has also mentioned such a case of harrasment. See his **An Indian Pathfinder**, p. 60.

১২২. **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ৮৪।
এই পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে সান্ত্বনা দিয়ে এক পত্র লেখেন। দ্রষ্টব্য: পত্র সংখ্যা ২৫, ৭ আষাঢ় ১৭৮৩ (জুন ১৮৬১) দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পৃ. ৩১।

১২৩. রামচন্দ্র দত্ত, **বাল্য বিবাহ নাটক**, পৃ. ২৯।

১২৪. Sir A. R. Benerji, **An Indian Pathfinder**, p. 70.

১২৫. 'পাত কুড়ান সংবাদ', বসন্তক, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৭৫, পৃ. ৩১।

১২৬. 'বঙ্গসমাজের একটি সুন্দর চিত্র: সম্পাদকের উত্তর', **সোমপ্রকাশ**, ১৫ বৈশাখ ১২৮৭, **আষাঢ় ৪, পৃ. ২৯৩।**

এই আন্দোলনের ফলে বাস্তবে মদ্যপানের রীতি যথেষ্ট পরিমাণে অবদমিত হয়েছিলো অথবা ব্যয়িত মদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিলো, এমন বোধ হয় বলা যায় না। আমরা পূর্বেই দেখেছি, ১৮৭৬-৭৭ সালে বঙ্গদেশে বিপুল পরিমাণ মদ আমদানি ও বিক্রি হয়েছিলো।[১২৭] পরের বছর, ১৮৭৭-৭৮ সালে, এই আমদানি ও বিক্রয়ের পরিমাণ প্রত্যেক শ্রেণীর মদের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পায়।[১২৮] এই বছর প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকার বিদেশী মদ আমদানি হয়।[১২৯] ১৮৭৬-১৮৭৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৮০-৮১ বছর পর্যন্ত পাঁচ আর্থিক বছরে মদ ও আনুষঙ্গিক পানীয় থেকে সরকারের গড়পড়তা আয় ছিলো বাৎসরিক প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৮৮০-৮১ সালে এই আয় দাঁড়ায় সাড়ে ৮৫ লক্ষ টাকায় এবং ১৮৮১-৮২ সালে প্রায় ৯৪ লক্ষ টাকায়।[১৩০] বর্ধিত হারে মদের কাটতি যে বাঙালিদের মধ্যেই হতো এমন জানা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বোধ হয় বলা যায় যে, আন্দোলনের ফলে পানাসক্তি সম্পর্কে সমাজমানসে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সূচিত হলেও, বাস্তবে মদ্যপান তেমন কমেনি।[১৩১]

মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনের সীমিত সাফল্য ভাষান্তরে ব্যর্থতার জন্য সামাজিকগণের ঐক্যের অভাব এবং সরকারের ঔদাসীন্য, এমনকি, পরোক্ষ উৎসাহ দান করাকে দায়ী করা হয়। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বলেন, সমাজবাসীরা একত্রিত হলেই মদ্যপান অনায়াসে নিবারিত হতে পারে। কিন্তু একত্রিত হতে পারেন না বলেই পানাসক্তির এতো প্রাদুর্ভাব।[১৩২]

অক্ষয়কুমার দত্ত পানাসক্তির জন্য সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে তিনি একটি রচনায় বলেন যে, ইংরেজ শাসকগণ মদ্যপানকে অন্যায় কর্ম বলে জ্ঞান করেন না, বরং আবগারি আয়ের প্রলোভনবশত মদের বিক্রয়কে উৎসাহিতই করেন।[১৩৩] পরবর্তী কালেও অক্ষয়কুমার পানাসক্তির প্রাদুর্ভাবের জন্যে সরকারকেই

১২৭. পূর্বে, পৃ.৩৪৬।

১২৮. **Report on the Administration of Bengal, 1877-78** (Calcutta, 1878), pp. 366-67.

১২৯. **Report on the Administration of Bengal 1881-82** (Calcutta, 1882), p. 164.

১৩০. **Ibid.**, p. 311.

১৩১. 'দলাদলি ও সুরাপান', **সোমপ্রকাশ**, ২৬ বৈশাখ ১২৭৮, **সাবাস ৪**, পৃ. ২৩৩; **মধ্যাহ্ন**, ১৩ মাঘ ১২৭৯, পৃ. ৬৮০।

১৩২. 'দলাদলি ও সুরাপান', **সোমপ্রকাশ**, পৃ. ২৩২।

১৩৩. **অক্ষয়কুমার দত্ত**, **'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা'**, পৃ. ৩১৪-১৫।

দায়ী করেন।[১৩৪] অক্ষয়কুমারের পর অনেকেই এ ব্যাপারে সরকারের উপর দোষারোপ করেন।[১৩৫] কিন্তু এর মধ্যে মনোমোহন বসুর নামই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মধ্যস্থ পত্রিকায় তিনি মদ্যপানের প্রসারের জন্য একাধিকবার সরকারের সমালোচনা করেন। বিলেতে মদ বিক্রয়ের আতিশয্য দমনের জন্যে আইন প্রণীত হচ্ছে—এমন সংবাদ পরিবেশন উপলক্ষে তিনি বলেন, 'কিন্তু অর্থগৃধ্নু ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহার উৎসাহদাতা।'[১৩৬] যুক্তি দেখিয়ে মনোমোহন বলেন যে, কোনো আবগারি কর্মচারীর এলাকায় মদ বিক্রয় বেশি হলে সরকার তার চাকুরির উন্নতি করেন। এভাবেই সরকার আবগারি কর্মচারীদের মদ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত করেন। তিনি মনে করেন, স্থানীয় ব্যক্তিদের এক-তৃতীয়াংশ আবেদন করলে সে স্থানে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার আইন প্রণীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর মতে, সরকার তেমন আইন প্রণয়ন করবেন না, বরং উল্টো মদ্যবিক্রয়কে উৎসাহিত করবেন।[১৩৭]

সত্যিকারভাবে, সরকার মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে কখনোই তেমন উৎসাহ দেখাননি। প্যারীচরণ সরকার পরিচালিত বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি এদেশে মদ্যপানের প্রসার, অনিষ্টকারিতা, মদ্য বিক্রয় ইত্যাদি বিষয় তদন্ত করার জন্যে সরকারের নিকট ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে একটি আবেদন করেন। কিন্তু সরকার সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন।[১৩৮] তখন প্রত্যেক ঔষধের দোকানে মদ বিক্রি হতো, সোসাইটি তা নিবারণ করার জন্যেও সরকারের কাছে আবেদন করেন।[১৩৯] এই আবেদন অবশ্য সরকার ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে নীতিগতভাবে মেনে নেন এবং ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ৩ আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে ঔষধের দোকানে বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়।[১৪০] তবে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন,

১৩৪. 'সুরাপান', তত্ত্ব, কার্তিক ১৭৭৪ (অকটোবর-নভেম্বর ১৮৫২); **বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার**, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২১২-১৪।

১৩৫. যেমন কৈলাসবাসিনী দেবী, 'সভ্যতা ও সমাজ সংস্কার', **অবোধ বন্ধু**, বৈশাখ ১২৭৫, পৃ. ১১। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালের ২৫ জুন তারিখে লণ্ডনে প্রদত্ত একটি সভায় অনুরূপ মন্তব্য করেন—গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৯-৩০; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 'দলাদলি ও সুরাপান', **সোমপ্রকাশ**, শ্রাবণ ৪, পৃ. ২৩২-৩৩।

১৩৬. **মধ্যস্থ**, ৩০ বৈশাখ, ১২৭৯, পৃ. ৭৮।

১৩৭. **মধ্যস্থ**, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৬৩১-৩২।

১৩৮. নবকৃষ্ণ ঘোষ, **প্যারীচরণ সরকার**, পৃ. ১১০।

১৩৯. এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করেন ভুবনমোহন সরকার। তাছাড়া তিনি ডাক্তারদের মদ্যপাননীতিকে বিদ্রূপ করে একটি নাটকও রচনা করেন।

১৪০. নবকৃষ্ণ ঘোষ, **প্যারীচরণ সরকার**, পৃ. ১১১।

সম্ভবত মদ্যপান নিবারণ করার জন্যে নয়, বিনা লাইসেন্সে বিক্রি করলে আর্থিক ক্ষতি হয়—সে জন্যেই। এ থেকে বলা যায়, মদ্যপান নিবারণে সরকারের কোনো আনুকূল্য ছিলো না।

আসলে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন উন্নতিশীল একটি সমাজের স্থিতিশীলতা ও শোভনতার দিকে দৃষ্টি রেখেই পরিচালিত হয়েছিলো। এও ব্রাহ্ম পিউরিটান মনোভাবেরই একটি আংশিক প্রকাশ। এর ফলে সমাজের একটি অংশে পানাসক্তি-বিরোধী সচেতনতা জেগে ওঠে। তার চেয়েও বড়ো কথা, পানাসক্তি গর্বের পরিবর্তে অপরাধের বিষয় বলে গণ্য হয়। ভিক্টোরীয় যুগের বঙ্গদেশীয় এলিটদের রুচির এই পরিবর্তন ঘটানোই বর্তমান আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

বাংলা নাট্যরচনায় পানাশক্তি-বিরোধী সচেতনতা

পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, পানাসক্তি-বিরোধী সচেতনতার উন্মেষ ১৮৪০-এর দশকে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার মাধ্যমে এবং তার বিকাশ ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে। সমাজের এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলোচ্যকালে অনেকগুলি নাটক-প্রহসন রচিত হয়। এর মধ্যে কতোগুলো নাটক-প্রহসনের নামকরণ থেকেই তাদের মদ্যপান-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। যেমন, মহেশচন্দ্র দাস দে-র নেশাখুরি কি ঝকমারি (কলিকাতা ১৮৬৩), নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বারুণীবিলাস (কলিকাতা, ১৮৬৭), অজ্ঞাতনামার সুধাকর বিষময় (কলিকাতা, ১৮৬৭), জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের সুধা না গরল (কলিকাতা, ১৮৭০) এবং রামচন্দ্র দত্তের মাতালের জননীর প্রলাপ (কলিকাতা, ১৮৭৪)। এছাড়া, আরো অনেকগুলি নাট্যরচনা এ সময়ে রচিত হয় যাদের একমাত্র লক্ষ্য মদ্যপান-বিরোধী প্রচার নয়; কিন্তু যাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে পানাসক্তি বিষয়ক মনোভাব প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আলোচনা থেকে এরূপ অনেকগুলি রচনার পরিচয় পাওয়া যাবে। এগুলির কোনো কোনোটির প্রধান লক্ষ্য লাম্পট্যবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করা। কিন্তু লাম্পট্যের অথবা বেশ্যাগমনের আনুষঙ্গিক দোষহিশেবেই পানাসক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। বস্তুত, এধরনের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ পানাসক্তি ও লাম্পট্যের মধ্যে কোনো ভেদ রাখেননি; বরং উভয় সমস্যাকে পরিপূরক সমস্যা হিশেবে চিত্রিত করেন। এক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্য লক্ষ্য করা যায়। একেই কি বলে সভ্যতায় মাইকেল পানাসক্তির প্রতিই মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, লাম্পট্যের প্রতি নয়। অপরপক্ষে, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-তে পানাসক্তির কথা আদৌ উত্থাপিত হয়নি, নাট্যকার

লাম্পট্যের কথাই বলেন। বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হিন্দু মহিলা নাটক এবং তারকচন্দ্র চূড়ামণি রচিত সপত্নী নাটকেও পানাসক্ত নয় এমন লম্পটের চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে লম্পট নয়, এমন মাতাল চরিত্রও এসব নাটক-প্রহসনে আছে। সধবার একাদশীর অটল এবং নিমচাঁদের তুলনামূলক আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, অটল বেশ্যাসক্ত এবং নারীদেহের প্রতিই তার প্রধান আকর্ষণ।[১৪১] নিমচাঁদের প্রধান আকর্ষণ মদে এবং অটলকে সে উপদেশ দেয়, 'আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিসনে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস।'[১৪২] অন্যত্র অটলের বুড় শাশুড়ীর সতীত্ব নাশের প্রয়াস দেখে নিমচাঁদ তাকে সতর্ক করে বলে, 'গৃহস্থের মেয়ে বার করবের মতলব করোনা বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে।'[১৪৩] এ নাটকের ভোলাও মদে দারুণ আসক্ত, কিন্তু সে লম্পট এমন প্রমাণ কোথাও পাইনে। সুধাকর বিষময় নাটকের তেজেন্দ্র-সোমেন্দ্রদের পরিবারে মদের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করি, কিন্তু তারাও লম্পট নয়। এ জাতীয় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্যত্র পানাসক্ত ব্যক্তিরা লাম্পট্যে লিপ্ত হয়েছে এবং লম্পটরা আবশ্যিক উপকরণ হিশেবেই মাদক গ্রহণ করেছে।

বিশ্লেষণ করার আগে এ নাটকগুলি সম্পর্কে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের মতো কালজয়ী নাট্যকার থেকে আরম্ভ করে অখ্যাত এবং অজ্ঞাত নাট্যকার পর্যন্ত কেউ-ই জীবনের সামগ্রিক চিত্র অঙ্কন করার উদ্দেশ্যে এগুলি রচনা করেননি। মদ্যপান বা লাম্পট্যসমস্যা সামগ্রিক জীবনের অঙ্গ হিশেবে না এসে, সামাজিক সমস্যা হিশেবে আসায়, অনেক সময়েই তা বিকৃত ও অতিরঞ্জিত রূপ লাভ করেছে। নাট্যকারগণও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকগুলি রচনা করায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি আদৌ সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। আসলে, নাট্যকারগণ প্রভাবিত হয়েছিলেন সমাজের ক্রমবর্ধমান পানাসক্তি এবং সেই সঙ্গে লাম্পট্যবিরোধী সচেতনতার দ্বারা এবং তাঁরাও এই সামাজিক আন্দোলনেই অংশ গ্রহণ করেন। একদিকে আন্দোলনের প্রভাবে তাঁরা এ নাটক-প্রহসনগুলি রচনা করেন, অন্যদিকে আবার নাট্যরচনাগুলি এই আন্দোলনকে উৎসাহিত ও জোরদার করে।

১৪১. অটল নিজেই বলে সে সাধারণ মদ খায় না, তার টাকা আছে, সুতরাং শ্যাম্পেন খায়। অর্থাৎ সে যথার্থ পানাসক্ত নয়, সধবার একাদশী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ২৯৩।

১৪২ ঐ, পৃ. ৩৬৫।

১৪৩. ঐ, পৃ. ৩৫৫। তাঁর মতে এমন কাজ কি 'ভদ্রলোক পারে?' পৃ. ৩৫৫।

আলোচনা করলে দেখা যাবে, বর্তমান নাটক-প্রহসনগুলি পাঠ্য গ্রন্থ হিশেবে এবং কোনো কোনোটি অভিনয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রকাশিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। তার চেয়েও বড়ো কথা এ প্রহসন দুটি নব্য ও প্রাচীন উভয় সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। পাইকপাড়ার রাজারা একেই কি বলে সভ্যতা-র অভিনয় করছেন শুনে, ইয়ং বেঙ্গলদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কেউ কেউ রাজাদের অনুরোধ করে অভিনয় বন্ধ করেন।[১৪৪] এ থেকেই বোঝা যায়, এ নাটকে অঙ্কিত সমাজচিত্র কতো বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ছিলো। প্রাচীন সমাজের চাপে বুড় সালিকের অভিনয়ও অনুরূপভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[১৪৫] কেবল তাই নয়, রামগতি ন্যায়রত্নের মতো সমসাময়িক সমালোচক যিনি একেই কি বলে সভ্যতা-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, প্রাচীন সমাজ উপহসিত হওয়ায় তিনিই বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-র তীব্র নিন্দা করেন।[১৪৬] এ থেকে বোঝা যায়, মাইকেল-অঙ্কিত প্রাচীন সমাজের চিত্রও ছিলো বাস্তবসমাজের বিশ্বস্ত অনুকরণ। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৫ সালে একেই কি বলে সভ্যতা এবং ১৮৬৭ বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ অভিনীত হয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও এই প্রহসন দুটি কয়েকবারই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।[১৪৭] জনপ্রিয়তার আরো প্রমাণ এই যে, মাইকেলের পরবর্তী নাট্যকারগণ একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ উভয় প্রহসনের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৪৮]

জনপ্রিয়তার বিচার করলে বোধ হয় সধবার একাদশীকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলতে হয়। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে নাটকটি তিনবার মুদ্রিত হয়। তা ছাড়া অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দারুণ সাফল্য লাভ করে। প্রকাশিত হওয়ার দু বছরের মধ্যে ১৮৬৮ সালে নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং তারপর কলকাতায় এবং মফস্বলে অনেক-

১৪৪. যোগীন্দ্রনাথ বসু, **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত** (তৃতীয় সং; কলকাতা, ১৯০৫), পৃ. ৬৭৬-৭৭।

১৪৫. ঐ, পৃ. ৬৭৭।

১৪৬. রামগতি ন্যায়রত্ন, **বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব**, প্রথম ভাগ (হুগলী. ১৯২৯ সংবৎ; ১৮৭২), পৃ. ২৬৭-৬৮।

১৪৭. **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃ. ৪৯-৫০; ৬০, ৬২।

১৪৮. **একেই কি বলে সভ্যতার** দ্বারা প্রভাবিত নাটকের মধ্যে **সধবার একাদশী**; **সুধাকর বিস্ময়**; **বউ হওয়া একি দায়**, **গঙ্গাস্নানে প্রাণ যায়**; **মনোরমা**; **সুধা না গরল**; **এরাই আবার বড়লোক**; **একাদশীর পারণ**, **অমরনাথ** ইত্যাদি প্রধান। **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ**-এর প্রভাব আছে দীনবন্ধুর **নীলদর্পণ** নাটকের তোরাপ চরিত্র নির্মাণে এবং **বুঝলে কি না** প্রহসনে।

বারই এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও নাটকটি পৌনঃপুনিকভাবে অভিনীত হয়েছিলো।[১৪৯]

সধবার একাদশীর অভিনয় পানাসক্তিবিরোধী আন্দোলনের বিশেষ পোষকতা করেছিলো বলে মনে হয়। প্রথমবার অভিনীত হওয়ার পরে, সুরাপান নিবারণী সভার সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার দীনবন্ধু মিত্রকে নাকি বলেন যে, অতঃপর সুরাপান নিবারণী সভার দায়িত্ব এ নাটকই পালন করতে সক্ষম হবে। সভাটি বাহুল্য মাত্র।[১৫০] জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা এই নাটকের সার্বিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তা দৃষ্টে মন্তব্য করে যে, দীনবন্ধুর তাবৎ নাটকের ভিতর সধবার একাদশীই শ্রেষ্ঠতম।[১৫১] প্রকৃত পক্ষে, এমন মন্তব্য করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, ১৮৬০-এর দশকের সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম ফসল সধবার একাদশী, আবার সধবার একাদশীও এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়।

অভিনয়ের সংখ্যা বিচার করলে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত যেমন কর্ম তেমনি ফল এবং চক্ষুদান আলোচ্য সবগুলি নাটকের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করবে। তা ছাড়া পাঠ্যগ্রন্থ হিশেবেও এ প্রহসন দুটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।[১৫২]

পানাসক্তি ও লাম্পট্যবিরোধী অন্যান্য নাটক-প্রহসনের মধ্যে বুঝলে কিনা, কিছু কিছু বুঝি, আমি তো উন্মাদিনী, মনোরমা, ডাক্তারবাবু, এরাই আবার বড়লোক, কিঞ্চিৎ জলযোগ ইত্যাদি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিলো। বুঝলে কিনা, কিছু কিছু বুঝি, আমি তো উন্মাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের অল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার মুদ্রিতও হয়েছিলো। মোট কথা, পানাসক্তি ও লাম্পট্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে সাহিত্য হিশেবে খুব উৎকৃষ্ট না হলেও এসব রচনা জনসমাজ কর্তৃক কমবেশি সমাদৃত হয়েছিলো এবং এসব নাটক পাঠ করে এবং/অথবা এসব নাটকের অভিনয় দেখে জনসমাজ পানাসক্তি এবং লাম্পট্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন বলে মনে করা যায়।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বারুণীবিলাস,[১৫৩] অজ্ঞাতনামা নাট্যকার রচিত সুধাকর বিষময়[১৫৪] এবং ১৮৭০ সালে প্রকাশিত

১৪৯. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃ. ৭৩-৭৪, ৯৯।

১৫০. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃ. ৯৮ পাটী।

১৫১. জ্ঞানাঙ্কুর, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৮৭।

১৫২. এ প্রহসন দুটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খৃস্টাব্দে।

১৫৩. প্যারীচরণ সরকারের স্কুল-বুক প্রেসে মুদ্রিত।

১৫৪. ১৮৬৭ সালে প্যারীচরণ সরকারের স্কুল-বুক প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই নাটকের অস্তিত্বের কথা কারো জানা ছিলো বলে মনে হয় না। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মুজিয়ম

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার রচিত সুধা না গরল[১৫৫] নাটক তিনটির লক্ষ্য পানাসক্তির অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করা। তিনটি নাটকই সমকালীন নাটকের মানে রীতিমতো উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। বিশেষত বারুণীবিলাস যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিলো। Calcutta Review পত্রিকা বাংলা নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণত সব সময়েই খুব কড়া মন্তব্যাদি করতো। তাতে বারুণীবিলাসের উচ্চ প্রশংসা করে বলা হয়। বারুণীবিলাস হলো—

> decidedly a touching play, and one of the most masculine delineations of modern Indian life that we have seen for some time...It is an old and terrible story well told. Babu Navin Chandra's book is not infant's food. You are offered strong meat and sharp tonic.[১৫৬]

কিন্তু রচনার গুণ সত্ত্বেও বারুণীবিলাস, সুধাকর বিষময় এবং সুধা না গরল[১৫৭] কোথাও অভিনীত হয় বলে আমাদের জানা নেই। এসব নাটকের একাধিক সংস্করণও হয়নি।

অপর পক্ষে, রামনারায়ণ তর্করত্নের যেমন কর্ম তেমনি ফল এবং চক্ষুদান অভিনয়ে এতো জনপ্রিয়তা লাভ করে দুটি কারণে—এক. এ রচনাদ্বয়ে পানাসক্তির চেয়ে লাম্পট্যের চিত্র অনেক গাঢ় রঙে রঞ্জিত, এবং দুই. প্রচুর শস্তা রসিকতা এদের যত্রতত্র লক্ষণীয়। নাটক হিশেবে অতি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, ডাক্তারবাবু বা মনোরমা যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিলো, তারও কারণ বোধ হয় নাট্যকারগণ এ নাটক দুটিতে লাম্পট্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দান করেছিলেন।

পানাসক্তির কুফল দেখাতে গিয়ে মাইকেল একেই কি বলে সভ্যতা-য় মাতলামি ও তার পরিণতির যে চিত্র অঙ্কন করেন, দীনবন্ধু থেকে আরম্ভ করে অখ্যাত নাট্যকারগণ পর্যন্ত প্রায় সকলেই মোটামুটি তা-ই অনুকরণ করেন। আলোচ্য সবগুলি

লাইব্রেরি বা পশ্চিম বঙ্গের কোনো লাইব্রেরিতে এর কপি নেই। সুকুমার সেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড), জয়ন্ত গোস্বামী, ব্রেমস্ নং—কেউই তাঁদের তালিকায় এ নাটকের উল্লেখ করেননি।

১৫৫. নামের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কারক সভার মদ না গরল পত্রিকার প্রভাব লক্ষণীয়।

১৫৬. 'Critical notes', **Calcutta Review**, Vol. LVII, No. 113 (1873), pp. i-ii.

১৫৭. নাটকটি রচিত হয় হিন্দু মেলায় অভিনীত হওয়ার জন্যে।—সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৬।

নাটক-প্রহসনেই কাহিনীর ক্ষেত্রে কম-বেশি কয়েকটি এতি ব্যবহৃত ছক বা প্যাটার্ন অনুসৃত হয়েছে। পিতার সঙ্গে মাতালের অসঙ্গত ও অশোভন আচরণ, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, রোগভোগ, দারিদ্র্য, বেশ্যাসক্তি ও প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ, পরনারীর সতীত্ব হরণ প্রয়াস, নর্দমায় পড়ে অথবা পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা—এরূপ গুটি কতক ছকেই এসব নাট্যরচনার কাহিনী আবর্তিত হয়।

একেই কি বলে সভ্যতা-য় নববাবু খুব বেআদব, অন্তত কালীবাবুর সঙ্গে আলাপের সময়, এমন মনে হয় না। বরং দেখতে পাই, পিতাকে সে বেশ সমীহ এবং সম্মান করে। কিন্তু সে-ই যখন মাতাল হয়ে ফিরে আসে, তখন পিতাকে old fool বলে গাল দিতে অথবা তার সামনে অসভ্যের মতো ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করে না।[১৫৮] সেকালের নব্য শিক্ষিতদের পক্ষে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাকে old fool বলে গাল দেওয়া খুব বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু তবু সাধারণ পাঠক বা দর্শকরা নববাবুর বর্বরোচিত আচরণে পীড়িত হয়ে শিক্ষিত বলে গর্ব করে এমন মাতালদের নিন্দা করবেন—নাট্যকার বোধ হয় এরূপ প্রত্যাশা করেছিলেন।

পাঠক হৃদয়ে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে **একেই কি বলে সভ্যতা** প্রহসনটি মুদ্রিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে প্রকাশিত অন্তত আরো তিনখানি নাট্যরচনায়[১৫৯] পিতার প্রতি নব্যশিক্ষিত পুত্র চরম অশ্রদ্ধা ও অযত্ন প্রকাশ করেছে। **বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়** নাটকে হর তার পিতাকে old fool, 'হুমো বাগ', 'হাড়গিলা', 'বাগি' এবং 'সেকেলে পাপী' বলে অভিহিত করে।[১৬০] বন্ধু বিনোদ হরর পিতার সম্পর্কে বলে,

> ভাই। আমি তোমাকে পূর্বেইত বলেছি, যে ঐ ব্রুট (brute) গুলোকে নাই দিলেই মাথায় চোড়বে। ··· ঐ বিটলে ব্যাটারা কি সামান্যি হারামজাদা, ওরা না কর্তে পারে এমন কাজই নেই। ওদের টীকি দেখে বিশ্বাস করো না, ওটা "হোজমিগুলি"। ··· আমি বুড় ব্যাটাকে চুমরেনিয়ে এক কথায় জল করে দে আসচি।[১৬১]

১৫৮. **একেই কি বলে সভ্যতা**, পৃ. ৩১, ৩৩-৩৪।

১৫৯. গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়**, হরিশচন্দ্র মিত্রের **ঘর থাকতে বাবুই ভেজে** এবং কানাচাঁদ উকীল ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের **একেই কি বলে বাবুগিরি**—সবগুলিতেই পিতাকে old fool বলার নজির আছে। **হুতোম প্যাঁচার নকসায়ও** অনুরূপ উক্তি আছে। দ্রষ্টব্য : **হুতোম প্যাঁচার নক্সা**, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (নতুন সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৫৫), পৃ. ৩৫।

১৬০. **বউ হওয়া বড় দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়**, পৃ. ৩৫-৩৭।

১৬১. ঐ, পৃ. ৩৫-৩৭।

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে-র[১৬২] রসিক তার পিতাকে বলে 'old fool', 'Rascal', 'বেড়ালতপস্বী', 'বুড় জাম্বুবান', 'শুকুনীর মড়া', 'আবাগের বেটা'।[১৬৩] কেবল তাই নয় একদিন বাড়িতে ফিরে সে—তার নিজের ভাষায়—'বাড়ীর ওল্ড ফুলটাকে এককালে অক্কা' দেখাতে চায়, শেষে 'এয়াদ' করার মতো 'গর্দানী' দেয়। 'মা গুখোর বেটী'কে 'বিলাতী বুসো' আর স্ত্রী প্রমীলার পিঠ 'কৈমাচ ক্যাচা করে' দেয়।[১৬৪]

একেই কি বলে বাবুগিরি-তে শ্যাম বৃদ্ধ পিতা মাতাকে 'ঘরের বড় উৎপাত', 'ঘরের শত্তুর বুড় বুড়ি' বলে গাল দেয়।[১৬৫] নায়ক রামতারণ বাবুগিরি করে, শুঁড়ি এবং বেশ্যাবাড়িতে বেহিশাবে ব্যয় করে কিন্তু বৃদ্ধ পিতার ভরণ পোষণ করতে অস্বীকার করে। পিতা সামান্য অর্থ চাইলে তাকে অর্থ দেওয়া দূরে থাক অপমানিত করে তাড়িয়ে দেয়।[১৬৬] রামচন্দ্র দত্ত-রচিত **বাল্যবিবাহ** নাটকেও মহেন্দ্র তার পিতার প্রতি হর, রসিক কিংবা রামতারণের মতো শ্রদ্ধাহীন। **সধবার একাদশী**-র অটল পিতার সঙ্গে বেআদবি করার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রসর। মাইকেল **নববাবুতে** পিতার প্রতি অভদ্র ব্যবহারের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, হর, রসিক এবং অটলে পর্যায়ক্রমে তারই চরম প্রকাশ লক্ষ্য করি। রসিক পিতাকে একবার ঘাড় ধাক্কা দেয় বটে, কিন্তু অটলের মতো পিতার মুখের উপর কথায় কথায় বেআদবি করে না অথবা পিতামাতার চোখের সামনে মদ খেয়ে বেশ্যার গলা ধরেও নাচে না। অটল এদিক দিয়ে সবচেয়ে নষ্ট চরিত্র।

পিতামাতার প্রতিই নয়, স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার এবং শারীরিক নিপীড়নের চিত্র অঙ্কন করেও আলোচ্য নাট্যকারগণ মাতাল ও লম্পটদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করতে চেয়েছিলেন। **একেই কি বলে সভ্যতা**-র হরকামিনী সুন্দরী, নম্রস্বভাব, সতী স্ত্রী। কিন্তু নববাবুর দুর্ব্যবহার এবং অবহেলায় সে ক্ষুব্ধ হয়, বলে—

১৬২. এ নাটকটি **বউ হওয়া বড় দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়**-এর আদলে রচিত। হর এখানে রসিকে, শামা বুঁচিতে রূপান্তরিত। নলিনী এবং প্রমীলা উভয়েই সুন্দরী স্ত্রী। উভয়ই স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচারে জর্জরিত। হর এবং রসিক উভয়ই স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করে বেশ্যার খরচ জোটাতে চায়। নলিনী এবং প্রমীলা উভয়ই স্বামীর চরম দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। হর এবং রসিক উভয়ই শেষে তাদের রক্ষিতাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়।

১৬৩. বোমচাঁদ বাঙ্গাল (হরিশচন্দ্র মিত্র), **ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে** (ঢাকা, ১৮৬৩), পৃ. ৪, ১৭, ১৯।

১৬৪. ঐ, পৃ. ১৯।

১৬৫. **একেই কি বলে বাবুগিরি**, পৃ. ২৩-২৪।

১৬৬. ঐ, পৃ. ২-৪।

এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি।[১৬৭]

বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায় নাটকে গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কৌশল অবলম্বন করেন। নলিনীর স্বামী হর যেমন একটি অমানুষ, সে তেমনি ভালোমানুষ। স্বামী বেশ্যাসক্ত জেনেও সে 'স্ত্রীলোকের জীবনসর্বস্ব স্বামী'র জন্যে দুঃখ করে, তাকে তুষ্ট করার জন্যে প্রাণপণ প্রযত্ন করে।[১৬৮] কিন্তু বিনিময়ে সে শারীরিক পীড়ন লাভ করে শুধু। শেষ পর্যন্ত উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে সে তার দুঃখ মোচন করে।

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে নাটকে প্রমীলা ভাবে, 'অতিবড় শত্রুরেরও (শত্তুরেরও) যেন নারীকুলে জন্ম হয় না।[১৬৯] আমরা জানতে পাই, সতেরো বছরের যৌবনে সে কখনো স্বামীর সহবাস লাভ করেনি। একদিন তার স্বামী তার ঘরে শুতে এলে সে অশ্রু দিয়ে তার স্বামীর চরণ ধুইয়ে দেয়। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়লে স্বামী তার গলা থেকে সাতনরী হার খুলে নেয়, আর নাকের নথ নেয় নাক থেকে ছিঁড়ে। নলিনীর মতো প্রমীলাও ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে দড়ি খোঁজে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে। আর একদিন, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, তার স্বামী রসিক এসে তার পিঠ 'কৈমাচ ক্যাচা করে' দেয়। সে আক্ষেপ করে বলে, 'মরণটা হলে বত্তিয়ে যাই। সংসারের সুখ আমার সব হয়েছে। যা বাকী আছে, আম কাঠের তলায় যেয়ে তা ভোগ করবো।[১৭০]

দীনবন্ধুও সধবার একাদশীতে একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন।[১৭১] এই নাটকের কুমুদিনী হরকামিনী, নলিনী এবং প্রমীলার মতো মাতাল-লম্পটের অবহেলিত স্ত্রী। হরকামিনী, নলিনী এবং প্রমীলার চেয়ে একটা জায়গায় তার দুঃখ

১৬৭. একেই কি বলে সভ্যতা, পৃ. ৩৪।

১৬৮. বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়, পৃ. ৫১।

১৬৯. ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ৭।

১৭০. ঐ, পৃ. ৭।

১৭১. সধবার একাদশী একেই কি বলে সভ্যতার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত। একেই কি বলে সভ্যতার হরকামিনী ও প্রসন্ন সধবার একাদশীতে যথাক্রমে কুমুদিনী ও সৌদামিনীতে রূপান্তরিত। তাদের কেবল নামই ভিন্ন নয়তো আচার-আচরণ একই রকমের। এমন কি ভাই-বোনের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে রসিকতাও হরকামিনী এবং কুমুদিনী উভয়ই করে। হরকামিনী ও কুমুদিনীর আক্ষেপও কম-বেশি একই ভাষায় বলা। নববাবু ও অটলের মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য আছে।

বেশি,—তারই চোখের সামনে তার স্বামী অটল বেশ্যা নিয়ে ঢলাঢলি করে। সে তাই তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভালো ; আমি ভাই, আর সইতে পারিনে, আমি গলায় দড়ী দে মরব।'[১৭২]

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের নায়িকা সুরমা সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং নম্রস্বভাব। সকলে তার প্রশংসা করে। কিন্তু তার স্বামী কমল মদ ও বেশ্যার আসক্ত হওয়ায় মনদুঃখে সুরমা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। স্ত্রীর এরূপ সকরুণ চিত্র চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা, মনোরমা, বাল্যবিবাহ এবং আমি তো উন্মাদিনী নাটকেও অঙ্কিত হয়েছে।[১৭৩]

সুধাকর বিষময় নাটকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে নাট্যকার কাহিনীতে খানিকটা বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে দেখানো হয়েছে, মাতাল লোকেন্দ্র এমন অধঃপাতে গেছে যে, সে নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের ভোগের জন্য উপহার দিতে চেষ্টা করে।[১৭৪]

ভদ্রলোক ও গুণবান বলে পরিচিত শিক্ষিত ব্যক্তিও মদ্যপানাসক্ত হয়ে কী করে আপন গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে অধঃপাতে যেতে পারে, নাট্যকারগণ সে দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বারুণীবিলাস এবং অজ্ঞাতনামার সুধাকর বিষময় এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বারুণীবিলাসের নায়ক অনঙ্গমোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শিক্ষা, নৈতিক আদর্শ ইত্যাদি নানা গুণের জন্যে সে তার পরিচিত মহলে প্রশংসিত। কিন্তু হঠাৎ কুসংসর্গে পড়ে সে পানাসক্ত হয়। এর ফলে এতোকাল তার যে গুণাবলীর জন্যে সবাই তাকে সম্মান ও খাতির করতো, সেগুলি অচিরেই লুপ্ত হয়। সে নানা দুকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তার দুই বোতল-সহচর ললিত ও মোহিতের সহায়তায় সে সৌদামিনী নামক একটি কুমারী মেয়ের সতীত্ব নাশ করতে উদ্যত হয়। সৌদামিনী আত্মহত্যা করে রক্ষা পায়। নাট্যকার এভাবে অনঙ্গমোহনের অধঃপতনের চিত্র অঙ্কন করেন এবং পানাসক্তির প্রতি পাঠক ও দর্শকদের ঘৃণার উদ্রেক করার প্রয়াস পান।

সুধাকর বিষময় এর লোকেন্দ্রও সমাজে মান্য ব্যক্তি বলে পরিচিত। কিন্তু প্রবীণের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমিত মদ্যপানের অভ্যাস করে। শেষে পরিমিত থেকে অপরিমিত মদে আসক্ত হয়। এ অবস্থায় আপন স্বভাব বিস্মৃত হয়ে সে পরিবারবর্গের

১৭২. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু রচনা সংকলন, পৃ. ২৯৬।

১৭৩. চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা, মনোরমা ও আমি তো উন্মাদিনীর কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য : নীলিমা ইব্রাহিম, পৃ. ১০৮-১৩ ; জয়ন্ত গোস্বামী, পৃ. ২০৫-০৭।

১৭৪. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৭৪-৭৫।

প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। ছোট ভাইকে সে স্ত্রী-পুত্রসহ খুন করার পরিকল্পনা করে, স্ত্রীকে অন্য পুরুষের ভোগের জন্যে উপহার দিতে চেষ্টা করে, বন্ধুদের নিয়ে এক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ধর্ষণ করে এবং এক প্রতিপক্ষ জমিদারকে গুলী করে খুন করতে চায়। পরিণতিতে সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং নানা দুঃখভোগ করে।

এমন কি, সধবার একাদশীর অটল এবং নিমচাঁদও গোড়াতে মন্দ ছিলো না। নিমচাঁদের কথা থেকে বোঝা যায়, সে শানানো বুদ্ধি এবং সুন্দর ইংরেজী জানা ভদ্রলোক। কিন্তু মদ তাকে অস্বাভাবিক ও বিকৃত একটি অকর্মণ্য প্রাণীতে পরিণত করে। অটল শুরুতে পানাসক্ত ছিলো না, বেশ্যাসক্তও নয়। কিন্তু পানাসক্ত হয়ে দ্রুত সে চরম অধঃপাতে নেমে যায়।

পানাসক্তির ফলে অপমৃত্যুর কথা আছে সুধাকর বিষময় এবং বাল্যবিবাহ নাটকে। সুধাকর বিষময়ের তেজেন্দ্র এবং বাল্যবিবাহের ভোলানাথ অত্যধিক মদ্যপানের ফলে মারা যায়।[১৭৫] সধবার একাদশীতে একাধিক উক্তি আছে, যাতে বলা হয়, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নানা রোগ হতে পারে।[১৭৬]

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মাতাল নিজের পিতামাতা এবং স্ত্রীকে প্রহার করেছে এমন কথা আছে ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে নাটকে।[১৭৭] মাকে খুন করার দৃষ্টান্ত আছে সুধাকর বিষময় নাটকে।[১৭৮] বটুবিহারীরচিত হিন্দু মহিলা নাটকে কমল মত্ত অবস্থায় এক পুরোহিত এবং এক দাসীকে খুন করে।[১৭৯]

নেশাগ্রস্ত হয়ে সম্মানিত ব্যক্তিও অতি অসংগত আচরণ করে এবং হাস্যাস্পদ হয়, নাট্যকারগণ সোৎসাহে এমন কথা বলেছেন। সুধাকর বিষময়ের লোকেন্দ্র এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রামের কতিপয় বোতল-সহচরকে নিয়ে এমন উন্মত্ত আচরণ করে যা স্বভাবতই হাসি ও করুণার উদ্রেক করে। একেই কি বলে সভ্যতার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অনুকরণে এই দৃশ্যটি পরিকল্পিত। এতে মাইকেলের স্বাভাবিকত্ব লুপ্ত হলেও মাতলামি ও উচ্ছৃঙ্খলার চিত্রটি কড়া রঙে অঙ্কিত।

রবীন্দ্র। প্রথমে আমি প্রোপোজ কচ্ছি এ সভার নাম ওয়ান মাইণ্ড সোসাইটি।

সকলে। হিয়ার হিয়ার--এর চেয়ে ভাল নাম চরকা ফরকা আসমানের নীচে নেই।

১৭৫. **সুধাকর বিষময়,** পৃ. ৩২ ; **বাল্যবিবাহ,** পৃ. ২৫-২৬।

১৭৬. **সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন,** নিমচাঁদের উক্তি, পৃ. ২৮০, ২৮১; ২৮২ ; নকুলের উক্তি, ২৮১ ; অটলের উক্তি, ২৯৩।

১৭৭. **ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে,** পৃ. ১৭-১৯।

১৭৮. **সুধাকর বিষময়,** পৃ. ১০।

১৭৯. **বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক,** পৃ. ১৩২-৩৬।

লোকেন্দ্র। আমি দেশের ভাল কত্তে চাই। মাই প্রপোজিসন এই, মদ সকলে খাবে, পেটের থেকে পড়ে অমনি ছেলে মদের জন্য কাঁদবে, বুড়োরা মরবার সময় গঙ্গাজলের বদলে হা করে মদ চাইবে।

সকলে। হিয়ার হিয়ার তোমার মাথাটা শেক্সপিয়ার্‌স—

নয়ন। জলের বদলে মদ চলবে তবেতো দেশের ভালো হবে। গুরু মাতাল, পুরুত মাতাল, ঠাকুরমা মাতাল, ঠাকুরদাদা মাতাল, সালগ্রাম মাতাল, মাকালী মাতাল---তবেতো দেশের ভাল হবে। রাত পোয়ালে মদ খাবে, সারাদিন মদ খাবে, স্বপ্নেতেও মদ খাবে, তবে তো দেশের ভাল হবে।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, অল ট্রুথ ইটসেল্‌ফ—

গোলক।...মেম্বরদের কি কি কোয়ালিফিকেসন চাই।

রবীন্দ্র। আমি প্রোপোজ করি লোকে যাকে ভুলে কুকর্ম বলে, সে সব যে কত্তে পারে।

নয়ন। স্ত্রীবৎ পরদারেষু যে দেখে, নিকট সম্বন্ধও বাছ দেয় না। আরো যে, বাবা, বেশ্যার সঙ্গে রাস্তার মাঝখানে নাচতে পারে।

লোকেন্দ্র। যে বেশ্যার জন্যে সব ত্যাগ কত্তে পারে, যে, বাবা, হাঁড়ি মুচির ভাত খেতে পারে।

কিশোরী। যে, বাবা, ভাল মানুষ ককলার যে শালারা, তাদের একেবারে দফা রফা কত্তে পারে।

* * *

নয়ন। যে, বাবা, বেহ্ম সভায় আগুন দিতে পারে, আর বিম্মিদের মুখ পোড়াতে পারে যে।

বংশী। যে, বাবা, ধর্মবই চুলোয় দিতে পারবে।

নয়ন। যে, বাবা, বেতে শ্রাদ্ধতে, মদের মচ্ছব দিতে পারবে।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, ওয়েল সেড।

রবীন্দ্র। দিস ইজ আওয়ার ক্যাথলিক চার্চ, নট একমন সভা।

নয়ন। যে, বাবা, আপনার স্ত্রীকে তার বন্ধুকে দিতে পারবে, এ সভায় আনতে পারবে।

সকলে। ও হিয়ার, হিয়ার। নয়নবাবু বেরোস্পতি।[১৮০]

নাট্যকার এখানেই থামেননি, অতঃপর দেখিয়েছেন এই মাতালরা কী ভাবে ঘোর মত্ত অবস্থায় কেউ কালী সেজে, কেউ পাঁঠা সেজে, কেউ মুরগি সেজে পুজোর

১৮০. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৬৯-৭১।

অভিনয় করে।[১৮১] নেশাখুরি কি ঝকমারি, একেই কি বলে বাবুগিরি, আলালের ঘরের দুলাল, দলভঞ্জন, বুঝলে কিনা, বাল্যবিবাহ, লীলাবতী, সধবার একাদশী, ফাজতো ঝকড়া এবং বটুবিহারীরচিত হিন্দু মহিলা নাটকেও মাতলামির দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। বুঝলে কিনা প্রহসনের অটলকৃষ্ণ, বিদ্যালঙ্কার এবং সুখী মেথরানীর মাতলামির মিলিত দৃশ্যটি এর মধ্যে স্বাভাবিকত্বের দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ মদের প্রভাবে কিভাবে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং সকল ঔচিত্য বিসর্জন দেয়, নাট্যকার নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার একটি সুন্দর ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছেন।

মাতলামির ফলে যে নাজেহাল হতে হয় আলোচ্য নাট্যকারগণ তা-ও উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবত হরিশ্চন্দ্র মিত্রই সর্ব প্রথম তাঁর ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে নাটকে এই পথ দেখান, পরে অন্যান্য নাট্যকার তাঁর অনুসরণ করেন। ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে-তে রসিক মত্ত অবস্থায় নর্দমায় পড়ে গিয়ে কেমন নাজেহাল হয়েছিলো, তারকের মুখে তার বর্ণনা পাই।

মাধব (রসিকের পিতা)। বেঁচে আছে ত ? মরে নাই ?

তারক। আজ্ঞে, মরে নাই, কিন্তু মরার বড় বক্রীও নাই। ··· অনুসন্ধান কত্তে ২ সেই পুলিশ পর্যন্ত যাওয়া গেল, সেখানে গিয়ে দেখি, হতভাগার সর্বাঙ্গে নর্দমার দুর্গন্ধ কাদা, দেখলে বোধহয় যেন, যমালয়ের নরককুণ্ড হতে এইমাত্র উঠে এসেছে। ··· মাঝে মাঝে হতভাগ্য বলছে "ও ভাই পাহাড়ালা (পাহারাওয়ালা) একটু জল দে ভাই ; পিপাসায় বুক ফেটে যাচেচ।" কিন্তু, তার সেই করুণ উক্তি শুনে কেউ এক ফোটা জল দিচেচ না, আর বলছে "শারা দারু পিও, মজা করো, পানিছে ক্যায়া কাম ?" কেউবা বলছে "ভাইয়া শারা কা মুমে খোরা পেসাব করকে দেও না।" ··· তারপর পুলিশের ক বেটাকে কিছু ২ দিয়ে বাবুকে ত ছাড়িয়ে নেওয়া গেল, শেষ দুজন মেথরকে কিছু দিয়ে ধুইয়ে ধাইয়ে একখান ছকরাতে করে আনা গেল।[১৮২]

এখানেই শেষ নয়। রসিক দ্বিতীয়বার মত্ত অবস্থায় পুলিশের হাতে বন্দী হয়, আমরা এমন দৃশ্যও দেখতে পাই।[১৮৩] নাট্যকার নিশ্চয় আশা করেছিলেন, মাতালের এমন দুর্দশার কথা শুনে, তাঁর পাঠক ও দর্শকরা পানাসক্তির অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন।

১৮১. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৭১-৭২।
১৮২. ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ১৫-১৬।
১৮৩. ঐ, পৃ. ২৫-২৬।

নেশাখুরি কি ঝকমারি নাটকে মাতালরা কেবল নর্দমায় পড়ে কষ্ট পায়নি, একজন মত্ত অবস্থায় সুন্দরী নারী মনে করে একটি কুকুরকে চুমো খায়। কুকুর তাতে তাকে কামড়ে রক্ত বের করে দেয়।[১৮৪] পুলিশ এসে মাতালের 'পোঁদে তিন বাড়ি' দিয়ে তাকে 'ঝোলাতে পুরে' নিয়ে যায়—একথাও আমরা জানতে পারি।[১৮৫] ফালতো ঝকড়া নাটকে প্রেমচাঁদ মাতলামো করার জন্যে বেশ্যার হাতে ঝাঁটার বাড়ি খায়। এবং চৌকিদারের হাতে ধরা পড়ে।[১৮৬] সধবার একাদশীতে মত্ত নিমচাঁদ উত্থান শক্তি রহিত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে এবং পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।[১৮৭]

বাল্যবিবাহ নাটকে দেখানো হয়েছে মাতাল গঙ্গা মনে করে নর্দমায় স্নান করে এবং পুলিশ তাকে ধরে নাজেহাল করে।[১৮৮] অপদস্থ ও অপমানিত হওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বুঝলে কিনা প্রহসনে। বিদ্যালঙ্কার যথেষ্ট অপমানিত হয়ে দর্পনারায়ণের হাত থেকে ছাড়া পায়।[১৮৯] কিন্তু দলপতি অটলকৃষ্ণের অপমানের কোনো তুলনা হয় না। দর্পনারায়াণ তাকে হনুমান সাজিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে, প্রহার করে চরম অপমান ও শারীরিক নির্যাতন করে।[১৯০] লম্পট-মাতালের এই বিড়ম্বনার দৃশ্য বলা বাহুল্য, বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যেই মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো, আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহ থেকে এমন অনুমান করা যায়। ইংরেজিতে সুশিক্ষিত,[১৯১]

১৮৪. মহেশচন্দ্র দাস দে, নেশাখুরি কি ঝকমারি, পৃ. ১৪-১৫, ১৯-২০।

১৮৫. ঐ, পৃ. ১৯-২০।

১৮৬. জীবনকৃষ্ণ সেন, ফালতো ঝকড়া (কলিকাতা, ১৮৭০), পৃ. ৭।

১৮৭. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ৩১১-১২।

১৮৮. দৃশ্যটি ঘর থাকতে বাবুই ভেজে ও সধবার একাদশীর অনুকরণে লিখিত। ঘুষ দিয়ে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অংশটি একেই কি বলে সভ্যতার অনুকরণ।

১৮৯. বুঝলে কিনা, পৃ. ৮৩-৮৯।

১৯০. ঐ, পৃ. ৯৩-১১৪। এই দৃশ্যটি দীনবন্ধু-রচিত নবীন তপস্বিনীর জলধরের নাজেহাল হওয়ার দৃশ্যের (নবীন তপস্বিনী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ১৯১-৯৯) অনুকরণ। সেদিক থেকে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খুব একটা মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠক-দর্শক দৃশ্যটি উপভোগ না করে পারেন না।

১৯১. যেমন একেই কি বলে সভ্যতার নববাবু; সধবার একাদশীর নিমচাঁদ; সুধাকর বিষময়ের রবীন্দ্র; বটুবিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের কমল; বারুণীবিলাসের অনঙ্গমোহন; এর মধ্যে রবীন্দ্র ও অনঙ্গমোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

সাধারণ শিক্ষিত,[১৯২] উকিল,[১৯৩] ডাক্তার,[১৯৪] ছাত্র,[১৯৫] ব্রাহ্মণপণ্ডিত,[১৯৬] রক্ষণশীল সমাজপতি,[১৯৭] সাধারণ মহিলা,[১৯৮] বেশ্যা[১৯৯] প্রভৃতি বহু শ্রেণীর মানুষকেই এই নাটক-প্রহসনে পানাসক্ত করে চিত্রিত করা হয়েছে। বটুবিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের বগলা এজন্যেই পানাসক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'যে যা বলুক ভাই, উটী সব বাড়িতেই চলিৎ হয়েছে।'[২০০]

পানাসক্তির ফলে বহু অনিষ্ট ঘটায় সুধাকর বিষময় নাটকে শান্তশীল তেজেন্দ্রকে উপদেশ দিয়ে বলে, জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে মূর্খ হতে চাইলে, সুন্দর স্বাস্থ্য নাশ করে অকালে রোগজীর্ণ হয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলে, পিতামাতা দারাপুত্র পরিবারকে নিরাশ্রয় ভিখারি করতে চাইলে, মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশু হতে চাইলে, সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে দুঃখকে বরণ করতে চাইলে, সংসার সমাজ ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইলে সে যেন মদ খায়।[২০১] এই উপদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে কেবল সুধাকর বিষময় নাটকেই নয়, আলোচ্য অন্যান্য নাটকেও কমবেশি মদ্যপানের এ সকল অনিষ্টকারিতার বাস্তব চিত্র যত্রতত্র অঙ্কিত হয়েছে। হর, রসিক, অটল, অটলকৃষ্ণ, লোকেন্দ্র, মহেন্দ্র ইত্যাদি অনেক পাষণ্ডচরিত্র মদ্যপানজনিত কুফলের মূর্ত প্রতীক।

১৯২. যেমন একেই কি বলে সভ্যতার কালীবাবু, মহেশ, চৈতন ইত্যাদি; সধবার একাদশীর অটল, ভোলা ইত্যাদি; বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়-এর হর ও বিনোদ; ঘর থাক্তে বাবুই ভেজের রসিক; একেই কি বলে বাবুগিরির রামতারণ ও তার বন্ধুগণ; সুধাকর বিষময়ের লোকেন্দ্র, বংশী, নয়ন ইত্যাদি; বারুণীবিলাসের ললিত ও মোহিত; লীলাবতীর ভোলানাথ ইত্যাদি; হিন্দু মহিলা নাটকের বিনোদ ইত্যাদি। এই দলের সদস্য সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

১৯৩. যেমন সধবার একাদশীর নকুল।

১৯৪. যেমন কিঞ্চিৎ জলযোগের পূর্ণচন্দ্র; ডাক্তার বাবু নাটকের ডাক্তার; সুধাকর বিষময়ের ভূষেণ।

১৯৫. যেমন বাল্যবিবাহের মহেন্দ্র; আলালের ঘরের দুলালের মতিলাল, গদাধর ও হলধর।

১৯৬. যেমন বুঝলে কিনার বিদ্যালঙ্কার; বটুবিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের গণেশ।

১৯৭. যেমন বুঝলে কিনার অটলকৃষ্ণ।

১৯৮. যেমন কামিনী নাটকের কামিনী।

১৯৯. একেই কি বলে সভ্যতা; সধবার একাদশী; সুধাকর বিষময়; বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়; ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে; বটুবিহারীরচিত হিন্দু মহিলা নাটক; নেশাখুরি কি ঝকমারি; একেই কি বলে বাবুগিরি ইত্যাদি অনেক নাটকেই এর প্রমাণ মেলে।

২০০. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৫।

২০১. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৯-১০।

পানাসক্তির প্রতি মনোভাব

এ সব নাটকে মদ্যপানের পক্ষে এবং বিপক্ষে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সামাজিক দলিল হিশেবে সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। যেমন মদ খায় না কেন তার কৈফিয়ৎ দিয়ে কেনারাম ডেপুটি বলে, মদ খেলে লোকে নিন্দা করবে, না খেলে 'শিষ্টশান্ত' বলবে বলে।[২০২] এ থেকে বোঝা যায়, সমাজে মদ্যপানবিরোধী একটা মনোভাব ১৮৬০ এর দশকে দানা বাঁধছিলো। সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের ফলে এই মনোভাব দৃঢ়তর হয়। অতঃপর মদ্যপরা ক্রমশ অধিকতর গোপনীয়তা অবলম্বন করতে আরম্ভ করে এবং অনেকে নিবারণী সভার সদস্য হয়ে পানাভ্যাস ত্যাগ করে। রামসুন্দর ও গোকুল এমনি দুটি চরিত্র। রামসুন্দর বিশ বছরের অভ্যাস ত্যাগ করে নিবারণী সভার সদস্য হয়।[২০৩] গোকুলও পানাসক্তির অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করতে পেরে অভ্যাস ছেড়ে দেয়। সে বলে, সমাজের ভয়ে সে অভ্যাস ত্যাগ করেনি।[২০৪]

সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের সাফল্যের কথা পাঁড়মাতাল নকুলেশ্বরও স্বীকার করে। সে বলে, 'এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েচে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে'। 'অনেক ভদ্র সন্তান মাতালদের অনুরোধে পড়ে মদ খেতে আরম্ভ করত, এখন অনুরোধ করিবা মাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিচি; মাতাল ভায়ারা অমনি পেচিয়ে যান।'[২০৫] নিমচাঁদও স্বীকার করে, আন্দোলনের ফলে প্রকাশ্যে মদ্যপান হ্রাস পেয়েছে।[২০৬] অন্যত্র বলে, 'সুরাপান নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভারি অমঙ্গল;— বড়মানুষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি খেনো খেয়ে মরব।'[২০৭]

পানাসক্তি সম্পর্কে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মনোভাব সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিকূল। এরা প্রায় মিশনারিসুলভ উৎসাহ নিয়ে মদ্যপানের

২০২. **সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন**, পৃ. ২৯১।
২০৩. ঐ, পৃ. ২৮৩।
২০৪. ঐ, পৃ. ২৯২।
২০৫. ঐ, পৃ. ২৭৯।
২০৬. ঐ, পৃ. ২৮০।
২০৭. ঐ, পৃ. ২৮১-৮২।

এ মন্তব্য ঐতিহাসিকভাবে যথেষ্ট সত্য বলে মনে হয়। একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখি মেদিনীপুরে। রাধাকান্তদেবের এক পৌত্র—ব্রজেন্দ্রনারায়ণ—মেদিনীপুরে উচ্চ সরকারি চাকুরি করতেন। তাঁর বাগানটি ছিলো মাতালদের একটি প্রিয় আড্ডা। কিন্তু তিনি রাজনারায়ণ বসুর সুরাপান নিবারণী সভার সদস্য হয়ে মদ্যপান ছেড়ে দিলে মাতালরা বিনে পয়সার ভালো মদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং রাজনারায়ণের উপর দারুণ রুষ্ট হয়।—**রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ৮৪।

অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। সুধাকর বিষময়ের শান্তশীল এবং বাল্যবিবাহের ভূষণ এমনি দুটি পানাসক্তি বিরোধী প্রচারক চরিত্র। পানাসক্তি সম্পর্কে শান্তশীলের বক্তব্য আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।[২০৮] এখানে ভূষণের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। সে বলে পানাসক্তি

> হাজার বার মন্দ, দশ হাজার বার মন্দ, দশলক্ষ বার মন্দ, দশকোটি বার মন্দ, পরার্দ্ধবার মন্দ। মদ যদি এই মুহূর্তে দেশ থেকে দূর হয়ে যায়, তাহলে আমি আনন্দে রাস্তায় রাস্তায় আনন্দ প্রকাশ করে বেড়াই। বল কিহে। রাক্সী সব খেয়ে ফেল্লে? দেশে আর কাউকে রাখলে না? নিশাচরী এত লোককে খেয়েছে তবু পেট ভরেনি, এখন খাচেচ, আরও কাকে খাবে তা বলতে পারিনি।[২০৯]

ব্রাহ্ম সমাজের বহু সদস্য পানাসক্তি বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, আমরা দেখেছি।[২১০] প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে নিবারণী আন্দোলনের নাম ১৮৬০-এর দশকের শেষভাগে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায়। আলোচ্য কোনো কোনো নাটকেও দেখতে পাই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সুরাপান নিবারণী আন্দোলনকে সমীকরণ করা হয়েছে।[২১১] ব্রাহ্মদের পানাসক্তি-বিরোধী মনোভাবের জন্যেই নয়নচাঁদ ব্রাহ্মসভায় আগুন দেওয়ার এবং 'বিহ্মি'দের মুখ পোড়াবার আহ্বান জানায়।[২১২]

মদ্যপায়ীদের ভুক্তভোগী আত্মীয়-স্বজন বিশেষত পিতামাতা এবং স্ত্রীর মনোভাবও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একেই কি বলে সভ্যতায় নববাবুর পিতা পুত্রের পানাসক্তির পরিচয় লাভ করে দারুণ বিচলিত হয় এবং সপরিবারে পাপ-নগরী কলকাতা ত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে নাটকের মাধব পানাসক্ত পুত্রের আচরণে মর্মাহত ও হতাশ হয়। সে আক্ষেপ করে বলে, 'পাপ প্রাণ কেন বেড়েয় না, বলতে পারি না।… এখন ভগবান আমাকে উঠান, তা হলেই প্রাণটা বাঁচে। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হতে এড়াই।… এমন ইচ্ছা হয় যে আত্মঘাতী হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করি।'[২১৩] সধবার একাদশীতে জীবনচন্দ্রও পুত্র অটলের আচরণে কম ক্ষুব্ধ নয়। তার কথা হলো, পানাসক্তি ত্যাগ করে অটল

২০৮. পূর্বে, পৃ. ৩৭৫।
২০৯. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ, পৃ. ২৭-২৮।
২১০. পূর্বে, পৃ. ৩৪৬।
২১১. সধবার একাদশী; সুধাকর বিষময়: বাল্যবিবাহ।
২১২. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৭০।
২১৩. ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ১৬।

যদি গরু খায় কি ব্রাহ্মসভায় নাম লেখায় তাতেও তার কোনো আপত্তি নেই।[২১৪] এ থেকেই বোঝা যায়, পানাসক্তি সম্বন্ধে তার মনোভাব কতোটা বিরূপ। পুত্রের পানাসক্তি বিষয়ে রামনারায়ণ বসু,[২১৫] জনক চট্টোপাধ্যায়[২১৬] ইত্যাদির মনোভাবও কম প্রতিকূল নয়।

পিতার মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র মাতালের স্ত্রীর মনোভাব। স্ত্রীরা সরাসরি ভুক্তভোগী বলে তাদের মনোভাব পিতাদের মনোভাবের চেয়েও বেশী বিরূপ। আমরা পূর্বেই এ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি।[২১৭]

পিতা ও স্ত্রীর পাশে মায়ের মনোভাব খুব বিসদৃশ ঠেকে। আলালের ঘরের দুলালে প্যারীচাঁদ মিত্র যে স্নেহান্ধ মায়ের চিত্র অঙ্কন করেন, তা-ই যেন পরবর্তীকালে অন্যান্য নাট্যকারের কাছে একটা আদর্শের মতো কাজ করে। একেই কি বলে সভ্যতায় নববাবুর মা পুত্রের মত্ততা দৃষ্টে বিস্মিত হয়ে বলে, 'ওমা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব কে শেখালে গা।'[২১৮] তার 'সোনার নব' যে মদ্যপ বা সে যে কোনো অপরাধ করতে পারে, তা তার কাছে অবিশ্বাস্য। বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায় এবং ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে নাটকের মা চরিত্র দুটিও অনুরূপ। একেই কি বলে বাবুগিরিতে সংসারের চরম দারিদ্র্য দৃষ্টে বা অনশনের কষ্টভোগ করে রামতারণের মা তার স্বামীকে দোষী করে কিন্তু মদ্যপ পুত্র সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করে না। বাল্যবিবাহ নাটকের মা-ও পুত্রের সকল দোষের প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ। হীরালাল মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদের আলালেরই নাট্যরূপ। সুতরাং এ নাটকে মতিলালের মা যে স্নেহান্ধরূপে চিত্রিত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মা চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্নেহান্ধ সধবার একাদশীর অটলের মা। সেই বস্তুত অটলকে অধঃপাতে যেতে সাহায্য করে। পুত্রকে অপরিমিত অর্থ দেয় সে-ই। এমন কি, পুত্রকে সুখী করার জন্যে সে পুত্রের রক্ষিতাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। তাকে বলে, সে যেন অটলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।[২১৯]

২১৪. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ২৯০-৯১, ২৯৩।

২১৫. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৭৯-৮২।

২১৬. একেই কি বলে বাবুগিরি, পৃ. ৪-৫; ৬-৭; ৮-১০, ১৪।

২১৭. পূর্বে, পৃ. ৩৬৯-৭০।

২১৮. একেই কি বলে সভ্যতা, পৃ. ৩১।

২১৯. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ৩৪০-৪১ (কাঞ্চনের উক্তি), পৃ. ৩৫১ (গিন্নির উক্তি)।

মাতালের জননীর বিলাপ প্রহসনে একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। এই মা মাতাল পুত্রের হাতে লাঞ্ছিত হয় এবং পুত্রের প্রতি তার অন্ধ স্নেহের বন্ধন ঘুচে যায়। ফলে সে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[২২০]

মদ্যপানের প্রতি মাতালদের মনোভাব কেমন ছিলো, তা দেখা যেতে পারে। নববাবুর মতে পানাসক্তি হচ্ছে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র একটি আচার। প্রাণ থাকতে সে এ সভা 'এবলিশ' করতে অথবা এ 'এনজয়মেন্ট' ত্যাগ করতে পারবে না।[২২১] সে মদ্যপানে কোনো অপরাধ দেখতে পায় না, বরং মনে করে এটা সংস্কারমুক্তির একটা উপায়। 'লিবার্টি হলে' সকল সভাই মদ্যপান করবে, এটা যেন স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। অটল (সধবার একাদশী), রসিক (ঘর থাকতে ইত্যাদি), বংশীধর, নয়নচাঁদ, রবীন্দ্র (সুধাকর বিষময়), অটলকৃষ্ণ (বুঝলে কিনা), মহেন্দ্র (বাল্য-বিবাহ), হর, বিনোদ (বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়) কেউ-ই একে অন্যায় কাজ বলে গণ্য করে না।

নেশাখুরি কি ঝকমারি নাটকের হরকালী মনে করে, একবার খেলে মদের গুণ আর ভোলা যায় না। 'এতে পুত্রশোক নিবারণ হয়।'[২২২] প্রসঙ্গত সে যে গল্পটি বলে তা কৌতুকপূর্ণ এবং তার মধ্য দিয়ে পানাসক্তির প্রাবল্য অনুধাবন করা যায়। পানাসক্ত পুত্র পিতাকে বলে, পিতা একবার মদ খেলে সে আর কোনো দিন মদ ছোঁবে না। শুনে পিতা পুত্রের মঙ্গলের জন্যে একদিন মদ খায়। তারপর কথামতো পুত্র যখন মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে পিতার অনুমতি চায়, তখন পিতা তাকে বলে, 'তুমি ছাড় মদ ছাড়া হবে না আমার।'[২২৩]

নিমচাঁদ বলে, একদিন শিক্ষিত সমাজ মদকে বরণ করে তারই আনুকূল্যে জাতিভেদ লোপ করেছিলো এবং একে অবলম্বন করে পাঁচবন্ধুতে বিমল আনন্দ লাভ করেছিলো। আজ রোগের ভয়ে সেই মদ ত্যাগ করা 'কাপুরুষের কাজ, কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা।'[২২৪] অন্যত্র সে বলে, মদ্যপানে অধর্ম হয় না।[২২৫]

অটলকৃষ্ণের মতে সুরা 'উদরস্থ হলেই এককালে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়।'[২২৬] কিন্তু প্রবীণ কথা বলে শর্তসাপেক্ষ। সে বলে, 'মিতাচার অমৃতবৃক্ষ, ইহার ফল চমৎকার,

২২০. জয়ন্ত গোস্বামী, পৃ. ১১৯-২১।
২২১ একেই কি বলে সভ্যতা, পৃ. ৩১।
২২২. নেশাখুরি কি ঝকমারি, পৃ. ২০।
২২৩. ঐ, পৃ. ২১।
২২৪. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ২৮১।
২২৫. ঐ, পৃ. ৩১৬।
২২৬. বুঝলে কিনা, পৃ. ৮।

স্বাস্থ্য, জ্ঞান, পুণ্য ও ধর্ম এ থেকে উৎপত্তি হয়।'[২২৭] নকুলও বলে, হয়তো ঠাট্টা করেই, 'মডারেটলি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বৈত নয়।'[২২৮]

মদ খেলে রোগ হয় কিনা এবং তার ফলে অপমৃত্যু হওয়া সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে নিমচাঁদের মনোভাব কৌতূহলোদ্দীপক। রোগের এবং অপমৃত্যুর আশঙ্কা সে অস্বীকার করে না। কিন্তু তার মতে, রোগভয়ে মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপন করা হাস্যকর ব্যাপার। কারণ দেখিয়ে সে বলে, মদ খেয়ে দু-চারটি অপমৃত্যু ঘটে সে ভয়ে মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপন করতে হলে, একটি পরিণয়-নিবারণী সভাও স্থাপন করতে হয়। কেননা, দু-চারটি বিয়ের ফলাফলও অত্যন্ত বিষময়।[২২৯] সে উল্টো বরং বিশ্বাস করে, পানাসক্ত ব্যক্তি হঠাৎ মদ ছেড়ে দিলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।[২৩০] সুরাপান নিবারণী সভার সদস্যদের নিমচাঁদ ভণ্ড বলে বিবেচনা করে। তার ধারণা এরা প্রকাশ্যে মদ্যপানবিরোধী কথা বললেও, গোপনে অকুণ্ঠচিত্তে মদের সেবা করে।[২৩১] আলালের ঘরের দুলাল নাটকেও নিবারণী সভার সদস্যদের এই ভণ্ডামির কথা বলা হয়েছে।

মতিলাল।...বাবা, মদের উপর ভারি চটা, এক কর্ম করা যাক আজ, কাল অনেকেই বই লিকচে, আমিও ড্রিংকিংয়ের বিরুদ্ধে একখানা বই লিখি, বাবা তা হলে ভারি খুসি হবেন, এ সময়ে মনটাও খুব খুলে গ্যাচে, নেশা হলে কলমটা খুব চলে। আর কোন সময় ...

গদাধর। মাথামুণ্ড আর কি লিখবে, আমরা যে নিজে এ কাজ কচ্চি।

মতিলাল। তা কল্লেমই বা ? এ রকম অনেকেই কোচেচ।

গদাধর। আজকাল অনেকেরই এই দশা হয়েচে, এদিকে ঢুক ২ করে মদ খাবেন, ওদিকে মদের বিপরীতে বই লিখবেন, কেবল ভণ্ডামির ব্যাপার বৈতো নয়?[২৩২]

সুরাপান নিবারণ সম্পর্কে কেউ প্রচার করলে, একদল যুবক যে তার সমালোচনা করতো—নাটকে এমন কথা বলা হয়েছে। ভূষণের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

গোটা কতক চ্যাংড়া ছোঁড়া এমনি গোঁড়া হয়েছে যে মদের নামে একটা বললে দশটা শুনিয়ে দেয়। তারা আবার সম্পাদক। ... খবরের কাগজে

২২৭. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৪৩।
২২৮. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ২৮৪।
২২৯. ঐ, পৃ. ২৮২-২৮৩।
২৩০. ঐ, পৃ. ২৮১।
২৩১. ঐ, পৃ. ২৮০।
২৩২. আলালের ঘরের দুলাল নাটক, পৃ. ৩৯-৪০।

লেখেন। দেখ আস্পর্দ্ধা কত, সুলভ সমাচার, হিন্দু পেট্রিয়টকে গালাগাল দিয়ে থাকেন…।[২৩৩]

এই বিরোধিতার চিত্র সুধাকর বিষময় নাটকেও অঙ্কিত হয়েছে। শান্তশীল এই বিরূপতা হেতুই দীর্ঘদিন লোকেন্দ্র, তেজেন্দ্র ইত্যাদির কাছে অভাজন বলে পরিচিত ছিলো। সুরাপান নিবারণে সরকারও যে প্রকারান্তরে বাধা দেয়, সে কালের এ জনপ্রিয় ধারণা নাটকেও লক্ষণীয়। ভূষণের মতে, মদের প্রসারে সরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহ আছে। সুতরাং মদের বিরুদ্ধে কিছু বলা ঠিক নয়।[২৩৪]

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে নাটকে মাধব ও তারকের সংলাপ থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়।

মাধব। বাপু, পূর্ব্বকালের রাজারা মদ্যপদিগের দণ্ড বিধান কত্তেন, ইংরেজ বাহাদুর এ বিষয়ে আরো প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছেন,···

তারক। রাজপুরুষের দোষ দিচেচন বৃথা। তাঁরা ত আর এমন কোনো নিয়ম করে দেন নাই, যে, যে মদ না খাবে, তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে?

মাধব। যদি কেউ মাতাব জালিয়ে বলে, আমি কিছু পতঙ্গদিগে বলছি না যে, তোরা এতে এসে পড়ে মর্, কিন্তু বাপু, তা বলে কি পতঙ্গদের প্রাণবধ দোষে সেই মাতাব জ্বালানোআলা দূষী হবে না?[২৩৫]

কিন্তু নাটকে দেখানো হয়েছে, সরকার মদ্যবিক্রয়ে উৎসাহ দিলেও কিংবা মাতালদের নিবারণী আন্দোলন-বিরোধী মনোভাব থাকলেও, নিবারণী আন্দোলন সমাজের উপর একটা সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এমন কি, এ প্রভাব মাতাল চরিত্রগুলির উপরও লক্ষ্য করা যায়।

নকুলেশ্বর এমনই পানাসক্ত যে, তার উদর একটি মদের সমুদ্রবিশেষ—'এক ঘড়া তুল্যেও কমে না, এক ঘড়া ঢাললেও বাড়ে না।'[২৩৬] কিন্তু সেও কখনো কখনো মদ ত্যাগ করার কথা চিন্তা করে। নিমচাঁদকে সে বলে, 'আমার সংস্কার হয়ে পড়েচে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখিয়ে মদ ছাড়তেম।'[২৩৭] পুনরায় সে বলে, 'এত ভাবি কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দেখিবা মাত্র প্রাণটা লাপিয়ে ওঠে।' নেশাক্রান্ত অবস্থায়ও তার মধ্যে পানাসক্তির

২৩৩. রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ নাটক, পৃ. ২৯।
২৩৪. ঐ, পৃ. ২৭-২৮।
২৩৫. ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ১৭।
২৩৬. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ২৮৪।
২৩৭. ঐ, পৃ. ২৮০।

অনিষ্টকারিতা বিষয়ক সচেতনতা অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়। সে বলে, "আমি ত কাজের বার হইচি; আমার জন্যে আমি বলি না, দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি,—।'[২৩৮]

তেজেন্দ্রও মদ্যপানের অবৈধতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। নিম্নের সংলাপ থেকে তার মনোভাব প্রকাশ পায়।

> কিন্তু কি করি ও অভ্যাস ছাড়তে পারিনে। আমি এখন বেশ জানতে পাচ্ছি যে আমার দুর্গতির একশেষ হয়েছে। যখন মন সুস্থ থাকে তখন এমনি গ্লানি হয় যে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি দেখতে পাচ্চি যে আমার বুদ্ধির লোপ হয়েছে, আমার দয়ামায়া মদে শুষে নিয়েছে, আমার মান সম্ভ্রম চলে গেছে, এখন ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইতে পারিনে।[২৩৯]

লীলাবতী নাটকে ভোলানাথ মদ খেতে স্বীকার করে, 'ছেলে মানুষে মদ না খায় সে ভাল।'[২৪০]

পানাসক্তির অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো মাতাল নিমচাঁদ দত্তও কখনো কখনো অনুতপ্ত হয় এবং তার অনুতাপের দাহ অন্য কারো চেয়েই ন্যূন নয়। নিমচাঁদের অনুতাপ স্বাভাবিক কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু তার অনুতাপ সমকালীন সমাজের নবলব্ধ পানাসক্তিবিরোধী সচেতনতারই প্রতীক। নিমচাঁদ স্বগতোক্তি করে :

> হা। জগদীশ্বর। (রোদন) আমি কি অপরাধ করিচি, আমাকে অধর্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্লে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেচেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদ্রিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাসেন. ... আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু শুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও

২৩৮. **সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন**, পৃ. ২৮১।
২৩৯. **সুধাকর বিষময়**, পৃ. ৮-৯।
২৪০. **লীলাবতী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন**, পৃ. ৪৭৭।

অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা। আমার নেশা হয়েচে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করচে, ··· মদ কি ছাড়ব ? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই ? সে কালে ভূতে পেত, এখন মদে পায়। —ডাক ওঝা, ডাক ওঝা, ঝাড়িয়ে আমার মদ ছাড়িয়ে দেক।[২৪১]

পানাসক্তি-বিরোধী সচেতনতা পাঁড় মাতালদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছাড়াতে পেরে থাকুক অথবা না-ই পেরে থাকুক, অন্তত সমাজবিবেককে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত করেছিলো এবং তার প্রভাব নিমচাঁদের মতো শক্তপ্রাণ মাতালের অন্তরেও পড়েছিলো—বর্তমান সংলাপ থেকে এটা অনুমান করা যায়।

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, মদ্যপানই নয়, সেকালে অনেকে গাঁজা, আফিম, চরস, গুলি ইত্যাদির নেশাও করতেন।[২৪২] বাংলা নাট্যরচনায়ও এর স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। নেশাখুরি কি ঝকমারি নাটকে পানাসক্ত যে যুবকদের দেখতে পাই, তারা আফিম, গুলি, গাঁজা ইত্যাদির প্রতিও আসক্ত। দলভঞ্জন নাটকে মধুসূদন, কান্তি, নীলকণ্ঠ, অম্বিকা, ভূতনাথ ইত্যাদি যে যুবকবৃন্দকে প্রত্যক্ষ করি তারা আদৌ মদে আসক্ত নয়, তাদের আকর্ষণ গাঁজা-গুলিতে। মধু একদিন দীর্ঘক্ষণ গাঁজা সেবন করতে না পেরে শেষে যখন আড্ডায় গিয়ে পেঁৗছে তখন দূর থেকে গাঁজা গুলির ধূম দেখে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করে, 'আঃ। বাঁচলুম, ধড়ে প্রাণটা এলো।'[২৪৩] 'প্রাণ বাঁচার' অন্য একটি দৃষ্টান্ত এ নাটকেই দেখতে পাই। পূর্বোক্ত যুবকগণ পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে একদিন নেশা করতে না পেরে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে, রামরত্নের ভাষায় 'ছোঁড়াগুলোর পেট ফেঁপে ঢোল সমুদ্দুর হয়্যে উঠেছে।' একজন গিয়ে দোকান থেকে তাদের খানিকটা গাঁজা এনে দেয়, 'তবে তাদের চৈতন্য হয়।' তা না হলে 'রাত্তিরের মধ্যেই পেট ফুলে' হয়তো মরে যেতো।[২৪৪] ফালতো ঝকড়া নাটকে কানা-সুন্দর কেবল মদ নয়, চাটের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[২৪৫]

বস্তুত গাঁজা, গুলি, আফিমের নেশাও মদের নেশার চেয়ে কিছু কম তীব্র নয়। নেশাখুরি কি ঝকমারিতে দেখি একটি গুলিখোর যুবক যথাসময়ে গুলি সেবন করতে

২৪১. **সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন,** পৃ. ৩৫২-৫৩।

২৪২. পূর্বে পৃ. ১৪০-৪১।

২৪৩. **দলভঞ্জন নাটক,** পৃ. ৯।

২৪৪. ঐ, পৃ. ৭১।

২৪৫. **ফালতো ঝকড়া,** পৃ. ২-৩

না পারায় তার 'চক্ষু দিয়ে জল এসে, আই ঢাই করিতেছে প্রাণ।'[২৪৬] মাধব গুলি-খোরের মতে, 'একটা ছিটে টানলে পরে চতুর্বর্গের ফল' পাওয়া যায়, 'দুই পুরিয়া'য় অমর হওয়া যায়। তার বন্ধুর মতে, গাঁজায়ও চতুর্বর্গের ফল পাওয়া যায়।[২৪৭]

এসব নেশার ফলে দারুণ স্বাস্থ্যহানি হতো নাট্যকার সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। গুলিখোরদের 'কার পেট ঢাকাই জালা, রোগা ২ হাতগুলা, কালিপড়া কাহার চক্ষেতে।' 'বেটাদের পোঁদে ট্যানা' অথচ তারা বাবুয়ানার নামে নেশা করে,[২৪৮] নাট্যকার এ কথা বলে পাঠকদের মনে এদের সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক করতে চেয়েছেন।

২৪৬. নেশাখুরি কি ঝকমারি, পৃ. ১৬।
২৪৭. ঐ, পৃ. ১৭-১৮।
২৪৮. ঐ, পৃ. ১৭-১৮।

স্থিতিশীল ও শোভন সমাজের জন্যে আন্দোলন ঃ লাম্পট্য ও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বিবাহ-অতিরিক্ত যৌন-সম্ভোগের রীতি মানব-সমাজের আদিম সমস্যা। বঙ্গদেশও এ বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রম নয়। প্রাক-মুসলিম বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তখনকার যৌননীতি মোটেই নিষ্কলুষ ছিলো না। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গীয় সমাজের নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে যে চিত্র রেখে গেছেন, তা থেকে মনে হয় নাগরিক জীবনে তখন বারাঙ্গনা, দেবদাসী ও পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিলো। বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় যুবক-যুবতীর কামলীলার কথা এবং বঙ্গদেশীয় রাজান্তঃপুরের মহিলাদের রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কামষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[১] স্মৃতিকার বৃহস্পতি, ধোয়ী প্রভৃতি অনেকেই সে সমাজের যৌন দুর্নীতির কথা ব্যক্ত করেছেন।[২] কাম চরিতার্থ করার জন্যে দাসী রাখার রীতিও এ সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিলো বলে জানা যায়।[৩] এ ছাড়া মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে পরিচারিকা রেখে আসলে তাদের যৌনকর্মে ব্যবহার করার প্রথাও প্রচলিত ছিলো।[৪] সেকালের সাহিত্যে এই পরিচারিকা বা সেবাদাসীদের দেব-বারবণিতা বা বারবামা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] দাসীদের চেয়ে একটু উন্নত মানের রক্ষিতা রাখার রীতিও তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।[৬]

মনে হয়, সমাজের নীচের তলায়ও বিবাহ অতিরিক্ত যৌনাচার বেশ ব্যাপকভাবে চালু ছিলো। চর্যাপদে যে ডোম্বীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাঁকে সতী নারী আদৌ বলা যায় না। বরং মনে হয়, এ জাতীয় নৃত্যগীতে পারদর্শিনী শূদ্রাগণ সমাজের উচ্চ

১. S. C. Upadhyaya (tr.) **Kama Sutra of Vatsayana** (Reprint; Bombay, 1963), p. 200.

২. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, পৃ. ৫৬০।

৩. **History of Bengal**, I, 618; নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, পৃ. ৫৬০।

৪. **History of Bengal**, I, 619; K. M. Ashraf, p. 320.

৫. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, পৃ. ৫৬১।

৬. **History of Bengal**, I, 618, 619.

কোটির পুরুষদেরও ভোগে ব্যবহৃত হতো।[৭] সেকালে ব্রাহ্মণরা শূদ্র স্ত্রীর সঙ্গে যৌনকর্ম করে ধরা পড়লে যৎকিঞ্চিৎ জরিমানা দিতে বাধ্য হতেন।[৮] এ থেকেও বোঝা যায়, উচচ শ্রেণীর পুরুষদের শূদ্রাগমন কিছু বিরল ঘটনা নয়।

মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর সমাজের এই যৌনাচার অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়নি বা হ্রাসও পায়নি। বরং মনে হয়, কমবেশি একই রকমের ছিলো। মুসলমান নরপতি-গণ কঠোর হস্তে পতিতাবৃত্তি দমন করেননি। উল্টো আকবরের মতো সম্রাট বারাঙ্গনাদের এক ধরনের রেজিস্ট্রেশন ও তাদের বসবাসের জন্যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল নির্ধারিত করে দেন।[৯] আলাউদ্দীন খিলজীর সময় বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্য ছিলো মেয়েরা—এমন কথাও শোনা যায়।[১০] মুসলিম আমলের বঙ্গদেশে পূর্ববর্তী যুগের মতোই পতিতাবৃত্তি ও যৌনাচার বহাল থাকে। এ সময় নিতান্ত স্বল্পমূল্যে দাসী বিক্রয় হতো এবং এ থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, কাম চরিতার্থ করা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে আদৌ কষ্টকর ছিলো না।[১১] এই যুগে বড়ো কোনো ভোজের পর অতিথিদের সুন্দরী বেশ্যা উপহার দেওয়া ছিলো আতিথ্যের আবশ্যিক অঙ্গ। না দিলে অখ্যাতি হতো।[১২] শোনা যায় সরফরাজ খানের হেরেমে নাকি ১৫০০ দাসী অর্থাৎ বেশ্যা ছিলো। সিরাজ উদ্দৌলার ৫০০। ইসলাম খান এবং শাহমৎ জঙ্গের হেরেমে অনেক সুন্দরী গায়িকা, নর্তকী ও দাসী ছিলো।[১৩]

মুসলিম শাসন কালে ধর্ম সাধনার নামে তান্ত্রিকদের মধ্যে পঞ্চ ম-কারের বেশ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেবল পূর্ববঙ্গে নয়, সমস্ত গৌড়, দক্ষিণ রাঢ় ও অন্যান্য অঞ্চলেও তান্ত্রিকদের 'কুলাচার' রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১৪] এই রীতি অনুসারে ধর্মের নামেই তান্ত্রিকগণ মদ, মাংস এবং পরনারী উপভোগ করতে সমর্থ হতেন।

৭. দ্রষ্টব্য: মনীন্দ্রমোহন বসু, **চর্যাপদ**, পদসংখ্যা ১৮ (কাহ্নুপাদ রচিত), পৃ. ৬৮-৬৯।

৮. **History of Bengal**, I, 618.

৯. K M. Ashraf, p. 320; বঙ্গদেশ সরকারও এই আইনগুলি মেনে নেয়। T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, pp. 169-70.

১০. K. M. Ashraf, p. 320.

১১. T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, pp. 167-68.

১২. **Ibid.**, p. 206.

১৩. M. A. Rahim, II, 151-52.

১৪. T. Raychaudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, p. 132.

ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর নগরের বিশেষত কলকাতার বিকাশ আরম্ভ হয় দ্রুত গতিতে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, এক শ্রেণীর লোকেরা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে বা নগর জীবনের অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবাধাদি গ্রহণ করার জন্যে পরিবার পরিজনকে গ্রামের বাড়িতে রেখে এসে কলকাতা ও অন্যান্য মফস্বল শহরগুলিতে বাসা বাঁধেন। এর ফলে লাম্পট্য এবং তার সহচর হিশেবে পানাসক্তি উভয়ই প্রশ্রয় পায়।[১৫] এ সময়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতাবশত 'প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।'[১৬] এভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি ও বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনাচার বৃদ্ধি পায়।[১৭] আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, এই পরিবেশে বেশ্যাগমন প্রায় নির্দোষ কর্ম বলে বিবেচিত হয়।[১৮]

বেশ্যাগমন যে কতখানি নির্দোষ কর্ম বলে গণ্য হতো, সমকালীন দুটি প্রমাণ থেকে তা অনুমান করা যাবে। এ সময়কার বেশ্যাগামীরা—

> অন্য অন্য কুকর্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না--আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জাবোধ করে না।[১৯]

আর এ সময়কার অভিজাত ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দুর্গাপূজা এবং ভোজ উপলক্ষে গান ও নাচ জানা বেশ্যা অর্থাৎ বাইজিদের অবশ্যই নিয়ে আসতেন। ধনী বাবুরাও অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুকরণে বেশ্যাদের নিয়ে বাগানবাড়িতে সবান্ধবে ফুর্তি করতেন। বাগানবাড়িতে বন্ধুদের জন্য বেশ্যা-নাচ ও ভোজনের আয়োজন করা বাবুদের অতি প্রিয় 'হবি' ছিলো এবং এর ফলে সামাজিক মান মর্যদা বৃদ্ধি পেতো।[২০] বিবাহ অনুষ্ঠানেও ভোজ ও বাই-নাচ, মদ ও মাংসের ব্যবস্থা হতো।[২১]

১৫. পূর্বে, পৃ. ৩৩৯-৪০।

১৬. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্ম-জীবনচরিত', **সাহিত্য**, পৃ. ৪৮০।

১৭. T. Raychaudhuri, 'Norms of Family Life and Personal Morality etc.', pp. 22-23.

১৮. পূর্বে. পৃ. ৩৩৯-৪১।

১৯. অক্ষয়কুমার দত্ত. 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা', পৃ. ৩১৩।

২০. দ্রষ্টব্য : **সমাচার দর্পণ**, ২২ ফেব্রুআরি ১৮৩১, ৫ নভেম্বর ১৮৩১, ১৯ অক্টোবর ১৮৩৩, ২৬ অক্টোবর ১৮৩৯, **সসেক** ২ পৃ. ২৬৩-৬৬, ২৮৬-৮৭, ৫২৩-২৪ ; **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, পৃ. ৫৬-৫৭ ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **নববাবুবিলাস**, পৃ. ২৬-২৭, ৩২-৩৬।

২১. পূর্ববর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, পৃ. ২১৬-১৯।

স্নানযাত্রা কি দোলযাত্রার নামেও এমনি অমিতাচারের অনুষ্ঠান হতো। 'ধর্মের নামে ভাগীরথীর স্রোতে সুচিত্র শোভনতম তরণীকে ভাসমান করিয়া সুবেশা বারাঙ্গনাগণ সঙ্গে মাদক মদে উন্মত্ত হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার সংযুক্ত উল্লাস কোলাহল দ্বারা জলকল্লোলধ্বনিকে অতিক্রমণপূর্বক অশেষ প্রকার নির্লজ্জ ব্যবহার' করার কথা অক্ষয়কুমার দত্ত ক্ষোভের সঙ্গে বর্ণনা করেন।[২২] সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায়ও একই সময়ে অনুরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেমটা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহী বাবুরা নর্তকীদের নিতম্বের পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভদ্রসন্তানগণ করিতে পারেন না...।[২৩]

এসব টুকরো টুকরো চিত্র থেকে আমরা সেকালের কলকাতা তথা বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। সত্যি সত্যি আলোচ্যকালে বিত্তবান নাগরিকদের মধ্যে বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনাচার শোভন সীমাকে অতিক্রম করেছিলো।

ধনী ও সচ্ছল লোকের বাড়িতে বেশ্যাসক্তি এতো স্বাভাবিক বলে গৃহীত হয়েছিলো যে, কনিষ্ঠদের অথবা সন্তানদের বেশ্যাবাবদ খরচপত্রের জন্যে খাজাঞ্চিখানাতে 'স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার কর্তার কাছ থেকে থাকতো'।[২৪] এমন কি পুত্র পিতার রক্ষিতার কাছে পিতার অনুমতি নিয়ে গমন করতে পারতো বলে শোনা যায়।[২৫] এসব থেকে মনে হয়, অক্ষয়কুমার সেকালের কলকাতাকে যে লাম্পট্য বিদ্যার পাঠশালা বলে অভিহিত করেছেন, তা মোটেই অসঙ্গত নয়।[২৬]

কলকাতার বাইরে মফস্বল শহরগুলিতেও কলকাতার আদর্শই কমবেশি অনুসৃত হতে থাকে। মদ্যপান ও ব্যাপক বেশ্যাগমন কৃষ্ণনগরে কীরূপ জনপ্রিয় হয়েছিলো দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের রচনায় তার স্বাক্ষর আছে।[২৭] কৃষ্ণকুমার মিত্র ময়মনসিংহের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, স্ত্রীকে কর্মস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রথা নিন্দনীয় হওয়ায়, ১৮৬০ এর দশকেও সেখানে বেশ্যাগমন প্রায় নির্দোষ কর্ম

২২. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, কার্তিক ১৭৬৯ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৪৭), পৃ. ১০২।

২৩. **সম্বাদ ভাস্কর**, ২৭২ সংখ্যা, ১৮৪৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ১২৩।

২৪. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী**, পৃ. ৯৯।

২৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ আশ্বিন ১৭৬৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৪৫), পৃ. ২১৭; 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা', তত্ত্বপ, পৃ. ৩১৩।

২৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্বপ, ১ আশ্বিন ১৭৬৭, পৃ. ২১৭।

২৭. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্ম-জীবনচরিত', **সাহিত্য**, পৃ. ৪৭৯-৮০।

বলে গণ্য হতো। দোলের দিনে যুবকবৃন্দ অনেকেই প্রকাশ্যভাবে পতিতাদের বাড়ি গিয়ে হোলি খেলতেন। ছাত্ররাও বেশ্যাবাড়ি গিয়ে তাদের গায়ে আবীর মাখিয়ে দিয়ে আমোদ করতো। ভদ্রলোকেরা বাইনাচ ও খেমটা নাচ দেখাকে আদৌ অন্যায় মনে করতেন না।[২৮]

বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনাচার কেবল বেশ্যাদের নিয়েই চলতো, এমন নয়। মনে হয়, পারিবারিক জীবনকেও এই দোষ যথেষ্ট আচ্ছন্ন করেছিলো। আমরা লক্ষ্য করেছি, সেকালের বিধবা, কুলীন স্ত্রী ও কুলীন কন্যাদের মধ্যে ব্যাপক ব্যভিচার প্রচলিত ছিলো। অনুমান হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গেই এই ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হতো।[২৯] সমাজের অনেক প্রধান ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিলেন, সমকালীন সংবাদপত্রে এমন মন্তব্য করা হয়েছে।[৩০] ধনী পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সকল সদস্যের মধ্যে ব্যভিচারের আশ্চর্যজনক চিত্র সেকালের পত্রিকায় অঙ্কিত হয়েছে। ১৮৩১ সালের ৫ নভেম্বর তারিখের *সুধাকর* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে বলা হয় যে, এক ব্রাহ্মণ সন্তান কলকাতার ধনী এক পরিবারে অতিথি হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি দেখতে পান যে, ঐ বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা এবং পরে ক্রমে ক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র বাড়ি থেকে একে একে বেরিয়ে যান। অন্য দিকে বাড়ির দুজন দারোয়ান ও কোনো কোনো চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করে রাত কাটায়। কর্তা ও পুত্রগণ রাত শেষে বাড়িতে ফিরে আসেন, দারোয়ান ও ভৃত্যগণও অন্দর মহল ত্যাগ করে বাইরে যায়।[৩১] এই চিত্র যে অতিরিক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চিত্রের চেয়েও বিস্ময়কর সম্পাদকের মন্তব্য। তিনি বলেন যে, এরূপ রীতি রাজধানীতে প্রচলিত আছে শুনে অনেকেই অবাক হবেন না।[৩২]---এ থেকে মনে হয়, সমাজের একটা অংশ লাম্পট্য ও ব্যভিচারকে একান্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিলো।

সমাজের মনোভাব এমন অনুকূল ছিলো যে, বেশ্যাদের সামাজিক স্ট্যাটাস তখন রীতিমতো অসাধারণ ছিলো বললে অত্যুক্তি হয় না। আমরা দেখেছি, তখন খ্যাতি অর্জন করতে হলে মহিলাদের হয় জমিদার নয়তো সুন্দরী বেশ্যা হতে হতো।[৩৩]

২৮. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, পৃ. ৪৮-৫০।
২৯. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, পৃ. ৯৫।
৩০. সমাচার দর্পণ, ১৪ এপ্রিল ১৮৩২, সসেক ২, পৃ. ২৬৭-৬৮।
৩১. সমাচার দর্পণ-এ উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ. ২৪৭।
৩২. ঐ, পৃ. ২৪৮।
৩৩. পূর্বে, সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একমাত্র মুসলমান বেশ্যার কাছে যাওয়াই বোধহয় সমাজের চোখে দূষণীয় বলে গণ্য হতো। কারণ তাতে একই সঙ্গে অন্যায় যৌন-সম্ভোগ ও জাতিভ্রষ্টজনিত অপরাধ হতো। কিন্তু ১৮২০-৩০-৪০ এর দশকের প্রসিদ্ধ বেশ্যারা ছিলেন অধিকাংশ মুসলমান।[৩৪] এবং এঁদের চাহিদাই ছিলো বেশী। মুসলমান বেশ্যাদের সম্পর্কে নববাবুবিলাসে বলা হয়েছে, 'যদি বল যবনী বেশ্যাগমন করিব ইহাতে পাপ হইবেক তাহা কদাচ মনে করিবা না।' কারণ 'তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।'[৩৫] এই উক্তি দিয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বোঝাতে চান, তা হলো বেশ্যাসক্তি তৎকালীন সমাজে এতোই প্রচলিত ছিলো যে যবনী গমনেও 'বাবু'-রা সংকোচ বোধ করতেন না।

লাম্পট্য ও বেশ্যাসক্তি সম্পর্কে সচেতনতা

১৮৩০-১৮৪০ এর দশকে থেকে ব্যভিচারের এই বিপুল স্রোতের বিরুদ্ধে অন্তঃসলিলার মতো একটি বিপরীত স্রোতও প্রবাহিত হতে থাকে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, হিন্দ কলেজে শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের যুবকগণ পানাসক্ত হন, কিন্তু যৌনাচার সম্পর্কে তাঁদের ভিন্নতর মনোভাব ছিলো।[৩৬] এঁরা রক্ষণশীল সমাজের ভণ্ডামি ও লাম্পট্য বিষয়ে সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন।[৩৭] কিন্তু তখনো বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্য এতোই বহুলভাবে প্রচলিত যে, ইয়ং বেঙ্গলদের ক্ষীণ বক্তব্য প্রায় অশ্রুত থেকে যায়। তা ছাড়া, সর্বসাধারণের সঙ্গে এঁদের দুস্তর সামাজিক বাধাও এঁদের অন্যান্য বক্তব্যের মতো এ বক্তব্যকে সংকীর্ণ একটি পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।[৩৮]

বরং ১৮৪০ ও ১৮৫০ এর দশকে বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত, সম্বাদ ভাস্করে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সর্বশুভকরী পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সমলেচানা করেন, তা তুলনামূলকভাবে একটি ব্যাপকতর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। বিশেষত অক্ষয়কুমারের নাম বর্তমান প্রসঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য।

৩৪. পূর্বে সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বিখ্যাত বেশ্যাদের নাম থেকেই তাদের ধর্মীয় পরিচয় পাওয়া যায়—নান্নিজান, মুন্নিজান, বেলাতি খানুম, সুপনজান, বকনা পিয়ারী, কোঁকড়া পিয়ারী ও নিকি মুসলমান ছিলেন।

৩৫. **নববাবুবিলাস**, পৃ. ২৩।

৩৬. পূর্বে, সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭. বিশেষত বাবুরা যে পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে নাচ ও ভোজের নামে আসলে লাম্পট্যকেই প্রশ্রয় দিতেন—এটাই এঁরা দেখিয়ে দেন। **সমাচার দর্পণ**, ৫ নভেম্বর ১৮৩১, সসেক ২, ২৬৫-৬৬।

৩৮. পর্বে, পৃ. ২৬৯।

তিনি লাম্পট্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মসীযুদ্ধ পরিচালনা করেন।[৩৯] তাঁর মতে লাম্পট্যের ফলে পারিবারিক স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। এর প্রভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়; দারিদ্র্য ও ব্যাধির মুখে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হয় এবং সমাজের শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বিঘ্নিত হয়।[৪০] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুরা বলেন, 'সুরাপান ও লাম্পট্য বুদ্ধিজীবী জীবের কার্য নহে একান্ত পশুধর্মাক্রান্ত না হইলে তাদৃশ কুৎসীত বিষয়ে রত হয় না।'[৪১]

১৮৪০ ও ১৮৫০ এর দশকে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শোভনতার খাতিরে বেশ্যাদের ভদ্রপাড়া থেকে বহিষ্কৃত করে স্বতন্ত্র পল্লীতে স্থান দেওয়ার জন্যেও কেউ কেউ দাবি উত্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে এ দাবি জানান।[৪২] কালীপ্রসন্ন সিংহ বিষয়টি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থাপক সভায় একটি আবেদন প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪৩]

আলোচ্য দু দশকের লাম্পট্য সম্পর্কিত সচেতনতার উন্মেষ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এ কথাটা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন, অক্ষয়কুমারের মতো সমাজ-সংস্কারক এটা উপলব্ধি করেন যে, নারী-স্বাধীনতাবর্জিত সমাজে লাম্পট্যের জন্যে দায়ী পুরুষরা, মেয়েরা নয়। তুলনামূলক বিচারে তিনি পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন।[৪৪]

কিন্তু ১৮৫০ এর দশক নাগাদ লাম্পট্যবিরোধী সচেতনতার উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও সমাজে সত্যি সত্যি লাম্পট্য বা বেশ্যাসক্তি যে হ্রাস পেয়েছিলো এমন মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। এক. ১৮৫০ এর দশকে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে সমাজ এতো ব্যাপৃত ছিলো যে, লাম্পট্যবিরোধী সচেতনতা আর-একটি স্বতন্ত্র আন্দোলনের রূপ

৩৯. **তত্ত্বপ,** ১ ভাদ্র ১৭৬৬ (অগস্ট ১৮৪৪), পৃ. ৯৭-৯৮; ১ কার্তিক ১৭৬৬ (অক্টোবর ১৮৪৪), পৃ. ১১৮; ১ পৌষ ১৭৬৬ (ডিসেম্বর ১৮৪৪), পৃ. ১৩৪; ১ শ্রাবণ ১৭৬৭ (জুলাই ১৮৪৫), পৃ. ১৯৮; ১ ভাদ্র ১৭৬৭ (অগস্ট ১৮৪৫), পৃ. ২০৫-০৬; ১ আশ্বিন ১৭৬৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৪৫), পৃ. ২১৭; ১ কার্তিক ১৭৬৭ (অক্টোবর ১৮৪৫), পৃ. ২২৯; ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), পৃ. ৩১১, ৩১৩, ৩১৫; ১ কার্তিক ১৭৬৯ (অক্টোবর ১৮৪৭), পৃ. ১০১-০২; ভাদ্র ১৭৭১ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪৯), পৃ. ৮৪; **ধর্মনীতি,** পৃ. ৯৩, ৯৮।

৪০. **ধর্মনীতি,** যত্রতত্র।

৪১. 'সর্বশুভকরী পত্রিকার উদ্দেশ্য', **সর্বশুভকরী পত্রিকা,** অক্টোবর ১৮৫০, **সাবাস ৩,** পৃ. ৫৩৪।

৪২. **তত্ত্বপ,** ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ (জুলাই ১৮৪৬), পৃ. ৩১৫।

৪৩. **সংবাদ প্রভাকর,** ২৩ মে ১৮৫৮, **সাবাস ১,** পৃ. ৪৮২।

৪৪. পূর্বে, পৃ. ২৬৯।

লাভ করেনি। দুই. ১৮৩০ ও ১৮৪০ এর দশকের তুলনায় ব্যাপকতর পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লেও ১৮৫০ এর দশকের লাম্পট্যবিরোধী ও সমাজের অতি নিম্ন নৈতিকমান সম্পর্কিত সচেতনতা তখনো ক্ষুদ্র একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এই সচেতনতার স্বাক্ষর এ সময়ে যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি তাঁরা হয় ব্রাহ্ম, নয়তো ব্রাহ্ম প্রভাবিত।[৪৫]

১৮৬০ ও ১৮৭০ এর দশকে এই সচেতনতা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিকীর্ণ হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুসারিগণ—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ এই মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। এ সময়ে ব্রাহ্মগণ অনেকে এতো পিউরিটান হয়ে পড়েন যে, তাঁরা বেশ্যাদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে, একটি ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন।[৪৬] এবং এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ব্রাহ্মদের এই আন্দোলন সমাজের নৈতিক আদর্শের মান যথেষ্ট উন্নত করে। বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনাচারের প্রতি ঘৃণা বস্তুত ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবজাত।[৪৭] ব্যক্তি হিশেবে বেশ্যাদের ঘৃণা করার মানসিকতাও এই প্রভাবজাত।

এ আন্দোলনের ফলে সমাজমানস কতোটা প্রভাবিত হয় ১৮৩০ ও ১৮৭০ এর দশকের দুটি ঘটনার তুলনামূলক একটি আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হতে পারে। ১৮৩০ এর দশকের কলকাতায় নবীন বসুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর "নাটকের" অভিনয় হয়। এই নাটকে স্ত্রী চরিত্রগুলির অভিনয় মেয়েরাই করেন। বিদ্যার ভূমিকায় ছিলেন রাধামণি। তাঁর অভিনয় খুবই সুন্দর হয়। এই অভিনয়ের সমালোচনা করে এক ভদ্রলোক পত্রিকায় রাধামণির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৪৮] রাধামণি

৪৫. এই ব্যক্তিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত রীতিমতো দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র পুরোপুরি ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু তত্ত্বোধিনী সভার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও প্যারীচাঁদ এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যে নিয়মিত অর্থ সাহায্যও করেন। রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্মও ছিলেন না, তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যও ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মগণ তাঁকে ব্রাহ্ম বলে দাবি করতেন এবং তিনি সত্যিই বহু ব্রাহ্মের চেয়ে আদর্শের দিক দিয়ে বেশি ব্রাহ্ম ছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এক কালে ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম না থাকলেও ব্রাহ্ম নৈতিক আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

৪৬. B. C. Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 251, 299-300. বিশেষত বেশ্যা বলে অভিনেত্রীদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদের এই দারুণ বিদ্বেষদৃষ্টে বিপিনচন্দ্র পাল এ মন্তব্য করেন।

৪৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী**, পৃ. ৯৬।

৪৮. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

বারনারী ছিলেন কিন্তু সমালোচক সে কারণে তাঁর নিন্দা করেননি, বরং তাঁর অভিনয় কলার প্রশংসা করে ভদ্র স্ত্রীদের মূর্খতারই নিন্দা করেন।[৪৯]

অপর পক্ষে, ১৮৭০ এর দশকে যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়,[৫০] তখন সমাজ তার প্রতি দারুণ ধিক্কার উচ্চারণ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মধ্যে মধ্যে নাটক দেখতেন, তিনি অতঃপর আর রঙ্গমঞ্চে গমন করেননি।[৫১] নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, 'অভিনয় দেখা আমার বাতিক। বর্তমান বঙ্গরঙ্গভূমিসকলে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল, সেদিন হইতে আমার অন্তর্ধান।'[৫২] বেশ্যা তথা অভিনেত্রী-বিরোধী মনোভাব এই দশকে কতো তীব্র হয়ে ওঠে, মনোমোহন বসুর উক্তি থেকেও তা বোঝা যায়। তিনি বলেন :

> ভদ্রযুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়?··· ইহা অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এদেশে নাটকাভিনয় রূপ সুখদৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তি সাধক ধর্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃসমাজ অবলম্বন না করেন।[৫৩]

লর্ড লীটন এই সময়ে একবার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের' অভিনয় দেখতে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যান। এতে ব্রাহ্মদের *Mirror* পত্রিকা মন্তব্য করে যে, যেখানে বারাঙ্গনা-গণ অভিনয় করে সেখানে দেশের গভর্নর জেনারেলের উপস্থিতি দুর্নীতির উৎসাহ জোগায়।[৫৪] সোমপ্রকাশ পত্রিকা অভিনেত্রীদের 'নরকের কীটতুল্য ঘৃণিত বেশ্যা', 'কুলটা' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করে।[৫৫] অভিনেত্রী তথা বেশ্যা-

৪৯. **Hindu Pioneer**, 22 Oct. 1835, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, **রহস্য সন্দর্ভ**-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৮-৯।

৫০. এ রকম অভিনয় আরম্ভ ১৮৭৩ সালের অগাস্ট মাসে। পূর্বে, দ্রষ্টব্য।

৫১. ইন্দ্রমিত্র, **সাজঘর**, পৃ. ৪০।

৫২. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৯০।

৫৩ মনোমোহন বসু, 'জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতা', **মধ্যস্থ**, পৌষ ১২৮০ (ডিসেম্বর ১৮৭৩-জানুয়ারি ১৮৭৪), পৃ. ৬২৩।

৫৪. 'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা', **আর্যদর্শন**, ভাদ্র ১২৮৪, পৃ. ২২৬।

৫৫. **সোমপ্রকাশ**, ১৯ ফাল্গুন ১২৮০ ও ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ (মার্চ ১৮৭৪ ও মে ১৮৮২), **সাবাস ৪**, পৃ. ৬৮৭, ৬২০।

বিরোধী ১৮৭০ এর দশকের এই আন্দোলন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, এই বিরোধিতার প্রায় সবটাই ছিলো ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত পিউরিটান আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ।[৫৬] সমাজের নৈতিকতার নামে ব্রাহ্মসমাজ বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই নতুন বিকাশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানায় এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বেশ্যা-অভিনেত্রী-অভিনীত নাটক দেখাকে পাপের কাজ বলে গণ্য করেন।[৫৭]

ব্রাহ্মদের এই মনোভাব গোঁড়ামিপূর্ণ— এমন মন্তব্য করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। আসলে লাম্পট্য ও ব্যভিচারের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরূপতা তাঁদের মনোভাবকে এক চরম অবস্থা থেকে অন্য এক চরম অবস্থায় উপনীত করে। এজন্যেই তাঁরা পাপকে ঘৃণা করতে গিয়ে, পাপীকেও ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী,[৫৮] দুর্গামোহন দাস[৫৯] প্রমুখ বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি বেশ্যাকে উদ্ধার করলেও, ব্রাহ্ম-সমাজ বেশ্যাদের উদ্ধার করার তেমন কোনো প্রয়াস চালায়নি।

১৮৫০ এর দশকের বিদ্যাসুন্দর "নাটকের" সমালোচক ও ১৮৭০ এর দশকের ব্রাহ্ম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিচার করলেই বেশ্যাদের প্রতি সমাজের মনোভাবের পরিবর্তন অনুমান করা যায়।

তবে সাধারণ মানুষের মনোভাব ১৮৭০ এর দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মদের মতো অতোটা প্রতিকূল হয়নি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা এবং ছাত্ররা তখনো অনেকে নিয়মিত বেশ্যালয়ে যেতেন—এমন কথা জানা যায়।[৬০] রাজনারায়ণ বসুর মতে তখন বেশ্যাগমন আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। স্কুলের ছাত্ররাও কেউ কেউ তখন বেশ্যাসক্ত হয়ে পড়েন।[৬১]

কিন্তু এ সময়ে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি মানুষের মনোভাবে। তাঁরা বেশ্যালয়ে গেলেও সমাজ এটা প্রতিকূল দৃষ্টিতে দেখছে মনে করে গোপনেই সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। আগে বাবুগিরির অঙ্গহিশেবে লোকেরা প্রকাশ্যে বেশ্যা রাখতেন, অপর পক্ষে এখন বেশ্যা রাখলেও সেটা আর গর্বের বিষয় বলে পরিগণিত হতো না।[৬২]

দুর্গাপূজা ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে আগের মতো মদ, বাইজি, নর্তকীর আর তেমন প্রাদুর্ভাব হতো না—অন্তত প্রকাশ্যে তো নয়ই। ১৮৪০ এর দশকে

৫৬. B. C. Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 251.
৫৭. Ibid., I, 299.
৫৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ১২২-২৩, ১৩৪-৩৬।
৫৯. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, **জীবনালেখ্য**, পৃ. ৪৭-৫৯।
৬০. 'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা', **আর্যদর্শন**, ভাদ্র ১২৮৪, পৃ. ২৩০।
৬১. রাজনারায়ণ বসু, **সেকাল আর একাল**, পৃ. ৬৭।
৬২. ঐ, পৃ. ৬৬।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে যৌনাচারের স্রোত প্রবাহিত হতো বলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়।[৬৩] কিন্তু ১৮৭০ এর দশকে এ বিষয়ের উল্লেখ পূর্বের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য।[৬৪] স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষেও পূর্বের চেয়ে কম অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। এ থেকে মনে হয়, অনাচার প্রচলিত থাকলেও, ১৮৬০ ও ১৮৭০ এর দশকে সমাজে একটা শোভনতা ও শ্লীলতার মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এই মূল্যবোধ এতোটা পিউরিটান মনোভাবের জন্ম দেয় যে, এ সময়ে ব্রাহ্ম ও দেশীয় খৃস্টানদের উদ্যোগে কলকাতা নগরীতে একটি 'অশ্লীলতা নিবারণী সভা'ও গঠিত হয়।[৬৫] এই সভা বাস্তবজীবন থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত অশ্লীলতা—সব কিছুই নিবারণের প্রয়াস পায়।[৬৬] সমাজের একাংশের প্রবণতা কোন মুখে চালিত হচ্ছিলো, তা এ সব ক্রিয়াকর্ম থেকে অনুমান করা যায়।

সমাজের অন্য একটি অংশের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে দেখি তা ব্রাহ্মদের পিউরিটান এবং সাধারণ মানুষের গোপনে লাম্পট্য সুখ ভোগের ইচ্ছা—উভয় মনোভাব থেকেই ভিন্ন ছিলো। বেশ্যাদের ঘৃণা করার পরিবর্তে তাদের উদ্ধার করার মানবিক সংকল্প ছিলো এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের। এঁরা বেশ্যাসক্তিকে ঘৃণা করলেও, বেশ্যাদের মানবিক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের পবিত্রতা বোধের দ্বারা উদ্‌বোধিত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তথাপি তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি যে কটি বারনারীর বর্ণনা দেন, তারা সকলেই তাঁর সহানুভূতিতে অভিষিক্ত।[৬৭] একটি বারনারীর চিত্র এর মধ্যে আবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর গর্ভে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের এক নিকটস্থ জ্ঞাতির একটি সন্তান জন্মে। এই নারী সন্তানটিকে দেখিয়ে কার্তিকেয়কে বলে, 'যদি আঁস্তাকুড়ে কোন আঁটি পড়ে ও তাহা

৬৩. তত্ত্বপ, ১ কার্তিক ১৭৬৬ (অক্টোবর ১৮৪৪), ১১৭-১৮; ১ কার্তিক ১৭৬৭ (অক্টোবর ১৮৪৫), পৃ. ২২৯-৩১; কার্তিক ১৭৬৯ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৪৭), পৃ. ১০১-০২।

৬৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: 'দুর্গোৎসব', তত্ত্বপ, আশ্বিন ১৭৯২ (সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৮৭০), পৃ. ৯৫-৯৯; 'দুর্গোৎসব', তত্ত্বপ, আশ্বিন ১৭৯৮ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৭৬), পৃ. ১১১-১২।

৬৫. 'অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রচার নিবারণী সভা', তমোলুক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ (১৮৭৪-৭৫), পৃ. ৮১-৮৩।

৬৬. এই সভার আবেদনে সরকার অন্তত দুটি গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেন—**বিদ্যাসুন্দর ও কামিনীকুমার**।—'অশ্লীল' মধ্যস্থ, ফাল্গুন ১২৮০ (ফেব্রুআরি-মার্চ ১৮৭৪), পৃ. ৭৩৮-৪১; সুকুমার সেন, **বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৪, পাটী।

৬৭. দ্রষ্টব্য: কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, আত্ম-জীবনচরিত', **সাহিত্য**, চৈত্র ১৩০৩, পৃ. ৭৫৩-৫৪।

হইতে বৃক্ষ জন্মে, তবে অপবিত্র স্থানের বৃক্ষ বলিয়া তাহার ফল কি অব্যবহার্য হইবে? অতএব যে সন্তানটি এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহাকে ঘৃণিত ভূমির উৎপন্ন বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। তাহার কোন দোষ নাই।'[৬৮] এ প্রসঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্রের মন্তব্য :

> কে তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে? কে তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে? কে তাহাদের স্ত্রীসর্বস্ব ধন সতীত্বরত্ন হরণ করিয়া ভিখারিণী করিয়াছে? স্বার্থপর রাক্ষসাধম পুরুষেরাই ক্ষণিক বা কিয়ৎ সুখসাধনের নিমিত্ত এই দুর্দশা করিয়াছে।[৬৯]

বেশ্যাসন্তান সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি আর্যদর্শনের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণও করেন। সুকুমারী দত্ত রচিত অপূর্ব সতী নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> আমরা সমাজ সংস্কারক ও ধর্মসংস্কারকদিগের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন নলিনীর ন্যায় বারবিলাসিনী দুহিতাদিগকে হস্তাবলম্বন প্রদানপূর্বক, তাহাদিগকে এরূপ ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করেন।[৭০]

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চে বেশ্যা অভিনেত্রী নিয়োগ করার ঘটনা উপলক্ষে যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তা-ও সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ। তাঁর মতে, অভিনয় করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়, বেশ্যাদের মুক্তির একটা পথ খুলে যায়। পরিবেশের চাপে যে সব কুলনারী গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং পরে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেন কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করতে উন্মুখ—রঙ্গমঞ্চে অভিনয় তাঁদের পক্ষে স্বাধীন জীবিকা উপার্জনের সুযোগ করে দেবে এবং এর ফলে এঁরা তাঁদের ঘৃণিত পেশা ত্যাগ করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।[৭১] তিনি আরো মনে করেন, পুরুষদের তুলনায় তাঁদের অভিনয় উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক। এই অভিনয় রঙ্গমঞ্চকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।[৭২] এবং যারা নিয়মিত শনিবারে পতিতালয়ে যায় তারা অতঃপর শনিবার অভিনয় দেখতে রঙ্গমঞ্চে গমন করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৭৩]

৬৮. দ্রষ্টব্য : কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্ম-জীবনচরিত', সাহিত্য, চৈত্র ১৩০৩, পৃ. ৭৫৫।
৬৯. ঐ, পৃ. ৭৫৬।
৭০. 'অপূর্ব সতী', আর্যদর্শন, আশ্বিন ১২৮২, পৃ. ২৮৫।
৭১. 'সতী কি কলঙ্কিনী', আর্যদর্শন, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২৪৮, 'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা', আর্যদর্শন, ভাদ্র ১২৮৪, পৃ. ২৩০।
৭২. 'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা', আর্যদর্শন, পৃ. ২২৮ ২৯।
৭৩. ঐ, পৃ. ২৩০-৩১।

রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটনার উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, ব্রাহ্মরা সাধারণভাবে অভিনেত্রীদের ঘৃণার চোখে দেখলেও যুবক ব্রাহ্মরা অনেকে একে বেশ্যাদের পক্ষে সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের পথ বলে গণ্য করেন এবং এই ঘটনাকে স্বাগত জানান।[৭৪] বাস্তবে দেখি বিপিনচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধুগণ অনেকেই অভিনেত্রী-অভিনীত নাটকের নিয়মিত পোষকতা করতেন।[৭৫]

ব্রাহ্মনেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও অভিনেত্রী সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি ১৮৭০ এর দশকে, বিশেষ করে উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত শরৎসরোজিনী নাটকের সুকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করে, গোলাপী খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৭৬] ১৮৭৫ সালে গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামক এক অভিনেতা তাঁকে ব্রাহ্মবিবাহ আইনানুসারে বিবাহ করেন।[৭৭] এর ফলে সমাজে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হতে পারে জেনেও নগেন্দ্রনাথ এই বিবাহ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।[৭৮]

সমাজে বেশ্যাবৃত্তির প্রসার ঘটছে—এই তথ্যের উল্লেখ করে কালীপ্রসন্ন ঘোষ যে মন্তব্য করেন তা-ও তাঁর উদার মানসিকতারই পরিচয় দান করে। কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম-প্রভাবিত হিন্দু ছিলেন এবং ব্রাহ্ম-পিউরিটান মনোভাব তাঁর মধ্যে অভ্রান্তভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু তিনি যখন বলেন, 'বেশ্যাবৃত্তির গরলস্রোতে অধিকাংশ প্রধান জনপদের শান্তিসম্পদ যে একেবারে ধৌত হইয়া যাইতেছে, বারাঙ্গনাদিগের সংখ্যা যে লোক সংখ্যার পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিনই পরিবর্ধিত হইতেছে,... ইহা কি নারী জাতির অপরাধ?'[৭৯]—তখন বোঝা যায়, শ্লীলতার নামে তিনি অন্ধ বা একচোখা হতে পারেননি।

কিন্তু কতিপয় উদার সমাজ সংস্কারকের পরিবর্তিত মূল্যবোধ সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এজন্যেই দেখা যায়, একদিকে সমাজের

৭৪. B. C. Pal, **Memories of My Life and Times**, I, 300.

৭৫. **Ibid.**, I, 301.

৭৬. পূর্বে, পৃ. ২৭৪, পাটী ২৩১।

৭৭. **বামাপ**, পৌষ, ১২৮১, পৃ. ২৯৩; 'চুক্তি বা মুক্তি বিবাহ', **মধ্যস্থ**, ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৮৪-৯৯; 'চমৎকার অভিনয়', **বসন্তক**, ২য় বর্ষ, ১৮৭৫, পৃ. ২২-২৫। **বামাবোধিনীর** মতো নারী দরদী পত্রিকাও বিবাহের সংবাদ পরিবেশন উপলক্ষে মন্তব্য করে, 'পাঠকগণ ইহা শুনিয়া অবশ্য কৌতুক লাভ করিবেন।'— পৃ. ২৯৩।

৭৮. 'চুক্তি বা মুক্তি বিবাহ', **মধ্যস্থ**, পৃ. ৪৮৬-৮৭; 'চমৎকার অভিনয়', **বসন্তক**, পৃ. ২২-২৫।

৭৯. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব**, পৃ. ১৬৪।

ভদ্র ও বিদগ্ধ শ্রেণী বারনারীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণা পোষণ করেন, অন্যদিকে সমাজের একটা বড়ো অংশই পূর্ববর্তী কয়েক দশকের মতো লাম্পট্য ও বেশ্যা-গমনকে প্রায় সমান প্রশ্রয় দান করে। তবে ১৮৬০-১৮৭০এর দশক থেকে হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালেই তাঁরা বেশ্যাগমন করতে শুরু করে।[৮০] লাম্পট্য-বিরোধী আন্দোলনের ফলে সমাজের মনোভাবে এইটুকু পরিবর্তন এসেছিলো—এটাই জোর করে বলা যায়।

বাংলা নাট্যরচনায় লাম্পট্য ও বেশ্যাসক্তি-বিরোধী সচেতনতা

পানাসক্তি বিষয়ক নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, সমস্যা হিশেবে পানাসক্তি ও লাম্পট্য নাট্যরচনাসমূহে, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।[৮১] সে কারণে, অধিকাংশ পানাসক্তি বিষয়ক নাটকেই লাম্পট্যের প্রসঙ্গও প্রায় সমান জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হয়। সমস্যা দুটিকে বস্তুত পরিপূরকরূপে চিত্রিত করা হয়। তবে ১৮৬০ এর দশকের শুরু থেকে কেবল মাত্র লাম্পট্য ও বেশ্যাসক্তি-বিরোধী নাটকও কয়েকখানি রচিত হয়। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), প্রসন্নকুমার পালের বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক (১৮৬১), রাধামাধব হালদারের বেশ্যাসক্তি বিষম বিপত্তি (১৮৬৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬৫?), তারিণীচরণ দাসের বেশ্যাবিবরণ (১৮৬৯), অজ্ঞাতনামার মা এয়েছেন (১৮৭৪) ইত্যাদি নাটক এর মধ্যে প্রধান।

সাধারণত দেখানো হয়েছে যে, পানাসক্ত ব্যক্তিরা লম্পটও এবং/অথবা লম্পটরা পানাসক্তও। কিন্তু এমন দু-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়, যে-ক্ষেত্রে লম্পট আদৌ পানাসক্ত নয়। এই ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। এই প্রহসনের নায়ক ভক্তপ্রসাদ বৃদ্ধ গ্রাম্য জমিদার। মুখে সে পরম বৈষ্ণব কিন্তু বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনাচারে তার আসক্তি অতি প্রবল। পুঁটির ভাষায় 'ত্রিশ বছরে ভক্তপ্রসাদ 'যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল' নষ্ট করেছে তার ঠিক নেই।[৮২]

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত হিন্দু মহিলা নাটকের গণেশও ভক্তপ্রসাদের মতো ভণ্ড ধার্মিক। সে পুরোহিত এবং গুরু। এবং অপকর্ম করার মুহূর্তেও সে দুর্গা, দুর্গা বলে ধর্ম স্মরণ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাহ অতিরিক্ত যৌনাচারে তার

৮০. পূর্বে, পৃ. ৩৪৩-৪৫।
৮১. পূর্বে, পৃ. ৩৬৫।
৮২. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, পৃ. ১১।

উৎসাহ অফুরন্ত। তার যজমান বিনোদের স্ত্রীর সঙ্গে তার নিয়মিত যৌন সম্পর্ক আছে। এমন কি, বিনোদের দাসীর সঙ্গেও একসময়ে তার যৌন সম্পর্ক ছিলো, দাসীর সঙ্গে তার আলাপ থেকে আমরা তা জানতে পারি।[৮৩] কি মজার কর্তা, প্রহসনের কর্তাও ভক্ত এবং 'ধর্মপ্রাণ'। কিন্তু ধর্মের নামে পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনকর্মে মিলিত হতে তার বাধা নেই। কিন্তু ভক্তপ্রসাদ, গণেশ এবং 'কর্তা' পানাসক্ত নয়। এ রকমের ব্যতিক্রম বাদ দিলে, মোটামুটি সকল লম্পটকেই পানাসক্ত বা নেশাখোর হিশেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

আলোচ্য নাটক-প্রহসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ব্যভিচারিণী রূপে যাদের চিত্রিত করা হয়েছে, তা বেশ্যা বা কোনো না কোনো ধরনের বারনারী। পূর্বোক্ত বিনোদের স্ত্রী এবং কলির কুলটার প্রমদা দুটি ব্যতিক্রম। আরো একটি গৃহবধূ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে বাল্যবিবাহের সরলা। তবে বাল্যবিবাহের ফল বিষময়—এটা দেখাতে গিয়েই নাট্যকার সরলাকে পরপুরুষের প্রতি অনুরক্ত করে চিত্রিত করেন। নয়তো সে শারীরিকভাবে ব্যভিচারিণী—এটা নাট্যকার দেখাননি।

লম্পট জোর করে সতীত্ব হরণের চেষ্টা করে বা সতীত্ব হরণ করে—এমন কয়েকটি নারীচরিত্র আমরা এসব নাটকে দেখতে পাই।[৮৪] কয়েকটি কুটনি চরিত্রও দেখতে পাই।[৮৫] কিন্তু নাট্যকারদের প্রবণতা হলো, মেয়েদের চরিত্রকে যৌনাচারের দিক দিয়ে কলঙ্কিত দেখানো। এজন্যই লাম্পট্যের চিত্র রচনা করতে গিয়ে তাঁরা বেশ্যা, বাইজি, নর্তকী ইত্যাদি চরিত্র আমদানি করেন।

এই বেশ্যাদের সামাজিক পটভূমি এবং দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে নাট্যকারগণ প্রায় কিছুই বলেননি। 'বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়' নাটকে শামা ও ফুলমণি নামে দুটি বেশ্যাকে দেখি। এর মধ্যে শামা বিধবা।[৮৬] অনুমান হয় ফুলমণিও বিধবা।[৮৭] ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে-র বুঁচি নিঃসন্দেহে

৮৩. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ২২-২৪।

৮৪. যেমন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-র ফাতেমা, সুধাকর বিষময়ের নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়-এর কন্যা, বুঝলে কিনা-র সুখী ও কুমুদিনী, বারুণীবিলাসের সৌদামিনী। নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির উল্লেখ অবান্তর, নাট্যকারের উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে লাম্পট্য নয় অত্যাচার চিত্রিত করা।

৮৫. যেমন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-র পুঁটি, নীলদর্পণের পদী ময়রানী, বটুবিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের দাসী, বিধবা বিবাহের নাপিতানী, চপলাচিত্ত চাপল্যের মালিনী।

৮৬. হরর উক্তি স্মরণীয়: 'শালী বেটী কি অসভ্য রাঁড়।' 'বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়,' পৃ. ৫২।

৮৭. ঐ, পৃ. ৪৬।

বিধবা।[৮৮] বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের মনোমোহিনীও ছেলেবেলায় হাতের নোয়া খসিয়ে আসার কথা বলে।[৮৯] একেই কি বলে সভ্যতা, সধবার একাদশী, নেশাখুরি কি ঝকমারি, একেই কি বলে বাবুগিরি, সুধাকর বিষময়, বাহবা চৌদ্দ আইন, ফালতো ঝকড়া ইত্যাদি নাটক-প্রহসনে যে বেশ্যাচরিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে, তাদের সামাজিক বা ব্যক্তিগত পটভূমি পুরো-পুরিই অজ্ঞাত।

হরকামিনী, কুমুদিনী (সধবার একাদশী), প্রমীলা, নলিনী, সুরমা, সরলা (বটু বিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটক), কুমুদিনী (কলির কুলটা) প্রভৃতি সুন্দরী, বিদুষী, নম্রস্বভাব কুলবধূর প্রতিযোগিনী করে বেশ্যাদের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার তাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পাইনে। পূর্বোক্ত বেশ্যাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুদরের বেশ্যা, বরং বলা উচিত রক্ষিতা, সধবার একাদশীর কাঞ্চন। সৌদামিনী তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বলে, সে 'শুঁটকো মাগী', 'তার হাত-পাগুলো যেন বাকারি।'[৯০] কিন্তু একেই অটল মাসে তিনশ টাকা বেতন দেয়। তদুপরি গয়নার জন্যে দিয়েছে দশ হাজার টাকা। গাড়ি-বাড়িও বলাবাহুল্য অটলের। প্রকৃত পক্ষে, সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব কোনোদিক দিয়েই কাঞ্চনকে অসাধারণ বলে মনে হয় না। কেবল অশালীন ভাষার জন্যেই তাকে সাধারণ নারীদের থেকে ভিন্ন মনে হয়।

মনমোহিনীকে বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ আকর্ষণীয় করে অঙ্কন করার চেষ্টা করেন। তার স্তাবকরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কমল তার অকর্ষণে অন্ধ। কিন্তু তার সৌন্দর্যের কোনো পরিচয় আমরা পাইনে। তার ব্যক্তিত্ব অতি দুর্বল। ভাষাও কাঞ্চনের মতো রূঢ় এবং অভব্য। 'বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়' নাটকের শামা, ঘর থাক্তে বাবুই ভেজের বুঁচি, এবং ফালতো ঝকড়ার মণি ও কাঞ্চন ও মনমোহিনীর মতোই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আদৌ জীবন্ত বলেই মনে হয় না।

এদিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার সুধাকার বিষময়ের অজ্ঞাতনামা বারাঙ্গনা চরিত্রটি। তার সৌন্দর্যের পরিচয় না পেলেও, সে যে-ভাবে ভূমেশ ডাক্তারকে দিয়ে সুরাপান নিবারণী এবং লাম্পট্যবিরোধী আন্দোলন বানচাল করে দেয়, তা থেকে

৮৮. প্রমীলার উক্তি স্মরণীয়: 'তিনি আবার ২৫ টাকা মাইনে করে রাঁড় রেখেছেন।'—ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ৯।

৮৯. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৯৮।

৯০. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ২৯৭।

তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার কথায় যে ধার এবং বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষ্য করি, কাঞ্চন বা অন্য কোনো বেশ্যাতে তা নেই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, নিমচাঁদ যেমন মাতাল হিশেবে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি সুপরিচিত চরিত্র, এমন কোনো বেশ্যা চরিত্র আলোচ্য নাট্যরচনাসমূহে অনুপস্থিত।

আসলে লাম্পট্যবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে বেশ্যাচরিত্র অঙ্কন করলেও, নাট্যকারগণ তাদের রাখেন যবনিকার আড়ালে। এর কারণ নির্ণয় করা শক্ত। হতে পারে, নাট্যকারদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব ছিলো। অথবা হতে পারে বেশ্যাদের চরিত্র অঙ্কন করে তাঁরা 'ভদ্র' সমাজের পরিবেশকে কলুষিত করতে চাননি। এটা যদি প্রকৃত কারণ হয়, তা হলে সমাজে বেশ্যাবিরোধী মনোভাব ১৮৫০ এর দশকের শেষেই ছড়িয়ে পড়েছিলো, এমন কথা বলতে হয়।

যে সংক্ষিপ্ত বেশ্যাচরিত্র কটি আমরা দেখতে পাই, তা থেকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের মনোভাব কেমন ছিলো তা বলা প্রায় অসম্ভব।

প্রিয়শঙ্কর এবং রমানাথের হাত-ফেরতা হয়ে কাঞ্চন শেষে অটলের রক্ষিতা হয়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাকে অটলের মন জোগানো কথা বলতে শুনি! এমন কি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অটলের সঙ্গে সে খানকিটা প্রেমাভিনয়ও করে। কিন্তু গহনা, তিনশো টাকা মাসোয়ারা, অটলের স্তুতি, অটলের মায়ের প্রশ্রয় ইত্যাদি পাওয়া সত্ত্বেও, কিছুকালের মধ্যেই তাকে অটলের প্রতি ধীরে ধীরে বিরূপ হতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে, সে জাত-বেশ্যা, দীর্ঘদিন একজনের সংসর্গ তার কাছে অসহ্য। এজন্যেই হঠাৎ একদিন নকুলেশ্বরের বাগান বাড়িতে এসে বিরক্তির সঙ্গে অটল সম্পর্কে সে বলে :

> আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেচে, কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি, ভাই, এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই, ব্যাটা অমনি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান, কত মিনতি করেন— তাইতে, ভাই, বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।[৯১]

এই বাঁধন কাঞ্চনের অপছন্দ, সম্ভবত অসহ্য। সে অটলকে বলে, সে তার 'ঘরের মাগ' নয়।[৯২] কিন্তু অটল তাকে একান্ত নিজের করে পেতে চায়। বিরক্ত কাঞ্চন 'এমন খুনের কাছে মানুষ থাকে' বলে অটলের আশ্রয় ছেড়ে চলে যায়।[৯৩]

৯১. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ৩৪৫-৪১।
৯২. ঐ, পৃ. ৩৪৮।
৯৩. ঐ, পৃ. ৩৫১।

বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায় নাটকের শামার মনোভাবও কাঞ্চনের মতোই। মনিবের প্রতি তার আনুগত্য সামান্যই, নেই বললেই চলে। যথাসময়ে প্রতিশ্রুত অর্থ না-পেলে মনিবকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে 'ফুর্তি' করতে তার মানসিক বাধা নেই। কাঞ্চনের সঙ্গে অধিকতর মিল বুঁচির। বুঁচি রসিকের পঁচিশ টাকা মাইনের রক্ষিতা। তা ছাড়া স্ত্রীর অলঙ্কার ছিনিয়ে এনে রসিক বুঁচির করকমলে অর্পণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাত্রিবেলায় ফিরে এসে রসিক দেখে বুঁচি অন্য নাগরের সঙ্গে 'ফুর্তি' করছে। রসিককে সে দরজা খুলে দেয় না, সে বাইরে বিষ্টিতে ভিজতে থাকে। মেজাজ দেখাতে গেলে বুঁচি পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয়। ফুলমণি এমনি একটি চরিত্র। একদা প্রথম যৌবনে এক নাগর তাঁকে ভালোবেসেছিলো। সেও তাকে পছন্দ করতো। তারপর একদিন কিছু নগদ অর্থের বিনিময়ে সে যখন অন্য একটি পুরুষের সেবা করছিলো, তখন তার মনিব এসে পড়ে। সেই তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যৌবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফুলমণি আজো সেই সুখস্মৃতি দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করে। বোঝা যায়, বেশ্যা হলেও ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিলো তার অন্তরে।[১৪]

মনমোহিনীও তার বেশ্যাজীবনের গোড়া থেকে কমলকে পেয়েছে এবং কমলকে সে বোধহয় ভালোও বাসে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশঙ্কা করে সে কমলকে বশীকরণের ঔষধ খাওয়ায়। এই ঔষধের ফলে কমল পাগল হয়ে গেলে মনমোহিনী যে মন্তব্য করে তা থেকেও বোঝা যায়, সে কমলকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলো।

> ছেলেবেলা হাতের নো খসিয়ে বেরিয়ে এসেচি, সেই অবধি ও আমার সঙ্গে ছিল, এত দিন ত বেশ ছিল, উনি বাড়ি যাবেন, আর কোথায় যাবেন, তা আমার সহ্য হবে কেমন করে, যে বেস্যে রাখবে তার আবার মাগ কি।[১৫]

অন্যত্র সে কমলকে বলে, স্ত্রীকে ছাড়তে পারলে তবেই সে যেন তার কাছে আসে।[১৬] কাঞ্চনের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য,—কাঞ্চন ভালোবাসা বোঝে না।

নাগররা তাদের মোহিনী মায়ার কাছে বন্দী,—আলোচ্য বেশ্যারা সবাই বোধহয় এটা মনে করে এবং সে জন্যেই তারা সম্ভবত নাগরদের প্রতি অমন রূঢ় ব্যবহার করতে সাহস পায়। প্রসঙ্গত সুধাকর বিষময়ের নামহীন বারাঙ্গনা ভূমেশ ডাক্তারের প্রতি, বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়-এর শামা হরর প্রতি, ঘর থাকতে

১৪. বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়, পৃ. ৪৪-৪৬।
১৫. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ৯৮-৯৯।
১৬. ঐ, পৃ. ৯২।

বাবুই ভেজের বুঁচি রসিকের প্রতি, সধবার একাদশীর কাঞ্চন অটলের প্রতি এবং বটুবিহারী রচিত হিন্দু মহিলা নাটকের মনমোহিনী কমলের প্রতি যে ব্যবহার করে এবং যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে তা স্মরণ করা যেতে পারে।[৯৭] নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, সেকালের নামকরা বেশ্যাদের ছেমো, ছেনালি, ছলনা ইত্যাদি কয়েকটি কৌশল শিক্ষা দেওয়া হতো।[৯৮] হয়তো এসব গুণের সাহায্যেই তারা নাগরদের বন্দী করে রাখতো।

কিন্তু নাগরদের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, সমাজে যে বেশ্যাবিরোধী একটি সচেতনতা ক্রমশ বিকাশ লাভ করছিলো, এ সম্পর্কে বেশ্যারাও সচেতন হয়ে উঠছিলো—এমন অনুমান নাটক থেকে করা যায়। সুধাকর বিষময়ের বারাঙ্গনা আহত অহংকার, আশঙ্কা এবং দুঃখ নিয়ে মন্তব্য করে—

> কতকগুলো ভণ্ডলোক আমাদের পাছে লেগেছে, ছি ছি আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেবে, শুনতে পাই বাঙ্গালার সকল জায়গায় আমাদের মান, দশলক্ষপতিও আদর করেন, সকলেরই নেক নজর আমাদের উপর পড়ে। কতকগুলো ছোঁড়া যারা পড়ে শুনে মাণ্ডট হয়েছে, তারা পাছ ফিরিয়ে নবাবপুত্রের মতন চলে যায়, যদি চায়, নাকমুখ শিকটে চলে যায়। সেই ছোঁড়ারা আমাদের তাড়াবার যোগাড় কচ্ছে।[৯৯]

এই 'ছোঁড়াদের' আন্দোলনে বেশ্যাদের সত্যি সত্যি কোনো ক্ষতি হোক বা নাই হোক, ১৮৬৮ সালে সরকারের প্রণীত চৌদ্দ আইনের ফলে বেশ্যাদের অনেককেই বিপদে পড়তে হয়। এই আইনানুসারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেশ্যাদের যৌন রোগের পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। যাদের রোগ ধরা পড়ে, তাদের হসপিটালে রেখে চিকিৎসা করা হয়। যাদের রোগ ছিলো না সম্ভবত তাদেরও নানা ঝামেলায় পড়তে হয়। আর যারা রক্ষিতা হিশেবে বেশ্যাপাড়ায় বাস করতো, তাদের অনেকেই পরীক্ষার ঝামেলা এড়ানোর জন্যে কলকাতার অন্যত্র বা মফস্বলে পালিয়ে যায়। বাহবা চৌদ্দ আইন প্রহসনে অজ্ঞাতনামা নাট্যকার এই আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারিকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো দাবি করেন, ভারতবর্ষের কোনো রাজাই প্রজাদের ধর্মরক্ষার জন্যে ইংরেজ রাজার মতো আন্তরিক প্রচেষ্টা

৯৭. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৩৬-৩৮, বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়, পৃ. ৪০-৪৩, ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ২৪-২৫; বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা পৃ. ৯২-৯৩।

৯৮. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, পৃ. ৯৮-৯৯।

৯৯. সুধাকর বিষময়, পৃ. ৩৯-৪০।

করেননি।[১০০] নিস্তারিণী, বসন্ত এবং মোহিনী এই তিন বেশ্যা যৌনরোগ পরীক্ষা করাতে গিয়ে বহু পুরুষের সামনে উলঙ্গ হতে বাধ্য হয় এবং পুলিসের হাতে কদিন বন্দী থাকে ও নানা অত্যাচার সহ্য করে—তাদের সংলাপ থেকে নাট্যকার তা দেখাতে চেষ্টা করেন। এই আইন প্রণীত হওয়ায় অনেক বেশ্যা তাদের ব্যবসা পরিত্যাগ করে, সে কথাও জানা যায়।[১০১]

লম্পটদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চিরপুরাতন বিবাহ-অতিরিক্ত যৌন কামনাই তাদের পরিচালিত করে। ভক্তপ্রসাদ, হর, বিনোদ, রসিক, রামতারণ, অটল, অটলকৃষ্ণ, গণেশ, কমল, চন্দ্রনাথ—সকলেই বশীভূত এই প্রলোভনের কাছে। কিন্তু এই প্রলোভনের কাছে বন্দী হলে মানুষ কখনো তৃপ্তি পায় না। ভক্তপ্রসাদের বর্ণনা দিয়ে পুঁটি বলে '···আজ হবে না তো ত্রিশ বছর ওর কর্ম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিক নেই।'[১০২] অন্যান্যরা কমবেশী এরকম। এর মধ্যে গোঁসাই, ভক্তপ্রসাদ, 'কর্তা' গণেশ এবং অটলকৃষ্ণ আবার ইংরেজি না-জানা প্রাচীন সমাজের সদস্য। মুখে তারা সব সময়ে ধর্মের কথাও বলে। কিন্তু যারা বলে, 'স্ত্রীর প্রেমালাপ সাতিশয় সুখোৎপাদক' কিন্তু পরনারী 'সম্ভোগ করে কোন ব্যক্তির স্ত্রী সম্ভোগে ইচ্ছা করে।'[১০৩]—তারা যে লাম্পট্যে গা ভাসিয়ে দেবে তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই গোঁসাই দীক্ষা এবং মন্ত্র দানের নামেও সব সময় পরনারীদের সতীত্ব হরণের পরিকল্পনা করে।[১০৪] এ রকমের ভণ্ড কি মজার কর্তা প্রহসনের কর্তাও। সে কর্তাভজা দলের নেতা। সর্বদা নারী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। নরনারীর প্রতি তার লোভ প্রায় সীমাহীন।

অটলকৃষ্ণ গোঁসাই বা ভক্তপ্রসাদের মতো রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দোহাই দিয়ে লাম্পট্যে লিপ্ত হয় না, সে 'কুলদায়িনী' 'কুণ্ডলিনী' কালীর নামে পরনারী উপভোগ করতে চায়। গণেশের মতো সর্বস্তরের নারীতেই তার সমান আকর্ষণ। কাম্য নারীটি ঝাড়ুদারনী হলেও তার আপত্তি নেই। এ সম্পর্কে তার স্বগতোক্তি স্মরণীয়:

> জাত্যংশে কিছু নীচ বটে, তা তাতে কি এসে-যায় দেখতে বড় সরস। আহা, কি লজ্জৎ।···আর তার স্বভাবটাও অতি সরল বোধ হয়, আ-আ-আ-কালি, কুল-কুণ্ডলিনি। ...আহা। ছুঁড়ির কি লাবণ্য দেখেচো। নীচকুলে জন্ম হলে কি হয়?

১০০. অজ্ঞাত, বাহবা চৌদ্দ আইন (কলিকাতা: প্রাকৃত প্রেস, ১২৭৬), পৃ. ১-২।
১০১. ঐ, পৃ. ৬-১২।
১০২. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, পৃ. ১১।
১০৩. বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ২১।
১০৪. সপত্নী নাটক, পৃ. ১৩১, ১৩৩-৩৫।

...ছুঁড়ি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আঁস্তাকুড়ে মাণিক পেলে কি লোকে অবহেলা করে?---আহা, কি হাত পার গড়ন। কি নাক। কি চক্ষু। কি কপাল। কি চলন। দেখলে বোধ হয়, যেন কোন দেবকন্যা ছলনা করবার নিমিত্তে অবনীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন।[১০৫]

বিধবা বিরহ নাটকের কর্তাও অটলকৃষ্ণের মতো মনোভাববিশিষ্ট। দুটি বিয়ে করার পরেও সে চাঁপা দাসীকে গর্ভবতী করে এ ছাড়া আরো দুটি মহিলার সঙ্গে যৌন-কর্মে লিপ্ত হয়।

রসিকও এমনি একটি লম্পট। সে মনে করে স্ত্রী যথেষ্ট আধুনিকা এবং চটপটে নয়। তার কথা বলা, সাজসজ্জা, হাবভাব কোনো কিছুই আকর্ষণীয় নয়। অপর পক্ষে, বেশ্যারা গান-বাজনা জানে, ধারালো কথাবার্তা বলতে পারে। সর্বোপরি, বেশ্যার কাছে ইয়ারদের নিয়ে একযোগে মজা করা যায়। 'ইয়ার বিনে দিন ফাঁক' ---বন্ধুরা না থাকলে সব আনন্দই মাটি। স্ত্রীর কাছে বন্ধুদের নিয়ে আসাতো দূরের কথা, তার সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও দেশাচার অনুসারে অসম্ভব। সে জন্যেই সতেরো বছরের যুবতী সুন্দরী স্ত্রী প্রমীলার সঙ্গে সহবাস করা দূরে থাক, তার মুখও সে কোনো দিন দেখে না, পড়ে থাকে রক্ষিতা বুঁচির কাছে।[১০৬]

এই লম্পটদের মধ্যে অনুশোচনা বা নবসৃষ্টি লাম্পট্যবিরোধী সচেতনতা প্রায় অনুপস্থিত। এদের আমরা সংশোধিত হতেও দেখিনে। কেবল দু একটি ব্যতিক্রম এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। নেশার ঘোর কেটে গেলে কমল স্ত্রীর কথা মনে করে এবং অনুতপ্ত হয়।[১০৭] চন্দ্রনাথও নেশা কেটে গেলে অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনো অন্য নারীর কাছে যাবে না।[১০৮] কিন্তু সাধারণত তারা শক্তপ্রাণ অপরাধী। সকল রকমের দুষ্কর্ম তারা অবহেলায় করতে পারে। হর একদিন তার স্ত্রীর কাছে ঘুমাতে আসে। ইচ্ছে, স্ত্রী ঘুমিয়ে গেলে তার অলঙ্কার চুরি করে নিয়ে বেশ্যার কাছে যাবে। কিন্তু স্ত্রী না ঘুমিয়ে অনুনয়, বিনয়, প্রেমপূর্ণ মধুর বাক্যে তার মন জয় করার চেষ্টা করলে সে মহাবিরক্ত হয়ে প্রহার করে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়।[১০৯] রসিকও অলঙ্কারের লোভে একদিন স্ত্রীর সঙ্গে শোয়। স্ত্রী ঘুমিয়ে গেলে সে তার গলা থেকে হার খুলে নেয়। নাকের নথ খোলার সময় স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেলে

১০৫. বুঝলে কিনা, পৃ. ৭-৮, ২৫, ২৮।
১০৬. ঘড় থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ৫।
১০৭. বটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মহিলা নাটক, পৃ. ১৩৮-৩৯।
১০৮. বটবিহারী চক্রবর্তী, কুলির কুলটা বা অদ্ভুত কাণ্ড (কলিকাতা, ১২৮৩), পৃ. ৫-৬, ১২।
১০৯. বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়, পৃ. ৫৯-৬০।

সে এক হেঁচকা টানে নাক ছিঁড়ে নথ নিয়ে চলে যায়।[১১০] অটল, কমল, গণেশ এরা অবশ্য হর বা রসিকের মতো এতো মন্দ নয়।

পিতামাতা, স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সব সদস্য লম্পটদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে, তা পানাসক্তি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি।[১১১] নাট্যকারগণ যেমন লম্পট মাতালদের চরিত্র গাঢ় কালো রং দিয়ে অঙ্কন করেছেন, তেমনি তাদের স্ত্রীদের অঙ্কন করেছেন আদর্শ নারী হিশেবে। হরকামিনী, নলিনী কুমুদিনী, প্রমীলা, সুরমা—সকলেই অকলঙ্কিত চরিত্রের এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের, অধিকারী। বস্তুত এই বৈপরীত্য সৃষ্টি করেই নাট্যকারগণ লম্পট-মাতালদের প্রতি সামাজিকগণের ঘৃণার উদ্রেক করার প্রয়াস পান।

এই লম্পটদের নানাভাবে নাজেহাল করার চিত্র এঁকেও নাট্যকারগণ লাম্পট্যের প্রতি সাধারণ মানুষদের ঘৃণার উদ্রেক করতে চান। সধবার একাদশীর অটল, সুধাকর বিষময়ের তেজেন্দ্র, হিন্দু মহিলা নাটকের কমল, ঘর থাক্তে বাবুই ভেজের হর, ফালতো ঝকড়ার কানা-সুন্দর ও প্রেমচাঁদ নানাভাবে জব্দ হয়। কেউ বেশ্যার হাতে ঝাঁটাপেটা হয়, কেউ পুলিসের মার খায়, কেউ জেলে যায়। কলির কুলটা নাটকের জীবনচন্দ্র লাম্পট্যের দায়ে তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করে এবং চন্দ্রনাথ দুশো টাকা জরিমানা দেয়। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনের ভক্তপ্রসাদের যে লাঞ্ছনা হয়, তা সুবিদিত। সম্ভবত পরবর্তী নাট্যকারগণ কমবেশি এই পরিণতি দৃষ্টেই প্রভাবিত হন। বুঝলে কিনার অটলকৃষ্ণ এবং কি মজার কর্তার 'কর্তা' ভক্ত প্রসাদের চেয়ে কম লাঞ্ছিত হয় না। অটলকৃষ্ণের হনুমান সেজে নাচা এবং কর্তার সপের মধ্যে পলায়ন ও ধরা পড়ে মার খাওয়ার দৃশ্য পাঠক-দর্শকদের কাছে নাট্যকারগণ উপদেশের মতো উপস্থিত করেন।

সমাজে লাম্পট্যবিরোধী সচেতনতার সৃষ্টি হচ্ছিল সুধাকর বিষময় নাটকের বারাঙ্গনার উক্তিতে আমরা এরূপ আভাস পাই।[১১২] সধবার একাদশীর জীবনচন্দ্র এবং কেনারাম ডেপুটির উক্তি থেকেও এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। কেনারাম যুব সমাজের ফ্যাশনের অনুকরণে দু-একবার বেশ্যাবাড়ি যায়। কিন্তু ভদ্রসমাজ লাম্পট্যকে প্রশংসার চোখে দেখে না—এই চেতনাবশতই সে বোধ হয় লম্পট হয়নি। জীবনচন্দ্রও গোকুলের প্রশংসা উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'তোমরা মাতার মণি তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও

১১০. ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, পৃ. ১১।
১১১. পূর্বে, পৃ. ৩৯০-৯২।
১১২. পূর্বে, পৃ. ৪০৩।

চলে না।[১১৩] প্রকৃত পক্ষে, ব্রাহ্ম ও ভদ্রসমাজ এক নতুন পবিত্রতা ও ঔচিত্যবোধের দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছিলেন, সুধাকর বিষময় নাটকেও এমন ইঙ্গিত আছে। শান্তশীল ও সোমনাথ কেবল মদ্যপান ও লাম্পট্যকে ঘৃণাই করে না, তারা বেশ্যাদের রীতিমতো উৎখাত করার জন্যেও আন্দোলন করে।[১১৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বঙ্গসমাজে প্রধানত কলকাতানগরী কেন্দ্রিক কিছুসংখ্যক হঠাৎ-ধনী পানাসক্তি ও লাম্পট্যে মগ্ন হয়েছিলেন। ১৮২০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ পানাসক্ত হয়েছিলেন। প্রভাবশালী এই ব্যক্তিদের পানাসক্তি ও লাম্পট্য সমাজ যে কেবল সহ্য করে তাই নয়, এটা প্রায় স্বীকৃত ফ্যাশনে পরিণত হয়। কিন্তু শিক্ষা বিস্তার এবং নবজাগ্রত এক পবিত্রতা বোধের উন্মেষ ও বিকাশের ফলে পানাসক্তি ও লাম্পট্য উভয়ই ভদ্র-সমাজে অপাংক্তেয় বলে গণ্য হয়। আলোচ্য কালের নাটকেও সমাজ-মানসের এই বিবর্তনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

১১৩. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু-রচনা-সংকলন, পৃ. ২৯০।
১১৪. সুধাকর বিষময়, পৃ. ১২।

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই নয়, দেশাচারবিরোধী মনোভাব বোধহয় চিরকালই এ দেশে ধর্মবিরোধী মনোভাব বলে বিবেচিত হয়। এ জন্যে, শাস্ত্রের প্রভূত দোহাই দিলেও, সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের ফলে রামমোহন রায় হিন্দু-ধর্ম-বিনাশী এবং খৃস্টান-প্রভাবিত বলে সমকালীন সমাজে পরিচিত হন। অথচ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংস্কারক হিশেবে রামমোহন ছিলেন মধ্যপন্থী—বড়ো রকমের সংস্কার করে তিনি আসলে পুরোনো কাঠামোকেই রক্ষা করার প্রয়াস পান। পরবর্তী দশকের ইয়ং বেঙ্গলগণের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য মাত্রাগত নয়, প্রকৃতি-গত। ঐতিহ্যিক হিন্দুদের মতো যতোটা সম্ভব পুরোনো কাঠামোকে অপরিবর্তিত রাখা অথবা রামমোহনের মতো সংস্কারের মাধ্যমে সেই কাঠামোকে বজায় রাখার নীতি এঁরা গ্রহণ করেননি। বরং এঁরা সম্পূর্ণ নতুন একটি কাঠামো নির্মাণ করতে উদ্যত হন। ধর্ম নয়, এঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয় মানবতা ও ইহলৌকিকতায়। এই পরিবেশে এঁরা জনপ্রিয় দেশাচারসমূহ ভঙ্গ করেন এবং ঘোষণা করেন, হিন্দু ধর্মকে তাঁরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করেন। বিধবাবিবাহের এবং স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য অথবা কন্যাবিক্রয় এবং কুলীন বহুবিবাহের অনৌচিত্য প্রমাণ করতে গিয়ে এঁরা আদৌ শাস্ত্রের দোহাই দেননি, বরং তার পরিবর্তে উচ্চারণ করেন মানবিকতা ও যুক্তির বাণী।

এ সময়কার ইয়ং বেঙ্গলদের যে মনোভাব লক্ষ্য করি, তাকে এ দেশের তৎকালীন মনোভাবের তুলনায় বৈপ্লবিক বলা উচিত। তবে এ মনোভাব ছিলো অনেকাংশে ধার-করা। এঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভাবের কোনো সমন্বয় করেননি, বরং প্রাচ্যকে বর্জন করে পুরোপুরি পাশ্চাত্য মনোভাবকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেন। (তাৎক্ষণিক কেননা এঁদের ইহলৌকিকতার দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৪০-এর দশক থেকেই লুপ্ত হতে আরম্ভ করে।) এজন্যেই ঐতিহ্যিক সমাজের চোখে এঁরা কখনো নাস্তিক, কখনো খৃস্টান বলে পরিচিত হন। আসলে খৃস্টান ও নাস্তিক শব্দ দুটি এই সমাজের কাছে সমার্থক হয়ে পড়ে এবং উভয়েরই অর্থ দাঁড়ায় হিন্দুধর্মবিনষ্টকারী। ইয়ং বেঙ্গলগণ দেশাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় একদিকে তাঁরা বৃহত্তর সমাজের কাছে নিন্দনীয় হন, অন্যদিকে তাঁরা যে মানবতা ও শ্রেয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান, তা-ও জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ উদার বুদ্ধিজীবী। এঁরা রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলদের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটান। বিদ্যাসাগর সর্বত্র এবং অক্ষয়কুমার প্রয়োজন মতো প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমকালীন সমাজকে সংশোধন করতে চান। কিন্তু এঁরা কেউই রামমোহনের মতো নতুন অথবা পুরোনো নামে ধর্মকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেননি। উত্তুঙ্গ যুক্তিবাদ ও অপরিসীম মানবিকতাই ছিলো এঁদের প্রেরণার উৎস। ইয়ং বেঙ্গলদের মতো র‍্যাডিকাল না-হওয়ায় এবং সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায়, এঁরা সংস্কারের মনোভাবকে একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে জনপ্রিয় করতে সমর্থ হন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষিত এলিটগোষ্ঠীর বাইরে বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু ১৮৫০-এর দশকে এই সচেতনতা সমাজের উচ্চতর স্তর থেকে ধীরে ধীরে নিম্নে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের অবদান সবচেয়ে বেশি।

১৮৪৯ সালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এবং ১৮৫৫ সালের শুরুতে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ উপলক্ষে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে একটি সচেতনতা জেগে ওঠে। এই সচেতনতা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে আন্দোলনের রূপ লাভ করে। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের নিকট আবেদনপত্র প্রেরিত হয় এ বছরই। কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ সম্পর্কিত কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে। এবং ১৮৫৬ সালেই বহুবিবাহনিরোধক আইন প্রণয়ন করার জন্যে সরকারের কাছে অনেকগুলি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। বাল্যবিবাহ-বিরোধী প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। এই দশকেই বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, বাল্যবিবাহ ও মদ্যপান বিষয়ক নাটক প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। মোট কথা আলোচ্য দশকেই সমাজ-সংস্কার সচেতনতা বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে পরিকীর্ণ হয় এবং তা আন্দোলনের রূপ নেয়।

১৮৬০-এর দশকের সংস্কার আন্দোলনের নায়ক কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর মধ্যে দুটি প্রায় পরস্পরবিরোধী সত্তার সমন্বয় ঘটেছিলো। আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর ও তাঁর অনুসারিগণের আকর্ষণ আত্যন্তিক আন্তরিক ছিলো। অপর পক্ষে, যুক্তি ও ঔচিত্য দিয়ে সমাজ-সংস্কার করার প্রয়াসও তাঁদের কম প্রবল ছিলো না। এঁরা সমাজ-সংস্কারকেও ধর্মের অঙ্গীভূত করেন এবং ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে সংস্কার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু এঁরা সংস্কারকে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে

একীভূত করায়, ঐতিহ্যিক সমাজ তাঁদের সংস্কার প্রয়াসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁদের সংস্কারের বিষয়গুলিও জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে।

১৮৭০-এর দশকে কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিকতায় সমধিক পরিমাণে নিমজ্জিত হন, সংস্কারের দায়িত্ব অর্পে শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দুর্গামোহন দাস প্রমুখের ওপর। এ দশকের শেষ দিকে এঁরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন এবং আধ্যাত্মিক চেয়ে ইহলৌকিকতার প্রতিই এঁরা এঁদের দৃষ্টি সমধিক পরিমাণে নিবদ্ধ করেন।

১৮৬০-এর দশকের শেষ ভাগে কলকাতার এলিট সমাজে আত্মগৌরবমূলক একটি জাতীয়তাবাদী সচেতনতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। নিজেদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ও অতিরঞ্জিত একটি প্রতিবিম্ব রচনা করতে গিয়ে এঁরা ধর্ম, দেশাচার ইত্যাদি বহু বিষয়ে আত্মসমালোচনা করতে অনীহা বোধ করেন। বৈদেশিক ধারণা এবং মূল্যবোধ গ্রহণ করার বিষয়েও সতর্ক ও কুণ্ঠিত বোধ করেন। ফলে, সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা ও রেনেসাঁসের চিত্তবৃত্তি উভয়ই পরাস্ত হয়। শিক্ষিত সমাজের কৌতূহল, মনোযোগ এবং আগ্রহ অতঃপর জাতীয়তাবাদের খাতে প্রবাহিত হয়। আত্মসমালোচনামূলক সমাজ-সংস্কারের দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গি আত্মগৌরবমূলক জাতীয়তাবাদের দিকে নিবদ্ধ হওয়ায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতো আধা-'প্রগতিশীল' প্রতিষ্ঠান রক্ষণশীল সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সঙ্গে এক যোগে জাতীয় সভার (১৮৬৯) মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ তরুণ 'প্রগতিশীল' ব্রাহ্মরা স্থাপন করেন Indian Association (১৮৭৬)। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মুখে সমাজ-সংস্কারের উৎসাহ এভাবে হ্রাস পায়।

সংস্কার আন্দোলনে ভাঁটা পড়ার অন্যতম কারণ আন্দোলনে যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য। বিধবাবিবাহ আন্দোলন কলকাতা নগরীতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে আইন প্রণীত হওয়ার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে। ১৮৬০-এর দশকের প্রারম্ভে এ আন্দোলন মফস্বলে খানিকটা প্রসার লাভ করলেও এই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিবাহ দিয়ে বিধবাদের দুর্দশামোচনের ধারণাটি মূল কলকাতায় পরাস্ত হয়। কিন্তু বিধবাদের দুঃখ সম্পর্কে সমাজ কিছুটা সচেতন হয়। তা ছাড়া সাধারণভাবে বিবাহের বয়স আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কুলীন বহুবিবাহ হ্রাস পাওয়ায় বিধবার সংখ্যা কিছু কমে যায়। সমাধান না হোক বৈধব্য সমস্যার তীব্রতা এভাবে কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়।

কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ, অকুলীন ব্রাহ্মণদের কন্যাবিক্রয় এবং কুলীন কায়স্থদের আদ্যরস প্রথা সম্পূর্ণরূপে লোপ না পেলেও আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত হয়।

আলোচ্য সময়ে বিবাহের বয়স কন্যাদের পক্ষে বৃদ্ধি পেয়ে দশ-এগারো-বারোতে পৌঁছে। শিক্ষিত পরিবারে ঋতুমতী কন্যার বিবাহও ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত হয়। পাত্র-পাত্রীর পছন্দ অনুসারে বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের ঘটনাও দু-একটি করে ঘটতে থাকে। সিভিল বিবাহের অধিকারও আইনত স্বীকৃত হয়।

ব্যাপকভাবে প্রচলিত না হলেও, ভদ্রসমাজ স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য মেনে নেয়। ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকারও স্বীকার করে নেয়। এ দিক দিয়ে বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন সংকীর্ণ অর্থে ইংলণ্ডের চেয়েও বেশি সাফল্য অর্জন করে। অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা-দের এ অধিকার মেনে নেয় আরো প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে।

১৮৭০-এর দশকের মধ্যে অবরোধমোচনের বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়। এ সময়ে বঙ্গদেশের মহিলারা প্রকাশ্য সভায় যোগদান করেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন, ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠ প্রদক্ষিণ করেন, গাড়িতে চড়ে রাজপথ ঘুরে বেড়ান, অভিভাবকসহযোগে এবং/অথবা একাকী সমুদ্রপথে ইংলণ্ড গমন করেন। এ দশকে মহিলাদের পোশাকেরও বিপুল পরিবর্তন ঘটে। পেটিকোট, ব্লাউজ, জুতো, মোজা সংবলিত যে পোশাক স্বল্পসংখ্যক পরিবারে প্রবর্তিত হয়, তা পূর্ববর্তী অশালীন ও অপ্রতুল পোশাকের তুলনায় যুগান্তকারী।

মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন ১৮৬০-এর দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে কিছুসংখ্যক মদ্যপায়ী তাঁদের অভ্যাস ত্যাগ করেন। তারচেয়ে বড়ো কথা, অতঃপর প্রকাশ্যে মদ্যপান করার রীতি নিরুৎসাহিত হয়। জনচিত্তে এ বিষয়ে সম্ভবত একটি নৈতিক শুচিতার বোধও জাগ্রত হয়। শতাব্দীর প্রথম চার-পাঁচ দশক পর্যন্ত ধনী সমাজে লাম্পট্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। রক্ষিতা রাখা নিয়েও সমাজে প্রতিযোগিতা চলতো। কিন্তু শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সমাজে এ সম্পর্কে একটি নতুন সচেতনতার উদ্রেক হয়। অতঃপর বাস্তবে লাম্পট্যের হ্রাস-বৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, একটি ঔচিত্য ও পবিত্রতাবোধ সমাজের মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। রক্ষিতা রাখা দূরের কথা, ভদ্র সমাজের একাংশ এ সময়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখাও নিন্দনীয় কর্ম বলে গণ্য করেন।

প্রকৃত পক্ষে, সংস্কার-আন্দোলনের ফলে আংশিক বাস্তব সাফল্য অর্জিত হয় এবং মনোভাবের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ জন্যে ১৮৭০-এর দশক নাগাদ

সমাজে কতকগুলি স্থিতিশীল মূল্যবোধ গড়ে উঠতে দেখি। এর পরে এ দিকে মনোযোগদান বাহুল্য বলে বিবেচিত হয় এবং এলিটগণ তাঁদের দৃষ্টি ভিন্নতর ফোকাসে নিবদ্ধ করেন।

সংস্কার-আন্দোলনের আংশিক মাত্র সফলতার একটি কারণ প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের অভাব। বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পোষকতা করলে তা যতো দ্রুত ও ব্যাপক হারে সাফল্য অর্জন করতে পারে, কেবল সেক্যুলার মানবতার আবেদন প্রথাবদ্ধ সমাজে ততো কার্যকর হয় না। বঙ্গদেশীয় সংস্কার আন্দোলন ধর্মীয় সমর্থনের অভাবে সীমিত সাফল্য অর্জন করে। ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৬০-এর দশকে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সিভিল বিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বিশেষত নব্য ব্রাহ্মদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এঁদের উদ্যোগে সিভিল বিবাহ আইনও প্রণীত হয় (১৮৭২ সালের ৩ আইন)। এঁদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বেশ দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে এবং অবরোধ মোচনেরও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ, সিভিল বিবাহ এবং অবরোধ মোচনের আদর্শ ঐতিহ্যিক সমাজের মূল্যবোধকে বড়ো বেশি বিচলিত করে। এ জন্যে এ সমাজ এসব ধারণা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। কেবল তাই নয়, এসব ধারণার পোষকতা করায় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয় (১৮৬৬ খৃস্টাব্দ) এবং সংস্কারের সমর্থক অংশ (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ) হিন্দু সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সিভিল বিবাহ আইন এই বিচ্ছিন্নতাকে দৃঢ়মূল এবং স্থায়ী করে।

তবে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মদের অতুলনীয় ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। এঁদের দৃষ্টান্তেই ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়। বিবাহে পাত্র-পাত্রীর মতামতকে যথোচিত মূল্যদান করা, বহুবিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখা, মদ্যপান ও লাম্পট্যকে অশুচি বলে জ্ঞান করা, মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা এবং তাঁদের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দান করার মনোভাব প্রধানত ব্রাহ্মসমাজেই দানা বাঁধে, পরে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তাকে অনুসরণ করে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের সম্মুখে যে দৃষ্টান্ত রাখে, হিন্দু সমাজ তাকেই অলক্ষ্যে অনুকরণ ও স্বীকরণ করে।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ও ইহলৌকিকতার প্রায় পরস্পরবিরোধী আদর্শ সম্পর্কে বলা যায়, প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিকতার

চেয়ে সেক্যুলার মানবতার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দান করে। এর সঙ্গে তুলনীয় দৃষ্টান্ত ইউনিটারিআন খৃস্টান সমাজ।

বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ইউনিটারিআনদের যোগাযোগ ঘটে আকস্মিকভাবে। কিন্তু এই যোগাযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। রামমোহন রায়ের সঙ্গে ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকার ইউনিটারিআনদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা প্রধানত তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারকগণ ইউনিটারিআনদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। একেশ্বরবাদ এবং সমাজ-সংস্কারের ইউনিটারিআন আদর্শ কেবল তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ব্রাহ্মসমাজকেই প্রভাবিত করেনি, কিছু ব্রাহ্মভাবিত হিন্দুও এই আদর্শ অনুসরণ করেন। (যেমন রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কার্তিকেয় চন্দ্র রায় এবং প্যারীচরণ সরকার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও এই দলভুক্ত করা যায়, যদি তাঁকে হিন্দু বলা যায়।)

বাস্তব ক্ষেত্রে কয়েকজন ইউনিটারিআন এ আন্দোলনে যোগদানও করেন। এদেশের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে Mary Carpenter, C. H. A. Dall, Annette Akroyd প্রমুখের অবদান অবশ্যই মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

আলোচ্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ধারাগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; কতকগুলি ধারা ধর্মসম্পৃক্ত এবং কতকগুলি সেক্যুলার। বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি যেমন বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, সিভিল বিবাহ এবং জাতিভেদ প্রভৃতি ছিলো ধর্মসম্পৃক্ত। অপর পক্ষে, বিবাহের বয়স, পাত্রপাত্রীর পছন্দ, স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধমোচন, স্ত্রীস্বাধীনতা, মদ্যপান, লাম্পট্য, মহিলাদের পোশাক ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে ধর্মের চেয়ে দেশাচারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর ছিলো।

ধর্মসম্পৃক্ত সমস্যাগুলির সাফল্য আসে খুব সীমিত মাত্রায়। বহুবিবাহ এবং কন্যাবিক্রয়ই এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম। সম্ভবত বল্লাল সেন, দেবীবর প্রভৃতি অদূর অতীতের ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলেই এ প্রথাদ্বয় ধীরে ধীরে ধর্মীয় সমর্থন হারিয়ে ফেলে এবং সাধারণ মানুষ এই প্রথা দুটিকে বর্জন করে।

সেক্যুলার সমস্যাগুলির সফলতা আলোচ্যকালে খুব দ্রুত গতিতে না এলেও ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আসতে থাকে। এক্ষেত্রে অবরোধ মোচন এবং স্ত্রী-স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা এবং উপার্জন ক্ষমতার অভাববশত সেকালের মহিলারা ছিলেন সংসারের সকল কর্তৃত্ববর্জিত এবং পুরুষরা

এই অধীনতাকেই চিরস্থায়ী করতে চান। এ জন্যই অবরোধ মোচন এবং স্বাধীনতার প্রস্তাব পুরুষসমাজ আদৌ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সেকালের সমস্যাগুলি নিয়ে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন হয় তার অনেকগুলিই ইংলণ্ডের অনুকরণ বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও ইউনিটারিআন খৃস্টান ও চার্চবিরোধী ব্যক্তিদের উদ্যোগে সমাজ সংস্কার আন্দোলন স্ফূর্তি লাভ করে। এই আন্দোলনেরই কয়েকটি ধারা বঙ্গদেশে অনুসৃত হয়। বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবর্তন, সিভিল বিবাহ রীতির প্রচলন এবং পানাসক্তি-বিরোধী আন্দোলন অনেকাংশে ইংলণ্ডীয় আন্দোলনেরই অনুকরণ।

তবে ইংলণ্ডীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এদেশের আন্দোলনের একটি পার্থক্য লক্ষণীয়। ইংলণ্ডের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো দরিদ্র বিশেষত কল-কারখানার শ্রমিকদের দুর্গতিমোচন। কিন্তু সেকালে এ ধরনের প্রোলেটারীএট বঙ্গদেশে ছিলো না। দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাবশত এলিটগণের মনোযোগও এদিকে নিবদ্ধ হয়নি। অপর পক্ষে, নগরবাসী ভদ্রলোকদের ঘরেই যে মহিলারা ছিলেন, তাঁদের দুর্গতির সীমা ছিলো না। সুতরাং বঙ্গদেশে প্রোলেটারিএটের ভূমিকা গ্রহণ করেন মহিলারা। এ জন্যে বঙ্গদেশের সমাজ সংস্কার আন্দোলন কার্যত নারীমুক্তি আন্দোলনের রূপ নেয়। বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, সিভিল বিবাহ, পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ, ভদ্র পোশাকের প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসমবয়স্ক বিবাহ, কন্যাবিক্রয়, মদ্যপান ও লাম্পট্য নিবারণের আন্দোলন আসলে নারী ও পরিবারের কল্যাণের কথা মনে রেখেই পরিচালিত হয়েছিলো। জাতিভেদ দূরীকরণ এবং সমুদ্রযাত্রা বৈধীকরণের মতো আন্দোলনের দু-একটি ধারাই ছিলো এর ব্যতিক্রম।

আন্দোলনকারীদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করা যায় তাঁদের সামাজিক পটভূমির বিশ্লেষণ থেকে। এই আন্দোলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজি শিক্ষা তখনো পর্যন্ত কলকাতার বাইরে (ঢাকার মতো দু-একটি জিলা শহর ছাড়া) বিস্তার লাভ করেনি। তা ছাড়া এ সময়ে ইংরেজি শিক্ষা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিকাশ লাভ করে নি। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, এ আন্দোলন ছিলো নগরবাসী, উচ্চবর্ণের, উচ্চ বা মধ্যবিত্তের শিক্ষিত হিন্দুদের। বঙ্গদেশে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীদের এক-দশমাংশও নয়। এঁদের মধ্যেও আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন নগরবাসী ভদ্রলোকই এ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হন। এ আন্দোলনের নেতাদের সামাজিক পরিচয় এই যে, তাঁদের কেউ

ছিলেন শিক্ষক (যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী), কেউ সাংবাদিক (যেমন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিশচন্দ্র মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্ণচন্দ্র বসু, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী), কেউ পেশাদার (যেমন দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, ভুবনমোহন সরকার), কেউ সরকারী চাকুরে (যমন কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র), কেউ শিক্ষিত জমিদার (যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, রাখালচন্দ্র রায়, সত্যশরণ ঘোষাল), কেউ বা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক (যেমন কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। সংক্ষেপে তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

সেকালের সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিতান্ত দুর্বল ছিলো এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-জাত নতুন মূল্যবোধ এবং সচেতনতা বিকাশ লাভ করেছিলো অতি ক্ষুদ্র একটি গণ্ডির মধ্যেই। এ জন্যে আন্দোলনকারীরা সমস্ত দেশবাসীকে তাঁদের আন্দোলনের শরিক করতে পারেননি। সমাজের উচ্চ শিখরে সংস্কারের যে আলোক প্রজ্বলিত হয়েছিলো, তাই সীমিত মাত্রায় মন্থরগতিতে নীচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবা হরিশচন্দ্র মিত্রের মতো স্বল্পশিক্ষিত মফস্বলবাসী নিম্নবিত্তের মানুষরা এ কারণে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাতে অংশ গ্রহণ করেন।

আন্দোলনকারীদের আন্তঃজাতি (intracaste) সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁদের আন্দোলন প্রয়াস থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এঁরা নিজেরা সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন এবং সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষদের সমস্যা এবং কল্যাণই ছিলো এঁদের লক্ষ্য। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো কুলীন ব্রাহ্মণ আবার কেবল কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে ভাবিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর যে বহু-বিবাহ সমস্যা বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা প্রকাশ করেন, অসম্ভব নয় যে, তার কারণ কুলীন ব্রাহ্মণ হিশেবে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের সমস্যা সম্বন্ধে বেশি অবহিত ছিলেন, হয়তো উৎকণ্ঠিতও ছিলেন।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আন্তঃজাতি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে একটি প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনকারিগণ স্বীকরণ করেন। এ জন্যেই দেখতে পাই, বহুবিবাহ আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন বিশেষত আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, তাঁদের অনেকেই ছিলেন অকুলীন, এমন কি অব্রাহ্মণ।

আলোচ্য আন্দোলনে নাট্যকারকগণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা প্রায় সকলেই নাটক রচনা করেন সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে নাটকের ভূমিকাতেই তাঁরা এ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন।[১] মাইকেল মধুসূদনের মতো অথবা দীনবন্ধু মিত্রের মতো শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের হাতে পড়ে এ রকমের উদ্দেশ্যমূলক নাটকও ক্ষেত্র বিশেষে সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়, কিন্তু অধিকাংশ নাটক-প্রহসনই আদৌ সাহিত্য বলে চিহ্নিত হতে পারে না। নাটকের আবেদন প্রত্যক্ষ, পক্ষীয়-বিপক্ষীয় মতামত সংলাপাকারে তুলে ধরাও সহজ, এ জন্যেই এসব নাট্যকার-সংস্কারক প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে নাটককেই বেছে নিয়েছিলেন; নয়তো নাটকের রূপতত্ত্ব কিংবা রসতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিলো না। অনেক স্থানে এদিকে তাঁরা তেমন মনোযোগও দেননি। বরং প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র বা কড়চার মতো প্রশ্নোত্তরের সংলাপ সাজিয়ে (যেমন রামমোহন রায় করেছিলেন) তাঁরা সমস্যা ও সমাধান পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। এ জন্যেই এসব রচনাকে নাটক-প্রহসন না বলে সংলাপাকারে লেখা 'নাট্য'-রচনা বলে আখ্যায়িত করতে হয়।

এই নাটক-প্রহসনগুলির গুণগত মান যেমনই হোক না কেন, সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে এগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না। এ নাট্যরচনাসমূহ আন্দোলনের প্রতি জনগণের উৎসাহ বর্ধন করে। সে সময়কার একটি অভ্রান্ত মনোভাবের চিত্রও এসব লেখায় বিধৃত আছে।

তবে সংস্কারকগণের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নাট্যকারগণের রচনাতেও প্রত্যক্ষ। দীনবন্ধু মিত্র আদ্যরস সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করেন, আবার তিনি নিজেও কুলীন কায়স্থ ছিলেন। জনৈক 'শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ' কন্যাবিক্রয় বিষয়ক নাটক রচনা করেন এবং কন্যাবিক্রয় সমস্যাটিও শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদের। প্রথম দিকের নাট্যকারগণ কেবল যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে নাটক-প্রহসন রচনা করেন, তাই নয়, তাঁদের পাত্রপাত্রীগণও নিজের নিজের সম্প্রদায়ের মানুষ (কায়স্থ নাট্যকারের পাত্রপাত্রী কায়স্থ, ব্রাহ্মণ নাট্যকারের পাত্রপাত্রী ব্রাহ্মণ)।[২]

১৮৬০ এর দশক থেকে নাট্যকারদের খণ্ডিত দৃষ্টি ঔদার্য লাভ করতে থাকে। এ সময়ে হরিশ্চন্দ্র মিত্র, নফরচন্দ্র পাল, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ নাট্যকার অব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও কন্যাবিক্রয় সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করেন। এ দশকের শেষ দিকে দীনবন্ধু মিত্রও ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করেন (লীলাবতী)।

কিন্তু এ নাট্যকারগণ যেহেতু সকলেই পূর্বোক্ত আন্দোলনকারীদের মতো সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন এবং নাটকগুলির পাঠক এবং দর্শকরাও

১ দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট।
২ দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট।

মোটামুটি উচচ স্তরের, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নগরবাসী ছিলেন, সে জন্যেই এ নাটকগুলিও সর্বসাধারণের মধ্যে অভিপ্রেত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে নি।

সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এই নাট্যকারগণ এবং তাঁদের রচনাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায়, আন্দোলনের মধ্যাহ্নকালেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাটক-প্রহসন রচিত হয়। বিধবাবিবাহ বিষয়ক নাটক সবচেয়ে স্ফূর্তি লাভ করে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে, ১৮৭২ সালের পর বহুবিবাহবিষয়ক, ১৮৭০ সালের পর কন্যাবিক্রয় বিষয়ক, ১৮৭৫ সালের পরে মদ্যপান ও লাম্পট্যবিষয়ক নাটক-প্রহসন রচনার ধারা শুকিয়ে আসে কারণ এসব সমস্যা নিয়ে যে আন্দোলন সমাজকে উত্তেজিত করেছিলো, তা এ সময়ে অনেকটা প্রশমিত হয়। আসলে সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবেই এ নাটকগুলি রচিত হয়। আবার এসব নাট্যরচনা আন্দোলনের পোষকতা করে তাকে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়। আন্দোলনের যৎকিঞ্চিৎ প্রাথমিক সাফল্য এবং শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে সমাজের মনোযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলে এসব নাটক-প্রহসন রচনার উৎসাহও নিভে যায়।

India Office Library-তে রক্ষিত ১৮৫৪ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে রচিত সাত শতাধিক নাটক-প্রহসনের[৩] বিষয়বস্তুকে স্থূলভাবে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুরুতে বেশির ভাগ, বলতে গেলে প্রায় সব নাটক-প্রহসনেরই বিষয়বস্তু ছিলো সামাজিক কোনো না কোনো সমস্যা। তারপর দুটি-একটি করে ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক নাটক রচিত হতে থাকে। ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক-প্রহসন পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যায় রচিত হয়। ১৮৭৫ সালে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক এবং পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা প্রায় সমতা অর্জন করে। কিন্তু তারপরেই সামাজিক নাটকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হওয়ায় ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনায়ও ভাঁটা পড়ে। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়।[৪] পৌরাণিক নাট্যরচনার মাধ্যমে জাতীয়তা এবং দেশপ্রেমের চেতনাই উৎসাহিত ও তৃপ্ত হয়।

অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের আনুকূল্য করবে মনে করেই কুলীনকুলসর্বস্ব, বিধবাবিবাহ, লীলাবতী,

৩. India Office Library-তে এ সময়কার যতো নাটক রক্ষিত আছে, অন্য কোনো গ্রন্থাগারেই তা নেই।

৪. এই নাটকসমূহের অঙ্কিত রেখাচিত্রের জন্যে দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট—ঞ।

সধবার একাদশী, একেই কি বলে সভ্যতা, নগ্নশো রূপেয়া ইত্যাদি নাটক-প্রহসনের অভিনয় করা হয়। এই প্রয়াস আসলে সংস্কার আন্দোলনেরই অংশ বিশেষ। এসব অভিনয়ের ফলে সমস্যাগুলি সম্পর্কে দর্শকগণ অধিকতর সচেতন হন, এমন মনে করা যেতে পারে।

সংস্কার আন্দোলনে ভাঁটা পড়ায় এ ধরনের সামাজিক নাটকের অভিনয়েও উৎসাহ কমে যায়। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ায় অল্প কিছু দিন সামাজিক নাটকের অভিনয় উৎসাহিত হলেও, শীঘ্রই অভিনেতা, অধিকারী এবং দর্শকদের মনোযোগ ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক-প্রহসনের দিকে ধাবিত হয়। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে এ ধরনের নাটক-প্রহসনের অভিনয় অতি-মাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই অত্যুৎসাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়।

সরাসরি দেশপ্রেম এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা বলা এই আইনের ফলে শক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং অতঃপর পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার ও অভিনেতাগণ নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও তার অতিরঞ্জিত ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চান। বাংলা রঙ্গমঞ্চ এ জন্যে ১৮৭৬ সালের পরে ভক্তিবাদের বন্যায় প্লাবিত হয়।

মনোযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে সংস্কার আন্দোলন অকালে শুকিয়ে যায়। অমীমাংসিত মানবিক সমস্যাগুলি অতঃপর নাটকের সীমানা থেকে বর্জিত হয়। কিন্তু জীবন্ত সামাজিক সমস্যা হিশেবে এরা নাটকের পরিবর্তে স্থান করে নেয় কথা-সাহিত্যে। রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে আরম্ভ করে শিবনাথ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেই বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহে পাত্রপাত্রীর মতামত, নারীদের দুর্দশা, পানাসক্তি, লাম্পট্য প্রভৃতি সমস্যা তাঁদের উপন্যাসে চিত্রিত করেন।

পরিশিষ্ট ক

প্রথম অধ্যায়ে আমি দাবি করেছি যে, 'বিধবার পুনর্বিবাহ' (বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর, এপ্রিল ১৮৪২) প্রবন্ধটি সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা। এই রচনার লেখক কে, পত্রিকায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু সম্পাদকদের কেউ যে এ রচনার লেখক নন, তা বোঝা যায় 'কোনো পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত'—উক্তি থেকে। এ রচনার ভাষা খুব বেশি বিদ্যাসাগরীয় নয়। ১৮৪২ সালে বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্য ঠিক কেমন ছিলো তা বোঝার উপায় নেই, কেননা তখনো পর্যন্ত তাঁর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং তুলনামূলক বিচার করার উপায় নেই। তবে ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন, তার সঙ্গে এই রচনাটির কাঠামোগত মিল লক্ষ্য না-করে পারা যায় না।

এই রচনার শুরুতে বিধবাবিবাহের অপ্রচলনহেতু সমাজে যে ব্যাপক অনিষ্ট ঘটছিলো, সে বিষয়ে সাধারণ উল্লেখ করে তারপর শাস্ত্রবিচারে লেখক প্রবৃত্ত হয়েছেন। শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের পর লেখক বিধবাবিবাহের রীতি পুনঃপ্রচলনের জন্যে সাধারণজনের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। অনুরূপ রীতি পূর্বোক্ত পুস্তিকায়ও অনুসৃত হয়েছে। বলা হয় যে, বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে বিধবাবিবাহের বৈধতা আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তিকায় যে শাস্ত্রীয় উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেন তার বেশির ভাগ এই রচনায়ই সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চম সংখ্যা বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে (জুলাই ১৮৪২) 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামক রচনায় পরাশরের বিখ্যাত শ্লোকেরও উল্লেখ ছিলো। এই রচনাদ্বয়ের অন্তত প্রথমটি বিদ্যাসাগরের রচিত না হলে বলতে হয়, বিধবাবিবাহ প্রথম পুস্তক রচনাটি বিদ্যাসাগরের নামে প্রকাশিত হলেও তাঁর কিছুমাত্র মৌলিকত্ব ছিলো না। বরং বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধ অবলম্বনে ঋণ স্বীকার না করেই তাঁর পুস্তিকাটি রচনা করেন।

এই প্রবন্ধের এবং পুস্তিকার একটি বাক্যাংশের যে-ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করি, তা নিতান্ত আকস্মিক এমন মনে হয় না। এই প্রবন্ধের একটি বাক্যাংশ—'এক্ষণে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে...।' তুলনীয় একটি বাক্যাংশ এ পুস্তিকায়ও লক্ষণীয়।—'বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে...।'

এ প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের কিনা সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা না গেলেও, বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক ১৭৭৬) 'বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা' প্রবন্ধটি যে বিদ্যাসাগরেরই রচনা তা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বিধবাবিবাহ প্রথম পুস্তক এবং সর্বশুভকরী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করে বিষয়বস্তু, যুক্তিপরম্পরা এবং বক্তব্যের অতি ঘনিষ্ঠ মিল থেকে বলা যায় এ রচনাটি বিদ্যাসাগরের লেখা। এ প্রবন্ধের ভাষা এবং রচনাশৈলিও একান্তভাবে বিদ্যাসাগরীয়।

নিম্নে এ রচনার সঙ্গে প্রথমে 'বাল্যবিবাহের দোষ' এবং পরে বিধবাবিবাহ প্রথম পুস্তকের সাদৃশ্য দেখানো হলো।

'বাল্যবিবাহের দোষ'	'বিবাহ-বিষয়ে এতদ্দেশীয় কুপ্রথা'
বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর যে পরস্পর প্রণয় তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের প্রণয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে ...।	এদেশে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হইবার রীতি প্রচলিত থাকাতে কি সর্বনাশ না হইতেছে? অনেকে বিবাহ করিয়াও যাবজ্জীবন উদ্বাহ-সুখে বঞ্চিত থাকিয়া মহাকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। এদেশে দম্পতির মধ্যে যে সকল অপ্রণয়, কলহ এবং বিরক্তির ভাব দেখা যায়, উক্ত রীতিই তাহার এক প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।
সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্যপরিণয় প্রযুক্ত ক্ষয় পায় ... বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ .....।	এদেশী লোকের হতবীর্য হইবার এবং শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্বক নানাপ্রকার রোগশোক ভোগ করিবার এমত প্রবল কারণ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না।
নববিবাহিত বালকবালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ বিদগ্ধতা বাক-চাতুরী কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাস করণে ও প্রকাশ করণে সর্বদা সযত্ন থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনায় বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া...।	এই রীতির নিমিত্ত এদেশীয় বালক-বালিকাদিগের অনুপযুক্তকালে মনের ভাবান্তর হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য হইয়া তাহাদিগের প্রকৃত সুস্থতাসাধন ও পুষ্টিবর্ধনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, এবং বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বাধা উপস্থিত হয়।

বিধবাবিবাহ	'বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা'
ভাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় . . .	উদ্বাহ-পর্বের কথা মনে হইলেই . . . শোণিত শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, . . .
বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে।	. . . অবশ্যই তাহাকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে. . . এদেশীয় এই কুরীতির প্রভাবে ভারতবর্ষের কত কন্যা যে যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া উদ্বন্ধন এবং বিষপানাদির দ্বারা আত্মঘাতিনী হইয়াছে, কত কন্যা যে শারীরিক বিকারে অধৈর্যা হইয়া সন্তাননাশ প্রভৃতি অসংখ্য অদ্ভুত পাপের সৃষ্টি করিয়াছে এবং কুলভয় ও লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্যভিচারিণী হওয়াতে পিতৃকুল ও ভ্রাতৃকুলের মাননাশিনী হইয়াছে . . .

আলোচ্য প্রবন্ধের ভাষাও নির্ভুলভাবে বিদ্যাসাগরীয়। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ থেকে এ কথার সত্য অনায়াসে অনুধাবন করা যায়।

"যাহার বিষয় যখন আলোচনা করা যায় তাহারই নিমিত্তে তখন অসম্ভব আক্ষেপ করিতে হয়; চিন্তাতে আকুল হইয়া একেবারে হতাশ হইতে হয়, এবং বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। এদেশের এক উদ্বাহ-পর্বের কথা মনে হইলেই কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, শোণিত শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, এবং মন যেন জলন্তানলে জ্বলিতে থাকে। . . .

সন্তানের কোন যোগ্যতা—কোন উপার্জন শক্তি না দেখিয়া তাহার উদ্বাহ-পর্বে আমোদিত হইয়া অনায়াসে তৎকর্ম সম্পন্ন করা কি ভয়ানক কুকর্ম? শৈশবাবস্থায় পুত্র যখন নিতান্ত বালক; নিতান্ত অবোধ, যখন তাহার কতিপয় বর্ণপরিচয়মাত্রই জ্ঞানের সীমা, এবং দৈহিক কার্যমাত্রই কেবল কর্তব্যবোধ, যে সময় তাহার অপর ব্যক্তির ভার বহন করা দূরে থাকুক, সে প্রাপ্ত অন্ন উত্তমরূপে ভোজন করিতে অশক্ত, পরিধেয় বস্ত্র সুচারুরূপে ধারণ করিতে অপটু এবং সামান্য বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম;—যখন সে সন্তান মূর্খ হইবে, কি পণ্ডিত হইবে, ধনী

হইবে কি দরিদ্র হইবে, সাধু হইবে কি অসাধু হইবে, তাহার কিছুই নির্দেশ করিবার উপায় হয় না, তৎকালে পিতামাতা জ্ঞাননেত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, এবং হৃদয়কে পাষাণসদৃশ কঠোর করিয়া সেই সন্তানের সহিত অল্পবয়স্কা কন্যার পরিণয়কার্য সম্পন্ন করিলে কেন না উত্তরোত্তর দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইবেক? . . .

বিবাহ বিষয়ে এদেশে আর যে একপ্রকার কুরীতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে... তাহার নাম করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মনুষ্য নিতান্ত নির্দয়—নিতান্ত নিষ্ঠুর না হইলে, এককালে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠোর না করিলে এবং বৃক্ষপর্বোতাদির ন্যায় অচেতন না হইলে যে কর্ম করিতে পারে না, উক্ত কুরীতির অনুসারে মহামহা বিচক্ষণ লোক অক্লেশে সেই কার্য করিয়া থাকে।

কোন বুদ্ধিমান লোক না স্বীকার করিবেন যে যৌবনাবস্থায় স্ত্রীর বিয়োগ হইলে পুরুষের যেমত পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পরমেশ্বর প্রণীত শারীরিক নিয়ম পালন করা বিধি, সেইমত অল্পবয়স্কা স্ত্রীদিগের স্বামী হত হইলে দ্বিতীয়বার পাণি গ্রহণ করিয়া শারীরিক ধর্মের রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। . . .

ধর্মশাস্ত্র মধ্যে বয়সের তারতম্যানুসারে বিধবাদিগের আচারব্যবহারের কোন ইতরবিশেষ করা নাই; পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর পতিবিয়োগ হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাহাকে যেমত বেশভূষাবর্জিতা হইয়া সময়ে সময়ে উপবাস ও অল্পাহার করিয়া দুঃসহ শারীরিক কষ্ট স্বীকার পূর্বক ঘোরতর নিয়মসকল পালন করিতে হয়, পঞ্চবর্ষীয়া কন্যারও দুর্ভাগ্যবশত বৈধব্য দশা হইলে, তাহার প্রতি সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিবার বিধি আছে। এবং পিতামাতাও বিষম ভ্রমে অন্ধ হইয়া অনায়াসে সেই বালিকা দুহিতাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এদেশীয় লোকের এত বিপুল অজ্ঞানতা যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণের মধ্যে কোন নিয়মিত দিবসে পিতামাতা যদি বালবিধবা কন্যাকে উপবাসের কষ্টে বা দারুণ পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেও দেখে তথাপি আপনাদিগের ধর্মভ্রম দূর করিয়া তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ আহার বা জলদান করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না।. . ., কি আশ্চর্য। কি মূঢ়তা। কি মহাভ্রম। এ আচার দৃষ্টে কখনই বোধ হয় না যে, ইহারা বিধবা স্ত্রীদিগের কোন সজীব প্রাণী বলিয়াও মনে করে, যেহেতু বুদ্ধি চৈতন্যবিশিষ্ট লোকে কোন পশুপক্ষীর প্রতিও এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। . . ."

পরিশিষ্ট খ

Widow Remarriage Papers, National Archives, New Delhi List of Papers of Act XV of 1856

(1) Petition of certain inhabitants of Bengal with a forwarding letter from Vidyasagar, dated Oct. 4, 1855.

That by long established custom the marrieges of widows among Hindoos is prohibited—

That in the opinion and firm belief of your petitioners this custom, cruel and unnatural in itself, is highly prejudicial to the interests of morality and is therwise fraught with the most mischievaus consequences to society.

That the evil of this custom is greatly aggravated by the practice among Hindoos of manying their sons and daughters at a very early age and in many cases in their very infancy, so that female children not unfrequently become widows before they can speak or walk.

That in the opinion and firm belief of your petitioners their custom is not in accordance with the Shastras or with a true interpretation of Hindoo Law.

That your petitioners and many other Hindoos have no objections of conscience to the marryings of widows and are prepared to disregard all objections to such marriages founded on social habits or on any scruple resulting from an erronous interpretation of religion.

That your petitioners are advised that by the Hindoo Law, as at present administered and interpreted to the Courts of Her Majesty and the East India Company, such marriages are illegal and the issue thereof would be deemed illegitimate.

That Hindoos, who entertain no objections of conscience to such marriages and who are prepared to contact them notwithstanding social and religious prejudices, are by the aforesaid interpretation of Hindoo Law prevented therefrom.

That in the humble opinion of your petitioners it is the duty of the Legislature to remove all legal obstacles to the escape from a social evil of such magnitudes which, though sanctioned by custom, is felt by many Hindoos to be a most injurious grievance and to be contrary to a true interpretation of Hindoo Law.

That the removal of the legal obstacles to the marriage of widows would be in accordance with the wishes and feelings of a considerable section of pious and orthodox Hindoos and would in no way affect the interests, though it might shock the prejudices of those who conscientiously believe that the prohibition of the marriage of widows is sanctioned by the Shastras and who uphold it on fancied grounds of social advantage.

That such marriage are neither contrary to nature and prohibitted by laws or custom in any other country or by any other people in the world.

That your, petitioners therefore humbly pray that your Honorable Council will take into early consideration the propriety of passing a law (as annexed) to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo widows and to declare the issue of all such marriages to be legitimate.

And your petitioners as in duty
bound shall ever pray—

Jaykissen Mukherjee
Harish Chunder Banerjee
Loknath Chatterjee
Bipin Bhusan Mukherjee (?)
কাশীকুমার শর্মণ
J---------Ray Choudhury
ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রী ঠাকুরদাস মুনশী (?)
Huromohun Mukerjee
বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়
Chundercumar Chatterjee
Rammohun.. .. .. ..
Juggobundhoo Banerjee
বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী
তারানাথ তর্কবাচস্পতি
Prasanno Kumar Sarbadhikary
Prussunno Chunder Roy
Sreenath Das
Tarini Charun Chatterjee
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
Rajkrisna Banerjee
সুরদেব চট্টোপাধ্যায়
জয়গোপাল সিদ্ধান্তশেখর
Bimal Charun Dey
Nabin Chunder B . . . .
Nabakumar Singh
Madhoosoodan Mitter
হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার
Khetter Mohun Chatterjee
Nilcomul Banerjee
Prasanno Chunder Chatterjee
Woomachuran Mookerjee
Taraprasanna Chatterjee
Abinash Chunder Banerjee
Kashinath Datt
Chundernath Chakravarty
Gopeshmohun Mookerjee
Khettra. . . . . .D. . .
Bhagabathi Prasad Ghose
Paddolochan Banerjee

J-------Chunder B.....
Denonath Mookerjee
Harruchunder Mitter
Ishan Chunder Dutt
Mahesh Chunder Coomar
Gopal Chunder Bose
Tarapersad-----------------
G- - - - Chunder Dutt
Umacharan Mitter
Satcoory Dutt
Shamachuran Dey
- - - - - - - - - - - - - - - পাধ্যায়
Caliprasanno Chatterjee
Chandrasekhar Dev
Nilmani Mitra
অযোধ্যানাথ পাকড়াসি
জয়গোপাল চৌধুরী
কানাইলাল মিত্র
Gopal Chunder Bose
- - - - - - - - - - - - - - -
Nilmadhab Mukherjee
Brajanath Chatterjee
Shashibhushan Bhadury
Bistoo Chunder Biswas
Dwarakanath Mitter
Prasanno Coomar Ghose
Taracknath Mookerjee
Nakur Chandra Ghosal
Mohesh Chandra Ghose
Issur Chandra Mookerjee
Manick Chunder Roy
Aughurnath Ghoshal
Narain Chunder- - - - -
Lukkinarain Lahiri
Ram--------Dutt
Haritaran Bhattacherjee

Denonath Biswas
....
Chander----------D-----
গোবিন্দচন্দ্র বসু
Radhanath Deb
Trilochan Mitter
Lalchand Dey
- - - - - - - - - - - - - - - -
Bissonath Dey
Ramcomul Bose
Greesh Chunder Mitter
জগন্নাথ রায়
.....বিশ্বাস
Brajanath Sing
নবীনচন্দ্র সরকার
Mohesh Chunder Dutt
Obhoy Churun Singh
- - - - - -nath Ghosal
....
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Gopal Chunder Dutt
Jaggobandhu Kar ?
Brajagopal Banerjee
Jadab Chunder Banerjee
Poornachunder Ghose
Callicoomar Dass
Nacoolchunder Datt
রাম.....পাধ্যায়
- - - - - - - - - - - - - -
Kaylas Coomar Dass
- - - - - - - - - - - - - - -
মৃত্যুঞ্জয় দাস সেন
Nabin Chunder Palit ?
Govinda Chunder Sen
Mohim Chunder Sen ?
Kedarnath Mookerjee
Debendernath Tagore
Coomar Callycoomar Mallik Ray ?

Dakhinaranjan Mukherjee
Khetramohun Dutt
Kalikrisna Dutt
Akkhay Coomar Dutt
Grish Chunder Dutt
Calliprasanno Bose
Haran Ch. Mukherjee
Gooru Churun Dutt
ঘানেশ্বর শর্ম্মা
..............মুখোপাধ্যায়
Matilal Chakravarty
Shamacharun Mukherjee
Dwarknath Mukherjee
H. . . . . Prasad Chatterjee
................বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
Harish C Nandy
Nabinchandra........
Debendernauth Takoor
Jadab C Muk.
Harish C Sharma
Anangamohan Mitter
....
Dwarkanath Paul
....
Shamachurun Sen
......Bysack
......Lall Bose
Nilmani Chatterjee
Sreenath Banerjee
......Ram Mookerjee
......Chunder Mookerjee
Rajendra N Mittra
Khethramohun Ganguli
Dwarkanath Sett
Dinanath Ganguli

Dinanath Mittra
Mahendranath......
Muralidhar Sen
Rajkrisna Guha
Ram....Chakravarty
Isser Chunder Nundi
Isser Chunder Gupta
Bisessor Kur
Shama Churun Banerjee
....
Nabakrisna Ray
Jadunath Chatterjee
....
.... মুখোপাধ্যায়
Denonath Choudhury
দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য
তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
Dinonath Chatterjee
Becharam Chatterjee
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
......লাল শর্ম্মা
গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবীচরণ শর্ম্মণ
চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

রামকুমার শর্ম্মা
----- শর্ম্মা
মাধবচন্দ্র শর্ম্মণ
মতিলাল মজুমদার গুপ্ত
নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
-------পাধ্যায়
-------প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বেণীমাধব বিশ্বাস
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Kallypada Banerjee

Woomes C. Haldar
নিবারণ শর্মা
Umesh C......
সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী
লালমোহন মুখোপাধ্যায়
দীননাথ মুখোপাধ্যায়
Gopal Chandra Moitry
Gopal Chandra Mookerjee

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য
ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়
উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী
তিলকচন্দ্র শর্মা
ভবানীচরণ শর্মা
দুর্গাদাস কৃষ্ণমণি (?)

Shamlal Chatterjee
রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য
Bhagabati Churun Ganguly
........Seal
Shama ......Seal
C........Seal
Gobindalal Seal
....
....
Nabakumar Chatterjee
Dinanath Ray
Gavinda Chandra B....
Shreenath..........
Ishvar C. Sen

Krisnadas Dutt
Dinanath Dhar
............Dass
Khetra M Sen
Nittananda.. .. ..
Mohesh C. Ganguly
Ramkumar Das
..........Chatterjee
........Dey
Pareslal Mallik
......Charun Das
W. C. Sen
..........Mallik
Mohesh C. Dey
Denonath Dutt
........Mohun......
কালিচরণ ধর
....
S. .. ..Bose
Bheemlal Pain
....
.... সেন
....
....
..........Chakravarti
............Bose
Bissumbhar Seal
....
.... Chand....
K....lal Dey
Callicoomar Dutt
....
....
N.......Sen
Bholanath Chunder
N.....lal Pain

Issur Chandra Chandra
......Chandra
..........nath
Ramanath Law
....
............Sen
Ramlal.. .. ..
জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়
Kalinath Lahiri
....lal Lahiri
....mohun Lahiri
Nandolal Lahiri
........Lahiri
Issur Chander Lahiri
Radhanath Lahiri
Raj........Chunder
........lal Chunder
রাধানাথ ধর
............Sein
Grish C. Sein
........Chunder Sein
কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়
Brajanath....
....
Durga C. Law
.... Kissen Law
............Law .
Shreenath Dey
..............Dey
Jaygovind Law
বিপ্রদাস...
Khetranath Mullik
Shamchandra Bose
Gopal Ch. Dass
Harimohun Paul
Brajanath Chandra
............Law

Gopal C. Nandi
Dwarkanath Pyne
Chandicharun Soor
Banomali Soor
Rashick C. Biswas
............nath....
..........Dutt
..........Dutt
Nityananda Nundi
....
Gourdass Bysack
Haridas Dutt
Durga C. Ghosal
Nabin Chunder Mukerjee
Nabin C. Ganguly
..........Niogi
..........Ghose
Rajkrisna Ganguli
Dwarkanath Ghosh
Harimohun Mukherjee
Kaylas C. Chatterjee
..........Ganguli
....
Sreekissen Ganguly
Jay K. Ganguli
....
Radhanath Bose
Woomesh C Chowdhury (?)
Callinath Dass
Sibchunder Chatterjee
........nath Ghose
. . . ভট্টাচার্য
. . . ভট্টাচার্য
. . . মুখোপাধ্যায়
..............Mitter
....
Shame C Dass

পরিশিষ্ট খ

রামচন্দ্র চক্রবর্তী
জগমোহন শর্মা
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
মনোহর গুপ্ত
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্যামাচরণ চক্রবর্তী
রামচন্দ্র মৈত্র
R. N. Ray
K. M. Mukherjee
Shib C Bysack
Ram....Bose
Doorga C Mitter
Shama Charun Sen (?)
....
Kalli............
D. G. Mitter
K. M. Nandi
Ramchandra Bose
Mahendranath Mukherjee
....
....
Benimadhab Bose
R. C. Bysack
Jadab Chandra Mitter
....
....
....
Grish C Mukherjee
....
....
....C. Haldar
....

....
Kalikumar Ghosh
............Sen
....
............Ganguli
................Ray
Kissta Ch. Ray
....
Jadunath Dass
R. L. Pand
Kailas C. Gupta
....
................Dey
................Bose
Gapal C Mallik
N. C. Bysack
....nath Banerjee
Nabin Chunder
....
............Bysack
Badan Ch. Dutt
Tarachand Dass
R........Dutt
..........Chakravarti
Khetramohun......
Chandracoomar Chatterjee
....
..............Banerjee
Jadunath Ghose
....
........Mallick
..........Dey
..........Dass .
....
Ramgopal Ghosh
Khetromohun Bysack
..............Dass

Benimadhab Banerjee
..........Chakravarti
..........Mukerjee
..........Dass
..........Banerjee
..........Ghose
..........Ghose
..........Chatterjee
..........Bose
....
....
..........Chatterjee
..........Ghosal
Nabin Ch. Banerjee
Gopal Ch. Mitter
....
.... Chatterjee
..........Banerjee
..........Bose
....
Manik C. Bysack
Lukhinarayan Biswas
Gobin Ch. Dhur
....
..........Chatterjee
..........Chatterjee
....
....
..........Dutt
..........Dutt
Brajendranath Biswas
..........Mukherjee
....
....
..........Sett
..........Chakravarti

..........Chatterjee
..........Sett
..........Chatterjee
....
..........Chatterjee
..........Dass
G.....C.....Dutt
....
....
..........Bysack
....
........Dass
Brajanath Mallik
Nabin C. Mukerjee
G.........Ghose
..........Ghose
Madhab Ch. Mukerjee
B. C. Mukerjee
Tarak......Bysack
..........Bhattacharji
Bholanath Sett
Wooma Ch. Banerjee
....
Motilal Bysack
......das Bysack
S. Mitter
Khetramohun Sen
Gopal Chandra Mukerjee
..........Mullik
T. Banerjee
Brajanath Biswas
....
....
Ram Ch. Banerjee
Madhab Ch. Chatterjee
..........Bysack

Rasiklal Chatterjee
..........Dutt
..........Haldar
..........Day
..........Ghose
Khetramohun Baral
....
Nilcomul Mitter
....
..........Dass
..........Banerjee
..........Mitter
Kedarnath Mukherjee
Benimadhab Chatterjee
G. C. Nandi
..........Chakravarti
Nilmohi Mallick
Ram C. Sirkar
Rajaram Choudhury
..........Bysack
Rasik C. Dutt
..........Banerjee
Benimadhab......
..........Chatterjee
Tincowry Ray
Sreenath Banerjee
..........Ganguly
Pitambar Ray
Woomesh C. Mukerjee
..........Dutt
Ramlal Laha
Sreenath Ray
Kissen Ch. Ganguli
Ramgopal Bysack
N. C. Dass

B. Dass
Jaykissen Bysack
Gopalchandra Dass
..........Mallik
....
G. C. Nath
M. Bysack
..........Mallik
Nabin C. Palit
..........Dass
....
Ram Chandra Mitter
....
..........Bysack
..........Dutt
..........Bysack
Ram....Ghose
M. Haldar
..........Dass
Durgachurun Sirkar
Anangamohun....
....
Charuchandra....
..........Chatterjee
..........Banerjee
..........Ghose
..........Dutt
..........Bose
..........Chatterjee
....
..........das Pyne
Grish Ch. Bose
B. C. Dass
M. Mohun Haldar
..........Mallik
Naba........

..........Mukherjee
Gopal Chandra Chatterjee
Haricharan Bose
..........Sen
..........Bysack
..........Mukherjee
....
..........Dass
Ramkissen Mitter
Sambhu C. Dey
....
Shomnath Banerjee
. . . . Nandi
....
..........Ghose
Nabakumar Gupta
বেনী . . . দত্ত
Jaykissen Ray
বৈকুণ্ঠনাথ শর্মা
Gopal Chandra Dey
..........Dass
....
জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়
Prasanna K. Chatterjee
Ganga....Chakravarti
বটকৃষ্ণ চৌধুরী
..........Sen
অভয়চরণ দে
..........Ghosh
....
Obhoy Ch. Dutt
....
Lalmohun Dhur
বিশ্বনাথ . . .
দুর্গাচরণ . . .

. . . .
. . . . মিত্র
....
....
Kedurnath Mitter

এরপর ২৮ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠার স্বাক্ষরসমূহের কিছু নির্বাচিত নাম:
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
রামরত্ন বিদ্যালঙ্কার
ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যাভূষণ
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
গোবিন্দচন্দ্র তর্কালঙ্কার
ব্রজমোহন বিদ্যাবাগীশ
প্রিয়নাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
রামমানিক্য তর্কালঙ্কার
শ্রীরাজনারায়ণ বসু (পৃঃ ৩৪)
Rajnarayan Bose (পৃ. ৪২)
Peari Charan Mukherjee
Bhuban Mohun Sirkar
রাধাচরণ বিদ্যানিধি
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন
দিগম্বর ন্যায়বাগীশ
রামশঙ্কর বাচস্পতি
গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি
গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
Govin Chunder Dutt
Grish Ch. Ghose
Rakhaldas Haldar
তারানাথ তর্কবাচস্পতি
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
জয়গোপাল সিদ্ধান্তশেখর
হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
Eshur Chandra Sharma

পরিশিষ্ট গ

An Act to declare the lawfulness of the marriage of Hindoo widows—

Whereas the marriage of the Hindoo widows is by long established custom and received opinion prohibited, and whereas this prohibition is not only a genuine hardship upon those whom it immediately affects but also tends generally to deprevation of morals and the injury of society, and whereas it is believed by many Hindoos that this prohibition is not accordance with a true interpretation of the Shastras and whereas it is expedient to declare the Lawfulness of such marriages and to make provision for the consequence of the Second marriage of a Hindoo widow as regards her rights in her first husband's Estate. It is hereby declared and enacted as follows.—

1 No marriages contacted between Hindoos shall be deemed invalid or the issue thereof illegitimate by reasons of the woman having been previously married or betrothed to another person since deceased any custom or interpretation of Hindoo Law to the contrary notwithstanding.

2 All rights and interests to which any widow may by law have in her deceased husband's estate either by way of maintenance or by inheritance shall upon her second marriage cease and determine as if she had then died, and the next heirs of such deceased husband then having shall thereupon succeed to such Estate. Provied that nothing in this section shall affect the rights and interests of any widow in any estate or other property to which she may have succeeded or become entitled under the will of her late husband or in any Estate or other property which she may have inherited from her own relations or in any Stridhan or other property acquired by her either during the lifetime of her late husband or after his death.

Signed I. C. Sharma 4. 10. 1855

A Bill to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindoo Widows.

Whereas it is known that by the law as administered in the Civil Courts established in the Territories in the possesion and under the Government of the East India Company, Hindu widows with certain exceptions are held to

be by reason of their having been once married, incapable of contracting second valid marriage, and the offspring of such widows by any second marriage are held to be illegitimate, and incapable of inheriting property; and whereas many Hindoos believe that this im legal incapacity, although it is in accordance with established custom, is not in accordance with a true interpretation of the precepts of their religion, and desire that the Civil Law administered by the Courts of Justice shall no longer prevent those Hindoos who may be so minded from adopting a different custom in accordance with the dictate of their own consciences and whereas it is just to relieve all such Hindoos from this legal incapacity of which they complain; and the removal of all legal obstacles to the Marriage of Hindoo Widows will tend to the promotion of good morals and to the public welfare. It is enacted as follows:

I. No marriage contracted between Hindoos shall be invalid, and the issue of no such marriage shall be illegitimate, by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person since deceased, any custom or any interpretation of Hindoo Law to the contrary notwithstanding.

II. All rights and interests which any widow may by law have in her deceased husband's estate, either by way of maintenance or by inheritance, shall, upon her second marriage, cease and determine as if she had then died ; and the next heirs of such deceased husband then having, shall thereupon succeed to such estate Provided that nothing in this Section shall affect the rights and interests of any widow in any estate or other property to which she may have succeeded by inhertiance otherwise than through her deceased husband, or to which she may have become entitled under the will of her deceased husband, or in any estate or other property which she may possess as stridhun or which she may have herself acquired either during the lifetime of her deceased husband, or after his death.

Prepared and brought by Mr Grant
Read a first time on the 17th November 1855.

পরিশিষ্ট ঘ

বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিধবাবিবাহের সংবাদ

১৮৬৪—১৮৮৪

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	বর-কন্যা এবং তাঁদের বয়স	মন্তব্য	বামাপ-এর সংখ্যা
১	কলিকাতা	পার্বতীচরণ গুপ্ত (২৪), কামিনী দেবী (১৭)	ব্রাহ্মবিবাহ	শ্রাবণ ১২৭১
২	মেদিনীপুর	শ্রীধর চক্রবর্তী, তারাসুন্দরী (১৪)		আশ্বিন ১২৭১
৩	ঢাকা	জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত, মুক্তকেশী সেন		ফাল্গুন ১২৭১
৪	বরিশাল	প্যারীমোহন সরকার, রামদুর্গা (১০)		ঐ
৫	কৃষ্ণনগর	চণ্ডীচরণ সিংহ, বিরাজমোহিনী দেবী (১২)	ব্রাহ্ম মতে	ঐ
৬	বরিশাল	হরলাল সরকার, পরশমণি দাসী (১৪)		চৈত্র ১২৭১
৭	যশোহর	মাধবচন্দ্র দাস, ক্ষমাসুন্দরী (১১)		ঐ
৮	সাজাদপুর	কালীপ্রসন্ন কুণ্ড, কৃপাময়ী দাসী (১০)		জ্যৈষ্ঠ ১২৭২
৯	বরিশাল	গৌরমোহন সেন, গৌরমণি দাসী		ঐ
১০	কলিকাতা	অঘোরনাথ গুপ্ত, কাদম্বিনী সিংহ (১৮)	ব্রাহ্ম মতে	মাঘ ১২৭২
১১	মেদিনীপুর			ফাল্গুন ১২৭২
১২,১৩, ১৪,১৫	জাহানাবাদ			ঐ
১৬,১৭,১৮	ঐ			জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩
১৯	ঐ	রামদাস রায় (২৪), বরদা দেবী (১৫)	ব্রাহ্ম মতে	আষাঢ় ১২৭৩
২০	বরিশাল	বৃন্দাবনচন্দ্র তন্তবায় (২৮), কালীশ্বরী দেবী (২২)	ব্রাহ্ম মতে	ভাদ্র ১২৭৩
২১	ঐ	কিশোরচন্দ্র রজক (৩০), অন্নপূর্ণা (১৫)	ব্রাহ্ম মতে	ঐ
২২	মেদিনীপুর	স্বরূপচন্দ্র দত্ত (৩০), শশীমুখী দাসী (১৪)		ঐ
২৩	কলিকাতা	কামাখ্যানাথ ঘোষ, নিত্যকালী (১৫)	ব্রাহ্ম মতে	চৈত্র ১২৭৩
২৪	বরিশাল	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২৬), দীনতারিণী রায় (১৫)	ব্রাহ্ম মতে	শ্রাবণ ১২৭৪
২৫	বরিশাল	বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভবানীসুন্দরী (২১)	ঐ	ঐ
২৬	কলিকাতা	কাশীনাথ দে (২৫), স্বর্ণময়ী দাসী (১৫)		ঐ
২৭	ঢাকা	নবকুমার বিশ্বাস, ভুবনময়ী দেবী	ব্রাহ্ম মতে	কার্তিক ১২৭৫
২৮	কলিকাতা	চন্দ্রনাথ চৌধুরী, পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা	ব্রাহ্ম মতে	অগ্র. ১২৭৫

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	বর-কন্যা এবং তাঁদের বয়স	মন্তব্য	বামাপ-এর সংখ্যা
২৯	যশোহর	জন্মেজয় কবিরাজ (৪০), হরিমণি (১৮)		আষাঢ় ১২৭৬
৩০	জাহানাবাদ	মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহিনী		আশ্বিন ১২৭৬
৩১	কলিকাতা	উপেন্দ্রনাথ দাস, সৌরভিনী বসু		ঐ
৩২	বরিশাল	স্বরূপচন্দ্র দাস, অন্নদায়ী দেবী (২৭।২৮)	ব্রাহ্ম মতে	ফাল্গুন ১২৭৬
৩৩	কলিকাতা	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবসুন্দরী দেবী (১৪)		ভাদ্র ১২৭৭
৩৪	ভবানীপুর	ব্রাহ্মণ পাত্রপাত্রী		ঐ
৩৫	পাবনা	গোপালচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণময়ী দেবী (১৩)	ব্রাহ্ম মতে	বৈশাখ ১২৭৮
৩৬	ঢাকা	ভুবনমোহন দাস, হেমাঙ্গিনী রায়	ব্রাহ্ম মতে	আষাঢ় ১২৭৯
৩৭	হুগলি	রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহিনী সেন	ব্রাহ্ম মতে	ঐ
৩৮	পাবনা	গিরিশচন্দ্র সার্বভৌমিক (৩০), কন্যা (২০)		ভাদ্র ১২৭৯
৩৯	যশোহর	প্রহলাদচন্দ্র নাথ, রাজকুমার নাথের কন্যা (১৭)		শ্রাবণ ১২৮০
৪০	কলিকাতা	গোপালচন্দ্র ঘোষ, সারদাসুন্দরী	ব্রাহ্ম মতে	কার্তিক ১২৮০
৪১	ঐ	আনন্দচন্দ্র রায়, অনুজাকুমারী	ব্রাহ্ম মতে	পৌষ ১২৮৬
৪২	ঐ	বিপিনচন্দ্র রায় সেহানবিশ, ক্ষীরোদাসুন্দরী	ব্রাহ্ম মতে	ঐ
৪৩	বোম্বাই	বিপিনচন্দ্র পাল, নৃত্যকালী দেবী	ব্রাহ্ম মতে	মাঘ ১২৮৮
৪৪,৪৫	বগুড়া			ঐ
৪৬	সিরাজগঞ্জ	(৩৩), (২০)		চৈত্র ১২৮৯
৪৭	বর্ধমান	বিপিনবিহারী মিত্র (২১), ক্ষেত্রমোহিনী (১৪)		শ্রাবণ ১২৯০
৪৮	নলগাঙ্গা	কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় (২৫/২৬), রাজকুমারী (১৮)		ফাল্গুন ১২৯০
৪৯,৫০	ঐ			জ্যৈষ্ঠ ১২৯১

পরিশিষ্ট ৬

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র

আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা করিয়া দেখিলাম কিন্তু তোমার কাগজ খোলাসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়া ছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীন অর্ধমাত্র দিয়াছ অবশিষ্টার্ধ এ পর্যন্ত দেও নাই, এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।---

উৎস : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ : ২৮৭-৮৮।

পরিশিষ্ট চ

বহুবিবাহবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্যে প্রেরিত আবেদনপত্র

(১৮৫৬ খৃস্টাব্দ)

১. বর্ধমানের মহারাজার আবেদনপত্র।
২. নদীয়ার রাজার আবেদনপত্র।
৩. দিনাজপুরের রাজার আবেদনপত্র।
৪. কলকাতাবাসীদের আবেদনপত্র।
৫. ভবানীপুর ও আলিপুরবাসীদের পত্র।
৬. কাশীশ্বর মিত্র ও অন্যান্যের আবেদনপত্র।
৭. কলকাতা টাকশালের হিন্দু কর্মচারীদের আবেদনপত্র।
৮. অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপয় হুগলিবাসীর আবেদনপত্র।
৯-১০. শিবনারায়ণ রায় ও কতিপয় হুগলিবাসীর আবেদনপত্র।
১১. কৃষ্ণনগরবাসীদের আবেদনপত্র।
১২. জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যের আবেদনপত্র।
১৩. আউটপুরবাসীদের আবেদনপত্র।
১৪. সারদাপ্রসাদ রায় এবং কতিপয় বর্ধমানবাসীর আবেদনপত্র।
১৫. পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কতিপয় বর্ধমানবাসীর আবেদনপত্র।
১৬. রামলোচন ঘোষ এবং কতিপয় নদীয়াবাসীর আবেদনপত্র।
১৭. ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, উমেশচন্দ্র রায় এবং কতিপয় শান্তিপুরবাসীর আবেদনপত্র।
১৮. সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কতিপয় নদীয়াবাসীর আবেদনপত্র।
১৯-২০. মেদিনীপুরবাসীদের দুটি আবেদনপত্র।
২১. যশোহরবাসীদের আবেদনপত্র।
২২. ঢাকাবাসীদের আবেদনপত্র।
২৩. মুরশিদাবাদবাসীদের আবেদনপত্র।
২৪. রাজশাহীবাসীদের আবেদনপত্র।
২৫. বাঁকুড়াবাসীদের আবেদনপত্র।
২৬. দিনাজপুরবাসীদের আবেদনপত্র।
২৭. ময়মনসিংহবাসীদের আবেদনপত্র।

২৮-২৯. শান্তিপুরবাসীদের দুটি আবেদনপত্র।

৩০. কলকাতাবাসীদের আবেদনপত্র।

৩১. বরাহনগরবাসীদের আবেদনপত্র।

৩২. শ্রীমতী রাসমণি দাসীর পত্র।

৩৩. রাণী স্বর্ণময়ী দাসীর আবেদনপত্র।

৩৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্যের আবেদনপত্র।

উৎস: **Anti-polygamy tracts, no.1,** pp. 12-15.

পরিশিষ্ট ছ

বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রাহ্মদের অসবর্ণ বিবাহের সংবাদ
১৮৬০ এবং ১৮৭০ এর দশক

ক্রমিক সংখ্যা	বর ও তাঁর বর্ণ	কন্যা ও তাঁর বর্ণ	বামাবোধিনীর সংখ্যা
১	পার্বতীচরণ গুপ্ত, কায়স্থ	কামিনী দেবী	শ্রাবণ ১২৭১
২	অঘোরনাথ গুপ্ত, কায়স্থ	কাদম্বিনী	মাঘ ১২৭২
৩	বৃন্দাবন তন্তবায়, শূদ্র	কাশীশ্বরী দেবী, ব্রাহ্মণ	ভাদ্র ১২৭৩
৪	প্রসন্নকুমার সেন, বৈদ্য	রাজলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ	অগ্রহায়ণ ১২৭৩
৫	কামাখ্যানাথ ঘোষ	নিত্যকালী	চৈত্র ১২৭৩
৬	বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বৈদ্য	ভবানীসুন্দরী, ব্রাহ্মণ	শ্রাবণ ১২৭৪
৭	চন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদ্গোপ	পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, ব্রাহ্মণ	অগ্রহায়ণ ১২৭৫
৮	বিহারীলাল ঘোষ, কায়স্থ	মহালক্ষ্মী দেবী, ব্রাহ্মণ	ফাল্গুন ১২৭৬
৯	হীরালাল লাহা, কায়স্থ		অগ্রহায়ণ ১২৭৮
১০	ভুবনমোহন সেন, বৈদ্য	হেমাঙ্গিনী রায়	আষাঢ় ১২৭৯
১১	রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ	মনোমোহিনী সেন, বৈদ্য	ঐ
১২	আনন্দচন্দ্র রায়, কায়স্থ	অনুজাকুমারী, ব্রাহ্মণ	পৌষ ১২৮৬

আলোচ্যকালে অব্রাহ্মদের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটিমাত্র অসবর্ণ বিবাহের সংবাদ জানা যায়। দুটি বিবাহই বিধবাবিবাহ এবং প্রেমজ।

১	গৌরমোহন সেন, বৈদ্য	গৌরমণি দাসী, শীল	জ্যৈষ্ঠ ১২৭২
২	উপেন্দ্রনাথ দাস, কায়স্থ	গৌরভিনী বসু	আশ্বিন ১২৭৬

পরিশিষ্ট জ

কয়েকটি নাটকের ভূমিকা

সপত্নী নাটক

বর্তমান কালে, বাঙ্গালাদেশে যে সকল কদাচার ও কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষত: বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে, নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই, এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য।· · ·২৪ পৌষ ১২৬৪।

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক

পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতিমর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গাস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম।· · ·পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তাহার মর্ম এই যে 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসম্বলিত "কুলীনকুলসর্বস্ব" নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।'· · ·

· · ·ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।—"বিজ্ঞাপন", পৃ. ১-২।

ইন্দুমতী নাটক

একাল পর্যন্ত অনেকানেক মহোদয় অনেক প্রকার নাটক প্রণয়নক রিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক প্রসঙ্গাধীন অতি অল্প। অতএব আমি স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া এই ক্ষুদ্র নাটকখানি প্রকটিত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি এক ব্যক্তিরও অবলাস্ত্রীজাতীকে (sic) বিদ্যা শিখান শ্রেয় বোধ হয় তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিলাম মনে করিব।—"বিজ্ঞাপন"।

একেই কি বলে বাবুগিরি? নামক নাটিকা

আমরা আধুনিক পিতামাতার কষ্টদায়ক নব্য বাবু সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার দেখিয়া, এই প্রবন্ধটি লিখিতে অনেকদিন হইল উৎসুক হইয়াছিলাম। . . . এক্ষণে এই সকল কুব্যবহার আমাদিগকে যেন পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায়, আমরা আর না থাকিতে পারিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। . . . . ইহাদ্বারা যথা কথঞ্চিৎ বর্তমান হঠাৎ বাবুদের অবস্থা ব্যক্ত হইলে চরিতার্থ হই। . . . অবশেষে বক্তব্য এই যে, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পাঠে, বর্তমান হটাৎ (sic) বাবুরা নিজ নিজ কুব্যবহার পরিহারপূর্বক স্বীয় স্বীয় জনক জননীর প্রতি প্রীতি সহকারে ভক্তি প্রদর্শন এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হয়েন তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ মনে সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইহাই আমাদের নিতান্ত উদ্দেশ্য।—"বিজ্ঞাপন", পৃ. ৴০ —৶০।

দলভঞ্জন নাটক

আমাদিগের দেশে অদ্যাপি বহুপ্রকার কুসংস্কারজনিত অনেক কুপ্রথা প্রচলিত আছে। এই সকল কুপ্রথার জন্য বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে, এবং দেশের মঙ্গল সাধনের পথ কণ্টকময় হইয়া রহিয়াছে। যত শীঘ্র সেই সকল কুপ্রথা অন্তর্হিত হয়, ততই আহ্লাদ এবং দেশের মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু যত দিন দেশস্থ লোকের সেই সকল কুপ্রথা মহানিষ্টাপাতের কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হইবে, ততদিন সেই সকল কুপ্রথা অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত তাহা অনিষ্টকর বলিয়া দেশস্থ লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্যকর্ম। কাব্য, নাটক এবং সঙ্গীতই ইহার যেমন সদুপায় এমন আর কিছুই নয়। সভ্য দেশ মাত্রেই এই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এজন্য আমাদিগের দেশস্থ বাঙ্গালা নাটক রচয়িতাদিগের উচিত কর্ম, যে তাঁহারা এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন।

অস্মদ্দেশে দলাদলি প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে মহৎ অনিষ্টাপাত হইতেছে, তাহা যত দূর ব্যক্ত করা আমার সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই এই দলভঞ্জন নাটকে উল্লেখ করিয়াছি। দেশের কুৎসিত ব্যবহার সর্বসাধারণের সমীপে প্রকাশ করা অনেকের মত নহে। কিন্তু যখন তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা ব্যক্ত করায় বোধ হয় কোন হানি হইতে পারে না।

আমার ইহাতে যশঃ অথবা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। দেশস্থ লোকের মনে দলাদলির অপকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই কেবল আমি এই দলভঞ্জন নাটক রচনা করিয়াছি। যদি এই অভিপ্রায় অল্প পরিমাণেও সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমার সমুদয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।—"বিজ্ঞাপন", পৃ. ১—২।

আসুরোদ্বাহ নাটক

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কন্যাপণ-প্রথা যে প্রচলিত আছে; তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু অনেকেই এই কুৎসিত বিষয়ের আনুষঙ্গিক দোষ সকল অবগত নহেন। ইহার কয়েকটি দোষ জনসমাজের গোচর করিবার অভি-লাষে "আসুরোদ্বাহ নাটক" নামে এই ক্ষুদ্র নাটকখানি সাধারণের নিকট প্রকা-শিত হইল। · · ·ইহা পাঠ করিয়া যদি এক ব্যক্তির মনেও কন্যাবিক্রয়ের দোষ উপলব্ধি হইয়া তৎপ্রতিকার চেষ্টা হয়; তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব। —"বিজ্ঞাপন", পৃ. ১।

বাল্যোদ্বাহ নাটক

· · · বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন অস্মদ্দেশে যে সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ ও যদিস্যাৎ এই নাটকে কীর্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ বিবেচনায় পরম সন্তোষানুভব করিব।—"বিজ্ঞাপন", পৃ. ১।

পুনর্বিবাহ নাটক

বঙ্গদেশ ক্রমশঃ বিদ্যার বিমল বিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গবাসীগণের মধ্যে অনেকে বিদ্যবুদ্ধি প্রভাবে দেশবিদেশে বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছেন। কিন্তু আজিও অনেকগুলিন কুরীতি বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকায় ও তন্নিবন্ধন ভূরি ভূরি অনিষ্ট সংঘটন হওয়ায় আধুনিক সভ্যপ্রধান ইংরাজ প্রভৃতি জাতীয়েরা বঙ্গবাসী-দিগকে অসভ্য ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।·· কুরীতিসকল শীঘ্র উচ্ছেদ করিতে না পারিলে বাঙ্গালিদিগের অত্যন্ত লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে কতগুলি এমত কুরীতি আছে যাহা বিদেশীয়েরা শ্রবণ করিলে তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালিদের লজ্জায় মুখ দেখান ভার হয়। অতএব সেই সকল লজ্জা নিবারণে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদিগের অবশ্য কর্তব্যকর্ম সন্দেহ নাই। নতুবা তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল কিসে হইবে? আমি ইতিপূর্বে বাঙ্গীয় (Sic) কুরীতি গর্ভ "বৌ হওয়া বড় দায় গঞ্জনায় প্রাণ যায়" নামক এক-খানি নাটক রচনা করিয়া পাঠক সমাজে অর্পণ করিয়াছি।·· বঙ্গবাসিগণের পুন-র্বিবাহ প্রথা যে কি পর্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর তাহা আর বলিবার নয়।......
—"আভাষ", ১৪ আশ্বিন ১২৬৯।

ম্যাও ধরবে কে? নাটক

এদেশীয় বিধবাবিবাহ-প্রচলনোদ্যোগি-স্বাক্ষরকারিদিগকে উত্তেজনা করণা-শয়ে বিগত বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে "শুভস্য শীঘ্রং" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। আমি যে সময়ে ঐ পুস্তক প্রচারিত করি, তখন ভরসা করিয়াছিলাম স্বাক্ষরকারীগণ অনতিবিলম্বে আপনাদিগের স্থিরপ্রতিজ্ঞা প্রদর্শাইয়া এ প্রদেশে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত করিয়া তুলিবেন। এক্ষণে সে আশা অন্তঃকরণ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ যেরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, তাঁহারা কৃতার্থতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ঘটনোপলক্ষে এ প্রদেশে সাধারণ্যে যেরূপ চর্চা হইতেছে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইল। কেবল কোন কোন স্থলে কল্পনা শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট ঝ

নাট্যকার	জাতি	নাটক	প্রধান পাত্র-পাত্রী
রামনারায়ণতর্করত্ন	ব্রাহ্মণ	কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪)	ব্রাহ্মণ
উমেশচন্দ্র মিত্র	কায়স্থ	বিধবাবিবাহ (১৮৫৬)	কায়স্থ
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্মণ	বিধবোদ্বাহ নাটক (১৮৫৬)	ব্রাহ্মণ
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	,,	চপলাচিত্তচাপল্য (১৮৫৭)	,,
তারকচন্দ্র চূড়ামণি	,,	সপত্নী নাটক (১৮৫৮)	,,
নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি	,,	কলিকৌতুক নাটক (১৮৫৮)	,,
শ্যামাচরণ দে	কায়স্থ	বাসরকৌতুক নাটক (১৮৫৯)	কায়স্থ
দীনবন্ধু মিত্র	,,	নীলদর্পণ নাটক (১৮৬০)	,,
কেদারনাথ দত্ত	,,	ইন্দুমতী নাটক (১৮৬১)	,,
অম্বিকাচরণ বসু	,,	কুলীনকায়স্থ নাটক (১৮৬১)	,,
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ব্রাহ্মণ	দলভঞ্জন নাটক (১৮৬২)	ব্রাহ্মণ
কালাচাঁদ শর্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	,,	একেই কি বলে বাবুগিরি (১৮৬৩)	,,
বিপিনমোহন সেনগুপ্ত	কায়স্থ/বৈদ্য	হিন্দু মহিলা নাটক (১৮৬৮)	কায়স্থ
বনমালী চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্মণ	বরের কাশীযাত্রা (১৮৬৮)	ব্রাহ্মণ
অনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ	,,	আসুরোদ্বাহ নাটক (১৮৬৯)	,,
রামচন্দ্র দত্ত	কায়স্থ	বাল্যবিবাহ (১৮৭৪)	কায়স্থ
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	ব্রাহ্মণ	কুলীনকন্যা বা কমলিনী (১৮৭৪)	ব্রাহ্মণ

পরিশিষ্ট ঞ

১৮৫৪ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে প্রকাশিত নাটকের বিষয়ভিত্তিক লেখচিত্র

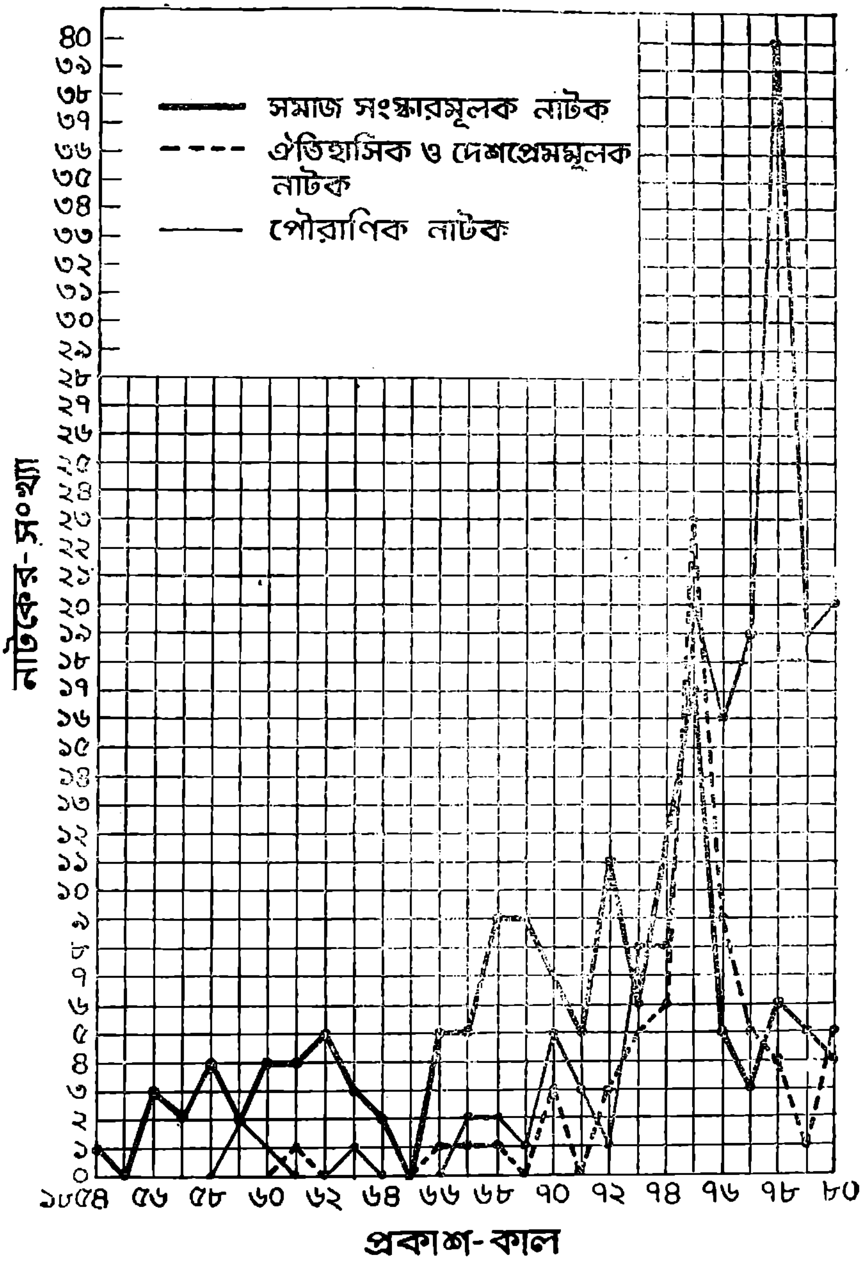

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উপকরণ

১. অপ্রকাশিত সরকারী দলিল

Widow Remarriage papres, National Archives, New Delhi.

২. সমসাময়িক পত্রপত্রিকা (১৮৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত)

অবোধবন্ধু (কলিকাতা)
আর্যদর্শন (কলিকাতা)
জ্ঞানাঙ্কুর (রাজশাহী ও কলিকাতা)
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (কলিকাতা)
তমোলুক পত্রিকা
ধর্মতত্ত্ব (কলিকাতা)
বঙ্গদর্শন
বঙ্গমহিলা (কলিকাতা)
বসন্তক (কলিকাতা)
বান্ধব (ঢাকা)
বামাবোধিনী পত্রিকা (কলিকাতা)
বিবিধার্থ সংগ্রহ (কলিকাতা)
ভারতসুহৃদ (কলিকাতা)
মধ্যস্থ (কলিকাতা)
মিত্রপ্রকাশ (ঢাকা)
রহস্য-সন্দর্ভ (কলিকাতা)
সমদর্শী (কলিকাতা)
হিতসাধক (কলিকাতা)
Calcutta Christian Observer
Calcutta Review

৩. সমসাময়িক পত্রপত্রিকার সংকলন গ্রন্থ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। চতুর্থ সং। কলিকাতা, ১৯৭২। (সমাচারদর্পণ পত্রিকার নির্বাচিত অংশসমূহ, ১৮১৮-১৮৩০।)

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯৫০। (সমাচারদর্পণ, জ্ঞানান্বেষণ, বঙ্গদূত, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা ইত্যাদি পত্রিকার নির্বচিত অংশসমূহ।)

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯৬২। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার নির্বাচিত অংশসমূহ।

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯৬৪। (বেংগল স্পেক্টেটর, সম্বাদভাস্কর, বিদ্যাদর্শন ও সর্বশুভকরী পত্রিকার নির্বাচিত অংশসমূহ।)

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯৬৬। (সোমপ্রকাশ ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার নির্বাচিত অংশসমূহ।)

Das, S. (ed) **Selections from the Indian Journals**, Vol. I, Calcutta, 1963.

৪· সমাজসংস্কারমূলক সমসাময়িক পুস্তক ও পুস্তিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্মনীতি। কলিকাতা, ১৮৫৬।

----। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সং. কলিকাতা, ১৮৫৬।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। ব্রাহ্মবিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা। কলিকাতা, ১৮৭৩।

ঈশানচন্দ্র বসু। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। কলিকাতা, ১৮৭৫।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, প্রথম খণ্ড। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত। কলিকাতা, ১৮৯৫। (প্রথম প্রকাশ ১৮৭১।)

----। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা, ১৯২৯ সংবৎ, ১৮৭২-৭৩।

----। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ২ খণ্ড। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৬১।

উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিধবাবিবাহে শেষ ফল। ঢাকা, ১৮৬৯।

কলিকাতা ধর্মসভা। বিধবাবিবাহ নিষেধবিষয়ক ব্যবস্থা। কলিকাতা, ১৮৪৫।

কালিদাস মৈত্র। পৌনর্ভবং খণ্ডনং অর্থাৎ শ্রীমদীশ্বর বিদ্যাসাগরেণ কলৌ বিধবাবিবাহ প্রচলিতার্থ নিমিত্ত নিবন্ধস্য প্রত্যুত্তরং। শ্রীরামপুর, ১৮৫৫।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ। নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব। কলিকাতা, ১৮৬৯।
------। সমাজ সংশোধনী। কলিকাতা, ১৮৭২।
কালীপ্রসন্ন বসু। স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন। কলিকাতা, ১৮৬৮।
কাশীনাথ দাসগুপ্ত। কন্যাপণ বিনাশিকা। কলিকাতা, ১৮৫৯।
কুলকালিমা। কলিকাতা, ১৮৭৩।
কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন। রীতিমূল। হুগলী, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৬২-৬৩।
কৈলাসবাসিনী দেবী। হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি। কলিকাতা, ১৭৮৭ শকাব্দ, ১৮৬৫-৬৬।
------। হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। কলিকাতা, ১৮৬৩।
ক্ষীরোদগোপাল মৈত্র। বাল্যবিবাহ উচিত নয়। কলিকাতা, ১৮৬৩।
গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাতৃশিক্ষা। কলিকাতা, ১৮৭০।
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। কলিকাতা, ১২৭২ বঙ্গাব্দ, ১৮৬৫-৬৬।
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৭-৩৮। (প্রথম প্রকাশ ১৮২২।)
টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)। রামারঞ্জিকা। কলিকাতা, ১৮৬০।
তারাশঙ্কর তর্করত্ন। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা। কলিকাতা, ১৮৫১।
দ্বারকানাথ রায়। স্ত্রীশিক্ষা বিধান। কলিকাতা, ১৮৫৬?।
ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা। বিধবাবিবাহ বাদ। শ্রীরামপুর, ১৮৫৪।
নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্ন। বৈধব্য ধর্মোদয়। কলিকাতা, ১৮৫৫।
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সমাজ-সংস্করণ। কলিকাতা, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৮৬৯-৭০।
পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন। বিধবাবিবাহ। কলিকাতা, ১৮৫৫।
প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত। স্ত্রীশিক্ষা। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯১৪। প্রথম সং. ১৮৭৪; দ্বিতীয় সং. ১৮৮১।
বহুবিবাহ সমালোচনা। বারাণসী, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, ১৮৭১-৭২।
ভুবনেশ্বর মিত্র। হিন্দুবিবাহ সমালোচনা, ২ খণ্ড। কলিকাতা, ১৮৭৫-৭৯।
ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পারিবারিক প্রবন্ধ। পঞ্চম সং.। হুগলী, ১৩০৬। (প্রথম সংস্করণ ১৮৯২। কিন্তু অনেকগুলি প্রবন্ধই ১৮৭৬ এর পূর্বে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সামাজিক প্রবন্ধ। দ্বিতীয় সং. হুগলী, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ১৯০৯-১০। (প্রথম সং. ১৮৯২। অনেকগুলি প্রবন্ধই ১৮৭৬ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয়।)
মনোমোহন বসু। জাতীয় সভায় মনোমোহন বসুর বক্তৃতা। কলিকাতা, ১৮৭৩।
-----। হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথম ভাগ—পারিবারিক। কলিকাতা, ১৮৭৩।
মোহনচন্দ্র গুপ্ত। স্ত্রীবোধ। ঢাকা, ১২৭০; ১৮৬৩-৬৪।
রামতনু গুপ্ত। স্ত্রীশিক্ষা। কলিকাতা, ১৮৬১।
রামদুর্লভ দত্ত। স্ত্রীনীতি। ঢাকা, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৬২-৬৩।
রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য। বিধবাবেদন নিষেধক পুস্তক। বোয়ালিয়া, ১৮৬৮।
রামসুন্দর রায়। স্ত্রীধর্মবিধায়ক। কলিকাতা, ১৮৫৯।
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। কুলীনকীর্তন। ঢাকা, ১৮৭৪।
-----। কৌলীন্য সংশোধনী। দ্বিতীয় সং.। ঢাকা, ১৮৭১।
-----। বল্লালি সংশোধন। ঢাকা, ১৮৬৮।
ললিতমোহন কর। বক্তৃতা। কলিকাতা, ১৮৭৩।
লোকনাথ বসু। হিন্দু ধর্মমর্ম। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৩-৭৪।
শ্যামলাল সেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ঢাকা, ১৮৬৪।
শ্যামাচরণ মল্লিক। সুরাসংকীর্তন। কলিকাতা, ১৮৬৮।
শ্যামানাথ রায় চৌধুরী। বিধবোদ্বাহ বিষয়ক প্রশ্নাবলি। শ্রীরামপুর, ১৮৫৪।
শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য। বিধবাবিবাহ নিষেধ। শ্রীরামপুর, ১৮৭৪।
সুরাপানের ফল। কলিকাতা, ১৮৬৮?
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। বাল্যবিবাহ। ঢাকা, ১৮৭০।
হরচন্দ্র ঘোষ। বারুণীবারণ বা সুরার সঙ্গদোষ। কলিকাতা, ১৮৬৪।
Anti-Polygamy Tracts, No. 1. Calcutta, 1856.
Chapman, **Hindoo Female Education.** Calcutta, 1839
Chattapadhyay, G. (ed) **Awekening in Bengal.** Calcutta, 1965. (Being the papers read at the Society for the Acquisition of General Knowledge during 1838-41.)
Emancipation of Women in India. Calcutta, 1855.
Evans, T. and Rouse, J. H. নেশানাশক সভা, Calcutta, 1876.
Fordyce, J. **Native Female Education in India.** Calcutta, 1855.

Pain, K. **A Lecture on Alcohol**. Calcutta, 1872.
Sircar, P. C. **The Tree of Intemperance**. Calcutta, 1874.

৫. সমসাময়িক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধ

অবোধ বন্ধু

'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা'। ভাদ্র ১২৭৬ (১৮৬৯)।
কৈলাসবাসিনী দেবী। 'সভ্যতা ও সমাজসংস্কার'। বৈশাখ ১২৭৫ (১৮৬৮)।

আর্যদর্শন

'অপূর্ব সতী নাটক'। আশ্বিন ১২৮২ (১৮৭৫)।
পূর্ণচন্দ্র বসু। 'বঙ্গবামার ধর্মনৈতিক অবস্থা'। চৈত্র ১২৮১ (১৮৭৬)।
'বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত'। মাঘ ১২৮১ (১৮৭৫)।
'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা'। ভাদ্র ১২৮৪ (১৮৭৬)।
'সতী কি কলঙ্কিনী'। ভাদ্র ১২৮১ (১৮৭৪)।

জ্ঞানাঙ্কুর

'অধুনাতন ও পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা'। পৌষ ১২৮১ (১৮৭৪)।
'ঔদাসীন্য'। ফাল্গুন ১২৮০ (১৮৭৪)।
'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্র'। বৈশাখ ১২৮১ (১৮৭৪)।
(চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়)। 'বিদ্যা বিড়ম্বনা'। বৈশাখ ১২৮০ (১৮৭৩)।
'ধর্ম কি'। মাঘ ১২৮০ (১৮৭৪)।
'বঙ্গীয় বিবাহ'। আশ্বিন ১২৮১ (১৮৭৪)।
'সিরাজ-উদ্দৌলা'। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ (১৮৭৬)।
'স্ত্রীশিক্ষা'। আশ্বিন ১২৮২ (১৮৭৫)।
'স্ত্রীস্বাধীনতা'। শ্রাবণ ১২৮৩ (১৮৭৬)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অক্ষয় কুমার দত্ত। 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা'। শ্রাবণ ১৭৬৮ শকাব্দ (১৮৪৬)।
-----। 'পানদোষ'। শ্রাবণ, ১৭৭২ (১৮৫০)।
-----। 'বর্তমান ব্যবহার'। ভাদ্র ১৭৭১ (১৮৪৯)।
-----। 'বিধবাবিবাহ'। চৈত্র ১৭৭৬ (১৮৫৫)।

------। 'সুরাপান'। কার্তিক ১৭৭৪ (১৮৫২)।
'জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন'। আষাঢ় ১৭৯৬ (১৮৭৪)।
'নিরীশ্বর বিবাহ'। পৌষ ১৭৯৮ (১৮৭৬)।
'বর্তমান কাল অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার কাল'। আষাঢ় ১৭৯৮ (১৮৭৬)।
'বহুবিবাহ'। ভাদ্র ১৭৭৮ (১৮৫৬)।
'বহুবিবাহ'। বৈশাখ ১৭৮৮ (১৮৬৬)।
'সমাজ সংস্কার'। কার্তিক ১৭৮৯ (১৮৬৭)।
সমাজ সংস্কার' পৌষ ১৭৯৭ (১৮৭৫)।
'সমাজের পত্তন ভূমি'। পৌষ ১৭৯৬ (১৮৭৪)।
'সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন'। আষাঢ় ১৭৯৪ (১৮৭২)।
'সুরাপান'। অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ (১৮৭৬)।
'স্ত্রীজাতির অধিকার, স্ত্রীস্বাধীনতা'। শ্রাবণ ১৭৯৪ (১৮৭২)।
'স্ত্রীলোকের কুলনাম'। আষাঢ় ১৭৯৩ (১৮৭১)।
'স্ত্রীশিক্ষা'। জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ (১৮৭৬)।
'হিন্দু সমাজ সংস্কার'। অগ্রহায়ণ ১৭৯৫ (১৮৭৩)।

তমোলুক পত্রিকা

'অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রচার নিবারণী সভা'। প্রথম বর্ষ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ (১৮৭৪-৭৫)।
একজন মাতাল। 'মদ্যপায়ীর নিজ দোষ স্বীকার'। ঐ।
'বঙ্গমহিলাদিগের বর্তমান অবস্থা'। ঐ।

ধর্মতত্ত্ব

'কলিকাতা ও মফস্বল ব্রাহ্মসমাজ'। আষাঢ় ১৭৮৭ শকাব্দ (১৮৬৫)।
'বিবাহ'। জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৭ (১৮৬৫)।
'ব্রাহ্মধর্ম প্রচার'। চৈত্র ১৭৮৭ (১৮৬৬)।

বঙ্গদর্শন

'জাতিভেদ'। শ্রাবণ ১২৮০ (১৮৭৩)।
'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন'। আষাঢ় ১২৮০ (১৮৭৩)।
'প্রাচীনা ও নবীনা'। বৈশাখ ১২৮১ (১৮৭৪)।
'বহুবিবাহ'। আষাঢ় ১২৮০ (১৮৭৩)।

বঙ্গমহিলা

'পারিবারিক সংস্কার'। মাঘ ১২৮২ (১৮৭৬)।
'বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার'। চৈত্র ১২৮২ (১৮৭৬)।
'স্ত্রীস্বাধীনতা'। মাঘ ১২৮৩ (জানুআরি ১৮৭৭)।

বসন্তক

'চমৎকার অভিনয়'। দ্বিতীয় বর্ষ, ১৮৭৫।
'দুটা কথা মাত্র'। ঐ।
'বসন্তকালে অশ্লীলতানিবারণী সভা'। প্রথম বর্ষ, ১৮৭৪।
'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্ন'। ঐ।

বান্ধব

'বিবি আর বউ'। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (১৮৭৪)।
'ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড'। শ্রাবণ ১২৮১ (১৮৭৪)।
সুশিক্ষিতের ভ্রম'। আশ্বিন-কার্তিক ১২৮২ (১৮৭৫)।

বামাবোধিনী পত্রিকা

'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা'। পৌষ ১২৭২ (১৮৬৫)।
'অবগুণ্ঠন' মাঘ ১২৭৬ (১৮৭০)।
'অলঙ্কার পরিধান'। আষাঢ় ১২৭২ (১৮৬৫)।
'উন্নতি'। শ্রাবণ ১২৭১ (১৮৬৪)।
'এদেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার'। বৈশাখ ১২৮০ (১৮৭৩)।
কুন্দমালা দেবী। 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই'। আশ্বিন ১২৭৭ (১৮৭০)।
কুলুটোলাস্থ ব্রাহ্মিকা। 'বামাবোধিনী ও বামাগণ'। কার্তিক ১২৭৬ (১৮৬৯)।
কৃষ্ণকামিনী।'বামারচনা'। পৌষ ১২৭৭ (১৮৭০)।
জানকীনাথ সরকার। 'এদেশীয় বামাগণের বহির্ভ্রমণ'। আশ্বিন ১২৭৮ (১৮৭১)।
'দেশাচার : কন্যাবিক্রয়'। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩ (১৮৬৬)।
'দেশাচার : কৌলীন্যপ্রথা'। কার্তিক ১২৭২ (১৮৬৫)।
'দেশাচার : বিবাহপ্রণালী—বার্ধক্যবিবাহ'। মাঘ ১২৭১ (১৮৬৫)।
'নারীচরিত'। অগ্রহায়ণ ১২৭৬ (১৮৬৯)।

'বঙ্গদেশের বর্তমান সময়ের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অনেক বিষয়ে প্রশংসনীয়'। অগ্রহায়ণ ১২৭২ (১৮৬৫)।
'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ'। ভাদ্র ১২৭৮ (১৮৭১)।
'বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মানসূচক উপাধি'। আশ্বিন ১২৮০ (১৮৭৩)।
'বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি'। অগ্রহায়ণ ১২৮০ (১৮৭৩)।
'বঙ্গীয় যুবতীদিগের ধর্মভাব। অগ্রহায়ণ ১২৮০ (১৮৭৩)।
'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। 'উন্নতি ও স্বাধীনতা'। আষাঢ় ১২৭৮ (১৮৭১)।
'বিবাহ'। ভাদ্র ১২৭৪ (১৮৬৭)।
বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা। বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের স্বাধীনতার বিষয়'। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (১২৭১)।
'ভগ্নীভাব'। আশ্বিন ১৮৭২ (১৮৬৫)।
যোগীন্দ্রমোহিনী বসু। 'কৌলীন্যপ্রথা'। আশ্বিন ১২৭৮ (১৮৭১)।
লক্ষ্মীমণি দেবী। 'পরাধীনতা কি কষ্ট'। কার্তিক ১২৭৫ (১৮৬৮)।
'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়'। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ (১৮৭০)।
'শোচনীয় ঘটার বিবাহ'। কার্তিক ১২৭৯ (১৮৭২)।
শ্রীমতী ---। 'বামাগণের রচনা'। অগ্রহায়ণ ১২৭৩ (১৮৬৬)।
'সিন্দূর'। কার্তিক ১২৭৫ (১৮৬৮)।
'স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ'। শ্রাবণ ১২৭১ (১৮৬৪)।
'স্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি'। আষাঢ় ১২৮০ (১৮৭৩)।
'স্ত্রীজাতির আদর্শ'। আশ্বিন ১২৭৮ (১৮৭১)।
'স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি'। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (১৮৭১)।
'স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার'। আষাঢ় ১২৭৪ (১৮৬৭)।
'স্ত্রীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম'। আষাঢ় ১২৭৮ (১৮৭১)।
'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা'। ভাদ্র ১২৭০ (১৮৬৩)।
'স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন'। কার্তিক ১২৭১ (১৮৬৪)
'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা'। ফাল্গুন ১২৭৪ (১৮৬৮)।
'হিন্দু বিধবা'। শ্রাবণ ১২৭৭ (১৮৭০)।

বিদ্যাদর্শন (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

অক্ষয়কুমার দত্ত। 'অধিবেদন'। ভাদ্র ১৭৬৪ শকাব্দ (১৮৪২)।
----। 'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ'। কার্তিক ১৭৬৪ (১৮৪২)।
----। 'বহুবিবাহ'। শ্রাবণ ১৭৬৪ (১৮৪২)।

------। 'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ'। আশ্বিণ ১৭৬৪ (১৮৪২)।
------। 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা'। আষাঢ় ১৭৬৪ (১৮৪২)।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

'কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও মনের অসুখ'। বৈশাখ ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০)।
'বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা'। কার্তিক ১৭৭৬ (১৮৫৪)।
'সতীত্ব'। ভাদ্র ১৭৭৪ (১৮৫২)।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

'ধর্মসভার গত বৈঠক'। সেপ্টেম্বর ১৮৪২।
'বিধবার পুনর্বিবাহ'। এপ্রিল ১৮৪২।
'বিধবার পুনর্বিবাহ'। জুলাই ১৮৪২।
'স্ত্রীশিক্ষা'। অক্টোবর, দ্বিতীয় পক্ষ, ১৮৪২।
'হিন্দু স্ত্রীজাতি'। জানুআরি, দ্বিতীয় পক্ষ, ১৮৪৩।

ভারতসুহৃদ

'আমাদের অভাব'। শ্রাবণ ১২৮৩ (১৮৭৬)।
'শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক স্বেচ্ছাচার'। আষাঢ় ১২৮৩ (১৮৭৬)।
'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ...কন্যাপণ'। ভাদ্র ১২৮৩ (১৮৭৬)।
'সমাজতত্ত্ব : বিবাহ'। আষাঢ় ১২৮৩ (১৮৭৬)।
'স্ত্রীশিক্ষা'। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (১৮৭৬)।

মধ্যস্থ

'চুক্তি বা মুক্তি বিবাহ'। ফাল্গুন ১২৮১ (১৮৭৫)।
'প্রণয়রোগ'। ২০ শ্রাবণ ১২৭৯ (১৮৭২)।
'বেঙ্গল থিয়েটরের অভিনয় অথবা বিলাতী ধরনের মেয়ে যাত্রা'। ১৪ ভাদ্র ১২৮০ (১৮৭৩)।

রহস্য-সন্দর্ভ

'আমাদিগের যথার্থ অভাব কি ?'। নবম সংখ্যা, ১২৮০ (১৮৭৩)।

সংবাদ প্রভাকর (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

'কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপণ'। ১ মাঘ ১২৬৩ (১৮৫৭)।
'বাংলার যুবক'। ১৯ মে ১৮৫৫।
'বিধবাবিবাহ'। ১০ মে ১৮৫৫।
'ভূম্যধিকারী সভা ও স্ত্রীবিদ্যা'। ২২ মে ১৮৪৯।
'স্ত্রীবিদ্যা'। ৭ মে ১৮৪৯।
'স্ত্রীবিদ্যা ও চন্দ্রিকা'। ১২ মে ১৮৪৯।
'স্ত্রীবিদ্যার ইতিহাস প্রাচীনকাল অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত'। ১৩ জুলাই ১৮৪৯।
'স্ত্রীশিক্ষা তথা বিধবাবিবাহ'। ১ মাঘ ১২৬৩ (১৮৫৭)।

সমদর্শী

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'জ্ঞান ও ধর্ম'। আশ্বিন ১২৮২।
'ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মণ'। মাঘ ১২৮১ (১৮৭৫)।
যদুনাথ চক্রবর্তী। 'বংশীয় ও সার্বভৌমিক ব্রাহ্ম'। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (১৮৭৫)।

সম্বাদ ভাস্কর

'বিধবাবিবাহ'। ৩১ জানুআরি ১৮৫৭।
'মিথ্যাগোল'। ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬।
'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান'। ১০ মে ১৮৪৯।

সোমপ্রকাশ (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

'অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী'। ৬ আশ্বিন ১২৭৫ (১৮৬৮)।
'ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্টকারিতা'। ৬ শ্রাবণ ১২৭৫ (১৮৬৮)।
'এদেশীয়দের ইংলণ্ডে গমন'। ১৬ ফাল্গুন ১২৭৭ (১৮৭১)।
'কন্যাদায়'। ১৪ বৈশাখ ১২৭১ (১৮৬৪)।
'দলাদলি ও সুরাপান'। ২৬ বৈশাখ ১২৭৮ (১৮৭১)।
'ধর্মরক্ষিণী সমাজ'। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (১৮৭১)।
'নবদলে ময়ূর সজ্জা'। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ (১৮৬৬)।
'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না'। ৩০ শ্রাবণ ১২৭৮ (১৮৭১)।
'বালিকা বিদ্যালয়'। ১৭ শ্রাবণ ১২৬৬ (১৮৫৯)।
'বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজে পরিবর্তন'। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ (১৮৬৮)।
'ব্রাহ্মদিগের বিবাহের আইন'। ৫ বৈশাখ ১২৭৮ (১৮৭১)।
'মোগলসরাই বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও বিধবাবিবাহ'। ৩০ ফাল্গুন ১২৭৭ (১৮৭১)।

'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা : কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণার্থ গভর্নমেণ্টের আবেদন'। ২০ আষাঢ় ১২৭৮ (১৮৭১)।
'সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ধর্ম ও বিদ্যা কাহার অধিকতর উপযোগিতা?'। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ (১৮৭০)।
'স্ত্রীনর্মাল বিদ্যালয়'। ৫ ফাল্গুন ১২৭৫ (১৮৬৯)।
'স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা'। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২ (১৮৬৫)।
'হিন্দু সমাজ'। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ (১৮৬৬)।

হিতসাধক

প্যারীচরণ সরকার। 'আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা'। চৈত্র ১২৭৪ (১৮৬৮)।
------। 'আসুর বিবাহ—কন্যাবিক্রয়'। ফাল্গুন ১২৭৪ (১৮৬৮)।
------। 'দৃষ্টান্তের ফল'। আষাঢ় ১২৭৫ (১৮৬৮)।
------। 'দেশভ্রমণ'। ভাদ্র ১২৭৫ (১৮৬৮)।
------। 'দেশাচার'। মাঘ ১২৭৪ (১৮৬৮)।
------। 'বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা'। শ্রাবণ ১২৭৫ (১৮৬৮)।
------। 'মাদক সেবন'। বৈশাখ ১২৭৫ (১৮৬৮)।
------। 'সামাজিক শাসন'। ফাল্গুন ১২৭৪ (১৮৬৮)।

Calcutta Review

Bannerjya, K. M. 'Hindu Caste'. vol. XV, No. 29 (1851,
······ 'Kulin Polygamy'. Vol. XI, VII, No. 93 (1868).
······ 'The Kulin Brahmins of Bengal' Vol. II, No. 3 (1844).
Hindu women'. Vol. XI, No. 80 (1863).
Mittra, P. C. 'Marriage of Hindu Widows'. Vol. XXV, No. 50 (1855).
Smith, T. 'Native Female Education'. Vol. XX. No. 49 (1855).
'The Brahma Samaj', Vol. LX, No. 123 (1875).
'The Brahma Samaj and Native Marriage Act', Vol LIV. No. 108 (1872).

৬. সমাজসংস্কারমূলক সমসাময়িক অন্যান্য রচনা (কবিতা, নকশা, কাহিনী ইত্যাদি)

অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ। এই এক মজা। কলিকাতা, ১৮৭২।

একজন দুঃখিনীর বিলাপ। কলিকাতা, ১৮৭১।
কামনা দেবী। 'আমি তো বিধবা' (কবিতা), বঙ্গমহিলা। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (১৮৭৬)।
কামিনীক্লেশ। কলিকাতা, ১৮৬৩।
কালিদাস মুখোপাধ্যায়। কলির নবরঙ্গ। কলিকাতা, ১৮৭৬।
'কুলীনকুমারীর খেদ' (কবিতা), মিত্রপ্রকাশ। আশ্বিন ১২৭৯ (১৮৭২)।
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুঃখিনী কুলীনকামিনী। কলিকাতা, ১৮৭২।
চন্দ্রশেখর সেন। কি হোলো। কলিকাতা, ১৮৭৫।
টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)। আলালের ঘরের দুলাল। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৬!
-----। মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৬১।
নবীনচন্দ্র দাস। অযোগ্য বিবাহ। কলিকাতা, ১৮৬৮।
নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। কলিকুতূহলম গ্রন্থ। ১২৫৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৫২-৫৩। (বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅম লাইব্রেরীতে এ গ্রন্থের যে কপিটি রক্ষিত আছে, তাতে প্রকাশের স্থানের উল্লেখ নেই।)
নিশাচর। সমাজ কুচিত্র। কলিকাতা, ১৮৬৫।
প্রমথনাথ শর্ম্মণ (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। নববাবুবিলাস নামক গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৪৪, ১৯৩৭-৩৮। প্রথম প্রকাশ ১৮২৩)
'বামাগণের রচনা: কুলীন বহুবিবাহ' (কবিতা)। বামাবোধিনী পত্রিকা। পৌষ ১২৭৮ (১৮৭১)।
ব্রজবালা দেবী। 'আমি কি উন্মাদিনী (কবিতা), বঙ্গমহিলা। কার্তিক ১২৮৩ (১৮৭৬)।
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। আপনার মুখ আপনি দেখ। কলিকাতা, ১৮৬৩।
মনোরঞ্জন গুহ। 'স্বয়ংবর' (কবিতা), মধ্যস্থ। পৌষ ১২৮১ (১৮৭৪)।
মহাদেব। হায়রে সখের কল্‌কেতা। কলিকাতা, ১৮৬৩।
মহেন্দ্রলাল মিত্র। দেখে শুনে হতজ্ঞান। কলিকাতা, ১৮৬৩।
মায়াসুন্দরী। 'নারীজন্ম কি অধর্ম (কবিতা), বঙ্গমহিলা। শ্রাবণ ১২৮২ (১৮৭৫)।
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কোরকে কীট বা সমাজচিত্র। কলিকাতা, ১৮৭৬-৭৭।
রাজকুমার চন্দ্র। দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম। কলিকাতা, ১৯২০ সম্বৎ, ১৮৬৩-৬৪।

লালমোহন দাস ঘোষ। বিধবা-বিলাপ। কলিকাতা, ১৮৫৯।
শ্যামাচরণ সান্যাল। জাত গেল পেট ভর্লো না। কলিকাতা, ১৮৬৩।
শ্রীমতী ------। 'সুরা' (কবিতা), তমোলুকপত্রিকা। প্রথম বর্ষ, ১২৮১ (১৮৭৪-৭৫)।
শ্রীমতি ------। 'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা,' বঙ্গমহিলা। শ্রাবণ ১২৮২ (১৮৭৫)।
'সূক্ষ্মবস্ত্র' (কবিতা), বামাবোধিনী পত্রিকা। কার্তিক ১২৭৫ (১৮৬৮)।
হদ্দ মজার কালীঘাট। কলিকাতা, ১৮৬৮।
হরিশচন্দ্র মিত্র। 'দুর্ভাগিনী শ্যামা', মিত্রপ্রকাশ। শ্রাবণ ১২৭৭, আশ্বিন ১২৭৭, পৌষ ১২৭৭ (১৮৭০)।
------। বিধবা বঙ্গাঙ্গনা। ঢাকা, ১৮৬২-৬৩।
হুতোম প্যাঁচার নকশা' সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব। ব্রজেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। নতুন সং.। কলিকাতা, ১৯৪৮।

৭. সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সমসাময়িক গ্রন্থাদি

রাজনারায়ণ বসু। সেকাল আর একাল। কলিকাতা, ১৭৯৬ শকাব্দ (১৮৭৪-৭৫)।
------। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা। কলিকাতা, ১৭৯৪ শকাব্দ (১৮৭২-৭৩)।
(হরনাথ ভঞ্জ)। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, ২ খণ্ড। অলোক রায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯৭৬। (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫-৭৭।)

৮. বাংলা সাহিত্য, নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক সমসাময়িক গ্রন্থাদি

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। সন্দর্ভ সংগ্রহ। কলিকাতা, ১৮৯৮। (অনেকগুলি রচনাই ১৮৭৬-এর পূর্বে প্রকাশিত।)
রামগতি ন্যায়রত্ন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। কলিকাতা, ১৮৭২-৭৩।
রাজনারায়ণ বসু। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। কলিকাতা, ১৮৭৮।
Mittra, K. C. 'The Modern Hindu Drama', **Calcutta Review**. Vol. LVII, No. 114 (1873).

৯. সমসাময়িককালে লিখিত চিঠিপত্রের সংকলন।

পুরাতনী। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ

(১৯৫৭)। (জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির সংকলন।)
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯০৯।
Some Interesting Letters : Letters to and from Rajnarayan Bose' **Modern Review**. April, 1965.
Unpublished Latters of Vidyasagar. A. Guha (ed). Calcutta, 1971.

১০. সমসাময়িক জীবনী, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। **নারীচরিত্র অর্থাৎ দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় গুণবতী কামিনীর জীবন বৃত্তান্ত**। ময়মনসিংহ, ১৮৬৬।
কানাইলাল পাইন। **চরিতমালা**। কলিকাতা, ১৭৮৭ শকাব্দ (১৮৬৫-৬৬)।
কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। **ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত**। কলিকাতা, ১৮৭৫।
কুমুদিনীচরিত। কলিকাতা, ১৮৬৭।
'কুমুদিনী জীবনী'। **বামাবোধিনী পত্রিকা**। বৈশাখ-আষাঢ় ১২৭২ (১৮৬৫)।
'কুমুদিনী' (জীবনীমূলক নাট্যরচনা)। **বামাবোধিনী পত্রিকা**। শ্রাবণ-আশ্বিন ১২৭৫ (১৮৬৮)।
কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়। **কুমুদিনী উপাখ্যান**। কলিকাতা, ১৮৬২।
গোপীকৃষ্ণ মিত্র। **মহিলাবলী**। কলিকাতা, ১২৭৪ (১৮৬৭-৬৮)।
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। **জীবনালেখ্য**। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৭৯। (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬।)
'নিস্তারিণী দেবী'। **বামাবোধিনী পত্রিকা**। জ্যৈষ্ঠ ১২৭১ (১৮৬৪)।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। **ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত ঘটনা**। কলিকাতা, ১৮৭২।
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। **মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত**। কলিকাতা, ১৮৫৯।
রামসদয় ভট্টাচার্য। **বামাচরিত**। কলিকাতা, ১৯১২ সংবৎ (১৮৫৫-৫৬)।
রাসসুন্দরী দেবী। **আমার জীবন**। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ (১৮৯৭-৯৮)। (প্রথম প্রকাশ ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৬৮-৬৯।)
সৌদামিনী সিংহ। **নারীচরিত**। কলিকাতা, ১৮৬৫।
Mittra, K.C. **Memoir of Dwarkanath Tagore** Calcutta 1870.
* *. Rammohun Roy', **Calcutta Review**. Vol.Iv, No. 8 (1845 .)

------. 'Rammohun Roy', Calcutta Review. Vol. XLIV, No. 87 (1866).

১১. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন

কন্যাপণ নিবারণী সভা। কন্যাপণ নিবরণী সভার বিবরণ। বগুড়া, ১৮৮৯।

কালিদাস মুখোপাধ্যায়। কৌলীন্যপ্রথা সংশোধনী সভা, ফরিদপুর। কলিকাতা, ১৮৭১।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ১২৯০ (৯১) সনের বার্ষিক কার্যবিবরণী। ঢাকা ১৮৮৪-৮৫।

বরাহনগর বিধবাশ্রম। বিধবার আশা। কলিকাতা, ১৮৯২।

বোয়ালিয়া ধর্মসভা। বোয়ালিয়া ধর্মসভার গৃহপ্রবেশ। রামপুর-বোয়ালিয়া, ১৮৬৮।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম-রক্ষিণী সভা। দশম ও ত্রয়োদশ মাসিক সভার কার্য-বিবরণী। কলিকাতা, ১৮৭০।

১২. সরকারী দলিলপত্র ও প্রতিবেদন

Adam W. **Reports on the state of Education In Bengel (1835 & 1838).** Edited by A. Basu. Calcutta, 1941.

General Report on Public Instruction in Bengal 1163-64. Calcutta, 1864.

General Report on Public Instruction in Bengal for 1871-72. Calcutta 1873.

General Report on Public Instruction in Bengal for 1881-82. Calcutta 1883.

Hunter, w. W. **A statistical Account of Bengal,** Vols. I, II, V, VII, VIII. London, 1876-77.

Legislative Department Proceedings, Nos. 7, 10, 11, 14, 25 & 26. December 1863-March 1867. Calcutta, 1864-1867.

Report of the Committee appointed by the Govt. to consider the question of legislative interference for preventing the "excessive abuse" of Polygamy as practised by the Kulin Brahmans, dated 7th February, 1867. Calcutta, 1867.

Report on the Administration of Bengal, 1877-78. Calcutta , 1878.

Report on the Administration of Bengal, 1881-82. Calcutta, 1882.
Report on the Administration of Bengal, 1892-93. Calcutta, **1894.**
Report on Public Instruction in Bengal for 1851-52. Calcutta,
Report on the Census of India, 1901, Vol. VI, Pt.I. Calutta, 1903.
Selections from Educational Records, Pt. II. Edited by J.A, Richey. Calcutta, 1922.

১৩. সমসাময়িক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধ

আর্যদর্শন

(পূর্ণ চন্দ্র বসু)। 'নাটকাভিনয়'। আশ্বিন ১২৮২ (১৮৭৫)।

জ্ঞানাঙ্কুর

'প্রাচীন ভারতে নাটকাভিনয়'। শ্রাবণ ১২৮২ (১৮৭৫)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'দুর্গোৎসব'। আশ্বিন ১৭৮৪ শকাব্দ (১৮৬২)।
'দুর্গোৎসব'। আশ্বিন ১৭৯৮ (১৮৭৬)।
'রঙ্গভূমি'। পৌষ ১৭৯৭ (১৮৭৬)।
'স্বদেশানুরাগ'। আশ্বিন ১৭৯৮ (১৮৭৫)।
'হিন্দুধর্মের সহিত ব্রাহ্মধর্মের সম্বন্ধ'। ভাদ্র ১৭৮৯ (১৮৬৭)।

বঙ্গমহিলা

'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা'। চৈত্র ১২৮৩ (মার্চ ১৮৭৭)।
'কলিকাতার লোকসংখ্যা'। কার্তিক ১২৮৩ (১৮৭৬)।

বান্ধব

'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'। আশ্বিন-কার্তিক ১২৮২ (১৮৭৫)।

বামাবোধিনী পত্রিকা

'অবলাবান্ধব'। শ্রাবণ ১২৭৬ (১৮৬৯)।
অবলাবান্ধব'। আষাঢ় ১২৭৮ (১৮৭১)।
'অভিনয়'। ফাল্গুন ১২৭৩ (১৮৬৭)।
'বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বামাগণের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ'। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৮৭০)।

'বামাবোধিনী পত্রিকার নবম বর্ষ'। ভাদ্র ১২৭৮ (১৮৭১)।
'বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব'। ভাদ্র ১২৭৯ (১৮৭২)।
'ভারত সংস্কারক সভা'। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৮৭০)।
'মিস মেরী কার্পেণ্টার'। কার্তিক ১২৭৩ (১৮৬৬)।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

'বেণীসংহার নাটকের সমালোচন'। ভাদ্র ১৭৭৯ (১৮৫৭)।

মধ্যস্থ

'জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতা'। পৌষ ১২৮০ (১৮৭৩)।
'জাতীয় রঙ্গভূমির অভিনয়'। ৮ পৌষ ১২৭৯ (১৮৭২)।
'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইণ্ডিয়ান মিরর'। ১২ ফাল্গুন ১২৭৯ (১৮৭৩)।

সোমপ্রকাশ (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

'আধুনিক রঙ্গভূমি'। ১৯ ফাল্গুন ১২৮০ (১৮৭৪)।
'দুর্গোৎসব'। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (১৮৭৪)।
'হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখা উচিত কি না'। ২৭ মাঘ ১২৭০ (১৮৬৪)।

হিতসাধক

প্যারীচরণ সরকার। 'কৃষিকার্যের আবশ্যকতা'। মাঘ ১২৭৪ (১৮৬৮)।

১৪. আলোচিত নাটক (প্রকাশকাল ১৮৫৪--১৮৭৬)

ক. পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নাটক

(মনোমোহন বসু)। 'নাগাশ্রমের অভিনয়'। মধ্যস্থ, শ্রাবণ ১২৮১-ভাদ্র ১২৮১ (১৮৭৪)।
হরিশচন্দ্র মিত্র। 'কন্যাপণ কি ভয়ানক!!!'। মিত্রপ্রকাশ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন ১২৭৭ (১৮৭০-৭১)।

খ. প্রকাশিত নাটক

অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অগত্যাস্বীকার প্রকরণ। কলিকাতা, ১৮৬১।
অম্বিকাচরণ বসু। কুলীন কায়স্থ নাটক। কলিকাতা, ১৮৬১।
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বিধবোদ্বাহ নাটক। কলিকাতা, ১৭৭৮ শকাব্দ (১৮-৫৬-৫৭)।

উমেশচন্দ্র মিত্র। বিধবাবিবাহ। দ্বিতীয় সং.। ভবানীপুর, ১৮৫৭।
কস্যিন হিন্দু মহীলা। বল্লালী খাত নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৭।
কালাচাঁদ উকীল ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। একেই কি বলে বাবুগিরি ? নামক নাটিকা। কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ, ১৮৬৩।
কেদারনাথ দত্ত। ইন্দুমতী নাটক। কলিকাতা, ১৮৬১।
গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনর্বিবাহ নাটক। কলিকাতা, ১৮৬২।
------। বউ হওয়া এ কি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়। কলিকাতা, ১২৬৮ (১৮৬১-৬২)।
জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। আসরোদ্বাহ নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৯।
জীবনকৃষ্ণ সেন। ফালতো ঝকড়া। কলিকাতা, ১৮৭০।
(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। কিঞ্চিৎ জলযোগ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ-এ সংকলিত কলিকাতা, ১৯৬৯। (প্রথম প্রকাশ ১৮৭২।)
তারকচন্দ্র চূড়ামণি। সপত্নী নাটক। কলিকাতা, ১৮৫৮। (নাটকে উল্লিখিত হয়েছে যে এটি এ নাটকের প্রথম ভাগ; কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ কখনো প্রকাশিত হয়নি।)
দীনবন্ধু মিত্র। জামাই বারিক। কলিকাতা, ১৮৭২।
------। বিয়ে পাগলা বুড়ো। The Collected Works of Dinabandhu Mittra-এ সংকলিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকাসহ। কলিকাতা, ১৮৭৭। (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬।)
------। লীলাবতী। পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীতে সংকলিত। (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৭)।
------। সধবার একাদশী। পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীতে সংকলিত। (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬।)
নফরচন্দ্র পাল। কন্যাবিক্রয় নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৪।
(নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। বুঝলে কিনা !!! কলিকাতা, ১২৭৩ (১৮৬৬-৬৭)।
নবীনবিরহিণী নাটক। কলিকাতা, ১৭৮৬ শকাব্দ (১৮৬৪-৬৫)।
পার্বতীচরণ সিংহ। তরঙ্গমোহিনী নাটক। হাবড়া, ১২৭২ (১৮৬৫-৬৬)।
বট বিহারী চক্রবর্তি। কলির কুলটা বা অদ্ভুত কাণ্ড। কলিকাতা, ১২৮৩,১৮৭৬।
বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু মহিলা নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৯।
বাহবা চৌদ্দ আইন। কলিকাতা, ১৮৬৯।
বিধবা বিষম বিপদ। কলিকাতা, ১৮৫৬।
বিধবা সুখের দশা। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৭৮৪ শকাব্দ (১৮৬২-৬৩)।

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত। হিন্দু মহিলা নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৮।

ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল (হরিশচন্দ্র মিত্র)। ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে। ঢাকা, ১৮৬৩।

মনোমোহন বসু। প্রণয়পরীক্ষা নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৯।

মহেশচন্দ্র দাস দে। নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি নাটক। কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ (১৮৬৩-৬৪)।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একেই কি বলে সভ্যতা ?। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৬৩।

-------। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৬৩।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। চপলাচিত্তচাপল্য। কলিকাতা, ১৯১৪ সংবৎ (১৮৫৭)।

রাধামাধব মিত্র। বিধবামনোরঞ্জন নাটক, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, ১৮৫৬।

রামচন্দ্র দত্ত। বাল্যবিবাহ নাটক। কলিকাতা, ১২৮১ বঙ্গাব্দ (১৮৭৪-৭৫)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন। কুলীনকুল সর্বস্ব। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৬০-৬১।

-------। নবনাটক। কলিকাতা, ১৮৬৬।

শিমুয়েল পিরবক্স্। বিধবা-বিরহ নাটক। কলিকাতা, ১৮৬০।

শিশিরকুমার ঘোষ। নয়শো রূপেয়া। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৯৫ (?)। (দিনাজপুর নাজিম উদ্দীন লাইব্রেরিতে রক্ষিত এ গ্রন্থের কপিটির নামপত্র ছিন্ন। চতুর্থ মলাটে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় গ্রন্থটি ১৮৯৬ সালের আগে প্রকাশিত।) (প্রথম প্রকাশ ১৮৭২।)

শ্যামলাল চক্রবর্তি। কি মজার কর্তা। আজিমগঞ্জ, ১৮৭৫।

শ্যামাচরণ দে। বাসরকৌতুক নাটক। কলিকাতা, ১৮৫৯।

শ্যামাচরণ শ্রীমানি। বাল্যোদ্বাহ নাটক। কলিকাতা, ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৫৯-৬০)।

শ্রীমতী নিতম্বিনী। অনূঢ়া যুবতী। ঢাকা, ১৮৭২।

সুধাকর বিষময়। কলিকাতা, ১৮৬৭।

স্ত্রীমিত্র নাটক। কলিকাতা, ১৮৬০।

হরিশচন্দ্র মিত্র। ম্যাও ধরবে কে। ঢাকা, ১৮৬২।

হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দলভঞ্জন নাটক। কলিকাতা, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ (১৮৬২)।

হীরালাল মিত্র। আমালের ঘরের দুলাল নাটক। কলিকাতা, ১৭৯১ শকাব্দ (১৮৬৯-৭০)।

গ. দ্বৈতীয়িক উপকরণ থেকে আলোচিত নাটক

ইহারই নাম চক্ষুদান। কলিকাতা, ১৮৭৫।

ক্ষেত্রমোহন ঘটক। কামিনী নাটক। কলিকাতা, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ (১৮৬৮-৬৯)।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। অশুভস্য কাল হরণং। ঢাকা, ১৮৬১।
জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার। সুধা না গরল। কলিকাতা, ১৮৭০।
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বর্ণলতা। কলিকাতা, ১২৮০ বঙ্গাব্দ (১৮৭৩-৭৪)।
নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বারুণী-বিলাস নাটক। কলিকাতা, ১৮৬৭।
প্যারীমোহন সেন। রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলকাতা। কলিকাতা, ১৮৬৩-৬৪।
বেচুলাল বেণিয়া। সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ। কলিকাতা, ১৮৮৫।
(ভুবনমোহন সরকার)। ডাক্তার বাবু নাটক। কলিকাতা, ১৮৭৫।
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। চার ইয়ারে (র) তীর্থযাত্রা। কলিকাতা, ১৮৫৮।
মাতালের জননীর বিলাপ। কলিকাতা, ১৮৭৪।
মেয়ে মনুমেন্টার মিটিং। কলিকাতা, ১২৮১ (১৮৭৪-৭৫)।
রামনারায়ণ তর্করত্ন। উভয় সঙ্কট। কলিকাতা, ১৮৬৯।
-------। চক্ষুদান। কলিকাতা, ১৮৬৯।
-------। যেমন কর্ম তেমনি ফল। কলিকাতা, ১৮৬৫ (?)।
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। কুলীনকন্যা বা কমলিনী। কলিকাতা, ১৮৭৪।
সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্। কলিকাতা, ১৮৬৭।
সুকুমারী দত্ত। অপূর্ব সতী নাটক। কলিকাতা, ১৮৭৫।
হরিশচন্দ্র মিত্র। শুভস্য শীঘ্রম। ঢাকা, ১৮৬১।

১৫. প্রায় সমসামযিক সাময়িকপত্র (১৮৭৭-১৯০১)

নব্যভারত (কলিকাতা)
ভারতী (কলিকাতা)
সাহিত্য (কলিকাতা)

১৬. সমাজসংস্কারমূলক প্রায় সমসাময়িক (১৮৭৭-১৯০১) পুস্তক-পুস্তিকা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচু ঠাকুর,। ৩ খণ্ড। কলিকাতা, ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪-৮৫)।
উপেন্দ্রনাথ রায়। বিধবার ব্রহ্মচর্য। কলিকাতা, ১৮৮৬।
কালীশঙ্কর দাস। হিন্দুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয়। কলিকাতা, ১৮০৯ শকাব্দ (১৮৮৭-৮৮)।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। কলিকাতা, ১৩০৭, (১৯০০-১৯০১)।

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। বঙ্গবিবাহ কলিকাতা, ১২৮৮ (১৮৮১-৮২)।
জ্ঞানচন্দ্র বসাক। সুরাপান বা বিষপান। কলিকাতা, ১৮৮৮।
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। বিবাহ সংস্কার। কলিকাতা, ১৮৮৯।
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। সোপান। কলিকাতা, ১৮৭৯।
পূর্ণচন্দ্র বসু। সমাজচিন্তা অথবা ইয়োরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজ-বিষয়ক প্রস্তাব। কলিকাতা, ১৮৮২।
প্যারীচাঁদ মিত্র। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা। কলিকাতা, ১৮৭৯।
ভুবনেশ্বর মিত্র। মদিরা। কলিকাতা, ১৮৮১।
যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। বঙ্গমহিলা। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৮৪। (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১।)
শশধর তর্কচূড়ামণি। ধর্মব্যাখ্যা। কলিকাতা, ১৮০৬ শকাব্দ (১৮৮৪-৮৫)।
শিবনাথ শাস্ত্রী। জাতিভেদ। কলিকাতা, ১৮৮৪।
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। ললনা-সুহৃদ। কলিকাতা, ১৮৮৮।

Chintamani C.Y. **Indian Social Reform**, Pt. I. Madras, 1892.
Infant Marriage and Enforced Widowhood in India, Bomby, 1887.
Sarasvati, P.R. **The High—Caste Hindu Woman**. 2nd ed. Philadelphia, 1887.
Tarkabhusan, T. **Drinking**, Calcutta, before 1893.

১৭. প্রায় সমসাময়িক কালের (১৮৭৭-১৯০১) পত্রপত্রিকায় ও সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধ

আর্যদর্শন

'কেন পড়ি'। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (১৮৭৮)।
'বৈদেশিক সংমিশ্রণ ও উহার উপকারিতা'। আষাঢ় ১২৮৭ (১৮৮০)।
'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা'। ভাদ্র ১২৮৪ (১৮৭৭)।
'রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্করণ'। ভাদ্র ১২৮৭ (১৮৮০)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা'। চৈত্র ১৮০২ শকাব্দ (১৮৮১)।
'বর্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ'। শ্রাবণ ১৭৯৯ (১৮৭৭)।
'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও দুঃখের কথা'। জ্যৈষ্ঠ ১৮১২ (১৮৯০)।

'সামাজিক আন্দোলন'। জ্যৈষ্ঠ ১৮১৬ (১৮৯৪)।
'স্ত্রীশিক্ষা ও মনু'। শ্রাবণ ১৮১৩ (১৮৮১)।
'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাস'। ফাল্গুন ১৮০২ (১৮৮১)।
'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা'। অগ্রহায়ণ ১৮০০ (১৮৭৮)।

নব্যভারত

ঈশানচন্দ্র বসু। 'স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ'। ফাল্গুন ১২৯৯ ও পৌষ ১৩০০ (১৮৯৩)।
কৈলাসচন্দ্র সিংহ। 'আমাদিগের বিবাহ প্রণালী'। বৈশাখ ১২৯২ (১৮৮৫)।
কোম্‌ত্‌ শিষ্য। 'পৌরাণিক কোম্‌ত্‌ ধর্ম্ম'। অগ্রহায়ণ ১২৯১ (১৮৮৪)।
চিরঞ্জীব শর্ম্মা। 'কলির হিন্দু ধর্ম্ম'। কার্তিক ১২৯১ (১৮৮৪)।
জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। 'জাতিভেদ ও ভূদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু'। আষাঢ় ১৩০০ (১৮৯৩)।
দীনেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'বিধবাবিবাহ'। চৈত্র ১২৯৫ (১৮৮৯)।
------। 'হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার'। কার্তিক ১২৯৮ (১৮৯১)।
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। 'মহাত্মা কানাইলাল পাইন'। ফাল্গুন ১৩০০ (১৮৯৪)।
------। 'স্বামী ও স্ত্রী'। আশ্বিন ১২৯৩ (১৮৮৬)।
দেবেন্দ্রনাথ পাকড়াশী। 'সমাজসংস্কার ও বর্তমান হিন্দুসমাজ'। মাঘ ১২৯১ (১৮৮৫)।
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। 'সংস্কারকদিগের প্রতি'। শ্রাবণ ১২৯২ (১৮৮৫)।
বরদাচরণ মিত্র। 'পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম'। কার্তিক ১২৯২ (১৮৮৫)।
বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়। 'নব্যবঙ্গ'। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ (১৮৮৬)।
যোগীন্দ্রনাথ বসু। 'নবজীবন ও বিধবাবিবাহ'। আষাঢ় ১২৯২ (১৮৮৫)।
শিবনাথ শাস্ত্রী। 'শাস্ত্র ও দেশাচার'। ভাদ্র ১২৯৮ (১৮৯১)।
------। 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম্ম'। ভাদ্র ১২৯১ (১৮৮৪)।
------। 'সামাজিক ব্যাধি রোগের কারণ নির্ণয়'। কার্তিক ১২৯২ (১৮৮৫)।
সদানন্দ তর্কচঞ্চু। 'সমাজসমন্বয়' (প্রতিবাদ)। আষাঢ় ১২৯১ (১৮৮৪)।
সীতানাথ নন্দী। 'বাল্যবিবাহ'। আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৯৩ (১৮৮৬)।
------। 'স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার'। ফাল্গুন ১২৯১ (১৮৮৫)।
সিদ্ধেশ্বর রায়। 'অভিনয়ে চরিত্রশিক্ষা'। আশ্বিন ১২৯৪ (১৮৮৭)।
------। 'সমাজ সমন্বয়'। জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ (১৮৮৪)।

বান্ধব

কৈলাসচন্দ্র সিংহ। 'রাজা রাজবল্লভ সেন'। দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ (১৮৮২)।

'বামাবোধিনী পত্রিকা
'নববর্ষ'। বৈশাখ ১২৮৯ (১৮৮২)।
'বহুবিবাহ'। বৈশাখ ১২৮৮ (১৮৮১)।
'সাময়িক প্রসঙ্গ'। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ (১৮৮২)।

সাহিত্য
অক্ষয়কুমার মৈত্র। 'রাণী ভবানী'। ফাল্গুন ১৩০৪ (১৮৯৮)।

সোমপ্রকাশ (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)
'আমাদের যুবকগণের প্রধান কর্তব্য কি?'। ৩ ভাদ্র ১২৯১ (১৮৮৪)।
'ইংরাজী শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়'। ১৬ কার্তিক ১২৯০ (১৮৮৩)।
'বঙ্গসমাজের একটি সুন্দর চিত্র'। ১৫ বৈশাখ ১২৮৭ (১৮৮০)।
'বঙ্গদেশে পুত্রবিক্রয়'। ১০ আষাঢ় ১২৯১ (১৮৮৪)।
'বাল্যবিবাহ'। ৮ পৌষ ১২৯১ (১৮৮৪)।
'বিধবাবিবাহ সাধারণ্যে চলিত কেন হইতেছে না'। ২৪ ভাদ্র ১২৯১ (১৮৮৪)।
'রূপচাঁদ পক্ষীর গান'। ১০ আষাঢ় ১২৯১ (১৮৮৪)।
'স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত কি না?'। ৩ বৈশাখ ১২৮৫ (১৮৭৮)।
'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কি না?'। ৬ আষাঢ় ১২৯২ (১৮৮৫)।
'হিন্দু সমাজ ও ধর্মসংস্কার'। ৭ ভাদ্র ১২৯১ (১৮৮৪)।

কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত এবং সাবিত্রী লাইব্রেরি কর্তৃক পুরস্কৃত প্রবন্ধসমূহের সংকলন: সাবিত্রী। কলিকাতা, ১২৯৩ (১৮৮৬-৮৭)।
অক্ষয়চন্দ্র সরকার। 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?'।
চন্দ্রনাথ বসু। 'হিন্দুপত্নী'।
-------।'হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য'।
পূর্ণচন্দ্র বসু। 'আমাদের অভাব'।
বীরেশ্বর পাঁড়ে। 'হিন্দু রীতিনীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে'।
শ্যামাসুন্দরী দেবী। 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা'।

১৮. প্রায় সমসাময়িক কালে (১৮৭৭-১৯০১) প্রকাশিত জীবনী, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা
কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। 'আত্ম-জীবন চরিত'। সাহিত্য, বৈশাখ-শ্রাবণ, কার্তিক-পৌষ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৮৯৬-৯৭)।

কুমুদিনী ঘোষ। স্বর্ণময়ী। কলিকাতা, ১৮৯৪।
কুমুদিনী চরিত্র। কুচবেহার, ১৮৯০।
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দির প্যাগম্বর। ঢাকা, ১৮৮০।
উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়। আচার্য কেশবচন্দ্র, ৩ খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ১৯৩৮। (প্রথম সংস্করণ ১৮৯২-১৯০৬)।
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর। কলিকাতা, ১৮৯৫।
চিরঞ্জীব শর্মা। কেশবচরিত। কলিকাতা, ১৮০৬ শকাব্দ (১৮৮৪)।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত। কলিকাতা, ১৮৯৮।
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৯৭। (প্রথম সং. ১৮৮১)।
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত। কলিকাতা, ১৮৮৫।
যোগীন্দ্রনাথ বসু। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯০৫।
রজনীকান্ত গুপ্ত। কুমারী কার্পেন্টারের জীবনচরিত। কলিকাতা, ১৮৮২।
রাখালচন্দ্র রায়। জীবনবিন্দু। কলিকাতা, ১৮৮০।
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৮৮১।
লক্ষ্মীমণি চরিত। ঢাকা, ১৮৭৭।
Edwards, T. 'Henry Louis Vivian Derozio', **Calcutta Review**, Vol. LXXII, No. 144 (1881).
Mazoomdar, P. C. **The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen**. Calcutta, 1887.
Mittra, P. C. **A Biographical Sketch of David Hare**. Celcutta, 1877.

১৯. নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক প্রায় সমসাময়িক প্রবন্ধ

নব্যভারত

গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যাত্রা ও থিয়েটার'। শ্রাবণ ১২৯৫ (১৮৮৮)।
সিদ্ধেশ্বর রায়। 'বঙ্গসাহিত্যে নাটক সৃষ্টি'। পৌষ ১২৯৬ (১৮৮৯)।

সোমপ্রকাশ (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

'বঙ্গীয় যুবক ও থিয়েটার অপেরা'। ১৮ শ্রাবণ ১২৯৩ (১৮৮৬)।

বিজয়লাল দত্ত। 'বঙ্গরঙ্গভূমি'। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ (১৮৮২)।

২০. গ্রন্থাবলী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কবিতা সংগ্রহ, প্রথম ভাগ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৮৮৫।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা, ১৮৯৫।

রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৮৭৩-৭৪।

Nag, K. and Burman, D. (ed). **The English Works of Raja Rammohun Roy**, 7 Vols. Calcutta, 1944-47.

২১. সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ঢাকা, ১৮৭৫।

পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বিগত আন্দোলন। ঢাকা, ১৮৭৯।

রাজনারায়ণ বসু। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, ১৭৯৭ শকাব্দ (১৮৭৫-৭৬)।

২২. হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ

পরাশর সংহিতা। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনূদিত। কলিকাতা, ১৮৭৮।

মনুসংহিতা। ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত ও অনূদিত। কলিকাতা, ১৮৬৬।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। উদ্বাহতত্ত্বম। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার অনূদিত। কলিকাতা, ১৮৪৫ শকাব্দ (১৯২৩-২৪)।

Rughoo Nundun. **Institutes of Hindoo Religion.** Serampore, 1835. (in Sanskrit.)

২৩. হিন্দু কৌলিক ইতিহাস

নগেন্দ্রনাথ বসু। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, প্রথমাংশ। দ্বিতীয় সং। কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১-১২)। রাজন্য কাণ্ড, প্রথমাংশ। কলিকাতা, ১৩২১ (১৯১৪-১৫)।

লালমোহন বিদ্যানিধি। সম্বন্ধ নির্ণয়। দ্বিতীয় সং। কলিকাতা, ১৮৯৬। (প্রথম সং. ১৮৭৫।)

দ্বৈতীয়িক উপকরণ

১৯০১ সালের পরবর্তী গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং প্রবন্ধের তালিকা।

২৪. পত্র-পত্রিকা

প্রদীপ (কলিকাতা)

প্রবাসী (এলাহাবাদ ও কলিকাতা)

ভারতবর্ষ (কলিকাতা)

Bengal Past and Present (Calcutta).

Journal of Asiatic Society of Pakistan (Dacca)

Modern Review (Calcutta and Allahabad)

Nineteenth Century Studies (Calcutta)

২৫. বাংলা সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা ও ইতিহাস

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯৭১-৭২।

রামদুলাল বসু। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ। কলিকাতা, ১৯৭৪।

সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। ষষ্ঠ সং.। কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (১৯৭০-৭১)।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত। সাহিত্য সাধনা। কলিকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ (১৯০১-০২)।

Dey, S. K. **Bengali Literature in the 19th Century**. 2nd ed. Calcutta, 1962.

Sarkar, J. 'Movements in Indian Literature since 1850', **Modern Review**, Vol. XXVI (Aug., 1919).

২৬. বাংলা নাট্যরচনা ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক গ্রন্থাদি

অজিতকুমার ঘোষ। বাংলা নাটকের ইতিহাস। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯৬১।

অহীন্দ্র চৌধুরী। বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র। কলিকাতা, ১৯৫৯।

আনিসুজ্জামান। 'দুটি পুরোনো বাংলা নাটক'। বাঙ্গালা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬ (১৯৫৯)।

আশুতোষ ভট্টাচার্য। নাট্যকার শ্রীমধুসূদন। কলিকাতা, ১৯৬৮।

-----। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। তৃতীয় সং.। কলিকাতা,।

-----। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন। কলিকাতা, ১৯৬৪।

-------ও অজিতকুমার ঘোষ। শতবর্ষে নাট্যশালা। কলিকাতা, ১৯৭৩।
ইন্দ্র মিত্র। সাজঘর। কলিকাতা, ১৩৬৭ (১৯৬০-৬১)।
জয়ন্ত গোস্বামী। সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন। কলিকাতা, ১৯৭৪।
ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালা। কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (১৯০৯-১০)।
নীলিমা ইব্রাহিম। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক। ঢাকা, ১৯৬৪।
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক। কলিকাতা, ১৯৭৫।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। চতুর্থ সং.। কলিকাতা, ১৩৬৮ (১৯৬১-৬২)।
মন্মথনাথ বসু। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। কলিকাতা, ১৯৪৮।
মাহবুবুল আলম ও গোলাম মুরশিদ (সম্পাদক)। মাইকেলের প্রহসন। ঢাকা, ১৯৬৮।
হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা।
Banerji, B. **Bengali Stage.** Calcutta, 1943.
Das Gupta, H. **The Indian Stage,** Vols. I & II. Calcutta, Vol. I, n. d. (J. V. Mevens Preface, April, 1934) ; Vol. II, 1938.
Das Gupta, R. K. 'The Political Background of the Dramatic Performances Contol Act of 1876', **Indian History Congress Proceedings**, Vol. XXI (1968).
Guha-Thakurta, P. **The Bengali Drama...Its Origin and Development,** London, 1930.

২৭. জীবনী, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

অজিতকুমার চক্রবর্তী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এলাহাবাদ, ১৯১৬।
আদিনাথ সেন। স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ কলিকাতা, ১৯৪৮।
আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত। লক্ষ্মীমণি চরিত। কলিকাতা, ১৯১১।
ঈশানচন্দ্র বসু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কলিকাতা, ১৯০২।
উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী। কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (১৯১৯-২০)।

কুমুদিনী মিত্র। মেরী কার্পেন্টার। কলিকাতা, ১৯০৬।
কৃষ্ণকুমার মিত্র। আত্মচরিত। কলিকাতা, ১৯৩৭।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী। কলিকাতা, ১৯৬৯।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। কলিকাতা, ১৯০৮।
গিরিশচন্দ্র নাগ। ব্রহ্মানন্দ কেশচন্দ্র সেন ও তাঁহার মহত্ত্ব। ঢাকা, ১৯৩৯।
গিরিশচন্দ্র সেন। আত্মজীবন। কলিকাতা, ১৯০৭।
------। ব্রহ্মময়ী-চরিত। তৃতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯০৩।
নবকৃষ্ণ ঘোষ। প্যারীচরণ সরকার। কলিকাতা, ১৯০২।
বঙ্কবিহারী কর। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত। ঢাকা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ (১৯১০-১১)।
বঙ্গচন্দ্র রায়। আমার জীবনালেখ্য। ঢাকা, ১৯১০।
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (১৯২০)।
বিনয় ঘোষ। বিদ্রোহী ডিরোজিও। কলিকাতা, ১৯৬১।
বিনোদিনী দাসী। বিনোদিনীর কথা বা (আমার কথা)। নবসংস্করণ। কলিকাতা, ১৩২০ (১৯১৩-১৪)।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত। পঞ্চম সং.। কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯-৬০)।
------। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র। পঞ্চম সং.। কলিকাতা, ১৯৫৫।
------। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯৬২।
------। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। পঞ্চম সং.। কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (১৯৫৫-৫৬)।
------। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯৬০।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চম সং.। কলিকাতা, ১৯৬৩।
মন্মথনাথ ঘোষ। কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র। কলিকাতা, ১৯২৭।
------। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ (১৯১৭-১৮)।

যোগেশচন্দ্র বাগল। উমেশচন্দ্র দত্ত। কলিকাতা, ১৯৬৩।
------। কেশবচন্দ্র সেন। কলিকাতা, ১৯৫৮।
------। রাজনারায়ণ বসু। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৯৫৫।
রাজনারায়ণ বসু। আত্মচরিত। কলিকাতা, ১৯০৯।
রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্নেহলতা। দ্বিতীয় সং.। কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ (১৯১৩-১৩)।
শিবনাথ শাস্ত্রী। আত্মচরিত। প্রথম সিগনেট সং.। কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (১৯৫২-৫৩)।
শিবদাস চক্রবর্তী। বিপিনচন্দ্র পাল: জীবন, সাহিত্য ও সাধনা। কলিকাতা, ১৯৭৩।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। কলিকাতা, ১৯১৫।
সুনীতি দেবী। শিবনাথ। কলিকাতা, ১৯৬৬।
সুশীল রায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ১৯৬৩।
হেমলতা দেবী। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত। কলিকাতা, ১৯২১।
হেমলতা সরকার। স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র। কলিকাতা, ১৯১৫।
Banerjea, Sir S. N. **A Nation in Making.** Reprint. Calcutta, 1963.
Banerji, Sir A. R. **An Indian Pathfinder: Memoir of Sevabrata Sasipada Banerji.** Reprint. Calcutta, 1973. (First published in the 1920's.)
Beveridge, Lord W. H. **India Called Them**. London, 1947.
Bose, S. C. **Life of Protap Chunder Mazoomdar.** Calcutta, 1940.
Chandra, R., and Majumdar, J. K. **Selections from Official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy.** Calcutta, 1938.
Ghosh, M. **Memoirs of Kali Prassunno Singh.** Calcutta, 1920.
Haldar, S. **A Mid-Victorian Hindu — a sketch of the life and times of das Rakhaldas Haldar.** Ranchi, 1921.
Mukherjee, N. **A Bengal Zamindar: Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his Times.** Calcutta, 1975.
'Notes on Govin Chunder Dutt', **Calcutta Review**, Vol CXV, No. 230 (Oct., 1902).
Pal, B. C. **Memories of My Life and Times**, Vol. I. Calcutta, 1932.
'Peary Chand Mittra', **Calcutta Review**, Vol. CXX, No. 239 (April, 1905).

Sarkar, H. **Life of Ananda Mohan Bose**. Calcutta, 1910.
Sastri, S. **Men I have Seen**. Calcutta, 1919.

২৮. বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা

কালীকৃষ্ণ ঘোষ। সেকালের চিত্র। কলিকাতা, ১৯১৮।
গোলাম মুরশিদ (সম্পাদক)। বিদ্যাসাগর। রাজশাহী, ১৯৭০।
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী। শিবচন্দ্র দেব ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী। কলিকাতা, ১৯৭০।
নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বাঙালী জীবনে রমণী। তৃতীয় সং। কলিকাতা, ১৯৭১।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সং, ১৯৭০; দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সং.। ১৯৬১।
----। রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য। কলিকাতা, ১৯৭২।
বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। প্রথম ওরিয়েণ্ট লংম্যান সং.। কলিকাতা, ১৯৭৩।
শিবনাথ শাস্ত্রী। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলিকাতা, ১৯০৪।
স্বামী ভূমানন্দ। সনাতন ধর্ম, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮-২৯)।
Ahmed, A. F. S. **Social Ideas and Social Change in Bengal**. Leiden, 1965.
Bearch G. D, 'Intellectual and Cultural Characteristics of India in a Changing Era', **Journal of Asian Studies**, Vol. XXV (Nov., 1965).
Chakrabarty, D. **Sasipada Benerji : A Study in the Nature of the First Contact of the Bengali Bhadralok with the Working Classes of Bengal**. Calcutta, 1974.
De Bary, W. T., and others. **Sources of Indian Traditions**. New York, 1958.
Griffiths, Sir P. **The British impact on India**, London, 1965.
Joshi, V. C. (ed.) **Rammohun Roy and the Process of Modernization in India**. Delhi, 1975.
Leonard, G. S. **A History of the Brahma Samaj**. Calcutta, 1879.
Majumdar, B. **Heroines of Tagore : A Study in the Transformation of Indian Society**. Calcutta, 1968.
Mukerji, D. P. **Modern Indian Culture**. 2nd ed. Bombay, 1948.

Murshid, G. 'Coexistence in a Plural Society Under Colonial Rule : Hindu-Muslim Relations in Bangal'. **Journal of the Institute of Bangladesh Studies**, Vol. I, No. 1 (1976).

O' Mally L. S. S. **Modern India and the West**. Reprint. London. 1968.

Page, W. S. 'Historical Notes on Modern Religious Movement' in **Religion of the Empire.** Edited by W. L. Hare. London, 1925.

Raychaudhuri, T. 'Norms Family Life and Personal Morality among the Bengali Hindu Elite, 1600-1850' in **Aspects of Bengali History and Society**. Edited by R. V. M. Baumer. Hawaii, 1974.

Sastri, S. **History of the Brahmo Samaj**, 2 Vols. 2nd ed. Calcutta, 1974.

Sinha, P. **Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History.** Calcutta, 1965.

Tripathi, A. **Vidyasagar the Traditional Modernizer**. Calcutta, 1974.

২৯.. বঙ্গদেশের সাধারণ ইতিহাস

যোগেশচন্দ্র বাগল। হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, ১৯৬৮।

রসিকলাল গুপ্ত। মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্তী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ। দ্বিতীয় সং। কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ (১৯১২-১৩)।

Ashraf, K. M. 'Life and Condition of the People of Hindustan', **Journal Asiatic Society of Bengal**, Vol. I, 1934.

Bandyopadhyay, S. **Foreign Accounts of Marriage in Ancient India.** Calcutta, 1975.

Baumer, R. V. M. (ed). **Aspects of Bengali History and Society.** Hawaii, 1974.

Blochmann, H. (tr.). **The Ain-I-Akbari**, Vol. I. Calcutta, 1873.

Borah, M.I. (tr.). **Baharistan-I-Ghayibi**, Vol. II. Gauhati, 1936.

Broomfield, J.H. **Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth-Century Bengal.** Berkeley, 1968.

Buchanan, F. **A Geographical, Statistical, and Historical Description of the District, or Zila of Dinajpur in the Province, or Subah of Bengal.** Calcutta, 1833.

Chattopadhyay, S. **Social Life in Ancient India.** Calcutta, 1965.

Datta, K. **Studies in History of Bengal subah.** Calcutta, 1936.

------. **Survey of India's Social Life and Economic Condition in Eighteenth Century.** Calcutta, 1961.

Ghose, L. **The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, & c.**, Pt. II. Calcutta, 1881.

Hussain, S. **Everyday Life in the Pala Empire**. Dacca, 1968.

Liard. M.A. **Missionaries and Education in Bengal.** Oxford, 1972.

Mclane, J.R. (ed.). **Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries**. East Lansing, 1975.

Majumdar, B. **History of Political Thought from Rammohun Roy to Dayananda.** Calcutta, 1934.

Majumdar, R.C. **Ancient India**.Revd. ed. Delhi, 1960

-----. **Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century**. Calcutta, 1960.

-----. (ed.), **History of Bengal,** Vol. I. Dacca, 1943.

Misra, B.B. **The indian Middle Classes**. London, 1960.

Rahim, M. A. **Social and Cultural History of Bengal,** 2 Vols. Karachi, 1963-67.

Raychaudhnri, T. **Bengal Under Akbar and Jahangir**. Calcutta, 1953.

Sachau. E. C. (tr.,) **Alberuni's India**, Vol. II. London, 1910.

Scrafton, L. **A History of Bengal Before and After the Plassey.** Reprint. Calcutta, 1975.

Sharma, R. **The Religious Pollicy of Mughal Emperors**. 2nd ed. Bombay, 1962.

Sinha, N. K. **The Economic History of Bengal**, 3 Vols Calcutta, Vol. I, 3rd ed., 1965; vol II, Reprint, 1968 ; vol. III, 1970.

Stokes, E. **The English Utilitarians and India**.Oxford, 1959.

Tarafdar, M.R. **Husain Shahi Bengal**. Dacca, 1965.

৩০. নারীমুক্তি সম্পর্কিত ইতিহাস

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নারী জাগরণ। কলিকাতা, ১৯৪৬।

Altekar, A.S. **The Position of Women in Hindu Civilization**. 3rd ed. Delhi, 1962.

Banerji, B. 'Iswarchandra Vidyasagar as a Promoter of Female Education in Bengal. Based on Unpublished state Records'. **Journal Asiatic Society of Bengal,** Vol. XXIII (1927).

Billington, M. F. **Women in India**. Reprint. New Delhi, 1973. (First published in 1890's.)

Bose, K. 'On the Education of Hindoo Females', in **Selections from the Bethune Society Papers, No. 3.** Calcutta, 1857.

Chakraborty, U. **Condition of Bangali Women Around the 2nd half of the 19th Century**. Calcutta, 1963.

De, S. K. 'Women's Education in Bengal from the Battle of Plassey to Sepoy Mutiny', **Calcutta Review**, Vol. CLXI (Dec, 1961).

Dessai, N. **Woman in Modern India**. Bombay, 1957.

Gidumal, D. **The Status of Women in India, or a Hand-book for Hindu Social Reformers**. Bombay, 1889.

Kopf, D. 'The Brahmo Idea of Social Reform and the Problem of Female Emancipation in Bengal', in **Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries**. Editid by J. R. Mclane. East Lansing, 1975.

Mill, J. S. **The Subjection of Women**. Reprint. London, 1955.

Sen Gupta, S. **A Study of Women in Bengal**. Calcutta, 1970.

Stenton, D. M. **The English Women in History**. London, 1957.

Thomas, P. **Indian Women Through the Ages**. Bombay, 1964.

৩১. বঙ্গদেশের রেনেসান্স ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক ইতিহাস।

কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ। কলিকাতা, ১৯৫৬।

বিনয় ঘোষ। বাংলার নবজাগৃতি। কলিকাতা, ১৯৪৮।

যোগেশচন্দ্র বাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৯৪১-৪২)।

সুশীলকুমার গুপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ। কলিকাতা, ১৯৫৯।

Bose, S. N. **Indian Awakening and Bengal**. Calcutta. 1960.

Datta, K. **Renaissance Nationalism and Social Changes in Modern. India**. Calcutta, 1965.

Ghose, A. **Renaissance in India**. 2nd ed. Calcutta. 1946.

Gupta, A. (ed.). **Studise in the Bengal Renaissance**. Jadavpur, 1958.

Hay, S. 'Western and Indigenous Elements in Modern Indian Thought : The Case of Rammohn Roy', in **Changing Japanese Attitudes Toward Modernization**. Edited by M. B. Jansen. Princeton, 1969.

Heimsath, C. H. **Indian Natioalism and Hindu Social Reform**. Princeton, 1964.

Ingham, K. **Reformers in India**. Cambridge, 1956.

Karunakaran, K. P. **Religious and Political Awakening in India.** 2nd ed. Meerat, 1969.

Kopf, D. **British Orientalism and the Bengal Renaissance.** Calcutta. 1969.

------. **The Shaping of Modern Indian Mind and a Histoy of the Brahmo Samaj.** Princeton, 1979.

McCully, B. T. **English Education and the Origins of Indian Nationalism.** New York, 1940.

Mukherjee, A. **Reform and Regeneration in Bengal.** Calcutta, 1968.

Natarajan, S. **A Century of Social Reform in India.** Bombay, 1957.

Potts, E. D. **British Baptist Missionaries in Bengal.** Cambridge, 1967.

Sen, A. (S. K. Sarkar) **Bengal Renaissance and Other Essays,** New Delhi, 1970.

৩২. সমাজ সংস্কারমূলক গ্রন্থ

দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী। বিধবাবিবাহ আন্দোলন। কলিকাতা, ১৯৪৬।

মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য। উত্থানের পথঃ বিধবাবিবাহাদির মিমাংসা, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, তারিখ নাই (১৯২০ এর দশক)।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সমাজ-সংস্কার। ঢাকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫-২৬)।

৩৩. সাময়িক পত্রের ইতিহাস

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথম খণ্ড। চতুর্থ সং। কলিকাতা, ১৯৭২।

৩৪. গ্রন্থ তালিকা

Blumhardt, J. F. **Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum.** London, 1886.

------. **Catalogue of the Library of the India Office,** Vol. II, pt. IV. London, 1905.

------. **Catalogue of the Library of the India Office,** Vol. II, pt. IV, Supplement. London, 1923.

Imperial. Library, Calcutta. **Author Catalogue of Printed Books in Bengali Language,** 2 Vols, Calcutta, 1941–1943.

Long, The Rev. J. **Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets.** Calcutta, 1867.

দুষ্প্রাপ্য নাটকের আলোকচিত্র

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোঽয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। { শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ অগ্রহায়ণ। } ৮ম সংখ্যা।

"কন্যাপণ কি ভয়ানক!!!"

নান্দি।

গীত রাগিণী বেহাগ তাল আড়া।

ঽও হে সদয় বিভো। কেন নিরদয়?
বঙ্গের দুর্গতি আর প্রাণে নাহি সয়!!
(লো)কাচার-দেশাচারে, যায় দেশ ছারে খারে,
(দে)শায়েরা কুসংস্কারে, আছে অন্ধ প্রায়—
(ও)হে বিভো জ্ঞানাঞ্জন! করি জ্ঞান বিতরণ,
(ক)র এ দুখ ভঞ্জন, দেহ পদাশ্রয়
নাথ দেহ পদাশ্রয়।

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। না, না, আর আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, এ-(ক্ষ)ণে যে উদ্দেশ্য সাধনে আমার চেষ্টা, তদ্বিষয়ে প্র-(বৃত্ত) হই,—একার যত্নে—একার অধ্যবসায়ে—একার (য)ত্নে কোন হিতকর-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, তা, (এ)ও আমার অধিক সহায় লাভের সম্ভাবনা নাই, (উ)পস্থিত বিষয়ে, আমার চিরানুগতা প্রেয়সী অবশ্যই (স)াহায্য করবে, পত্নীই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ-রূপা আর স-(ক)ল কাজের প্রধান সহায়—তাকেই ডাকি।—প্রিয়ে! (প্রি)য়ে!! অয়ি প্রিয়ে!!!

নটীর প্রবেশ।

নটী। নাথ, কি কত্তে হবে বল?

সূত্র। প্রিয়ে, দেখ কেমন সুসময় উপস্থিত! এ-ক্ষণে দেশীয়লোকেরা কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদ পরি-ত্যাগ করে বিশুদ্ধ নাট্যামোদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেখ, নাট্যদর্শনার্থ সভাস্থ সকলেই কেমন উৎসুক হ-য়েছেন। আমরা এখানে অভিনয় কর্ত্তে আমন্ত্রিত হ-য়েছি, তা তুমি একবার মনোহর সংগীত দ্বারা সভাস্থ সকলের চিত্তবিমোহিত কর।

নটী। (অবজ্ঞা পূর্ব্বক) হাঁ, ইয়ের জন্যে এত চেঁচাচেচি, আমি ভেবেছিলাম, না জানি কি!—তোমার কি! "ভাঙে না মচকায়" কেবল নাচ গান নিয়েই ব্যস্ত! ঘরকন্না গোচে যায় না যেকে যায়, চোক তুলে দেখা নাই। আমার মাখন—(অর্দ্ধোক্তি।)

সূত্র। (মস্তকাবনত করিয়া) কি লজ্জা, তুমি এই সভার মধ্যে আমার অপমান কল্লে। জানইত আমার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, আমি কি মাখন ছানা খা-ওয়াতে পারি, তা মাখন মাখন করে—"

নটী। হোয়েছে! এ যে "ধানভান্তে শিবের গান" গাইলে! আমি কি বোল্লাম, কি বুঝ্লে! আমি কি ঘি মাখন খেতে চাচ্চি—বোলছিলাম কি, আমার মাখনলাল—"

সূত্র। (সচকিতে) হাঁ, তার কি হয়েছে? কোন অসুখ হয়েছে না কি?

নটী। অসুখ কি আবার? বাছা আমার সতত্তই অসুখ ভোগ কচ্চে! যেঠের কোলে পা দিয়ে বাছার এই পাঁচিশ বছোর বয়েস হল, বিয়ে হলে আজ কাল ছেলের বাপ হতো!—বাছা আমার ধার্ম্মিক, সুশীল,

['কন্যাপণ কি ভয়ানক' নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা]

নাগাশ্রমের অভিনয়।

(ক্রৈঁড়েল-প্রণীত-প্রহসন)

(প্রথম পটোত্তোলন।)

PROLOGUE *

জগতে পুরুষ যত ভাই, সব তারা
ভ্রাতা মোর ; যত নারী প্রাণের ভগিনী ;
পিতা মাতা কে তাহারা ? যত দিন, ভাই,
খাইতে পরিতে আমি নিজে না পেরেছি,
ততদিন, মা বাপকে ছিল প্রয়োজন ;
সত্য বটে—তত দিন অবশ্য ডেকেছি,
বাবা কিম্বা মা মা ব'লে—ততদিন বাঁধা
থাকিতে ছিলাম বাধ্য অধীনতা-ডোরে !
চরিয়া খাইতে নিজে শিখেছি এখন—
এবে আর কি সম্বন্ধ তাদের সহিত ?
কর্ষিত হয়েছে মম মন ; জ্ঞানে অন্ধ
তারা—থাকে অন্ধকারে—অতি মূর্খ ঘোর ;
আমি সে আঁধার থেকে আলোতে এসেছি—
পবিত্র ধর্ম্ম-কিরণে জ্ঞান-চক্ষু মোর
দীপ্ত পথে মুক্ত সদা। তবে আর কেন
মূর্খ, ভ্রান্ত, অপবিত্র, অধার্ম্মিক সঙ্গ
করিতে যাইব ফিরে ?—ছি ছি ছি কি ঘৃণা !
—নামে যেন গায় জ্বর আসে !—হিঁদু-ঘরে
ফিরে ? হিঁদু মা বাপেরে, আবার এ মুখে,
মা, বাবা, বলিয়ে ডাকা ? কাটা গায় ফিরে
নতি ? কাই কাই ভাই ও নাম ক'রো না !
পশু, পক্ষী, কীট, আদি স্বাধীন কে নয় ?
স্থলে জলে ঈশ্বরের জীব-সৃষ্টি মাঝে,
কোন্ প্রাণী, শৈশব উত্তীর্ণ হ'লে তার,
থাকে আর মা বাপের কাছে ? তবে ভাই,
সর্ব্ব জীবোপরি যার মান উচ্চতম,
সে সুখে কি সে হবে বঞ্চিত ? কখনই
নয় ! নয় ! নয় !—হায় ! বঙ্গবাসী ভীরু
তেজোহীন—পোষা পশু প্রায়—চির-কাল
রহিবি কি বাপ মার বশে ?—পরাধীন
পর-পদানত-পর-প্রত্যাশায় রত ?
স্বাধীনতা নিধি হায় ! চিনিবিরে কবে ?
রাজকীয় স্বাধীনতা হবে না এখন—
তা ব'লে কি স্বাধীনতা—অমূল্য রতন—
লভিব না মোরা ? অবশ্য লভিতে হবে ;
আর কোথা সে সাধ মিটাতে যাব বল ?
কেবা তা সহিবে ? বিনা নিজ মাতৃভূমি
—বিনা নিজ জনক জননী—বিনা খুড়া জেঠা ?
এমন সহজ সৌখ্য—অক্লেশ-অর্জিত—

* মধ্যস্থ মহাশয়। আমার এই প্রহসনে মাঝে মাঝে ইংরাজী দেখিয়া আপনার পাঠকগণ যেন বিকৃতি ভাবেন না ; যাঁহাদের উদ্দেশে ইহা লিখিত হইতেছে, তাঁহাদের বাক্য, রীতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই ইংরাজী-মিশ্রিত ! তবে যে বেশী ইংরাজী দিলাম না, সে কেবল আপনার কতকগুলি পাঠকের জন্য।

['নাগাশ্রমের অভিনয়'-এর প্রথম পৃষ্ঠা]

বিধবোদ্বাহ নাটক।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ত্তৃক

বিরচিত।

LIBRARY
89 7-11-67
RAJSHAHI

কলিকাতা।

অনুবাদ প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৮।

ক্ত পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক সহর কলিকাত যোড়া-
অনুবাদ যন্ত্রালয়ে অথবা কলু টোলা সুরতির বাগানে
স্থানে, অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

['বিধবোদ্বাহ নাটক'-এর আখ্যাপত্র]

বিধবা বিষম বিপদ্।

—০✽০—

মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গভূমি প্রবেশ।

মুখো—(দোবজা কাঁধে, বৃক্ষের চারি পাশে ভ্রমণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) কোথা গো চাড়ুয্যে বাড়ী আছ ?

চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ

চট্টো—(সজল নয়ন) আস্‌তে আজ্ঞা হউক, আসুন।
মুখো—বাড়ীর ভিতর কি করতেছিলে ? কাঁদছ কেন ?
চট্টো—(করুণ বচন) মুখুয্যে মহাশয় গো ! কান্নার কথা বলেন কেন ? কন্যা সন্তান, বড়ই যন্ত্রণা। বছর খানেক হলো, একটী কুলীনের ছেলে ডেকে তিনটে মেয়েই সম্প্রদান করিয়াছিলাম। বিস্তর খরচপত্র হয়েছিল। জামাইটী দেখ্‌তে শুন্‌তে দিব্যটী ছিল। কালি খবর পেয়েছি, সেটী গত হয়েছে।

(সজল নয়ন, গদ্গদ বচন)

মহাশয় গো। কি দুঃখ ! একেবারে তিনটে মেয়েই বিধবা ! আহা ! মেয়ে গুলি যেমন সুন্দরী, তেমনি সুশীল। কালি তাহাদের পতি বিয়োগ শুনিয়া যেরূপ ক্লেশ ও কাতরালি দেখিলাম [illegible]

['বিধবা বিষম বিপদ্' নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা]

বিধবামনোরঞ্জন

নাটক।

প্রথমভাগ।

শ্রীরাধানাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সরানহাটা ষ্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে

শ্রীসেখ সেরাজ জমাদারের

['বিধবামনোরঞ্জন' নাটকের আখ্যাপত্র]

অগত্যা স্বীকার

প্রকরণ।

শ্রীউমাচরণ দে কর্ত্তৃক।

প্রকাশিত।

LIBRARY
৭০ ৭.11.69
SHAHI

কলিকাতা।

শাঁকারিটোলা নং ১৯ ভবনে নিউ বেঙ্গাল প্রেসে
মুদ্রিত।

১২৬৮

['অগত্যা স্বীকার' নাটকের আখ্যাপত্র]

VARENDRA RESEARCH MUSEUM
3978
RAJSHAHI

"ম্যাও ধর্‌বে কে?"

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

"শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।
————————"　　　　বিরাট পর্ব্ব।

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম
লাইব্রেরী
সন ১২৬৯ সাল = ১৮৬২

ঢাকা নূতনযন্ত্রে মুদ্রিত।

['ম্যাও ধরবে কে?' নাটকের আখ্যাপত্র]

কন্যা বিক্রয় নাটক

পাবনা বাসী

শ্রীনফরচন্দ্র পাল।

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শকাব্দ ১৭৮৫।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE 'GUPTA PRESS' NO. 16 MIRZAFFER'S LANE

1861.

মূল্য চারি আনা মাত্র

ORIENTAL

['কন্যা বিক্রয় নাটক'-এর আখ্যাপত্র]

আসুরোদ্বাহ নাটক

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কন্যাপণসম্বন্ধীয়
কুৎসিত ব্যবহার।

"শোভাদনদৃশে পুংসি কন্যাং যস্তু প্রযচ্ছতি।
রৌরবং নরকং প্রাপ্য চাণ্ডালত্বঞ্চ গচ্ছতি"॥
পদ্মপুরাণ।

জনৈক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রণীত।

কলিকাতা
বি, পি, এম্‌স যন্ত্রে
কালিকুমার চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৬।

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

['আসুরোদ্বাহ নাটক'-এর আখ্যাপত্র]

নবীন বিরহিণী

নাটক।

—০—

কলিকাতা।

ব্রাহ্ম-সমাজের যন্ত্রে

মুদ্রিত

—০—

১৭৮৬ শক।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

TRÜBNER & CO.

['নবীন বিরহিণী' নাটকের আখ্যাপত্র]

৯৫৭ 2973

বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রস্তাবনা।

সূত্রধর (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া)
এই যে মহারাজ কলি বাহাদুর আমারি দিকে উৎসুক নয়নে বারম্বার দৃষ্টি পাত করিতেছেন না জানি অদৃষ্টে আজ কি কর্ম্মভোগ আছে।

অহঙ্কার মন্ত্রী।

ওহে সূত্রধর! আজ যে একেবারে বেলাটা কাটয়ে (সভায় এলে হে) দেখ দেখি সভাস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং মহা

['বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়' নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা]

ইন্দুমতী নাটক।

VARENDRA RESEARCH MUSEUM
৪৭৭

শ্রীকেদারনাথ দত্ত কর্তৃক প্রণীত।

VARENDRA RESEARCH MUSEUM
LIBRARY
101
9-11-64
RAJSHAHI

কলিকাতা

শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

আহীরীটোলা নং ৯৩ বাটী।

সন ১২৬৮ সাল।

মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

['ইন্দুমতী নাটক'-এর আখ্যাপত্র]

শ্রীমিত্র নাটক।

প্রস্তাবনা।

(নটের প্রবেশ)

হাম্বির।-তেওট।

" কৃপাকর-গো মা সারদে
করি স্তুতি মিনতি তব পদে ॥
কমলবনে শোভিতা বাণি, বীণাপাণি জননি,
ষড়্‌রাগ তান মানে বিনোদিনি, মোদিনি,
কবিতা রস মদে।
নাটক রসে বাসনা মনে, তুষিবারে সুজনে,
অভিলাষ হয় যেন পরিপুর্ণ, তোমার
চরণের প্রসাদে ,, ॥

(নটীর প্রবেশ)

নট। (অবলোকন করিয়া) এই যে প্রণয়িনী এসেছ, অতি উত্তম হয়েছে! এক্ষণে, সকলের নেপথ্য

['শ্রীমিত্র নাটক'-এর প্রথম পৃষ্ঠা]

VARENDRA RESEARCH MUSEUM RAJSHAHI

সুধাকর বিষময়।

কলিকাতা।

কলিকাতা চোরবাগান ৪৫ নং ভবন স্কুলবুক
প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

['সুধাকর বিষময়' নাটকের আখ্যাপত্র]

নেশাখুরি কি ঝকমারি।

নাটক।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে

প্রণীত।

শ্রীসেখ জমিরদ্দীন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে

১২ নং ভবনে এংগ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫

মূল্য /১০ আনা মাত্র।

['নেশাখুরি কি ঝকমারি' নাটকের আখ্যাপত্র]

V.R.M LIBRARY ৬৩৭
...ARA KUMAR SARKAR'S LIBRARY

দলভঞ্জন নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

[মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দোচালায় উপবিষ্ট।]

মধু। (স্বগত) হায় হায় হল্যো কি! শালার
শে আগুন লেগেছে। তখন তখন পালমশাগের
ষের মত পয়সায় এক এক আটী গাঁজা মিলতো; চাউে
য়সার আফিম কিন্‌লে কাঁচা পাকা হরেক রকম করে
ওয়া যেতো; চরসও এত মাগ্গি ছিল না। ঐ যে
থায় বলে "নড়্যে চড়্যে বুড়ীর—হাত" তা বেটারা চাল,
াট, পাট, নীল ছেড়্যে কেবল উঠে পড়্যে আবগারীর
ঙ্গে লেগেছে। শুন্তে পাচ্চি, আবার নাকি গুড়-
কর উপর লাগে লাগে হয়েছে। নীলকরেরা যেমন
সার উপর লেগেছে, এ বেটারাও তেমনি আমাদের
পর উঠে পড়্যে লেগেছে। সে যা হোক্, আজ্
তে একটী পয়সা নেই, ঘরে একটু মালও নেই,
বলাটা অধিক হয়েছে, ঘন ঘন হাই উঠ্‌চে, গা টা মাটি
টি কচ্চ্যে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) যাই দেখি এক বার
ন্তে বেটাদের কাছে, যদি এ বেলাটার কোন রকম
গাড় করে আসতে পারি। আর দেখি দেকি যদি"

['দলভঞ্জন নাটক'-এর প্রথম পৃষ্ঠা]

পুনর্ব্বিবাহ নাটক।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

গৌড়ীয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।

মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

['পুনর্ব্বিবাহ নাটক'-এর আখ্যাপত্র]

RAJSHAHI 487
LIBRARY 115

বিধবা সুখের দশা

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

প্রাকৃত যন্ত্রে

তৃতীয়বার

মুদ্রিত।

LIBRARY
598
20-3-65

মির্জ্জাপুর।

হলওএলস্ লেন ১ নং বাটী।

শকাব্দা ১৭৮৪।

মূল্য পাঁচ পয়সা মাত্র।

['বিধবা সুখের দশা' নাটক-এর আখ্যাপত্র ।]

নির্ঘণ্ট

[এ-নির্ঘণ্টে পাদটীকার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় নি।]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ২৬৫, ৪১১

অক্ষয়কুমার দত্ত ৬, ১৪, ২৪, ৫৩, ১০৩, ১০৪, ১৫৪, ১৮৬, ১৮৭, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২২১, ২৬১, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৫. ৩১০, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৪০৯,

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৫৬, ৫৭, ১২০

অখৃস্টান ২৭৩

অগত্যা স্বীকার প্রকরণ (নাটক) ১৭, ৬৫, ৭০, ৮৪, ২৩১, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৭, ২৯৫,

অজিতকুমার চক্রবর্তী ২২৬

অঞ্জনা ৩২৮, ৩২৯

অটল ২৯৮, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭০. ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৪০০, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬,

অটলকৃষ্ণ ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৯, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬

অদৃষ্টতত্ত্ব ১৫২

অধর্মরুচি মুখোপাধ্যায় ১২৭, ১৩৪, ১৪২

অনঙ্গমোহন ৩৭০

অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৪; ২৯৭

অনূঢ়া যুবতী (নাটক) ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ২৯৬

অন্নদাচরণ খাস্তগির ২০৯, ২৩০, ২৭২, ২৮৯, ৩১৭

অন্নদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৮, ১৬২, ২৩৩

অন্নদায়িনী ২০৯

অপূর্ব সতী (নাটক) ২৯৪, ২৯৬, ৩০৪, ৩৯৬

অবরোধ প্রথা ৩০৮, ৩১৫

অবরোধ বিরোধী মনোভাব বা সচেতনতা ৩০৯, ৩১৫, ৩১৬

অবলা বান্ধব (পত্রিকা) ২২৪, ২৭২, ২৮৮

অবোধবন্ধু (পত্রিকা) ৮, ২৭২, ২৮৮

অভয়কুমার ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৯২

অভয়াদেবী ১৮

অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫, ৭০

অভিজ্ঞান শকুন্তলম ৩৯৩

অমলা ১৯৬, ১৯৭

অমৃতবাজার পত্রিকা ৭, ১৭, ১১০, ৩৩৭

অমৃতলাল বসু ২৫০

অমৃতাচার্য ১৪২

অম্বিকা ৩৮৩

অম্বিকাচরণ বসু ১৭৬, ১৮৩

অযোধ্যা ২৫

অরুদত্ত ২৮৮

অর্জুনস্পৃহ ভট্টাচার্য ২৩৬

অশুভ পরিহারক ৪৭

অশ্লীলতা নিবারণী সভা ৩৯৫

অহিন্দু খ্রীকারোক্তি ২২৬

অ্যাংলিকান চার্চ ২২২

অ্যাডভোকেট জেনারেল ২২৫

অ্যামেরিকার ইউনিটারিয়ান ৪১৩

আইচ ১৭৪

আইন-ই-আকবরী ২০৩

আকবর, সম্রাট ২০৩, ৩৮৬,

আগ্রা ৩৬

আট গাঁই ৯০

আদি ব্রাহ্মসমাজ ১১১, ২২৬, ২২৭, ২৩০, ২৪৮, ২৮৯ ৩২৩, ৪১০,
আদিত্য ১৭৪
আদিশূর ১৭৪
আদুরী ৩২৬
আদ্যরস ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ২১৯
আদ্যরস প্রথা ১৭৭, ১৭৯, ৪১১
আদ্যরস সমস্যা ১৭৬, ১৮৩, ৪১৬
আনন্দমোহন বসু ৪১৫
আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ ২২৪
আন্তঃমেল বিবাহ ১১১
আবাগের বেটা ৩৬৮
আমহার্স্ট (গভর্নর জেনারেল) ২৭৪
আমি কি উন্মাদিনী ৫৩
আমি তো উন্মাদিনী (নাটক) ৩৬৫, ৩৭০
আমেরিকা ৫৫, ২৬৬
আমোদিনী ১০৯
আয়ারল্যাণ্ড ৩৫১
আর্যদর্শন (পত্রিকা) ৪৮, ২৭২, ২৮৮, ৩৯৬
আর্যবিবাহ ২০১, ২০২
আলাউদ্দীন খিলজী ৩৮৬
আলালের ঘরের দুলাল (নাটক) ২৩১, ২৩৪, ২৪১, ২৭১, ৩৫২, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৮০
আলেকজাণ্ডার ডাফ (ধর্ম যাজক) ৩৫২
আলো ১৯৩
আশুতোষ চক্রবর্তী ২৪২, ২৪৩
আশুতোষ দেব ২৭৬
আসুর বিবাহ ২০১, ২০২
আসুরোদ্বাহ (নাটক) ১৫৬,১৫৮, ১৫৯, ১৬০ ১৬২, ১৬৭, ১৭১, ২৩১, ২৩৩, ৪৪৩
আহমেদনগর ৩৪, ৩৬

ইউনিটারিআন ২৬৬, ২৬৭, ৩৫১, ৪১৩
ইউনিটারিআন আন্দোলন ২৬৬
ইউনিটারিআন খৃস্টান ৪১৪
ইংরেজ ১, ২৭৬, ২৯১, ৩১৩, ৩৩৫, ৩৫০, ৩৫২
ইংরেজ রাজত্ব ১, ৭, ২৫৩, ৩৩০, ৩৩৯, ৩৮৭
ইংরেজ রাজা ৪০৩
ইংরেজ শাসক ৩৬০
ইংরেজ সভ্যতা ২৬৪, ২৬৫
ইংরেজ সরকার ১৭২
ইংরেজদের মদ্যপান রীতি ৩৪০
ইংরেজি ৮, ১৯, ৩৪, ৩৭, ১১০, ১১৩, ১৬১, ২৩৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৮, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৯, ২৯১, ২৯৯, ৩০০, ৩৪০, ৩৫৮, ৩৭১, ৩৭৪, ৪০৪
ইংরেজি বিদ্যা ৩৪৬, ৩৫৬
ইংরেজি শিক্ষিত ৩৫৬, ৪১৪, ৪১৫
ইংলণ্ড ১৯, ২২২, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৩, ২৮৯, ৩১১, ৩১২, ৩২২, ৩৫০, ৩৫১, ৪১১, ৪১৩, ৪১৪
ইংলণ্ডীয় আদর্শ ২৬৫
ইংলণ্ডীয় নারীমুক্তি আন্দোলন ২৬৪, ২৬৫
ইংলণ্ডীয় সমাজ ২৬৫
ইংলণ্ডীয় সমাজসংস্কার আন্দোলন ৪১৪
ইঙ্গবঙ্গসমাজ ২৭৩
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ৮,৯
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিএশন ৭
ইন্দুমতি ২০৯, ৩০৪
ইন্দুমতি (নাটক) ২৯২; ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩০৪, ৩০৬, ৪৪১
ইন্দ্রনারায়ণ ২৭৮
ইভেনজেলিক্যাল ধর্মযাজক ৩৫১
ইম্পেরিআল লাইব্রেরী ৯
ইয়ং বেঙ্গল ১৯, ২২, ২৪, ২৭, ৩৭, ৯৬, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৮, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৯, ২৯৪, ৩০৯ ৩৪১, ৩৬৪, ৩৯০, ৪০৮, ৪০৯
ইয়র্কশায়ার ৩৫১

ইসলাম খান ৩৩৮, ৩৮৬
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৩৫২
ইহলৌকিকতার আন্দোলন ২৬৬
ইহারই নাম চক্ষুদান (নাটক) ২৯৪
ইশান চন্দ্র বসু ৪৮

ঈশ্বর গুপ্ত ১৫
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৭, ২৫৯, ২৭১, ২৭৯, ২৮১, ৩১০, ৪১৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫, ৬, ১৫, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮২, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৪, ১৬৮, ১৮৬, ১৮৭, ২০৪, ২০৬, ২১৩, ২৫২, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৯, ২৮০, ২৮৫, ৩১০, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ৪০৯, ৪১৩, ৪১৫, ৪১৯ ৪২০, ৪৩৭

উইলিআম অ্যাডাম ২৬১
উইলিআম ওয়ার্ড ২৭৩
উইলিআম কেরী ২৬৭
উইলিআম জোন্‌স্ ১
উইলিয়াম টম্‌পসন ৩২২
উড়িষ্যা ৩৬
উত্তম মুখোপাধ্যায় ১৩২, ১৩৪
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ৩৭
উপনিষদ ২
উপবীত ৬
উপেন্দ্রনাথ দাস ৪৪, ৫৪, ২৪৩, ২৪৬, ৩৯৭
উমা ১২৮, ১৮৪
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৫৮, ৫৯, ৬৯, ৭১, ৭৫, ১৫৪, ১৫৬, ৩২৭

উমেশ ১৬৮
উমেশচন্দ্র দত্ত ১৫৪, ২৭২, ২৮৬, ৩৫৪, ৪১৫
উমেশচন্দ্র মিত্র ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭১, ৩২৮, ৩৩০

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক ১০

এই এক রকম (প্রহসন) ২৪০
একেই কি বলে বাবুগিরি ৩৬৮, ৩৭৩, ৩৭৪ ৪০০, ৪৪২
একেই কি বলে সভ্যতা (প্রহসন) ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৭, ৩৭৮, ৪০০, ৪১৮
একেশ্বরবাদ ৪১৩
এডিনবরা ৩৫০
এডুকেশন গেজেট (পত্রিকা) ৪৫, ১২১
এমন কর্ম আর কর্ব না (নাটক) ২৪৩, ২৯৬
এরাই আবার বড়লোক ৩৬৫
এলাহাবাদ ২০
এলিট ১২, ১৯, ৩৩, ৩৪, ১০৯, ১১৮, ৪০৯, ৪১২, ৪১৪

ঐলবালা ২৪৭,

ওয়াহাবি আন্দোলন ২
ওয়েল উইশার পত্রিকা ৩৫৮

ঔপনিবেশিক সরকার ৩৬

কনৌজ ৮৯, ৯০, ১৭৪
কন্যাদায় নাটক ২৫০
কন্যাপণ ও কৌলীন্য প্রথা নিবারণী সভা ১৭২

কন্যাপণ কি ভয়ানক (নাটক) ১৪৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ২৪০, ২৪৪
কন্যাপণ নিবারণ আন্দোলন ১৫৫, ১৭১
কন্যাবিক্রয় নাটক ১৫৬, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৬, ২৪৪
কবি কঙ্কণ ৮৬
কমনওয়েলথ রিলেশন অফিস ৮
কমল ১৯৬, ৩৭০, ৩৭১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬
কমলা ১৯৭
কমলীনি / কমলিনী ৮৩, ১২৪, ১৪৫, ২৪৩, ২৪৬, ২৯৬, ৩০১, ৩০২
কর ১৭৪
কর্ণাট রাজার স্ত্রী ২৬২
কর্তা ঠাকুর ১৭০
কলকাতা ১, ২, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৬৪, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮৯, ৯৬, ১০০, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১২০, ১২১, ১২২, ১৫৪, ১৫৯, ১৭২, ১৭৭, ২১৭, ২২০, ২২৯, ২৪২, ২৫৬, ২৬৭, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৮০, ২৮৩, ২৯০, ২৯৬, ৩০০, ৩১২, ৩১৬। ৩২৬, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬৪, ৩৭৭, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৪০৩, ৪০৯, ৪১০, ৪১৪
—নগরী ৩৩৯, ৩৯৫, ৪০৭, ৪১০
—বিশ্ববিদ্যালয় ২৯০, ৪১১
কলকাতার এলিট ৪১০
কলিকুতূহল ১০৪
কলিকৌতুক (নাটক) ২৩১, ২৩৩
কলির কুলটা ৩৯৯, ৪০০, ৪০৬
কসবা ৩৬
কস্মিন হিন্দু মহিলা ১২৩, ১৫৬-৫৭, ৩২৭
কস্যচিৎ বঙ্গোঃ ২০৫
কাকুন ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩
কাঁচরা পাড়া ৩৪৪
কাদম্বিনী ৮২, ১২৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৪০, ১৮৮, ৩০৪, ৩২৬
কাদম্বিনী দেবী ২৭২
কানা-সুন্দর ৩৮৩, ৪০৬
কানাই ঘোষাল ১৭২,২৩৬, ২৩৯
কানাইলাল গাইন ৩৫৫, ৩৫৬
কান্তি ৩৮৩
কান্তিচন্দ্র ১৫৮, ১৬৮, ১৬৯
কামদেব ১৩২
কামসূত্র ৩৮৫
কামিনী ৬৫, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ১১৮, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২৪২, ২৬০, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০
কায়স্থ-কৌস্তভ ১৭৪
কালাপানি ৩
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ১০১
কালিদাসের পত্নী ২৬২, ৩০২
কালী ৩৪৫
কালীকিঙ্কর রায় ১৫৫
কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৭৯
কালীচরণ চৌধুরী ১১৮
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২১৪, ২৬১, ৩৯৭, ৪১৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৪০, ৫০, ১৮৭, ২০৪, ৩৯১ ৪১৫
কালীপ্রসাদ ঘোষ ২৭৯
কালীবাবু ৩৬৭
কালীমোহন ৪৪
কাশী ১৮, ৪৪, ৪৫, ১৭৩
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ২৬৪
কাশীশ্বর মিত্র ১০৪
কি মজার কর্তা ৩৯৯, ৪০৪, ৪০৬
কিছু কিছু বুঝি (নাটক) ৩৬৫
কিঞ্চিত জলযোগ (প্রহসন) ২৪৮, ২৯৪, ২৯৬, ৩২৩, ৩৩৩, ৩৬৫

কিটস ২৬৬
কিশোরী ৩৭২
কিশোরী চাঁদ মিত্র ৬, ২৭, ৩২, ৪০, ১০৪, ১০৫, ১৮৭, ২০৭, ২৭০, ২৭১, ২৭৯, ২৮০, ৩১০, ৩৪২, ৩৪৮, ৪১১, ৪১৫
কীর্তিরাম ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭৮, ৭৯,৮০
কুঁচিল বাবু ১৭৭, ১৮০
কুণ্ডু ১৭৪
কুণ্ডাগ্রাম ১১৮
কুবিক্রম ৮৫, ১৪৩
কুমুদিনী (নাটকের নায়িকা) ৭১, ৭৬, ৭৭, ৮৪, ৮৫, ১২৮, ১২৯, ২৯৫, ৩২৫, ৩৬৯ ৪০০, ৪০৬
কুমুদিনী ২৭২
কুমুদিনী দেবী ২৭৭
কুলকালিমা ১০৯
কুলজীকার ৯০
কুলজীশাস্ত্র ৮৯
কুলবন মুখোপাধ্যায় ১৩৩, ১৪১
কুলপালক ১৪১
কুলরহস্যকাব্য ১০৯
কুলক্ষণ ১০৫
কুলসিন্ধু ১৪০
কুলীন কন্যা বা কমলিনী ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪৫, ২৪৩, ২৪৬, ২৯৪, ২৯৬
কুলীন কায়স্থ (নাটক) ১৮৩, ২৫০
কুলীনকুল সর্বস্ব (নাটক) ৬, ২৮, ৫৮, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১৩২, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৩, ১৭২, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৯২, ২৯৫, ৪১৭, ৪৪১
কুসুম কুমারী দেবী ১১৭
কৃপারাম ২৯৭, ২৯৮
কৃষ্ণকুমার মিত্র ৩৪৫, ৩৮৮, ৪১৫
কৃষ্ণচন্দ্র রায় (কৃষ্ণনগরের রাজা) ২৫, ১৪৯
কৃষ্ণদাস ৬৫, ৬৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৭
কৃষ্ণদাস পাল ১০৬, ৩৫৪
কৃষ্ণনগর ৩৩, ৩৪৪, ৩৪৫
কৃষ্ণনগরের ডেপুটি কালেকটর ৩৪২
কৃষ্ণনগরের রাজা ৩৪৫
কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ১৮৪, ২৫০
কৃষ্ণমণি ১১৪
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২,৯৬, ৯৮, ১০৩, ১০৪, ৩৪৯
কেদারনাথ ১৫৮, ১৬২
কেদারনাথ দত্ত ২৯২
কেনারাম ডেপুটি ৩৭৬, ৪০৬
কেশবচন্দ্র সেন ৫১, ৫৩, ৬৪, ১৮৭, ২০৪ ২০৭, ২০৮, ২১৩, ২১৭, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৪৮, ২৭২, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯, ৩১০, ৩১১, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৩, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৯২, ৪০৯, ৪১০, ৪১৫
কৈলাস ৩৩৫
কৈলাসচন্দ্র দত্ত ২৬১
কৈলাসবাসিনী দেবী ২৬১, ২৭২, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৬, ২৯১
কৈশবব্রাহ্ম ২২৪
কোটালিপাড়া ৩৫
কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে (নাটক) ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ২৩১, ২৩৩, ২৪৭
কোরাণ ৮০, ২৯৭
কৌলিন্য ও বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ৮৯, ১১৯, ১৩৬, ১৪৪
কৌলিন্য প্রথা সংশোধনী (পুস্তিকা) ১০৯
কৌলীন্য বিরোধী আন্দোলন ১০৮, ১১৬, ১২১, ১৪২, ২১২
ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ২৬৫, ২৮৮, ৪১১
ক্রোটন ৫৬
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৪৫

ক্ষীরদা ১৭১
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯
ক্ষেত্রমোহিনী ১৯৫

খনা ৩২০
খাঁটুরা ১৫
খৃস্টান ধর্ম ২৬৭, ২৭৫, ২৭৮
খৃস্টান ধর্মযাজক ১৭, ৩৫২
খৃস্টান মিশনারী ১, ২০, ১০২, ২৭৩
খৃস্টান সমাজ ৪১৩

গঙ্গা ১৩৫, ৩১৬, ৩৭৪
গঙ্গাজল ৭৩
গঙ্গাতীর ৩৮৮
গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২০৪, ২০৮
গঙ্গাযাত্রা ১৩১
গঙ্গা সাগরে শিশুহত্যা ২৬৭
গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথা ১০৫
গঙ্গাস্নান ৩১১, ৩২৭
গণকঠাকুর ৮০, ৩৩২
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২৩
গণেশ ৩৯৮, ৪০৪ ৪০৬
গণেশবাবু ১২২
গণেশ সুন্দরী ১৭
গদাধর ৩৮০
গবেশ বাবু ১২৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২৩৬, ২৩৯
গাঙুলি ৬৭
গান্ধর্ব বিবাহ ১৯৯, ২১২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক) ৩৫৩
গুপ্ত ১৭৪
গুপ্তপ্রেমা ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৪
গুরুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ২৪৪, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩১, ৩৬৯
গুর্মুখ সিং ২৫৭
গুহ ১৭৪
গোঁসাই ৪০৪
গোকুল ২৯৮, ৩৭৬, ৪০৬
গোপাল ২৩৪, ২৩৬, ২৪১, ২৯৭
গোপালচন্দ্র বসু ৩৫৭
গোপাল দেশমুখ ৩৩
গোপাল মল্লিক ৬৪
গোপীমোহন ১৬০, ১৬৩, ১৭২
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ২৮৮
গোয়ালিনী রসবতী ১৬৬
গোলক ৩৭২
গোলাপী ৮৮,১৬৭, ১৮৯, ১৯৬, ২৯৫, ৩০৩, ৩৩০
গোলাপী (অভিনেত্রী) ৩৯৭
গোষ্ঠ বিহারী দত্ত ৩৯৭
গোস্বামী ৫৩
গৌড় ৩৮৬
গৌড়ীয় সমাজ ২৬৭
গৌড়ের রাজা আদিশূর ৮৯
গৌরদাস বসাক ২৭
গৌরমণি ৭২, ৭৬, ৮৬, ৮৭
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ২৬২, ২৬৩, ২৬৭
গৌরীদান ২০০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ২৪, ৩১, ২৭০, ২৭১, ২৭৯, ৩১০ ৩৯০, ৪১৫

ঘর থাকতে বাবুই ভেজে ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৯৯ ৪০০, ৪০২, ৪০৩, ৪০৬
ঘোষ ১৭৪
ঘোষজা ৮১
ঘোষাল ৬৭

চক্ষুদান (নাটক) ৩৬৫, ৩৬৬
চঞ্চলা ১২৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৮৮, ৩২৬
চট্টগ্রাম ৩৬
চণ্ডী ২৩৩

চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার ২৭৬
চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় ৪৩৭
চণ্ডীচরণ সেন ১৭
চণ্ডীপ্রসাদ ১৬৭, ২৪০
চন্দ্র ১৭৪
চন্দ্রকলা ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭
চন্দ্রকুমার হাজরা ১৬০, ১৬৮
চন্দ্রনাথ ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬
চন্দ্রমণি ৭৪
চন্দ্রমুখী ১৩৮
চন্দ্রলেখা ১২৫, ১২৬, ১৯২ ১৯৪, ১৯৫
চন্দ্রশেখর দেব ২৮৮
চপলা ৬৬, ৬৭, ৭০, ৮১, ৮৪, ১৯৪, ১৯৫
চপলাচিত্তচাপল্য (নাটক) ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৯, ৮৪, ১৩৪, ১৪০, ২৩১, ২৯৫, ৩২৭, ৩২৮
চর্যাপদ ৩৩৮, ৩৮৫
চাঁপাদাসী ৪০৬
চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা ৩৭০
চারুচন্দ্র ১৩৪
চারুপাঠ (তৃতীয় ভাগ) ২৮৪
চার্চ বিরোধী প্রগতিশীল সেক্যুলার আন্দোলন ২৬৬
চার্চ মিশনারী সোসাইটি ২৭৩
চুঁচুড়া ১২০, ১২১, ২৭৩
চুক্তি অথবা মুক্তি বিবাহ ২২৬
চোদ্দগাঁই ৯০
চৌত্রিশ গাঁই ৯০
চৌদ্দ আইন ১৭, ৪০৩

ছোকু মজুমদার ৮২

জগৎমোহিনী ৩৩০
জগদীশপুর ৪১, ২৬৮, ৩০৩, ৩৮২
জগবন্ধু (পত্রিকা) ২০৬
জন স্টুয়ার্ট মিল ২৬৬, ৩২২
জনক চট্টোপাধ্যায় ৩৭৮
জয়কৃষ্ণ মুখার্জী ৩৩, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ২৮০ ৪১৫
জয় গোপাল ২৪১, ২৪৯, ২৫০
জয়ন্ত গোস্বামী ১০
জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা ৭
জাতীয় সভা ৭,১১২, ৪১০
জাতীয়তাবাদ ৬
জানকীনাথ রায় ১১৪
জামাই বারিক (নাটক) ১২৪, ১৭৭, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২৯৬, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬
জাস্টিস অব পীস ২২২
জাহ্নবী ১৩৫, ১৩৯
জীবন চন্দ্র ২৯৮, ৩৭৭, ৪০৬
জে. ই. ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন ২৭৭
জে. এইচ. হেরিংটন ২৭৩
জে. পি. গ্র্যান্ট, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ১০৬
জেরিমি বেন্থাম ২৬৬
জোড়াসাঁকো ৮৭, ৩১২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪৩, ২৪৭, ২৪৮, ২৭২, ২৯৪, ২৯৬, ৩১১, ৩১৬, ৩২৩ ৩৩৩, ৩৩৪

জ্ঞান তরঙ্গিনী সভা ২৯৪, ৩৭১, ৩৭৯
জ্ঞানদা ১৬৭, ২৩৩
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ২৭২, ২৯১, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৫, ৩২০, ৩২১
জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার ৩৬২, ৩৬৬
জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা ৪৯, ২০৮,২১৫, ২১৯, ৩৩৬ ৩৬৫
জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা ১৯,২২,২৫,৯৬, ১০২, ১৪৯, ১৫৩, ২৬৮, ২৬৯, ৩০৯

টম পেইন ২৬৬
টমাস ট্রটার ৩৫০

টাকী ৩৪৪
ঠাকুর ঘর ৫৬
ডাক্তারবাবু (নাটক) ৩৬৫; ৩৬৬
ডিরোজিও ৫,
ডিরোজিও শিষ্য ৩১৬, ৩৪১, ৩৪২
ডেভিড হেয়ার স্মৃতি তহবিল ২০৬

ঢাকা ৪৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১৬, ২২৯
৩৪৫, ৩৫৪, ৪১৪
ঢাকা কলেজ ২০৮
ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা ৪৭, ৮৪, ১১১

তক্ষক ৩৩৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৪১, ১০৩, ২০৫, ২০৬,
২০৭, ২০৯, ২১৮, ২২৭, ২৫৭, ২৬৯,
২৭৯, ২৮৯, ৩১৬, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৯০,
৩৯১, ৩৯৫
তত্ত্ববোধিনী সভা ১০৪, ৪১৩
তপনরায় চৌধুরী ১০
তমোলুক পত্রিকা ৮
তরঙ্গমোহিনী নাটক ১১৩, ১৩৮
তরুদত্ত ২৮৮
তর্কালঙ্কার ৮১
তাঁতি ৪৬
তারক ৩৭৩, ৩৮১
তারকচন্দ্র চূড়ামণি ১২২, ১২৩, ১৮৬, ১৮৭,
২৩৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৯৪, ২২৮, ৩৬৩
তারা ৮৭
তারানাথ বাচস্পতি ১১১, ১১৩
তারাপদ চক্রবর্তী ২২
তারাশঙ্কর তর্করত্ন ২৭০, ২৭১
তারিণীচরণ দাস ৩৯৮
তিন আইন ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৮, ২১৯
২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৪৬, ৪১২
তিন আইনের ৪৭ ধারা ৩৬১
তুলসী মঞ্চ ৫৬

তেজেন্দ্র ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৮১, ৩৮২, ৪০৬
তৈলঙ্গ (স্থানের নাম) ১৮
ত্রিবেণী ৩৫

থাকমণি ৯৮, ৯৯, ১০০

দক্ষিণ রাঢ় ৩৮৬
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৯, ২৫, ২৬, ১৮৭,
২৭২, ২৭৭, ২৭৮
দত্ত ১৭৪
দমদম ৩৫১, ৩৫২
দত্তাচার্য ১৪৪, ১৪৫
দয়ারাম দত্ত ২৫১
দয়াল চক্রবর্তী ১৬৯
দর্পনারায়ণ ৩২৬, ৩৭৪
দলভঞ্জন নাটক ৮১, ৩৭৩, ৩৮৩, ৪৪২
দাস ১৭৪
দিগম্বর মিত্র ২৮, ৩৩, ১০৭, ৪১৫
দিনাজপুর ১০৪
দীনদয়াল ১৫৪
দীননাথ ১২৪, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৬, ২৪৬
দীনবন্ধু মিত্র ৭১, ৮৬, ৮৭, ১২১, ১২৩, ১২৪
১৪৫, ১৭৬, ১৭৭ ১৭৯, ১৮৩, ১৮৬,
১৮৭, ১৯০, ২৪৩, ২৪৫, ২৯৪, ২৯৮,
৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬,
৩৬৯, ৪১৫, ৪১৬
দীনেশচরণ বসু ১১৭
দুঃখহর ৭১
দুঃখিনী কুলীন কামিনী ১০৯
দুর্জন দমন মহানবমী (পত্রিকা) ২৪
দুর্গাচরণ গুপ্ত ২৭৬
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০, ৪৩৭
দুর্গাচরণ রায় ২৫০
দুর্গানারায়ণ ৪৩
দুর্গামোহন দাস ৪৪, ৪৫, ১১৫, ১৮৭, ২১৩,
২৭২, ২৮৬, ২৮৯, ৩১৭, ৩৯৪, ৪১০,
৪১৫

দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ৩২৮, ৩৪১, ৩৮৮, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪১৩
দেব ১৭৪
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ১১৪, ২১১, ২৭২, ৪১৫
দেবীবর ৯১, ৯২, ৪১৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬, ২৭, ২৮, ৩৩, ৪৩, ১০৩ ১৮৭, ২০৪, ২০৯, ২১৩, ২১৬, ২১৭, ২২৩, ২২৬, ২৭৯, ২৮৫, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৭, ৪১৫
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৫, ২৪৬, ২৯৪
দেশাচার নাটক ২৯৪
দৈবজ্ঞ ৬৫
দোলযাত্রা ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৫
দ্রবময়ী দেবী ২৭৬.
দ্রাবিড় ১৮
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ১০৪, ১০৮, ১১২, ১৮৭, ২৭২, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ৪১০, ৪১৫
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ২১৮, ৩৬০, ৪১৫
দ্বারকানাথ মিত্র ১০৬, ৩৪৮
দ্বারকানাথ রায় ২৭০, ২৭১
'দ্বিজতনয়া' (লেখিকা) ২৯১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ৩১১

ধর(জাত) ১৭৪
ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা ২০৭, ২২৪
ধর্মনীতি (গ্রন্থ) ১০৩, ১০৪, ২০৭, ২১৪
ধর্মসভা ২৩, ২৮, ৩৫
ধীগান ৬৯, ৮৫
ধুলিয়া ৩৪
ধোয়ী ৩৮৫

নকুল ৩৮০
নকুলেশ্বর ৩৭৬, ৩৮১, ৪০১
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৯৭, ৪১৫
নগেন্দ্রনাথ বসু ১১৬
নদের চাঁদ ১২১, ১২৪, ২৪৫
নন্দী ১৭৪
নফরচন্দ্র পাল ১৫৬, ১৬১, ২৪০, ২৪৪, ৪১৬
নবগোপাল মিত্র ৭
নবদ্বীপ ৩৫, ৩৪৪, ৩৪৫
নববাবু ২৯৪, ৩০২, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯
নববাবু বিলাস ২৫৭, ২৫৮, ৩৪০, ৩৯০
নবশাখিকা ১৯৭
নবীন ৭৪, ১৫৮, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬ ১৯৭, ২৪৪
নবীন তপস্বিনী (নাটক) ২৯৫, ৩২৪, ৩২৫
নবীন বসু ৩৯২
নবীন বিরহিণী (নাটক) ১৮৯, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮
নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৬২, ৩৬৫, ৩৭০
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৯৪, ৩২৭, ৩৭৩
নবু বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭, ১২৮, ১৩২, ১৪২
নব্যবঙ্গ ২৬৮
নব্যভারত (পত্রিকা) ৫৭, ২৭২, ২৮৮
নয়ন ৩৭২
নয়ন চাঁদ ৩৭৭, ৩৭৯
নয়শো রূপেয়া (নাটক) ১৪৬, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭২, ২৩১, ২৩২, ২৩৬, ২৩৯, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৫, ৪১৮
নলিনী ২৯৬, ৩০৪, ৩৬৯, ৩৯৬, ৪০০, ৪০৬
নাগ (জাত) ১৭৪
নাগা সন্ন্যাসী ১৭৮
নাগাশ্রম (পত্রিকা) ৩১৬
নাগাশ্রমের অভিনয় (নাটক) ২৯৫, ৩২৩, ৩৩৫, ৩৩৬
নাটোর ১০৪, ১৪৯
নাসিরজান ২৫৮
নান্দীতে সূত্রধার ১২২

নাপিতানী রসবতী ৬৩, ৭০
নারদ ২২, ২৯, ৯৭
নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি ১০৪
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪
নিতম্বিনী ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৮৮, ২৯৬
নিত্যানন্দ রায় ১৫৮, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৩, ২৩১ ২৩৬
নিমচাঁদ দত্ত ৩২৫, ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৬ ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৪০১
নিমাইচরণ সিংহ ৪৫
নিয়ুইর্ক ৩৫০
নিরীশ্বর বিবাহ ২২৭, ২২৮, ২৪৮
নিস্তারিণী (নাটকের চরিত্র) ১৬৭, ৩০১, ৩০৬ ৩৩০, ৪০৪
নিস্তারিণী দেবী ২৭৭
নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১০, ২৫৯, ৪০৩
নীলদর্পন (নাটক) ১২৫, ২৯৫, ৩২৪, ৩২৫ ৩২৬
নীলকণ্ঠ ৩৮৩
নীলিমা ইব্রাহীম ১০
নেশাখুরি কি ঝকমারি ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮৩, ৪০০
নৈকষ্যকুলীন ১১২
নোয়াখালি ৪৬
ন্যায়রত্ন ৭১, ৭৬, ৭৭
ন্যাশনাল থিয়েটার ১২১

পদ্মদিদি ৭৭.
পদ্মমুখী ৭১
পদ্মলোচন ৩০, ১২৫, ১৭৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭
পদ্মাবতী ৭৪,৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০
পণ্ডিত সর্বসুন্দর ২৪৫, ২৪৭
পণ্ডিতা রমাবাই ৫৫
(২৪) পরগণা ২৭০
পরাশর ২৯, ৩০, ৯৭, ২০১, ৪১৯
পরাশর সংহিতা ২০০
পরিণয় নিবারণী সভা ৩৮০
পরিবর্ত বা বিনিময় বিবাহ পদ্ধতি **১৫১, ১৬৭**
পশ্চিমবঙ্গ ৮
পশ্চিম ভারত ২৯১, ৩১১, ৩১২
পাইকপাড়ার রাজা ৩৬৪
পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ৪১৮
পাঁচি ২৯৬
পান ১৭৪
পান আমল ৩৩৮
পালিত ১৭৪
পাশ করা ছেলে (নাটক) ২৫০
পাশ করা জামাই (নাটক) ২৫০
পাণি ৩২০
পিউরিটান ৩৯২, ৩৯৫
পিউরিটান আন্দোলন ৩৯৪
পিউরিটান মনোভাব ৩৯৫
পিয়ারী ২৫৮
পুঁটি ৩৯৮, ৪০৪
পুনর্বিবাহ (নাটক) ৭৫, ২৩১, ২৩৩, ২৪৪ ২৪৯, ২৩৭, ৩৩১, ৪৪৩
পুনর্বিবাহ আন্দোলন ১৯
পুনর্বিবাহ উৎসব ১২৮, ১২৯, ৩২১, ৩৩১, ৩৩২
পুনর্বিবাহ বা পুস্পোৎসব ২০৩
পুনর্বিবাহের আইন ২৮
পুনা ৩৩, ৩৬
পুন্নাম নরক ১৯৯
পুরাণ ৮০, ১৮৫, ২৯৩
পূর্ণচন্দ্র ৩৩৪
পূর্ণচন্দ্র বসু ৪৮, ২০৯, ২১২, ৪১৫
পূর্ববঙ্গ ৩৫৪, ৩৮৬
পূর্বোক্ত কৃপারাম (নাটক) ৩০০
পেট্রিয়ট ৩৩৭
পৌরাণিক ৭, ১৯৯, ২১২, ২৯১, ৩০২, **৪১৭**
পৌরাণিক নাটক ৪১৮

পৌরাণিক যুগ ২৫৩
প্যারীচরণ সরকার ৪৫, ৫০, ১০৬, ১১৫, ১৩৪, ১৮৭, ২০৯, ২১০, ২৭০, ২৭১, ২৭৭, ২৮৮, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬৫, ৪১৩, ৪১৫
প্যারীচাঁদ মিত্র ৬, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৯, ১৮৬, ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ২৮৫, ৩১০, ৩১৬, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৭৮, ৪১৩, ৪১৫
প্রণয় পরীক্ষা (নাটক) ১২৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২৯৫
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ২১৭, ৩৫৫
প্রভাকর (পত্রিকা) ৪৬
প্রভাত ৮৫
প্রমদা ২৩৩, ২৩৭, ২৯৫, ৩০৩, ৩০৪, ৩২৬ ৩২৯, ৩৯৯
প্রমীলা ৩৬৮, ৩৬৯, ৪০০, ৪০৫, ৪০৬
প্রসন্ন ৫৩, ৬৭, ৬৯, ৭৭, ৮৪, ১৮৮, ১৯২, ১৯৬, ১৯৭, ২৩৩, ২৪২, ২৯৫, ৩০৩
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৭৬, ২৯৩, ৩১৩
প্রসন্নকুমার পাল ৩৯৮
প্রাক-মুসলিম বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাস ৩৮৫
প্রাচীন বঙ্গদেশ ৩৩৮
প্রাণনাথ ২৪৭
প্রাণেশ্বরী ৩৮৩
প্রিন্স অব ওয়েলস্ ৩১৫
প্রিয়শঙ্কর ৪০১
প্রেমচাঁদ ১৫৮, ১৬৬, ৩৭৪, ৪০৬
প্রেসিডেন্সি কলেজ ৩৪৩, ৩৫৩

ফরাসি ৩২০
ফরিদপুর ১৫৪, ১৫৫
ফালতো ঝকড়া ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৩, ৪০০, ৪০৬
ফিলাডেলফিয়া ৩৫০
ফুলকুমারী ১৩৬
ফুলমণি ১৬০, ৩৯৯, ৪০২
ফোর্ট উইলিয়াম ৩৫২
ফ্রান্স ২৬৬

বউ-হওয়া একি দায় গঙ্গানাতে প্রাণ যায় ২৫৮, ২৯৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৯৯, ৪০০, ৪০২
বংশজ ৯১, ৯২, ৯৩, ১০১, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮ ১৫০, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৫, ১৭২, ১৯১, ২৩৬, ২৪৫, ৩০৫
বংশজ ব্রাহ্মণ ৪১৬
বংশধর সেন ১৮৪, ২৫০
বংশী, বংশীধর ৩৭২, ৩৭৯
বকনা ২৫৮
বকস ৬৭, ৬৯
বগলা ১২৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬ ৩৭৫
বঙ্কিম, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৩, ১৮৬, ১৮৭, ২৩৪, ২১১, ২৯৬
বঙ্গ ২২২, ২৭৭
বঙ্গদূত পত্রিকা ২৭৫
বঙ্গদেশ ১, ২, ৪, ১৫, ২১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৫৩, ৮৯, ৯০, ৯৫, ৯৮, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১২৩, ১৩৮, ১৮৩, ১৮৫, ১৯০, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২১২, ২১৬, ২১৯, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৬, ২৮৭, ২৬৮, ২৯৪, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬০, ৩৮৫, ৩৮৬ ৩৮৮, ৪১৪
বঙ্গদেশীয় ২৪২, ২৫২, ২৬৬
বঙ্গদেশীয় এলিট ৩৬২
বঙ্গদেশীয় ইতিহাস ৪
বঙ্গদেশীয় গ্রন্থাগার ৮
বঙ্গদেশীয় সংস্কার আন্দোলন ৪১২

বঙ্গদেশের আন্দোলন ২
বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ৪১৩, ৪১৪
বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ৪১১
বঙ্গমহিলা ৮
বঙ্গমহিলা পত্রিকা ৫৩, ২৭২, ২৮৮
বঙ্গসমাজ ১২, ৪৯, ২৬৮, ৩২৩ ৪০৭
বঙ্গীয় ৩, ৯, ২৫৩, ৩০৭, ৩৪২
বঙ্গীয় বিবাহ ২০৪
বঙ্গীয় সংস্কৃতি ১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী ৯
বজ্রযোগিনী গ্রাম ১০০
বজ্রযোগিনী গ্রাম ১০০
বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৫, ৩০১, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯৮, ৪০০ ৪০৩
বণিক ২১৯, ২২০
বর্ধমান রাজ ২৫
বর্ধমানের রাজা ৩৩, ৪০, ১০৪, ১০৬
বনমালী চট্টোপাধ্যায় ১৫৬
বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭, ১৩০
বন্ধুবর্গ সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভা ১০৪, ১০৫
বরদা ১৬৮
বরপণ ২১৯, ২২৮, ২৪৯
বরপণ প্রথা ২২০, ২৪৯
বরপণ রীতি ২০২, ২০৩
বরাহনগর ৫৫, ৩৪৪, ৩৫৪, ৩৫৯
বরিশাল ৪৫, ১৫৪, ৩১৩
বরের কাশী যাত্রা (নাটক) ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৩, ২৩১, ২৩৩, ২৩৬
বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত ৮৭
বলহীন ২৩৬, ২৩৭
বল্লবীন ১২৯
বল্লাল সেন (রাজা) ৯০, ৯১, ৯২, ১০১, ১৩৯ ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৭৪, ৩০২, ৪১৩
বল্লালীখাত নাটক ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৫, ১৫৭, ১৬৭, ৩২৭
বসন্ত ১৯৮, ২৩৩, ২৩৭, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪০৪
বসন্তক ৮
বসন্তকুমারী ২৫
বসাক ২১৯, ২২০
বস্ত্র ১৭৪
বহুবিবাহ ৯৬, ১৪৭
বহুবিবাহ আন্দোলন ৩৫২, ৩৯১, ৪১৫
বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণী সভা ১৫৪, ১৫৫
বহুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয় নিবারণী সভা ১৫৫
বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলন ১৫৪, ১৫৫
বহুবিবাহ নিবারণী সভা ১৪৪
বহুবিবাহ নিরোধক আইন ১০৪, ১০৬, ১০৭ ১১১, ১১৯, ১৪৫, ৪০৯
বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক; নবনাটক ১২২, ১২৫, ১২৬, ১৫৭, ১৬৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২৩১, ২৩৬, ২৩৯, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০
বহুবিবাহ বিরোধী আইন ৪৩৮
বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ৩, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৯, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৪৪, ২৮১
বহুবিবাহ বিরোধী আবেদনপত্র ১০২
বহুবিবাহ বিরোধী সভা ১৪৪, ১৯৮
বহুবিবাহ ব্যবসা ১৪০
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিষয়ক পুস্তক (প্রথম খণ্ড ১৮৭১) ১৪৮
বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন ১০৮ ১০৯
বাইজি লিকী ২৫৭, ২৫৮
বাইবেল ২, ৩০০
বাংলা ৬, ৯, ১৬
বাংলা রঙ্গমঞ্চ ৪১৮
বাংলা সাহিত্য ১৮৬, ২৫৯, ৩০৫, ৪০১
বাংলাদেশ ৮, ১০, ২৩,

বাংলার ইতিহাস ২৭৪
বাঁকলা ৩৫
বাঙালী জীবনে রমণী ১০
বাঙালী পাড়া ৩৪৪
বাঙালী সংস্কৃতি ১
বাঙালী সমাজ ১০, ২৬৭, ২৯১, ৩১৪
বাৎসায়ন ৩৮৫
বামা ১৮৪
'বামা রচনা' ২৮৮
বামা সুন্দরী (লেখিকা) ২৭২, ২৯১
বামাবোধিনী পত্রিকা ৮, ১৮, ৪৮, ১১৩, ২০৪, ২০৭, ২১২, ২১৪, ২২১, ২২৪, ২৭২, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৪, ৩১৬, ৪৩৫, ৪৪০
বামাবোধিনী সভা ২৮৬
বামুন পিসী ২৩৮
বায়রন ২৬৬, ৩৪২
বারাসত ৩৩, ২৭১, ২৭৭, ২৮০
বারুণী বিলাস ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ২২২
বালবিধবাদের দুর্দশা মোচনের আন্দোলন ১২
বালি ৯৬
বালীরাজা ৮৭,
বাল্যবিবাহ নাটক ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ২৪৪, ২৪৯ ২৯৬, ২৯৮, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৯৯
বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ২০৮, ২১১
'বাল্যবিবাহের দোষ' (প্রবন্ধ) ২৫,২৭০, ৪২০
বাল্যদ্বাহ নাটক ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬ ২৩৭, ২৪১, ৪৪৩
বাসব ৬৬, ৬৭, ৭০, ৮১
বাসর কৌতুক (নাটক) ৩২৮
বাসুকী ৩৩৫, ৩৩৬
বাহবা চৌদ্দ আইন ৪০০, ৪০৩
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১০৩
—(দ্বিতীয় ভাগ) ৩৫৭
বিক্রমপুর ৯৫, ১১০, ১১৫, ১৫৪, ১৭১
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ২০৪, ২১৩, ২৭২ ২৮৬ ৩৪৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৯২, ৪১৫
বিজয়বসন্ত ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯
বিদ্যাদর্শন পত্রিকা ৯৯, ১০০, ১০৩, ২০৫, ২৬৯, ২৭০, ৩৯০
বিদ্যাদেবী ৩৮
বিদ্যাভূষণ মহাশয় ২৪২
বিদ্যালঙ্কার ৩৭৩, ৩৭৪
বিদ্যাসাগরীয় ভাষা ৪২১
বিদ্যাসুন্দর (নাটক) ১৯৪, ২৬০, ২৯১, ৩০৫, ৩৯২, ৩৯৪
বিদ্যাহীন ২৩৫, ২৪১
বিদ্যোৎসাহিনী সভা ৩৯১
বিধবা বিবাহ (নাটক) ৫৯, ৬০,৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৮৪, ১১৩, ২৯২, ২৯৫, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩২, ৪১৭
বিধবা বিবাহ (পুস্তক) ৩০, ৪৭, ২৭০
বিধবা বিবাহ আন্দোলন ৭, ১৫, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ১১৮, ৩৫২ ৩৯১, ৪১০
'বিধবা বিবাহ উচিৎ কিনা' (বক্তৃতা) ৫৬
বিধবাবিবাহ প্রচলন ১৫৪, ১৫৫, ২০৬, ২৭০, ২৮১
বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ৬
—(দ্বিতীয় পুস্তক) ২৯
বিধবা বিবাহ প্রথম পুস্তক ৪১৯,৪২০, ৪২১
বিধবা বিবাহ প্রথা ৬৫
বিধবা বিবাহ বিরোধী আন্দোলন ৩৫
বিধবা বিবাহ বিরোধী দল ৭৯
বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন ৬, ১৯, ২০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৫৮, ১০৬, ৪০৯
বিধবা বিবাহ সমস্যা ২১, ২৮, ২৯৩
বিধবা বিবাহের সভা ৭১,
বিধবা বিবাহোৎসাহিনী সভা ৪৮

বিধবা বিরহ (নাটক) ৬৭, ৬৮, ৪০৫
বিধবাশ্রম ৫৫
বিধবা বিষম বিপদ (নাটক) ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮১, ২৯৫
বিধবা মনোরঞ্জন ৫৯, ৬১, ৭১, ৭৬, ২৯৫
বিধবা সুখের দশা (নাটক) ৬১, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৮২, ৮৪, ১৩৭, ২৩১, ২৯৫
বিধবোদ্বাহ (নাটক) ৫৯, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১৪৩, ১৫৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৬, ২৪৯, ২৯৫, ৩২৭
বিধুশেখরবাগীশ ২৯৭, ২৯৯, ৩০০
বিধুভূষণ ২৪২
বিধুমুখী ১১৫, ২৯৬, ৩৩৩, ৩৩৪
বিনোদ ৩৬৭, ৩৭৯, ৩৯৯, ৪০৪
বিনোদচন্দ্র চৌধুরী ২৫৪
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১০৯
বিনোদা ৭২, ৭৯, ১১৩, ১৪০
বিনোদিনী ৭১, ৭৭, ১৭১, ২৪৭,
বিনোদিনী (অভিনেত্রী) ২৫৭
বিন্দুবাসিনী ১২৫, ১৮১, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭
বিন্দুমাধব ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ৩২৬
বিপিনচন্দ্র পাল ৫৪, ৩৪৫, ৩৫৮, ৩৯৪, ৩৯৭, ৪১৫
বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ১৮৭
বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ৮৭, ১২৫, ১২৭, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৭, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৬, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩২
বিবাহ আইন ১৪৭, ২২৭
বিবাহ প্রতিষ্ঠান ২৩০, ২৩১, ২৫১
বিবাহ বিচ্ছেদ ২৪৮, ২৪৯, ২৫১, ৩৩৩, ৩৩৪
বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা ১৯৯, ২৪৮
বিবাহ বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা (প্রবন্ধ) ৪২০, ৪২১,
বিবাহ-ব্যবসা ১২৮
বিবিধার্থ সংগ্রহ (পত্রিকা) ৬, ২৬, ২৭, ১০৩, ২০৬, ২৩১, ২৭০, ৪২০
বিমল ৩৭৯
বিমলা ১৯৭, ৩০৪, ৩০৬
বিয়ে পাগলা বুড়ো (নাটক) ৬৯, ৭১, ৭২, ৮৬, ২৩১, ২৩৬
বিরহিনী ১৩২, ১৯৬
বিরাজ মোহিনী ২৪৭
বিলাসবতী ৭৬
বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য ২৩৬
বিহারীলাল রায় ৩১৩
বুঁচি ৩৯৯, ৪০২, ৪০৩, ৪০৫
বুঝলে কিনা (নাটক) ২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ৩০১ ৩২৭, ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৯, ৪০৬
বুড় জাম্বুবান (নাটক) ৩৬৮
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (নাটক) ৩৬২, ৩৬৪, ৩৯৮, ৪০৬
বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ২৩
বৃটিশ মুজিয়ম লাইব্রেরী ৮, ৯
বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা (প্রহসন) ২৩১, ২৪০
বৃন্দাবন ১৮১, ১৯০, ৩৭৭
বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬১
বেঙ্গল স্পেকটেটর (পত্রিকা) ২২, ২৩, ৩১, ১০৩, ২০৫, ২৬৯, ৩৪৯, ৪১৯
বেণী মাধব ৩০২
বেথুন ২৭৮, ২৭৯
বেথুন স্কুল, বেথুন বালিকা বিদ্যালয় ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৭, ২৯০, ২৯২, ৪০৯
বেথুন সোসাইটি ২৮৬
বেদ ২, ৩০, ৮০, ২৬৮, ২৯৭

বেদজ্ঞ শিক্ষিত ২০১
বেনজামিন রাগ ৩৫০
বেশ্যাবিবরণ ৩৭৮
বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক ৩৭৮
বেশ্যাসক্তি বিষম বিপত্তি ৩৭৮
বৈদিক ২১২, ২২২, ২৪২
বৈদিক বিবাহরীতি ২০৩
বৈদিক ব্রাহ্মণ ২৪২
বৈদিক ভারতবর্ষ ১৯৯
বৈদিক যুগ ২৫৩
বৈদ্য ৪১৪
বৈদ্যনাথ রায় (রাজা) ২৭৪
বৈষ্ণব ৩
বৈষ্ণব চরণ ৬৫, ৬৬
বৈষ্ণব দাস ৬৫
বৈষ্ণব সাহিত্য ৩৯৯
বৈষ্ণবী ২৭৬, ২৮৪
বোধোদয় ২৮০, ২৯১
বোম্বাই ২০, ৩৫১
ব্যবস্থাপক সভা ৩৭, ৩৮, ১০৬, ২২৭, ৩৯১
ব্যাপটিস্ট ১
ব্রহ্মচর্য ৩, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৭, ৩২, ১০১, ১৯৭
ব্রহ্মময়ী (নারী কর্মী) ২৭২
ব্রহ্মসঙ্গীত ৩২৫
ব্রহ্মসমাজ (প্রতিষ্ঠান) ২০৭
ব্রহ্মহত্যা ২৯৯
ব্রহ্মিকা বিবাহ ১৬৯
ব্রজবালা দেবী ৫৩, ৫৫
ব্রজবিলাস ১৯২, ২৩৩, ২৩৮, ২৪০
ব্রাহ্ম ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৪, ১০৯, ১৬৯, ২০৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২৩, ২২৪, ২২৭, ২৩০, ২৪৯, ২৮৯, ২৯৭, ৩১৪, ৩২৩, ৩৪৭, ৩৪৩, ৩৫৪, ৩৭৭, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০৭, ৪১০, ৪১২ ৪৪০
ব্রাহ্মকন্যা ২২৫
ব্রাহ্মধর্ম ১৭, ১৮, ৫৪, ৩৪২, ৪০৯, ৪১৫
ব্রাহ্ম পরিবার ৩২৩
ব্রাহ্ম পিউরিটান মনোভাব ৩৬২, ৩৯৭
ব্রাহ্ম প্রভাবিত হিন্দু ৩৯৭
ব্রাহ্মবন্ধু সভা ২৮৬
ব্রাহ্ম বিবাহ ২১৬, ২২৩, ২২৭, ২২৮, ২৪৯
ব্রাহ্ম বিবাহ আইন ১১৩, ২২৩, ২২৭, ৩৯৭
ব্রাহ্মসভা ৩৭৭, ৩৭৮
ব্রাহ্ম সমাজ ১৮, ২০৯, ২২৩, ২৭২, ২৮৬, ৩১৯ ৩২০, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৫, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৭৭, ৩৯৪, ৪০৬, ৪১০, ৪১২, ৪১৩
ব্রাহ্মণ ৪৫, ৫৭, ৬৯, ৮১, ৮৯, ৯০, ৯২, ১০১, ১০৭, ১১২, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৫, ১৭৪; ১৭৬, ১৯৪, ২০০, ২১৯, ২৩৬, ৩৮৬, ৪১৪, ৪১৬, ৪২২
ব্রাহ্মণ কন্যা ৩৭১
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৪২,৪৬, ৮৩, ৩৭৫
ব্রাহ্মণ সন্তান ৩৮৯
ব্রাহ্মণ সমাজ ১৭৪
ব্রাহ্মণী ১৩৯, ১৪০, ১৪১
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ২৯০

ভক্তপ্রসাদ ৩৭৮, ৪০৪, ৪০৬
ভক্তিবাদ ৭
ভগবান মাষ্টার ৮২
ভঙ্গকুলীন ৯৩, ৯৫, ৯৬, ১১০, ১১১, ১১২ ১২৪, ১২৮
ভঙ্গকুলীন মেল ১১৬
ভট্টাচার্য ১২১, ৩০০
ভদ্র ১৭৪
ভণ্ড ১৭৪
ভবানী (রাণী) ১৮, ১৪৯, ২৫৮, ২৬২, ২৯৩
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭, ২৬৭, ৩৪০, ৩৯০

ভয়বারিণী ২৩৩
ভাটপাড়া ৩৫
ভানুমতি ২৬২
ভারত ৭, ১০৬, ১০৭, ২১৮
ভারত আশ্রম ; ভারতাশ্রম ৩১৯, ৩৩৪, ৩৩৬
ভারতচন্দ্র রায় ২৫৮
ভারতবাসী ৫৫
ভারতভূমি ৪১, ১৪৩, ২৪১, ৩০৩
ভারত সংস্কারক সভা ২৮৬, ২৮৯, ৩৫৪, ৩৫৫
ভারত সুহৃদ (পত্রিকা) ৮, ২৭২, ২৮৮
ভারতবর্ষ ১, ৪১, ২২২, ২৫২, ২৭৬, ২৯১, ৩৩৮, ৩৩৯, ৪০৩
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৩৬১
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ২২৫, ২২৮, ২৪৮, ২৪৯, ৩১৭, ৩১৮, ৩৩৪, ৩৩৬, ৪১২
ভারতীয় ৭, ২৬, ১১৫, ২০৩,২৭৩, ২৮৮
ভারতীয় ঐতিহ্য ২৬৯
ভিক্টোরিয় বঙ্গদেশ ৫১
ভিক্টোরীয় যুগ ৩৬২, ৩৯৫
ভিক্টোরিয়া, রাণী ৩৫১
ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় ২৭৮
ভুবনমোহন সরকার ৩৫৯, ৪১৫
ভুবনেশ্বর মিত্র ৩৫৭
ভূতনাথ ৩৮৩
ভূদেব ৮১
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪৫, ৫৩, ১১৪, ১৮৭, ২০৪, ২৫৩
ভূধর ১৩৮, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ২৩৩, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ২৪৫, ৩০০, ৩২৬ ৩৩০
ভুবনেশ্বর ১৯৮, ২৩৮
ভূমেশ ৪০০, ৪০২
ভূষণ ২৪০, ২৪৪, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১
ভোটাধিকারের আন্দোলন ২৬৫
ভোলা ৩৩৪
ভোলানাথ ৩৭১, ৩৮২
ভোলানাথ চৌধুরী ১২৪
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৫৬, ২৪০, ২৪৭
ভ্যালারে মোর বাপ (প্রহসন) ২৪০

মণি ৪০০
মতিলাল ২৩৪, ২৪১, ৩৭৮, ৩৮০
মথুরা ৪৩
মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় ২৭১, ৩৪০, ৩৫২
মদ না গরল ? (পত্রিকা) ৩৩৫
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ২৫, ২০৬, ২৭০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ৩১০
মদনমোহন বসু ৪৩
মদনমোহন বিদ্যালঙ্কার ২৪, ২৬১, ২৭৭
মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন ৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০
মদ্যপান নিবারণী সভা ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৮০
মদ্যপান নিরোধক আইন ৩৫১
মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২ ৩৫৯, ৩৬২, ৪১১
মদ্যপান বিরোধী প্রচার ৩৬২
মদ্যপান বিরোধী রচনা ৩৫২
মদ্যপান বিরোধী সঙ্গীত ৩৫২
মধু ২৩৩
মধুসূদন ৩৮৩
মধুসূদন ঘোষ ৪২
মধ্যস্থ পত্রিকা ৭, ৮, ২১৫, ৩৪৪, ৩৬১
মনু ২৯, ৯৭, ২০০, ২০১, ২০২, ২৫২
মনুর বিধান ৩০, ২১৬
মনোমোহন বসু ১১১, ১২৫, ১২৬, ১৮৭, ২১০, ২২৬, ২২৮, ২৯৪, ৩২৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৬১, ৩৯৩
মনোমোহিনী ৬৭; ৮৪, ৪০০, ৪০২, ৪০৩
মনোরমা ৭৩, ৭৫, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৪, ১৬৭, ২৩৩, ২৯৫, ৩০১
মনোরমা ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০

মন্দোদরী রাণী ৮৭
মন্মথ ১৭, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৩৩০
ময়মনসিংহ ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৮৮
মহানির্বাণ তন্ত্র অথবা বৃহৎসংহিতা ২৬৮, ৩০২
মহাপাপ বাল্য বিবাহ ২০৮
মহাভারত ২৯১
মহামায়া ১২৫, ১২৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২৯৫
মহারাণী স্বর্ণময়ী ২৫৮
মহেন্দ্র ২৩৪, ২৩৭, ২৩৮, ৩৪১, ২৪৪, ২৬৮ ৩৭৪ ৩৭৬
মহেন্দ্রনাথ বসু ২৯২
মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭, ২০৮, ৪১৫
মহেশচন্দ্র দাস দে ৩৬২
মহেশচন্দ্র দেব ২২
মা এয়েছেন ৩৯৮
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৯৪, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৬২ ৩৬৩, ৩৬৪ ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৯৮ ৪১৬
মাখনলাল ১৫৮
মাগসর্বস্ব (নাটক) ২৩১, ২৩৯
মাঘোৎসব ৩১৭
মাঝিলপুর ২৮০
মাতাল জননীর প্রলাপ (নাটক) ৩৬২
মাতালের জননীর বিলাপ ৩৭৯
মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ৩৫৭
মাদ্রাজ ২০, ৩৭
মাধব ১৯৮, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৮৪,
মাধবচন্দ্র মল্লিক ৩৪২
মাধবনারায়ণ (নাটকের চরিত্র) ১৬৯
মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী ১৫৫
মায়া ৭৫, ৭৬, ৭৯, ২৪৯
মায়াবতী ২৩৪, ২৩৬
মায়া সুন্দরী ৩১৬
মারাঠা ২
মার্থা ১৭
মালতী ১৫৯, ১৬৩, ১৭০, ২৩৩, ২৩৬, ২৪০, ২৪৪, ২৯৫, ৩২৪
মালিনী ৭০, ১৩৪, ২৩৪
মালিপোতা ৩৪৫
মাসিক পত্রিকা (সাময়িক পত্র) ৬, ২৮, ১৩৩ ২৭১
মাহেশ ৩৮৮
মাহেশ্বরী ১৯২, ১৯৩
মিত্র ১৭৪
মিথিলা ১৮
মিশনারি বিদ্যালয় ২৭৫
মুক্তি বিবাহ ২২৮
মুরিজান ২৫৮
মুরলীধর সেন ৬৪
মুর্শিদাবাদ ৩৪৪
মুসলমান ২, ৩, ৭, ২০৮, ২৭৪, ৩৯০
মুসলমান নরপতি ৩৮৬
মুসলমান বেশ্যা ৩৯০
মুসলমান শাসক ৩৩৮
মুসলমান শিক্ষক ৩৩৮
মুসলিম ১৪, ২০২
মুসলিম আমল ৩৩৮ ৩৮৬
মুসলিম রাজত্বকাল ৩৩৮
মুসলিম শাসন ৩৮৬
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাঙ্কার ২৬৭
মেছুনী ৬৯, ৭০
মেছোবাজার ২৯৮
মেদিনীপুর ৪৬,২৭০, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৫৪
মেয়ে মনস্টার মিটিং (নাটক) ২৯৪, ৩৩৭
মেরী অ্যানকুক, মিস ২৭৩
মেরী কার্পেণ্টার ২৮৩, ৩১৩, ৩১৪
মেলবর্জন ১১০
মৈত্রেয়ী ২৬২
মোক্ষদা ৭৯
মোগল সরাই ৪৮

মোজাফফরপুর ৫২, ৫৫
মোহন্তের এই কাজ (নাটক) ২৩৮
মোহিত ৩৭০
মোহিনী ৭৪, ৮২, ৮৩, ১২৭, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৮, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭, ২৩৩, ২৩৮, ২৪০, ৩০৩, ৩২৭, ৪০৪
মৌলিক কন্যা! ১৭৪, ১৭৫
মৌলিক কায়স্থ ১৮৩, ১৮৪, ২৫০
ম্যাও ধরবে কে (নাটক) ৭১, ৮৩, ৮৫, ২৯৪, ২৯৫, ৩০১, ৩০২, ৪৪৪
ম্যাকান ২০

যতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৫০
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ৫৯, ৬৭, ৭০, ৩২৭
যবন ৭, ৫৩, ৬৮
যশোদা ১৩০, ১৩১, ১৩৬
যশোর/যশোহর ৩৪৪, ৩৪৫
যাজ্ঞবল্ক্য ২২, ২৯
যাদব চন্দ্র রায় ৩৫৫
যুক্তরাষ্ট্র ৩৫০
যুক্তিবাদ ২
যূথিকা ৭৯
যেমন কর্ম তেমনি ফল (নাটক) ৩৬৫, ৩৬৬ ৩৯৮
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩, ৪৫, ৫৪
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ ৩৯৬, ৪১৫

য়ুরোপ/য়োরোপ ৫৫, ২০২, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৭ ২৮৮, ৩১৪, ৩৪১, ৩৫১
য়োরোপীয় নারী ২৭০, ৩০৭

রংপুর ৬, ১১৮
রজনীনাথ রায় ১১৫
রঞ্জন ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫
রত্নগিরি ৩৪, ৩৬
রত্নাবলী ২৯৬
রবসন ৩৩৩
রবার্ট আওয়েন ২৬৬
রবার্ট মে ২৭৩
রবার্ট হ্যামিল্টন, স্যার ৩৭
রবীন্দ্র ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৯
রবীন্দ্রনাথ ২০৪, ২০৫, ২১২, ৩১১
রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৪০
রমাকান্ত ১৩০, ১৩২, ১৪১
রমাকান্ত দত্ত ২৩৯
রমানাথ ৪০১
রমানাথ ঠাকুর ১০৭
রমাপ্রসাদ রায় ১০৬
রমেশ ১৬৮,৩২৭
রমেশচন্দ্র দত্ত ১১৬, ৪১৮
রসিক ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৯, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ২৭, ৩৪৯
রাই কিশোরী ৭৫
রাইমণি ১৯৬
রাখালচন্দ্র রায় ২৭২, ৩১৩, ৪১৫
রাজকুমার চন্দ্র ৩৪৪
রাজকুমারী ৭৫, ৮৪
রাজকৃষ্ণ মুখার্জী ৩৩
রাজকৃষ্ণ রায় ২৫০
রাজনারায়ণ বসু ৬, ৭, ২৯, ৩০, ৪১, ৪৩, ১৮৭, ২০৪, ২০৯, ২১৩, ২১৭, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৯৪, ৪১৫
রাজপুর ২৪২
রাজবল্লভ, রাজা ১৮, ৫৫
রাজময় দীননাথ ১৪৫
রাজলক্ষ্মী ২৪৫, ২৯৫, ৩২৪, ৩২৫
রাজশাহী ২৮০, ৩১৫

রাজীব ১৫৮, ১৭১, ২৪০
রাজীব মুখুজ্জে ৬৯, ২৩৬
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৮, ৫৩, ২০৬, ২০৭, ২৭০, ৪৫১
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ২২২
রাধাকান্ত দেব ২৬, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৪
রাধানাথ শিকদার ৬, ২৮, ২৭১
রাধাকৃষ্ণ ৪০৪
রাধাবিনোদ হালদার ২৫০
রাধামণি ২৫০, ৩৯২
রাধামাধব মিত্র ৫৯, ৬১, ৭১
রাধামাধব হালদার ৩৯৮
রাবণ ৮৭
রামকানাই ১৮১
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১৬০
রামগতি ন্যায়রত্ন ৩৬৪
রামগোপাল ঘোষ ১৯, ২২, ১৮৭, ২৬৯, ২৭২, ২৭৭, ২৭৮; ৩৪২, ৩৪৯
রামচন্দ্র দত্ত ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ২৪৪; ২৪৯, ৩৫২, ৩৬৮
রামতনু লাহিড়ী ৬, ২৫, ২০৯, ৩১৬, ৪১৩, ৪১৫
রামতারণ ৩৬৮, ৩৭৮, ৪০৪
রামদাস ৩০২, ৩০৬, ৩৩২
রামধন ৩০৫
রামধন মজুমদার ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩ ১৬৪
রাম নারায়ণ তর্করত্ন ৬, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১৪৫, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৮৬, ১৮৭, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৯৮
রামনারায়ণ বসু ৩৭৮
রামব্রহ্ম ১২৭, ১৩২, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪
রামমণি ৭৬, ৮৬, ৮৭, ২৩৭
রামমোহন রায় ১, ৫, ১৯, ২৪, ৩১, ৫৫, ৮০, ১০১, ১০২, ১০৬, ১৪৭, ১৫৩, ২২৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৫, ৩৪২, ৪০৮, ৪০৯, ৪১৩, ৪১৬
রামরত্ন ৩৮৩
রামসুন্দর ৩৭৬
রামায়ণ ৮৭, ২৯১
রামায়ণজিকা ২৭১
রায় গিন্নী ২৪৭
রায় মহাশয় ১৫৯, ১৬০, ২৩৩
রায়েরকাটি ১৫৪, ১৫৫
রাসবিহারিণী ১৭, ৬৫, ৬৬, ৮৪
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৬, ১৪৪, ১৫৫, ৪১৫
রাসমণি, রাণী ২৫৮
রাসসুন্দরী দেবী ২৫৪, ২৮৩, ২৮৪
রাহা ১৭৪
রিচার্ড কার্লাইল ২৬৬
রুদ্র ১৭৪
রুদ্ররাম ২৪৫
রূপচাঁদ পক্ষী ১০১, ২২৮
রূপনারায়ণ পাকড়াশি ১৬০, ১৬৩
রেনেসান্স ৪, ৪১০
রেবতী ৭৪
রেভারেণ্ড পীয়ার্স ২৭৩
রোকা কড়ি চোকা মাল (নাটক) ২৫০
রোহিণী দাস ২০০
র‍্যালফ ফিচ ২০২

লক্ষ্মণ সেন ৯২
লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী ১২৩; ১২৪, ১৪৫, ২৪৩, ২৪৬, ২৯৪
লক্ষ্মী নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১১৪
লজ্জাহীন ২৪১
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ২৬৫
লর্ড নীটন ৩৯৩
ললিত ১২১, ১২৩, ১২৪, ১৪৫, ২৪৫, ২৪৬, ৩০৫, ৩৭০

লাক্ষাশায়ার ৩৫১
লাম্পাট্য বিরোধী আন্দোলন ৩৯৮, ৪০০
লীলাবতী ২৬০, ২৬২, ৩০২
লীলাবতী (নাটকের চরিত্র) ১২১, ১২৩, ১২৪, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৫, ৩২৪
লীলাবতী (নাটক) ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪২, ১৪৫, ২৪৩, ২৪৬, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯, ৩২৪, ৩৭৩, ৩৮২, ৪১৬, ৪১৭
লোকেন্দ্র ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৮১
লোকেন্দ্র গবেন্দ্র (নাটক) ২৫০
ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার ২৬৬

শকুন্তলা ২৯৬
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ৩৫৩
শরৎ সরোজিনী (নাটক) ২৪৩, ২৯৬, ৩৯৭
শর্মিষ্ঠা ২৯৬
শশাঙ্ক ৮৩, ৮৫
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫, ৫৫, ৫৬, ২৭২, ২৮৬, ২৮৯, ৩১৪, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৯, ৪১০, ৪১৫
শশিমুখী ১৮৯, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ৩৩০
শান্তশীল ১২৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ১৯৮, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮১, ৪০৭
শান্তিপুর ১৯, ৩৯, ৪৬, ১৫৪, ৩১৯, ৩৪৪
শামা ৩৯৯, ৪০০, ৪০২
শাম্ভবী ১৩৯, ১৪০
শারদা সুন্দরী ২৯৯, ৩২৪, ৩২৫
শালগ্রাম ৫৬
শাহমৎ জঙ্গের হেরেম ৩৮৬
শিখ ২
শিবচন্দ্র রায় ২৭৬
শিবনাথ ৪৪, ৪৫
শিবনাথ শাস্ত্রী ৯৮, ১১৩, ২০৪, ২১৩, ২২৭, ২৭২, ২৮৬, ২৮৯, ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪১০, ৪১৫, ৪১৮
শিববংশ ৩৩৫
শিমুয়েল পিরবক্স ৬৭, ৬৮, ৭১
শিল্প বিপ্লব ২
শিশির কুমার ঘোষ ১৪৬, ১৫৬, ১৭২, ৪১৬
শিশুকন্যা বিবাহ রীতি ২১২
শিশু শিক্ষা ২৮০
শীল (জাত) ১৭৪
শুকুনীর মড়া ৩৬৮
শুভাচার্য ১৪২
শূদ্র ৬, ১০০
শূদ্রপতি ২০০
শূদ্র-স্ত্রী ৩৮৬
শূদ্রা ৩৮৫
শেলী ২৬৬
শ্বেতাঙ্গ দেবতা ৩৩৬
শ্যাম ৩৬৮
শ্যাম বাজার ১২১, ৩৩৪
শ্যামবাজার নাট্য সমাজ ২৪৬
শ্যামা ১২৭, ১৩৬, ১৮৪, ২৫১
শ্যামাচরণ দাস ২৫, ২৬, ৭৮
শ্যামাচরণ দে ৩২৮
শ্যামাচরণ শ্রীমানি ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭
শ্রীনাথ দাস ৪৪
শ্রীনাথ সিংহ ১০৯
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ২৩১
শ্রীমতি ৭৫
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ২৬৭
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৩৯, ৪০, ৪২, ৭১
শ্রীশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ৩৩, ৫৩, ১০৪, ১০৬
শ্রোত্রিয় ৯২, ৯৩, ১০১, ১৪৮, ১৫০, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৫, ২৩৬
শ্রোত্রীয় কন্যা ৯১
শ্রোত্রীয় বংশজ ২১৯

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ৪১৬
শ্রোত্রীয় সংভ্রান্তভাজন ৯০

ষষ্টীদাস ১৫৮, ১৬৫, ১৬৬

সংবাদ প্রভাকর ১৫, ২৩, ২৬, ২৭, ৩৯, ১২০ ২০৬, ২৭১, ২৭৯
সংস্কৃত কলেজ ৫, ৩৯, ১০৯, ১১১, ১৪২
সংস্কৃত বিবাহ-রীতি ২২৩
সংস্কৃত শ্লোক ৩০
সংস্কৃত সাহিত্য ২৭৬
সখী ৭৪, ৮২
সঙ্কর বিবাহ ২২৩
সঙ্গত সভা ২০৭
সঞ্জীবনী ৫৭
সতীদাহ ৩, ১২, ১৯, ২৪, ৩১, ৫১, ৭৪, ১০২ ১০৩, ২৬৭
সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন ৪০৮
সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন ১২
সতীপ্রকাশ সেন ২৫৪
সত্যভামা ৭৮, ১১১
সত্যশরণ ঘোষাল ১০৬, ১০৭, ৪১৫
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭২, ২৮৬, ২৯১, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩২০
সদাশিব মুখোপাধ্যায় ১২৭
সধবার একাদশী ২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ৩২৫ ৩৬৩, ৩৬৪; ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৪০০, ৪০৩, ৪০৬, ৪১৮
সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা ১০৮, ১১১, ১১২, ১১৩ ১২৯, ১৫৪, ১৭২, ৪১০
সন্ন্যাসী ঠাকুর ৩৩২
সপত্নী ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২৩১, ২৩৩, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৯, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ৩০০, ৩০২, ৩২৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩২, ৩৬৩, ৪৪১
সপত্নী সমস্যা ১৮৭, ১৯০
সপত্নীত্ব সমস্যা ১৯৮
সমদর্শী ৮
সমাচার চন্দ্রিকা ১০২, ২৬৪
সমাচার দর্পণ ১৯, ১৫৩, ২৭৪
সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি ৬
সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন ১০
সমাজ সংস্কার আন্দোলন ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১০২, ১০৩, ২১০, ২৬৭, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪৪৮
সমাজোন্নতি বিধায়ক বান্ধব সভা ২৭১
সমাজোন্নতি বিধায়িনী বন্ধুবর্গ সমিতি ২৭, ৩২, ২০৭
সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক আইন ২৬৫
সম্বন্ধ সমাধী নাটকম ২৩২, ২৩৩, ৩৪২
সম্বাদ কৌমুদী ১৫৩
সম্বাদ ভাস্কর ৩৮, ১০৩, ১১৮; ২৭১, ২৭৭, ২৭৯, ৩৮৮, ৩৯০
সরফরাজ খানের হেরেম ৩৮৬
সরমা ২৯৫
সরলতা (নাটকের চরিত্র) ২৯৫, ৩২৪, ৩২৫
সরলা ৮৪, ১২৫, ১২৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৭২, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৫, ৩৯৯, ৪০০
সরোজিনী ২৪৩, ২৪৭, ২৯৬
সর্বশুভকরী পত্রিকা ২৪, ১০৩, ২০৬, ২৭৯, ৩৯০, ৪২০
সর্বশুভকরী সভা ২৪, ১০৪
সর্বস্কন্দর শিরমণি ৩০৬
সহজিয়া ৩
সহমরণ ১৩, ১০১, ১৯৯, ২০২, ২৪৬

সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ (গ্রন্থ) ১০২
সাঁতার। ৩৪,৩৬
সাতুলাল ১৪৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৭২, ৩০৫
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতি ১০২
সাধুচরণ ৬৫
সাধের বিয়ে নাটক ২৩১
সাপত্ন্য ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৮, ২৫৪
সাপত্ন্য সমস্যা ১৯৭
সাবিত্রী ১২৫, ১২৬, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ২৮১
সামাজিক আন্দোলন ১১৮
সামাজিক সমস্যা ২৯৪
সারদা ৩০২, ৩০৪, ৩০৬
সারদা দেবী ৫২, ৫৫
সারদা সুন্দরী ২৪৫, ২৭৬, ২৯৩, ২২৫
(১৮৫৬) সালের ১৫ আইন ৩৮
সি. এইচ. ডল ৩৫৩
সিংহ (জাত) ১৭৪
সিদ্ধেশ্বর ১২৪, ২৪৫, ৩২৪
সিদ্ধেশ্বর রায় ২৭২
সিন্দুর দেওয়ার রীতি ৩২১
সিন্দুরিয়া পট্টি ৬৪
সিন্ধু ১২৬
সিপাহী বিপ্লব ১০৬
সিবিল বিবাহ আইন ১৮, ৩৭, ৪১২
সিবিল বিবাহের অধিকার ৪১১
সিবিল ম্যারেজ আইন ২২২
সিরাজউদ্দৌলা ৩৮৬
সিলেট ৩৪৫
সিসিল বীডন ১০৬
সীতা ২০১
সীতানাথ ঘোষ ২০৬
সীতার বনবাস ২৯১
সুকুমারী ২২৩, ২৪৭, ৩৯৭
সুকুমারী দত্ত ২৭৪, ৩০৪, ৩৬৯
সুখময়ী ৭২, ৩০১
সুখা মেথরাণী ৩৭৩
সুদেব ৭০
সুধা না গরল ৩৬২, ৩৬৬
সুধাকর ৩৮৯
সুধাকর বিষময় ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮১, ৪০০, ৪০২ ৪০৩, ৪০৬, ৪০৭
সুধীর ১৪৫, ১৯৮
সুনীতি দেবী ২৩০
সুন্দরী দেবী ২৮৩
সুবর্ণ বণিক ২২০
সুবর্ম ৭৯
সুবোধ ১৮৯
সুমতি ১৯৬
সুরমা ১৯৭, ৩০১, ৩২৫, ৪০০, ৪০৬
সুরমা সুন্দরী ৩৭০
সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় ১১৩
সুরাপান নিবারণী আন্দোলন ৩৫৮,৩৬৫, ৩৭৭, ৪০০
সুরাপান নিবারণী সভা ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬৫, ৩৭৬
সুরাপান বিরোধী আন্দোলন ৩৫৩
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, ৪৩, ৩৫৫, ৩৫৮
সুরেন্দ্র বিনোদিনী ৪৪
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১১৭, ৪১৮
সুলভ সমাচার (পত্রিকা) ২২৪, ৩৪৫, ৩৫৯, ৩৮১
সুলোচনা ৬৩ ৬৪, ৬৮, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮৪, ১৩৫, ১৩৮, ২৩৩, ৩৩০, ৩৩২
সুশীল ৮১
সুশীলা ১৭০, ১৭১, ১৯৬
সূর্যকান্ত ৮১, ১৪২, ৩০০, ৩০২
সেক্সপিয়ার ৩৪২
সেকান্দারাবাদ ৩৪
সেক্যুলার ২২৬, ২২৯, ৪১৩
—অনুষ্ঠান ২২৬

—চুক্তি ২২২
—ধারণা ২২৯
—মানবতা ৪১২, ৪১৩
—মূল্যবোধ ৪
—সমস্যা ২৯৩, ৪১৩, ৪১৪
সেন (জাত) ১৭৪
সোনাগাছি ১৩৫
সোমনাথ ৪০৭
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ২০৮
সোম প্রকাশ ১৪, ৫৭, ৬৪, ২১০, ২২০ ৩৩৭, ৩৬০, ৩৯৩
সোমেন্দ্র ৩৬৩
সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ ১০২
সৌদামিনী ১৬৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ২০৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ৩২৫, ৩৩৭, ৩৭০, ৪০০
সৌদামিনী (নারীকর্মী) ২৭২
সৌদামিনী (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) ২৭৯
সৌরিন্দ্রী ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬
স্যাক্রামেণ্ট ২২৬
স্কুল বুক সোসাইটি ২৬৩, ২৬৭, ২৭৩
স্ত্রীলোক সাধ্য (নাটক) ২৯২
স্ত্রী শিক্ষা (নিবন্ধ) ২৫
স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন ৩৩২, ৩৯১
স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক (গ্রন্থ) ২৬৩, ২৭৪
স্ত্রী স্বাধীনতা ২৮১ ২৯২,, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৭, ৩১২, ৩১৬, ৩১৮, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪
স্ত্রী স্বাধীনতামূলক নাট্যরচনা ৩২৩
স্নান যাত্রা ৩৮৮, ৩৯৫
স্বয়ংবর প্রথা ২১৫, ২৪৪, ২৪৫
স্বয়ংবর বিবাহ রীতি ২১২
স্বয়ম্বর সভা ৩৩৭
স্বর্ণকুমারী ২০৯
স্বর্ণকুমারী দেবী ৩২০
স্বর্ণলতা ২৪৩, ২৯৬
স্বর্ণকুমারী দেবী ৩২০
স্বর্ণলতা ২৪৩, ২৯৬
স্বর্ণলতা নাটক ২৪৩, ২৪৬, ২৯৪, ২৯৬
স্মৃতিকার বৃহস্পতি ৩৮৫

হটিবিদ্যালঙ্কার ২৬২, ২৯৩
হর ৬৮, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৫, ৩৭৯, ৪০২, ৪০৪, ৪০৫, ৪৯৫
হর সুন্দরী ২৭৬, ২৯৩
হরকামিনী সুন্দরী ৩৬৮, ৩৬৯, ৪০০, ৪০৬
হরকালী ৩৭৯
হরচন্দ্র ঘোষ ২৭৮, ৩৫৪, ৩৫৬, ৪১৪
হরদেব চট্টোপাধ্যায় ২৭৯, ৩১০
হরবিলাস ১২৪, ১৪২, ১৪৫, ২৪৫
হরমণি ৩০৪
হরমোহিনী ১৩২, ১৪১
হরিপ্রিয়া ১৯৬
হরিবোল ১২৯
হরিমণি ১৯৬
হরিমোহন কর্মকার ২৩৯
হরিশচন্দ্র মিত্র ৪৭, ৭১, ১৪৫, ১৫৬, ২২৮, ২৪৪, ২৯৪, ৩০২, ৩৭৩, ৪১৫, ৪১৬
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৪২, ৩৪৮
হরিহর চক্রবর্তী ১৬২
হলধর ১৬১
হাওড়া ৪৮
হাড়িয়া পাড়া ১৫
হাণ্টার ৯৫, ১৫০
হাবা ১৯১, ১৯৭
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮১
হারীত ২৩, ২৯
হাসিশহর ৩৪৪
হিতসাধক (পত্রিকা) ৮, ৩৫৫, ৩৫৮

হিন্দু ২১৯; ২২৬, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ৩০৯, ৩৩৫, ৩৩৬, ৪০৮, ৪১৩
—ঐতিহ্য ২৫২
—কলেজ ৬, ২০৬, ২৬৪, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৯০
—জাতি ৪১, ৫৩, ২০৮
—জাতীয়তাবাদ ৪১৮
—জাতীয়তাবাদী লেখক ৩২৩
—ধর্ম ৭, ১৭, ২৮, ১১০, ৪০৮
হিন্দু পেট্রিয়ট ৩৫১
হিন্দু মহিলা নাটক অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা ব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য, হিন্দু মহিলা নাটক ৮৪, ৮৭, ১২৫, ১২৭, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৮ ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৭, ২৪২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ৩০১, ৩০১, ৩০২, ৩০৬, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩২, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৩, ৪০৬
হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ৩১৮
হিন্দু মেলা ৭
হিন্দুশাস্ত্র ৮০, ৯২, ৯৬, ১৮৫, ২১৯, ৩০০,
হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ১০
হিন্দু সমাজ ১, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৭, ২০, ২৩ ২৯, ৩২, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৭, ৬৭,৮১ ১০২, ১০৯, ১১০, ১১২, ১৬৮, ১৭৬, ২০৭ ২১০, ২১৩, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২১০, ২২৩, ২২৫; ২২৭, ২৩০, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৬, ২৬৩, ২৭৫, ২৭৯, ৩৩৬, ৩৩৮, ২৫৬, ২৬৩, ২৭৫, ২৭১, ৩৩৬, ৩৩৮, ৪১২
হিন্দু হিতৈষিনী পত্রিকা ১০৯, ১১৬
হিরণ কুমার ৩০৩
হারালাল ঘোষ ২৫০
হীরালাল মিত্র ৩৭৮
হুগলি ২৭০
হেনরি কোলব্রুক ১
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ২৬৬, ২৬৭ ২৬৭
হেম চাঁদ ১২৪, ২৯৯, ৩২৪
হেমলতা ২১৭
হেমাঙ্গিনী ২৪০, ২৪, ২৪৭, ২৯৬
হৈমবতী দেবী ১১৪

A Sketch of the condition of the Hindoo Woman ২২
Act III of 1872 ২২৫
Annette Akroyd. ২৯০, ৪১৩

Babu Navin chandra. ৩৬৬
Bengal Social Science Association. ৩৫১,
Bombay Temperance Advocate. ৩৫১
British and Foreign Temperence Society. ৩৫১

C. H. A. Dall ৪১৩
Calcutta Review ১০৩, ১০৪, ১৫৭; ২৭১, ৩৬৬
Calcutta university ২৮২
Caroline Norton. ২৬৫, ৩২২
Civil Law ৪৩৪,
Comptroller of Accounts. ১১৩

E. A. gait ১৪৮
East India Compny ৪২৩, ৪৩৩

Fanny parks ৩২০
Female Juvenile Society for the

Establishment and Support of Bengal Female schools. ২৭৩
Friend of India ২০

Grant **(Mr.)** ৪৩৪
Gregory ২৬৫

Hannah More ২৬৫, ৩২২
Hindoo law ৪২৩, ৪৩৩, ৪৩৪
Hindu intelligencer ২৬৪
Hindu Patriot ৪৯, ৩৩৭, ৩৪৮
House of Commons ৩৫১

I. C. Sharma· ৪৩৩
India office library. ৪১৭
Indian Association. ৪১০
Indian Mirror. ৩৩৭

J. S. Mill ২৬৬
Literary chronicles ২৬৪
Lox Loci (আইন) ৩৫

Mary Anne Radcliffe ২৬৫, ৩২২
Mary Berry ২৬৫
Mary carpenter ৬১৩
Mary Hay ২৬৫
Mary Somerville ২৬৫
Mary wollstone craft ২৬৫, ৩২২
Max Muller ৫৫
Mirror ২১৭, ২২৪, ৩৯৩

National Paper ৭
Norms of family life and personal morality among the Bengali Hindu elite, 1600-1850 (in **Aspects of Bengali History and Socity,** ed. by R. V. M Baumer, Hawaii, 1974) ১০

On Native Education (প্রবন্ধ) ২২
Orthodox Hindoos. ৪২৪

Reform, Civil and Social ২২

Shastras ৪২৩, ৪২৪, ৪৩৩
Sic ১৫২, ২৮৫, ৩০৪
Society for the Acqusition of General Knowledge. ২১

Temperance Hymn. ৩৫২
Temperance Society Record. (সাময়িক পত্র) ৩৫১
The East III, 1877. ১১১
The kulin Brahmins of Bengal. (প্রবন্ধ) ১০৪
The Tree of Intemperance. (গ্রন্থ) ৩৫৭
Thomas gisborne ২৬৫

Well Wisher ৩৫৫
widow Remarriage Papers ৪২৩
Willam Thompson. ২৬৫